গল্প পঞ্চাশৎ

হুমায়ূন আহমেদ

গল্প সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

AMARBOI.COM

রূপা

'ভাই, আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান?'

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে — তাও এমন কোনো আলাপ না। আমি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি কি–না জানতে চাইলেন। আমি বললাম 'হ্যাঁ' এবং ভদ্রতা করে জানতে চাইলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার স্ত্রীকে রিসিভ করতে এসেছি। ও চিটাগাং থেকে আসছে। ট্রেন দু'ঘন্টা লেট। ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় যাবো আবার আসবো, ভাবলাম অপেক্ষা করি।

তাঁর সঙ্গে এইটুকুই আমার আলাপ। এই আলাপের সূত্র ধরে কেউ যখন বলে, ভাই আপনি কি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনতে চান, তখন খানিকটা হলেও বিস্মিত হতে হয়। অপরিচিত লোকের কাছ থেকে গল্প শোনার আগ্রহ আমার কম। তাছাড়া আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি — ইন্টারেস্টিং গল্প বলে যে গল্প শুরু হয় সে গল্প কখনোই ইন্টারেস্টিং হয় না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান হলে আমার চুপ করে থাকার অর্থ বুঝতে পারবেন। বুদ্ধিমান না হলে এই গল্প আমার শুনতেই হবে।

দেখা গেলো ভদ্রলোক মোটেই বুদ্ধিমান নন। পকেট থেকে পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে সাজাতে গল্প শুরু করলেন —

'আপনি নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয়ে আমার কথা শুনছেন। নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ হড়বড় করে গল্প বলা শুরু করেছে। বিরক্ত হবারই কথা। কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন? আজ আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনে আমার মজার গল্পটা কাউকে না কাউকে বলতে ইচ্ছা করে। যদি অনুমতি দেন — গল্পটা বলি।'

'বলুন।'

'আপনি কি পান খান?'

জ্বি – না।'

'একটা খেয়ে দেখুন মিষ্টি পান। খারাপ লাগবে না।'

'আপনি কি বিশেষ দিনে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে পানও খাওয়ান?'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আন্তরিক ভঙ্গিতেই হাসলেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মতো হবে। অত্যন্ত সুপুরুষ। ধবধবে সাদা পায়জামা–পাঞ্জাবীতে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে।

AMARBOI.COM

মনে হচ্ছে তিনি স্ত্রীর জন্যে খুব সেজেগুজেই এসেছেন।

'প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছি — পদার্থ বিদ্যায়। এখানে অন্ধকার বলে আপনি সম্ভবত আমাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না। আলো থাকলে বুঝতেন আমি বেশ সুপুরুষ। কুড়ি বছর আগে দেখতে রাজপুত্রের মতো ছিলাম। ছাত্রমহলে আমার নাম ছিলো — 'দ্যা প্রিন্স।' মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেয়ে মহলে আমার কোনো পাত্তা ছিলো না। আপনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কি-না জানি না — পুরুষদের রূপের প্রতি মেয়েরা কখনো আকৃষ্ট হয় না। পুরুষদের সব কিছুই তাদের চোখে পড়ে — রূপ চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে ভাব করার জন্য কিংবা কথা বলার জন্যে এগিয়ে আসেনি। আমিও নিজ থেকে এগিয়ে যাইনি। কারণ আমার তোতলামি আছে। কথা আটকে যায়।'

আমি ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি তো কোনো তোতলামি দেখছি না। আপনি চমৎকার কথা বলে যাচ্ছেন।

'বিয়ের পর আমার তোতলামি সেরে যায়। বিয়ের আগে প্রচণ্ড রকম ছিলো। অনেক চিকিৎসাও করেছি। মার্বেল মুখে নিয়ে কথা বলা থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথি অষুধ, পীর সাহেবের তাবিজ কিছুই বাদ দেইনি। যাই হোক — গল্পে ফিরে যাই, আমার সাবসিডিয়ারী ছিলো ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি সাবসিডিয়ারীতে একটি মেয়েকে দেখে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো। কি মিষ্টি চেহারা! দীর্ঘ পল্লব, ছায়াময় চোখ। সেই চোখ সব সময় হাসছে। ভাই, আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েছেন?'

'জ্বি - না।'

'প্রেমে না পড়লে আমার সেই সময়কার মানসিকতা আপনাকে বুঝাতে পারবো না। আমি প্রথমদিন মেয়েটিকে দেখেই পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সারারাত ঘুম হলো না। প্রচণ্ড পানির পিপাসায় একটু পরপর গলা শুকিয়ে যায়। পানি খাই আর মহসিন হলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি।

সপ্তাহে আমাদের দু'টা মাত্র সাবসিডিয়ারী ক্লাস। রাগে-দুঃখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে। প্রতিদিন একটা করে সাবসিডিয়ারী ক্লাস থাকলে কি ক্ষতি হতো? সপ্তাহের দু'টা ক্লাস মানে পঞ্চাশ মিনিট করে একশ' মিনিট। এই একশ' মিনিট চোখের পলকে শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া মেয়েটা খুব ক্লাস ফাঁকি দেয়। এমনও হয়েছে সে পর পর দু'সপ্তাহ কোনো ক্লাস করলো না। তখন আমার ইচ্ছা করতো লাফ দিয়ে মহসিন হলের ছাদ থেকে নীচে পড়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাই। সে যে কি ভয়াবহ কষ্ট আপনি বুঝবেন না। কারণ আপনি কখনো প্রেমে পড়েননি।'

'মেয়েটার নাম তো বললেন না, তার নাম কি?'

'তার নাম রূপা। সেই সময় আমি অবশ্যি তার নাম জানতাম না। নাম কেন —কিছুই জানতাম না। কোন্ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী তাও জানতাম না। শুধু জানতাম তার সাবসিডিয়ারীতে ম্যাথ আছে এবং সে কালো রঙের একটা মরিস মাইনর গাড়িতে করে আসে। গাড়ির নাম্বার — ভ ৮৭৮১।'

'আপনি তার সম্পর্কে কোনো রকম খোঁজ নেননি?'

AMARBOI.COM

'না। খোঁজ নেইনি। কারণ আমার সব সময় ভয় হতো খোঁজ নিতে গেলেই জানবো — মেয়েটির হয়তো বা কারো সঙ্গে ভাব আছে। একদিনের একটা ঘটনা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন — সাবসিডিয়ারী ক্লাসের শেষে আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটা হেসে হেসে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। সব ক্লাস বাদ দিয়ে হলে চলে এলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আমার জ্বর এসে গেলো।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য তো বটেই। পুরো দু'বছর আমার এই ভাবেই কাটিলো। পড়াশোনা মাথায় উঠলো। তারপর একদিন অসীম সাহসের কাজ করে ফেললাম। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভারের কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিলাম। তারপর মেয়েটিকে সম্বোধনহীন একটা চিঠি লিখলাম। কি লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। তবে চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে — আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। তাকে রাজি হতেই হবে। রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বাড়ির সামনে না খেয়ে পড়ে থাকবো। যাকে পত্রিকার ভাষায় বলে 'আমরণ অনশন।' গল্পটা কি আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ হচ্ছে। তারপর কি হলো বলুন। চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিলেন?'

'না। নিজেই হাতে করে নিয়ে গেলাম। ওদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম, এ বাড়ির একজন আপা আছেন না — ইউনিভার্সিটিতে পড়েন — তাঁর হাতে দিয়ে এসো। দারোয়ান লক্ষ্মী ছেলের মতো চিঠি নিয়ে চলে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, আপা বলেছেন তিনি আপনেরে চিনেন না। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমি তাঁকে চিনি। এটাই যথেষ্ট।

এই বলে আমি গেটের বাইরে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বুঝতেই পারছেন — নিতান্তই পাগলের কাণ্ড। সেই সময় মাথা আসলেই বেঠিক ছিলো। লজিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। যাই হোক, সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কোনো রকম ঘটনা ছাড়াই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। লক্ষ্য করলাম দোতলার জানালা থেকে মাঝে, মধ্যে কিছু কৌতূহলী চোখ আমাকে দেখছে। বিকেল চারটায় এক ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বের হয়ে কঠিন গলায় বললেন, যথেষ্ট পাগলামি করা হয়েছে। এখন বাড়ি যাও।

আমি তাঁর চেয়েও কঠিন গলায় বললাম, যাবো না।

'পুলিশে খবর দিচ্ছি। পুলিশ এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'কোনো অসুবিধা নেই খবর দিন।'

'ইউ রাস্কেল মাতলামি করার জায়গা পাও না?'

'গালাগালি করছেন কেন? আমি তো আপনাকে গালি দিচ্ছি না।'

ভদ্রলোক রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। তার পরপরই শুরু হলো বৃষ্টি। ঢালাও বর্ষণ। আমি ভিজছি নির্বিকার ভঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝছি যে জ্বর এসে যাচ্ছে। সারাদিন রোদে পোড়ার পর এই ঠাণ্ডা বৃষ্টি সহ্য হবে না। তখন একটা বেপরোয়া ভাব চলে এসেছে — যা হবার হবে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

AMARBOI.COM

ইতিমধ্যে আমি আশেপাশের মানুষদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আমি তাঁদের সবাইকে বলেছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি একজন পাগল মানুষ।

মেয়েটির বাড়ি থেকেও হয়তো টেলিফোনে এই বিচিত্র ঘটনার কথা কাউকে কাউকে জানানো হয়েছে। তিনটি গাড়ি তাদের বাড়িতে এলো। গাড়ির আরোহীরা রাগী ভঙ্গিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন।

রাত ন'টা বাজলো। বৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও থামলো না। জ্বরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। দারোয়ান এসে আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, সাহেব পুলিশ আনতে চাইতেছে, বড় আফা রাজি না। বড় আফা আপনের অবস্থা দেইখ্যা খুব কানতাছে। টাইট হইয়া বইয়া থাকেন।

আমি টাইট হয়ে বসে রইলাম।

রাত এগারোটা বাজলো। ওদের বাড়ির বারান্দায় বাতি জ্বলে উঠলো। বসার ঘরের দরজা খুলে মেয়েটি বের হয়ে এলো। মেয়েটির পেছনে পেছনে ওদের বাড়ির সব ক'জন মানুষ। ওরা কেউ বারান্দা থেকে নামলো না। মেয়েটি একা এগিয়ে এলো। আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং অসম্ভব কোমল গলায় বললো, কেন এমন পাগলামি করছেন?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। অন্য একটি মেয়ে। একে আমি কোনোদিন দেখিনি। মরিস মাইনর গাড়ির ড্রাইভার আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে। হয়তো ইচ্ছা করেই দিয়েছে।

মেয়েটি নরম গলায় বললো, আসুন, ভেতরে আসুন। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। আসুন তো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বলতে চেষ্টা করলাম, কিছু মনে করবেন না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি সেই মেয়ে নন। আপনি অন্য একজন। মেয়েটির মমতায় ডুবানো চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলা সম্ভব হলো না। এতো মমতা নিয়ে কোনো নারী আমার দিকে তাকায়নি।

জ্বরের ঘোরে আমি ঠিকমতো পা ফেলতে পারছিলাম না। মেয়েটি বললো, আপনার বোধহয় শরীর খারাপ। আপনি আমার হাত ধরে হাঁটুন। কোনো অসুবিধা নেই।

বাসার সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠিন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সবার কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলো। যে গভীর ভালোবাসায় হাত বাড়ালো সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। আমি তার হাত ধরলাম। এই কুড়ি বছর ধরেই ধরে আছি। মাঝে মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করি। ভ্রান্তির এই গল্প আমার স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছা করে। বলতে পারি না। তখন আপনার মতো অপরিচিত একজন কাউকে খুঁজে বের করি। গল্পটা বলি। কারণ আমি জানি — এই গল্প কোনোদিন আমার স্ত্রীর কানে পৌঁছাবে না। আচ্ছা ভাই, উঠি। আমার ট্রেন এসে গেলো।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনে ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। ট্রেন সত্যি সত্যি এসে গেলো।

AMARBOI.COM

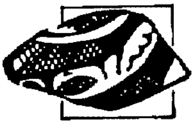

বুড়ি

রাত দুপুরে কুঁ-কুঁ পোঁ-পোঁ শব্দ।

সবে শুয়েছি, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছে — বিচিত্র শব্দে উঠে বসলাম, ব্যাপারটা কি? আমেরিকায় নতুন এসেছি। এদের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে এখনো তেমন পরিচয় হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে হয়।

এখন যেখানে আছি তার আমেরিকান নাম রুমিং হাউস। পায়রার খোপের মত ছোট্ট একটা ঘর। সেই ঘরে সোফা-কাম-বেড, পড়ার টেবিল। টেবিলের একপাশে একটা এফ.এম. রেডিও। এই হল আমার ঘরের সাজসজ্জা। ভাড়া পঞ্চাশ ডলার — জলের দাম বলা চলে। আমেরিকান এক দম্পতি তাদের বসতবাড়ি দোতলার সব ক'টা ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। দরিদ্র বিদেশী ছাত্ররা এইসব ঘরে থাকে। কমন বাথরুম। রান্নাঘর নেই। খেতে হয় বাইরে। সিগারেট খাওয়া যায় না, ল্যান্ড লেডি ঘর ভাড়া দেয়ার সময় কঠিন গলায় এই তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। উঁচু ভল্যুমে স্টেরিও শোনাও নিষিদ্ধ। নানান বাধ্যবাধকতা। তবুও এখানে উঠে এসেছি। কারণ — সস্তা ঘর ভাড়া, তাছাড়া জায়গাটা ইউনিভার্সিটির খুব কাছে। ওয়াকিং ডিসটেন্স। নর্থ ডেকোটার এই প্রচণ্ড শীতে দূর থেকে ক্লাস করতে আসা সম্ভব নয়। একটা গাড়ি কিনে নেব সেও দুরাশা। দুপুরে ইউনিভার্সিটি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে খেয়ে নেই। সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরি সঙ্গে থাকে একটা হ্যামবার্গার। ঐ খেয়ে রাত পার করি।

রুমিং হাউসে উঠে এসেছি পনেরো দিন হল। কারো সঙ্গে তেমন পরিচয় হয়নি। আমার পাশের রুমে আছে ভারতীয় ছাত্র অনন্ত নাগ। সে আমাকে দেখলেই 'আবে ইয়ার' বলে একটা চিৎকার দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। কথাবার্তা এই পর্যন্ত। কোণার দিকের ঘরে থাকে কোরিয়ান ছাত্র 'হান'। সে ইংরেজী একেবারেই জানে না। আমাকে একদিন এসে বলল — 'হেড পেইন মার্ডার, মার্ডার'। অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম — সে বলার চেষ্টা করছে মাথার যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছি। তার সঙ্গে ভাষার কারণেই ভাব হবার কথা নয়। আমার ঠিক মুখোমুখি ঘরে থাকে ফিলিপিনো মেয়ে তোহা। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স, অত্যন্ত রূপবতী। এই মেয়েটির ভাবভঙ্গি বিচিত্র। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। প্রায়ই গভীর রাতে ফুঁপিয়ে কাঁদে। পঞ্চম বোর্ডার এক আমেরিকান বুড়ি নাম এলিজাবেথ। শুরুতেই আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল — আমেরিকান বুড়িদের কাছ থেকে যেন শত হস্ত দূরে থাকি। আমেরিকান সমাজে বুড়োবুড়ির কোন স্থান নেই। তারা খুবই নিঃসঙ্গ। কাজেই কথা বলার কাউকে পেলে বুড়োবুড়িরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়। অনন্ত নাগ আমাকে বলে দিয়েছে — এই বুড়িকে পাত্তা দেবে না। পাত্তা দিয়েছ কি মরেছ। সিন্দাবাদের ভূতের মত কাঁধে চেপে বসবে, আর নামাতে পারবে না।

AMARBOI.COM

বুড়ি কয়েকবারই আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে, আমি অনন্ত নাগের উপদেশ মনে রেখে শুকনো গলায় বলেছি — এখন তো কথা বলতে পারব না, পড়াশোনা করছি। বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, 'আচ্ছা আচ্ছা, পরে কথা হবে। এক জাহাজের যাত্রী, দেখা তো হবেই . . . হা-হা-হা। বরং এক কাজ করো, তোমার লেখাপড়ার চাপ যখন কম থাকবে আমার ঘরে চলে এসো। গল্প করব।'

আমি এখনো তার ঘরে যাইনি। যাবার উৎসাহ বোধ করিনি।

এখন এই মধ্যরাতে বিছানায় জেগে বসে আছি — শুনছি বিচিত্র কোঁ-কোঁ শব্দ। মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। পরদিন ভোরে মিডটার্ম পরীক্ষা। ভাল ঘুম দরকার। এ-কি যন্ত্রণা। শব্দের উৎসের সন্ধানে দরজা খুলে বাইরে বের হলাম। দেখা হল অনন্ত নাগের সঙ্গে। সেও বিরক্ত মুখে বের হয়েছে। আমি বললাম, কিসের শব্দ?

অনন্ত শুকনো গলায় বলল, 'ব্যাগ পাইপ।'

'ব্যাগ পাইপটা কি?'

'এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। আইরিশরা বাজায়। ফুসফুসের মারাত্মক জোর লাগে।'

'বাজাচ্ছে কে?'

'এলিজাবেথ। কি যন্ত্রণা বল তো দেখি। তুমি কি বুড়িকে বলে আসবে — এখন মিডনাইট। বুড়ির কোন রাইট নেই মিডনাইটে আমাদের বিরক্ত করার।'

আমি এলিজাবেথের ঘরের দিকে এগুলাম। দরজা হাট করে খোলা। বুড়ি বিছানায় পা তুলে ব্যাগ পাইপ নিয়ে বসে আছে। এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাতে ফুসফুসের প্রচণ্ড জোর লাগার কথা। আশি বছরের বুড়ি এই জোর কোথায় পেল কে জানে?

আমাকে দেখেই বুড়ি হাসিমুখে উঠে এল — আহমাদ, ওয়েলকাম।

প্রথমেই অভদ্র হওয়া যায় না। আমি বললাম, কেমন আছ?

'ভাল। খুব ভাল। গ্যারাজ সেল থেকে একটা ব্যাগ পাইপ কিনে ফেললাম। একেবারে ব্রাণ্ড নিউ। মাত্র কুড়ি ডলারে দিয়ে দিল। চমৎকার না জিনিসটা?'

'হ্যাঁ, চমৎকার।'

'অনেকদিন থেকেই শখ ছিল একটা বাদ্যযন্ত্র বাজান শিখব তাই . . .'

'ব্যাগ পাইপ বাজান তো খুব কঠিন। শুনেছি ফুসফুসের খুব জোর লাগে।'

'তা লাগে। প্রথমে বাতাস ভরাটাই কষ্ট। একবার ভরা হয়ে গেলে মোটামুটি সহজ বলা চলে। তুমি বস না — দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'আমি অন্য একদিন এসে বসব। কাল আমার একটা পরীক্ষা। মিডটার্ম। আমার ঘুম দরকার।'

'অফকোর্স। আমার বাদ্যযন্ত্রে তোমার ঘুমের অসুবিধা করলাম কি?'

'কিছুটা করেছ।'

'স্যরি। এক্সট্রিমলি সরি। আর বাজাব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। জাস্ট এ মিনিট, তোমাকে এক মগ হট কোকা বানিয়ে দিচ্ছি। হট কোকার মত ঘুমের অষুধ হয় না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, হট কোকা খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'না বললে হবে না। আমার কথা শোন, খেয়ে দেখ। মরার মত ঘুমুবে। হাসবেণ্ডের মৃত্যুর

AMARBOI.COM

পর আমার অনিদ্রা রোগ হল। সারারাত জেগে থাকি, ঘুম আসে না। তখন এই অষুধটা আবিষ্কার করলাম।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে বলতে বুড়ি হিটিং কয়েল দিয়ে পানি গরম করে ফেলেছে। কোকা প্রস্তুত।

আমাকে খেতে হল। খেতে খেতে বুড়ির গল্প শুনতে হল। তার চার ছেলে-মেয়ে। একেক জন একেক জায়গায়। গত দশ বছর ধরে কারো সঙ্গে দেখা নেই। তবে যোগাযোগ আছে। ওরা চিঠি লেখে, ছবি পাঠায়।

'আহমাদ, তুমি আমার নাতী-নাতনিদের ছবি দেখবে?'

'আজ থাক, অন্য একদিন দেখব।'

'আচ্ছা থাক। তুমি আরাম করে ঘুমাও। গরম কোকা খেয়েছ — চমৎকার ঘুম হবে। দেখবে এক ঘুমে রাত কাভার।'

গরম কোকা খাওয়ার কারণেই হয়ত সেই রাতে এক ফোঁটা ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটালাম। ভোরবেলা বাথরুমে যাচ্ছি, এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা। সে হাসিমুখে বলল, কেমন ঘুম হল বল তো? আমি বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, ভালই।

বুড়ি উল্লসিত গলায় বলল, বলেছি না চমৎকার ঘুম হবে। কি, কথা ঠিক হল?

রুমিং হাউসের বুড়ি আমাদের খুব বিরক্ত করতে লাগল।

জানা গেল সে ডাকযোগে ব্যাগ পাইপ বাজান শিখছে। ডাকযোগে বাইবেল শেখা যায় জানি, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র বাজানও যে শেখা যায় জানতাম না। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

কিছুদিন পরপরই মাঝরাতে কোঁ-কোঁ পোঁ-পোঁ শব্দ হতে থাকে। তিক্ত-বিরক্ত অবস্থা। একদিন অনন্ত নাগ খুব চিৎকার-চেচামেচি করে এল —

'তুমি বাজনা শিখছ ভাল কথা। দুপুর রাতে কেন? দিনে শিখতে পার না? দিনে আমরা কেউ থাকি না — ঘর থাকে ফাঁকা।'

'দিনে আমার নানান কাজকর্ম থাকে।'

'তোমার আবার কিসের কাজকর্ম? তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও।'

'এটাই আমার কাজ।'

'খুব ভাল কথা। রাতে যখন তোমার ঐ যন্ত্র বাজাও — দরজাটা বন্ধ করে রাখতে পার না?'

'এই বাদ্যযন্ত্র ফাঁকা জায়গায় বাজাতে হয়। ইনস্ট্রাকশানে লেখা আছে। বিশ্বাস না করলে পড়ে দেখতে পার।'

'তোমার নামে বাড়িওয়ালার কাছে আমরা নালিশ করব।'

'করতে চাইলে কর। তাতে লাভ হবে না। বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমার যে লীজ এগ্রিমেন্ট হয়েছে সেখানে লেখা নেই যে, ব্যাগ পাইপ বাজান যাবে না।'

'তুমি অতি নিম্নশ্রেণীর একটি প্রাণী।'

'ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলবে না। আচ্ছা যাও, আর বাজাব না।'

কয়েকদিন সত্যি সত্যি বাজনা বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয়। রাগে দাত কিড়মিড় করি। কিন্তু বুড়ি সদাহাস্যময়ী। দেখা হলে একগাদা কথা বলবেই —

AMARBOI.COM

'আমার নাতনি এ্যানীর দাঁত উঠেছে। ছবি পাঠিয়েছে। দেখবে? কি যে সুন্দর। এঞ্জেলের মত লাগে। আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে তার মত সুন্দর বাচ্চা জন্মায়নি। সামারে তাকে দেখতে যাব। ছেলেকে লিখেছি টিকিট পাঠাতে। ও টিকিট না পাঠালে যেতে পারব না। ও লিখেছে পাঠাবে।

ছেলে টিকিট পাঠায় না। বুড়ির যাওয়া হয় না। আমেরিকার অসংখ্য হতদরিদ্র বুড়িদের সে একজন। সোস্যাল সিকিউরিটির টাকায় কোনক্রমে বেঁচে আছে। বাড়ি ভাড়া, খাবার খরচ এবং মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স দিয়ে বুড়ির কাছে কিছুই থাকে না। এর মধ্যে তার আবার পার্টি বাতিক আছে। সস্তা ধরনের কয়েক বোতল মদ কিনে সে প্রায়ই পার্টি লাগিয়ে দেয়। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখি দরজার গায়ে নোট ঝুলছে। নোটে প্যাঁচান হরফে লেখা—

> প্রিয় বন্ধু,
> আজকের দিনটি আমার জীবনের বিশেষ দিন। এই দিনে আমার স্বামী ববের সঙ্গে প্রথম দেখা। এই দিনেই আমরা প্রথম একসঙ্গে ডিনার করি এবং বব আমাকে বলে — I love you. বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্যে ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করেছি। আয়োজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তুমি আসবে।

পার্টিতে যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। বুড়ি দশ মিনিট পরপর এসে বলবে, কই এখনো এলে না। সবাই এসে গেছে শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা। আমি যাবার পর দেখি — আমিই শুধু এসেছি আর কেউ আসেনি। বুড়ি এক কথা সবাইকে বলে বলে আসছে।

ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলে কিছু পটেটো চিপস্, চিনাবাদাম, কাজুবাদাম এবং দু'বোতল রেড ওয়াইন—যার দাম বড়জোর ছ' থেকে সাত ডলার।

ঠোটে টকটকে লাল রঙ মেখে বুড়ি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার আনন্দের সীমা নেই। পার্টিতে লোক বলতে আমরা ক'জন। বাড়িওয়ালা—বাড়িওয়ালী কখনো আসে না। বুড়ির বাইরের কোন বন্ধুবান্ধবও নেই। আমাদেরই সে বোধহয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ধরে নিয়েছে।

পার্টির মধ্যমণি হয়ে লাল মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বুড়ি এর–তার কাছে যায়। উজ্জ্বল চোখে বলে, জীবন বড় আনন্দময়, কি বল?

আমরা বিরস মুখে বলি, হ্যাঁ।

'বড় সুন্দর পার্টি হল। অসাধারণ।'

'হ্যাঁ — অসাধারণ।'

'আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার ইয়্যুথে ফিরে গেছি।'

'খুবই ভাল কথা — ফিরে যাও।'

এলিজাবেথ তার যৌবনে ফিরে যাবার ব্যবস্থা এত ঘনঘন করতে লাগল যে, আমরা তিক্ত–বিরক্ত হয়ে গেলাম। পার্টিতে যাওয়া বন্ধ। সে এসে করুণ গলায় বলে, আজ আমার এমন একটা বিশেষ দিন আর তোমরা কেউ আসবে না?

AMARBOI.COM

'পড়াশোনার খুব চাপ।'

'আজ দিনটি আমার জন্য খুবই স্পেশাল। আজ বব আমাকে প্রপোজ করেছিল। ষাট বছর আগের কথা অথচ মনে হয় সেদিন . . . '

'প্লীজ, আজ যেতে পারব না। এ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে।'

'ঘণ্টাখানিকের জন্যে এসো।'

'অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব।'

বুড়ি একা একাই পার্টি করে এবং এক সময় ভয়াবহ ব্যাগ পাইপ বেজে উঠে। আমাদের কাউকে–না–কাউকে ছুটে যেতে হয়। আমাদের কাছে অসহ্য বোধ হয়।। একি যন্ত্রণা !

যাই হোক, শীতের শুরুতে যন্ত্রণার অবসান হল। জানা গেল, টাকা–পয়সার অভাবে এলিজাবেথ তার ব্যাগ পাইপ বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাঁচা গেল, এখন আর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ছুটে যেতে হবে না।

এক বিকেলের কথা। অনন্তের কাছে শুনলাম বুড়ি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। অবস্থা খুব ভাল নয়। মনটা একটু খারাপই হল। সেন্ট জোসেফ হাসপাতালে বুড়িকে দেখতে গেলাম। বুড়ি মহাখুশি। উজ্জ্বল চোখে বলল, কার্ড, কার্ড এনেছ?

অসুস্থ কাউকে দেখতে হলে কার্ড নিয়ে যাওয়ার নিয়ম আছে। আমি গেট ওয়েল কার্ড নিতে ভুলে গেছি।

এলিজাবেথ বলল, আমি কার্ডগুলি জমাচ্ছি। তুমি পরেরবার আসার সময় কার্ড নিয়ে এসো।

'আচ্ছা, আনব।'

'এই দেখ হান কি সুন্দর কার্ড দিয়েছে, এই কার্ডটা দিয়েছে 'তোহা', আহা মেয়েটা বড় ভাল। অনন্ত কি করছে দেখ — শুধু যে কার্ড দিয়েছে তাই না, ফুলও নিয়ে এসেছে। বেচারার টাকা–পয়সা নেই — এর মধ্যে এত খরচ। আমি খুব রাগ করেছি।'

বুড়ির আনন্দ দেখে বড় ভাল লাগল। ভিজিটিং আওয়ারের শেষে বের হচ্ছি — বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে বলল, তোমাদের কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপার আছে।

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকালাম। বুড়ি লাজুক গলায় বলল, ব্যাগ পাইপ কেন বাজাতাম জান? একা একা থাকতে এত খারাপ লাগত। কুৎসিত বাজনাটা বাজালেই তোমরা কেউ না কেউ আসতে — খানিকক্ষণ কথা বলতে পারতাম। স্যরি, তোমাদের কষ্ট দিয়েছি।

আমার মনটা অসম্ভব খারাপ হল। কোন কথা বলতে পারলাম না।

বুড়ি দু'মাস রোগ ভোগ করে সুস্থ হল। তার বাড়ি ফেরা উপলক্ষে আমরা ছোট্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করলাম। শুধু পার্টিই না — বুড়ির জন্যে সামান্য উপহারও আছে — নতুন একটা ব্যাগ পাইপ। আমরা সবাই চাঁদা করে কিনেছি।

আমেরিকানরা কাঁদতে পারে না–এই কথা যে বলে সে মহামূর্খ। অনন্ত নাগ যখন ব্যাগ পাইপ বুড়ির হাতে তুলে দিল — বুড়ি অবাক হয়ে আমাদের সবার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শিশুদের মত চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কান্নার এমন মধুর দৃশ্য আমি আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

AMARBOI.COM

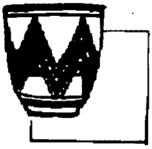

একটি নীল বোতাম

বারান্দায় এশার বাবা বসেছিলেন।

হাঁটু পর্যন্ত তোলা লুঙ্গি, গায়ে নীল রঙের গেঞ্জী। এই জিনিস কোথায় পাওয়া যায় কে জানে? কি সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ধবধবে শাদা। আকাশী রঙের গেঞ্জীতে তাঁর গায়ের রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। সব মিলিয়ে সুখী-সুখী একটা ছবি। নীল রঙটাই বোধহয় সুখের। কিংবা কে জানে ভদ্রলোকের চেহারাটাই বোধহয় সুখী-সুখী। কালো রঙের গেঞ্জীতেও তাঁকে হয়ত সুখী দেখাবে।

তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমি ইচ্ছা করেই গেটে একটু শব্দ করলাম। তিনি আমাকে দেখলেন। সুন্দর করে হাসলেন। ভরাট গলায় বললেন, আরে রঞ্জু, তুমি? কি খবর? ভাল আছ?

জ্বি ভাল ।

গরম কি রকম পড়ছে বল দেখি?

খুব গরম।

আমার তো ইচ্ছা করছে চৌবাচ্চায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকি।

তিনি তাঁর পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, বসো। তোমার কাছ থেকে দেশের খবরা-খবর কিছু শুনি।

আমার কাছে কোন খবরা-খবর নেই চাচা।

না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে বল। বর্তমানে চালু গুজব কি?

আমি বসলাম তাঁর পাশে। এশার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে এসে শুনি এশা নেই — মামার বাড়ি গেছে। রাতে ফিরবে না। তার মামার বাড়ি ধানমণ্ডিতে। প্রায়ই সে সেখানে যায়। আমার খানিকটা মন খারাপ হয়। কিন্তু এশার বাবার সঙ্গে কথা বললে আমার মন-খারাপ ভাবটা কেটে যায়।

এই যে এখন বসলাম উনার পাশে — এখন যদি শুনি এশা বাসায় নেই, মামার বাড়ি গিয়েছে — অমার খুব খারাপ লাগবে না ।

তারপর রঞ্জু নতুন কোন গুজবের কথা তাহলে জান না?

জ্বি না ।

বল কি তুমি? শহর ভর্তি গুজব। আমি তো ঘরে বসে কত কি শুনি। চা খাবে?

জ্বি না ।

খাও এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। তুমি আরাম করে বস। আমি চায়ের কথা বলে আসি।

আপনাকে বলতে হবে না, আমি বলে আসছি। এশা কি বাসায় নেই?

আছে। বাসাতেই আছে।

AMARBOI.COM

বলেই তিনি চায়ের কথা বলতে উঠে গেলেন । কি চমৎকার তাঁর এই ভদ্রতা। আমি কে? কেউ না। অতি সামান্য একজন। একটা এ্যাড ফার্মে কাজ করি। অল্প যে ক'টা টাকা পাই তার প্রতিটির হিসাব আমার আছে। আর এঁরা? আমার ধারণা, এদের গেটে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান আমার চেয়ে বেশি টাকা পায়। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে এঁদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে এ-বাড়িতে এসেছিলাম। প্রথমদিনেই এশার কি সহজ সুন্দর ব্যবহার যেন সে অনেকদিন থেকেই আমাকে চেনে। সেদিন কেমন হাসিমুখে বলল, আপনি তো বেশ লম্বা। আসুন একটা কাজ করে দিন। চেয়ারে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে খুব উঁচুতে একটা পেরেক লাগিয়ে দিন।

আমি বললাম, এত উঁচুতে পেরেক দিয়ে কি করবেন ?

আজ বলব না। আরেকদিন এসে দেখে যাবেন।

দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে আসার কি চমৎকার অজুহাত তৈরী হল। অথচ অজুহাতের কোন প্রয়োজন ছিল না। এদের বাড়ি — দুয়ারখোলা বাড়ি। যে কেউ যে কোন সময় আসতে পারে। কোন বাধা নেই। অথচ মনে আছে দ্বিতীয়বার কত ভয়ে ভয়ে এসেছি। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। যদি আমাকে কেউ চিনতে না পারে। যদি এশা বিস্মিত হয়ে বলে, আপনি কাকে চান?

সে রকম কিছুই হল না। এশার বাবা আমাকে দেখে হাসি মুখে বললেন, কি ব্যাপার রঞ্জু, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আস, ভেতরে আস।

আমি খানিকটা বিব্রত ভঙ্গিতেই ঢুকলাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, দেশের খবরা-খবর বল। নতুন কি গুজব শুনলে?

এশা বোধহয় বাইরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, বেছে বেছে আজকের দিনটিতেই আপনি এলেন? এখন বেরুচ্ছি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। চট করে আসুন তো, পেরেকটা কি কাজে লাগছে দেখে যান।

আমি ইতস্ততঃ করছি। এশার বাবার সামনে থেকে উঠে যাব, উনি কি মনে করেন কে জানে। উনি কিছুই মনে করলেন না। সুখী-সুখী গলায় বললেন, যাও দেখে আস। জিনিসটা ইন্টারেস্টিং।

পেরেক থেকে হলুদ দড়ির মত একটা জিনিস মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। এশা বাতি নিভিয়ে একটা সুইচ টিপতেই অদ্ভুত ব্যাপার হল। হলুদ দড়ি আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল। সেই আলো স্থির নয়। যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নামছে। আলোর ঝরণা।

অপূর্ব!

কি, অবাক হয়েছেন তো?

হ্যাঁ হয়েছি।

এ রকম অদ্ভুত জিনিস এর আগে কখনো দেখছেন?

জ্বি না।

আমার বড় বোন পাঠিয়েছেন। নেদারল্যাণ্ড থাকেন যিনি, তিনি। এখন যান। বসে বসে বাবার গল্প শুনুন। বাবা কি আপনাকে তার কচ্ছপের গল্পটা বলেছে?

জ্বি না।

তাহলে হয়ত আজ বলবে। বাবার গল্প বলার একটা প্যাটার্ণ আছে। কোনটির পর

AMARBOI.COM

কোন গল্প আসবে আমি সব জানি।

এশা হাসল। কি সুন্দর হাসি। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম — না জানি কোন ভাগ্যবান পুরুষ এই মেয়েটিকে সারা জীবন তার পাশে পাবে।

এশার বাবা সেদিন কচ্ছপের গল্প বললেন না। পরের বার যেদিন গেলাম সেদিন বললেন।

কচ্ছপ কোথায় ডিম পাড়ে জান তো রঞ্জু? ডাঙ্গায়। সে নিজে থাকে কিন্তু পানিতে। চলাফেরা, জীবনযাত্রা সবই পানিতে অথচ তার মন পড়ে থাকে তার ডিমের কাছে ডাঙ্গায়। ঠিক না?

জ্বি ঠিক।

বুড়ো বয়সে মানুষেরও এই অবস্থা হয়। সে বাস করে পৃথিবীতে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে পরকালে। আমার হয়েছে এই দশা।

এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমার মধ্যে বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন হল। আগে বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে চমৎকার লাগতো। এখন আর লাগে না। এক সময় মেয়েদের নিয়ে কেউ কোন কুৎসিত কথা বললে বেশ মজা পেতাম। এখন ভয়ংকর রাগ লাগে। মনে হয় এই কুৎসিত কথাটি কোন না কোন ভাবে এশাকে স্পর্শ করছে। যে খুপড়ি ঘরটায় থাকি সেই ঘর আমার আর এখন ভাল লাগে-না। দম বন্ধ হয়ে আসে। নোনাধরা বিশ্রী দেয়াল। একটি ছোট জানালা যা দিয়ে আলো-বাতাস আসে না রাতের বেলা শুধু মশা ঢুকে। চৈত্র মাসের গরমে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। নানান রকম কল্পনা মাথায় আসে। কল্পনায় আমার এই ঘর হয়ে যায় পদ্মানদীর নৌকায় একটা ঘর। জানালা খুললেই নদী দেখা যায়। সেই নদীতে জোছনা হয়েছে। চাঁদের আলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। আমি জানি কে টোকা দিচ্ছে। তবু কাঁপা গলায় বলি, কে? এশা বলে, কে আবার? আমি। এরকম চমৎকার রাতে আপনি ঘরটর বন্ধ করে বসে আছেন। পাগল নাকি? আসুন তো।

কোথায় যাব?

কোথায় আবার, নৌকার ছাদে বসে থাকব।

আমরা নৌকার ছাদে গিয়ে বসি। মাঝি নোকা ছেড়ে দেয়। এশা গুনগুন করে গায়, যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে। আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।

সবই খুব সুন্দর সুখের কল্পনা। তবু এক এক রাতে কষ্টে চোখে জল আসে। সারারাত জেগে বসে থাকি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, আমার এই জীবনটা আমি কি কিছুতেই বদলাতে পারি না?

বন্ধু-বান্ধব সবাইকে অবাক করে এক সন্ধ্যায় জগন্নাথ কলেজের নাইট সেকশানের এম.এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাই। ধার-টার করে আমার ঘরের জন্যে নতুন পর্দা, বিছানার নতুন চাদর, নেটের মশারী কিনে ফেলি। অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা ফুলদানী কিনি। একশ' টাকা লেগে যায় ফুলদানীতে। তা লাগুক, তবু তো একটা সুন্দর জিনিস। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা যখন এখানে রাখব তখন হয়ত এই ঘরের চেহারাও পাল্টে যাবে। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধুর কাছ

থেকে একদিন প্রায় জোর করে জলরঙা একটা ছবিও নিয়ে আসি। নোনাধরা দেয়ালে সেই ছবি মানায় না। নিজেই চুন এনে দেয়ালে চুনকাম করি।

চুন দেয়ালে আটকায় না, ঝরে ঝরে পড়ে। তবু আমার ঘর দেখে বন্ধুরা চোখ কপালে তুলে।

করছিস কি তুই? ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছিস দেখি। আবার দেখি খুশবুও আসছে। বিছানায় আতর ঢেলে দিয়েছিস নাকি?

মাই গড। মেয়ে মানুষ ছাড়া এই ঘর মানায় না। এক কাজ কর একশ টাকা দিয়ে একটা মেয়ে মানুষ এক রাতের জন্যে নিয়ে আয়। ফূর্তি কর। আমরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি।

রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। কিছু বলি না। কি হবে বলে। আমার বন্ধুরা গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দেয়। সিগারেটের টুকরা দিয়ে মেঝে প্রায় ঢেকে ফেলে। একজন আমার নতুন কেনা বিছনায় চায়ের কাপ উল্টে দিয়ে বলে, যা শালা, চাঁদে কলংক লেগে গেল।

আমি কিছু বলি না। দাঁতে দাঁত চেপে থাকি। আর মনে মনে ভাবি — এই মূর্খদের সঙ্গে কি করে এতদিন কাটিয়েছি। কি করে এদের সহ্য করেছি?

ইরফান বলল, প্রেম ফ্রেম করেছিস কিনা বল। তোর হাবভাব যেন কেমন রঙ্গিলা।

আমি জবাব দেই না। ইরফান পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, জিনিস কেমন বল। টিপে-টুপে দেখেছিস তো?

সবাই হো হো করে হাসে। কোন অন্ধকার-নরকে এরা পড়ে আছে? এদের কি কোনদিন মুক্তি ঘটবে না? আমার ইচ্ছা করে এশাকে একদিন ওদের সামনে উপস্থিত করি। সেটা নিশ্চয়ই খুব অসম্ভব নয়। বললেই সে আসবে। তবে আমার বলতে সাহস করে না।

প্রথম যেদিন তাকে তুমি বললাম কি প্রচণ্ড ভয়ে ভয়েই না বললাম। সে গোলাপ গাছের ডাল ছেঁটে দিচ্ছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কি হল নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, কাঁচিটা আমার হাতে দাও, আমি ছেঁটে দি। বলেই মনে হল — এ কি করলাম আমি? আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। আমার মনে হল সে এবার চোখে চোখে তাকিয়ে শীতল গলায় বলবে, আমাকে তুমি করে বলবেন না। এত ঘনিষ্ঠতা তো আপনার সঙ্গে আমার নেই।

এশা সে রকম কিছুই বলল না। কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল, তিন ইঞ্চি করে কাটবেন। এর বেশী না। আর আপনি কি চা খাবেন?

হ্যাঁ খাব।

চা নিয়ে আসছি। শুনুন, এ রকম কচকচ করে কাটবেন না, ওরা ব্যথা পায়। গাছেরও জীবন আছে। জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা।

এশা ঘরে ঢুকে গেল। চৈত্র মাসের বিকেলে আমি গোলাপ ছাটতে লাগলাম। আমার ত্রিশ বছর জীবনের সেটা ছিল শ্রেষ্ঠতম দিন। বিকালটাই যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। শেষ বিকেলের রোদকে মনে হল লক্ষ লক্ষ গোলাপ, বাতাস কি মধুর। এশার বাবা যখন বাইরে এসে বললেন, তারপর রঞ্জু দেশের খবর কি বল? নতুন কি গুজব শুনলে?

কি যে ভাল লাগল সেই কথাগুলি! মনে হল এরকম সুন্দর কথা এর আগে আমাকে কেউ বলে নি।

AMARBOI.COM

গোলাপের ডাল ছাঁটছি মনে হচ্ছে।

ছিঃ চাচা।

এর একটা ফিলসফিক আসপেকট আছে। সেটা লক্ষ্য করেছ? ফুল ফোটাবার জন্যে গাছকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। হা হা হা।

তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও হাসলাম। এশা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল, এত হাসাহাসি হচ্ছে কেন? আমি কি যোগ দিতে পারি?

ওদের বাড়ি থেকে ফিরলাম সন্ধ্যার পর। এশা গেট পর্যন্ত এল। হাসিমুখে বলল, আবার আসবেন।

এই কথাটি কি পৃথিবীর মধুরতম কথার একটি নয়? আমি আবার আসতে পারি এ বাড়িতে। যতবার ইচ্ছা আসতে পারি। আমাকে কোন অজুহাত তৈরী করতে হবে না। তবুও ছোটখাট কিছু অজুহাত আমি তৈরী করেই রাখি। যেমন একবার আমার একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ ফেলে এলাম যাতে পরদিন গিয়ে বলতে পারি, জরুরী কিছু কাগজপত্র ছিল। যাক পাওয়া গেল। সবচে' বেশী যা করি তা হচ্ছে — গল্পের বই নিয়ে আসি। তারপর সেই বই ফেরত দিতে যাই।

গল্পের বই আমি পড়ি না। ভাল লাগে না। কোন কালেও ভাল লাগেনি। তবু রাতে শুয়ে শুয়ে বইয়ের ঘ্রাণ নেই, পাতা ওল্টাই। এশার স্পর্শ এই বইগুলির পাতায় পাতায় লেগে আছে ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ বোধহয়। গা শিরশির করে। গভীর আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। বই ওল্টাতে ওল্টাতে একরাতে অদ্ভুত এক কাণ্ড হল। টুক করে বইয়ের ভেতর থেকে কি যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখি ছোট একটা নীল রঙের বোতাম। যেন একটা নীল অপরাজিতা। নাকের কাছে নিয়ে দেখি সত্যি গন্ধ আসছে। আমি গভীর মমতায় বোতামটা বালিশের নীচে রেখে দিলাম। সারারাত ঘুম হল না। কেবলি মনে হল একদিন না একদিন এশা আসবে এ বাড়িতে। আমি তাকে বলব, তুমি যে ফুলটি আমাকে দিয়েছিলে সেটা এখনো ভাল আছে। কি সুন্দর গন্ধ। সে অবাক হয়ে বলবে, আমি আবার ফুল দিলাম কবে?

এর মধ্যে ভুলে গেলে? একটা নীল ফুল দিয়েছিলে না ?

বলেন কি! নীল ফুল আমি কোথায় পাব?

আমি বালিশ সরিয়ে বোতামটা বের করে আনব। এশা বিস্মিত হয়ে বলবে — এটা বুঝি আপনার নীল ফুল? আমি বলব, বিশ্বাস না হলে গন্ধ শুঁকে দেখো।

এশার বাবা নিজেই দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন। আমার বড় লজ্জা লাগল। আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ, আপনি কেন? তিনি হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে? খাও, চা খাও। চিনি হয়েছে কি-না বল।

হয়েছে।

গুড। চিনি আমি নিজেই দিয়ে এনেছি। কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ব্যস্ত।

কোন উৎসব নাকি?

না, উৎসব কিছু না। মেয়েলী ব্যাপার। এশার বিয়ে ঠিক হল। ওরা দিন পাকা করতে আসবে। রাত আটটায় আসবে। এখনো তিন ঘণ্টা দেরী অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে . . . ।

MYBOI.COM

আমি নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলাম। এশার বাবা বললেন, ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ সাহেবের ছেলে। তুমি চিনবে নিশ্চয়ই। ইমতিয়াজ চৌধুরী, জিয়ার আমলে হেলথ মিনিস্টার ছিলেন। ছেলেটা খুব ভাল পেয়েছি। জার্মানী থেকে পি-এইচ.ডি করেছে ক্যামিকেল ইন্জিনীয়ারিং-এ। এখন দেশে কি সব ইণ্ডাস্ট্রি দিবে। রঙ তৈরী করবে। আমি ঠিক বুঝিও না।

চা শেষ করবার পরও আমি খানিকক্ষণ বসে রইলাম। যাবার আগে এশা বেরিয়ে এল। কি চমৎকার করেই না আজ তাকে সাজিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হয়। এশা হাসিমুখে বলল, বেছে বেছে আপনি ঝামেলার দিনগুলিতে আসেন কেন বলুন তো?

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার খুপড়ি ঘরে। অন্যসব রাতের মত আজ রাতেও হয়ত ঘুম হবে না। বালিশের নীচ থেকে নীল বোতাম বের করে আজো নিশ্চয়ই দেখব। এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশী পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। এই সহজ সত্যটি আজ রাতেও আমার মাথায় ঢুকবে না। আজ রাতেও বোতামটিকে মনে হবে একটি অপরাজিতা ফুল।

পিপড়া

আপনার অসুখটা কী বলুন?

রুগী কিছু বলল না, পাশে বসে-থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ডাক্তার নূরুল আফসার, এমআরসিপি, ডিপিএস, অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, আটটা বেজে গেছে — রুগী দেখা বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে। আজ তাঁর শ্যালিকার জন্মদিন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গাম থেকে আসা রুগী তিনি পছন্দ করেন না — এরা হয় বেশি কথা বলে, নয় একেবারেই কথা বলে না। ভিজিটের সময় হলে দর-দাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলে মুখে তেলতেলে ভাব ফুটিয়ে বলে, কিছু কম করা যায় না ডাক্তার সাব। গরীব মানুষ।

আজকের এই রুগীকে অপছন্দ করার তৃতীয় কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু নূরুল আফসার সাহেবের কাছে এই কারণটিই প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। লোকটির চেহারা নির্বোধের মত। এই ধরনের লোক নিজের অসুখটাও ঠিকমত বলতে পারে না। অন্য একজনের সাহায্য লাগে।

বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।

লোকটি কিছু বলল না। গলা খাঁকারি দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাবখানা এরকম যে অসুখের কথাবার্তা সঙ্গীটিই বলবে। সে-ও কিছু বলছে না। ডাক্তার নূরুল আফসার হাতঘড়ির দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, গরু-ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয়। আপনি তো আর গুরু ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? নাম কি আপনার?

AMARBOI.COM

রুগী কিছু বলল না। তার সঙ্গী বলল, উনার নাম মকবুল। মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া।

নামটাও অন্য আরেকজনকে বলে দিতে হচ্ছে। আপনি কি কথা বলতে পারেন, না — পারেন না?

পারি।

কী নাম আপনার?

মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া।

বয়স কত?

বায়ান্ন।

আপনার সমস্যাটা কি?

রুগী মাথা নিচু করে ফেলল। নূরুল আফসার সাহেবের ধারণা হল অস্বস্তিকর কোন অসুখ, যার বিবরণ সরাসরি দেয়া মুশকিল।

আর তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এক্ষুণি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।

রুগী আবার গলা খাঁকারি দিল।

তার সঙ্গী বলল, উনার অসুখ কিছু নাই।

অসুখ কিছু নেই, তা এসেছেন কেন?

উনারে পিপড়ায় কামড়ায়।

কী বললেন?

পিঁপড়ায় কামড়ায়। পিপিলিকা।

ডাক্তারী করতে গেলে অধৈর্য হওয়া চলে না। রুগীদের সঙ্গে রাগারাগিও করা চলে না। এতে পশার কমে যায়। রোগের বিবরণ শুনে বিস্মিত হওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রোগের ধরন-ধারন যতই অদ্ভুত হোক ভান করতে হয় যে, এ জাতীয় রোগের কথা তিনি শুনেছেন এবং চিকিৎসা করে আরাম করেছেন। নূরুল আফসার সাহেব ডাক্তারীর এই সব সহজ নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। আজ মানতে পারলেন না। ধমকের স্বরে বললেন, পিপড়ায় কামড়ায় মানে?

রুগী পকেটে হাত দিয়ে একটুকরা কাগজ বের করে বলল, চিঠিটা পড়েন। চিঠির মধ্যে সব লেখা আছে।

কার চিঠি?

কাশেম সাহেব।

কাশেম সাহেব কে?

এমবিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্চলের। খুব ভাল ডাক্তার। উনি আপনার কাছে আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি চিনবেন। উনি আপনের ছাত্র।

নূরুল আফসার সাহেব কাশেম নামের কোন ছাত্রের নাম মনে করতে পারলেন না। কাশেম বহুল প্রচলিত নামের একটি। ক্লাসে প্রতি বছরই দু'একজন কাশেম থাকে। এ কোন্ কাশেম কে জানে।

AMARBOI.COM

স্যার চিনেছেন?

চিনি না বলাটা ঠিক হবে না। পুরানো ছাত্ররা রুগী পাঠায়। এদেরকে খুশি রাখা দরকার। কাজেই আফসার সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, হ্যাঁ চিনেছি। কি লিখেছে দেখি।

উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি চিঠিটা দেখি।

চিঠি দেখে ডাক্তার সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বাঙালী জাতির সবচে' দোষ হল — এরা কোন জিনিস সংক্ষেপে করতে পারে না। দুই পাতার এক চিঠি ফেঁদে বসেছে। তিনি পড়লেন।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেন্টি থ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজী পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক, আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। মকবুল এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর চারেক ধরে অদ্ভুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা যাবে না কিন্তু অন্য কোন নামও আমি পাচ্ছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিঁপড়ায় কামড়ায়।

বুঝতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আমি নিজে লক্ষ করেছি মকবুল সাহেব কোথাও বসলেই সারি বেঁধে পিঁপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

পীর-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক জাতীয় আধি ভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোন লাভ হয়নি। আমি কোন উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

আবুল কাশেম।

ব্লু স্টার ফার্মেসী। নান্দাইল। কেন্দুয়া।

ডাক্তার সাহেব রুগীর দিকে তাকালেন। রুগী পাথরের মত মুখ করে বসে আছে। গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা। পরনে লুঙ্গি। অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তির পোশাক নয়।

ডাক্তার সাহেব কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। কিছু-একটা বলতে হয়। মকবুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই জাতীয় উদ্ভট যন্ত্রণার কোন মানে হয়?

পিঁপড়া কামড়ায় আপনাকে?

জ্বি স্যার। কোন এক জায়গায় বসে থাকলেই পিঁপড়া এসে ধরে।

নূরুল আফসার সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, আপনি কি রসোগোল্লা না-কি যে পিঁপড়া ছেঁকে ধরবে? শেষ পর্যন্ত বললেন না।

বড় কষ্টে আছি স্যার। যদি ভাল করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হইয়া থাকব। টাকা-পয়সা কোন ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।

AMARBOI.COM

আপনার কি অনেক টাকা ?

জ্বি স্যার।

কী পরিমাণ টাকা আছে?

রুগী কোন জবাব দিল না। রুগীর সঙ্গী বলল, মকবুল ভাইয়ের কাছে টাকা-পয়সা কোন ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উনার হাতের ময়লা।

নূরুল আফসার সাহেব এই প্রথম খানিকটা কৌতূহলী হলেন। লাখ টাকা ফতুয়া-গায়ে লুঙ্গী-পরা এই লোকটির হাতের ময়লা — এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি নিজেও ধনবান ব্যক্তি। ফিক্সড ডিপোজিটে তাঁর এগারো লাখ টাকার মত আছে। এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবন পানি করে দিতে হয়েছে। ভোর ছটা থেকে রাত বারোটা — এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।

একমাত্র ছুটির দিন শুক্রবারটাও তিনি কাজে লাগান। সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং যান, লাস্ট ফ্লাইটে ফিরে আসেন। ওখানকার একটা ক্লিনিকে বসেন । ঐ ক্লিনিকের তিনি কনসালটিং ফিজিসিয়ান। আর এই লোককে দেখে তো মনে হয় না সে কোন কাজকর্ম করে। নির্বোধের মত এই লোক এত টাকা করে কী করে? নূরুল আফসার সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

মকবুল ক্ষীণ স্বরে বলল, রোগটা যদি সারায়ে দেন।

এটা কোন রোগ না। আমি এমন কোন রোগের কথা জানি না — যে রোগে দুনিয়ার পিঁপড়া এসে কামড়ায়। অসুখটা আপনার মনে। আমি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি -- তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যা এই সমস্যার সমাধান আমার কাছে নেই।

নূরুল আফসার সাহেব বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করলেন না। কারণ একটা অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁর চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন, টেবিলের উপর রাখা মকবুলের ডান হাতের দিকে এক সারি লাল পিঁপড়া এগুচ্ছে। পিঁপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগুচ্ছে।

ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টি লক্ষ্য করে মকবুলও তাকাল পিঁপড়ার সারির দিকে। সে কিছু বলল না বা হাতও সরিয়ে নিল না।

নূরুল আফসার সাহেব বললেন, এই পিঁপড়াগুলি কি আপনার দিকে আসছে?

জ্বি স্যার।

বলেন কী ?

পায়েও পিঁপড়া ধরেছে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারি না স্যার।

নূরুল আফসার সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন। উচু হয়ে বসলেন। সত্যি সত্যি দু'সারি পিঁপড়া লোকটির পা'র দিকে এগুচ্ছে।

মকবুল সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমার একটা জরুরী কাজ আছে, চলে যেতে হচ্ছে। আপনি কি কাল একবার আসবেন?

AMARBOI.COM

অবশ্যই আসব। যার কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাত্রে ঘুমাইতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিপড়া ঢুকে যায়।

আপনি কাল আসুন। কাল কথা বলব।

জ্বি আচ্ছা।

মকবুল উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে নূরুল আফসার সাহেব মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কাছে মনে হল মকবুল কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচার শক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে, পা ঘসে ঘসে পিঁপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দু'হাতে পিষে ফেলল পিঁপড়ার সারি। মকবুলের মুখ ঘামে চটচট করছে। চোখের তারা ঈষৎ লালাভ। মুখে হিসহিস শব্দ করছে এবং নিচু গলায় বলছে, হারামজাদ, হারামজাদ।

তার সঙ্গী কিছুই বলছে না। মাথা নিচু করে দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জাতীয় ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। এই ঘটনায় সে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না।

নূরুল আফসার সাহেব শালীর জন্মদিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। রুগীর দিকে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দু'জন অ্যাসিস্টেন্টও ছুটে এসেছে। তারা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চেয়ে ভয় বেশি।

মকবুল হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, স্যার মনে কিছু নিবেন না। এই পিঁপড়ার ঝাঁক আমার জেবন শেষ কইরা দিছে। হারামজাদা পিঁপড়া। এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিবেন?

ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিসটেন্ট অতি দ্রুত ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে নিয়ে এল। একজন ভয়ংকর পাগলের পাগলামি হঠাৎ থেমে গেছে এই আনন্দেই সে আনন্দিত।

মকবুল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইল। পানি মুখে দিল না। মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, যেখানে যাই সেইখানে পিঁপড়া, কি করব কন। যে খাটে ঘুমাই সেই খাটের পায়ার নিচে বিরাট বিরাট মাটির সরা। সরা ভর্তি পানি। তাতেও লাভ হয় না।

লাভ হয় না?

জ্বি না। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিঁপড়া উঠে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিছানার চাদর বদলাইতে হয়।

বলেন কি?

সত্যি কথা বলতেছি জনাব। একবর্ণ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। আমি জনাব এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেও পারি না। জায়গা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যে লোকটিকে শুরুতে মনে হয়েছিল কথা বলতে পারে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রচুর কথা বলতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের লোকজনের প্রাথমিক ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনের কথাই বেশি বলে।

চিকিৎসায় কোন ত্রুটি করি নাই জনাব। কেরোসিন তেলে কর্পূর দিয়ে সেই তেল শরীরে মাখছি যদি গন্ধে পিঁপড়া না আসে। প্রথম দুই-একদিন লাভ হয়, তারপর হয় না। পিঁপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাখি নাই। যে যা বলেছে মাখছি। একজন বলল, বাদুরের গু শরীরে মাখলে আরাম হইব। সেই বাদুরের গু'ও মাখলাম। এর চেয়ে জনাব আমার মরণ ভাল।

ডাক্তার সাহেব তার অ্যাসিসটেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাসায় টেলিফোন করে দাও যে আমি একটা ঝামেলায় আটকে পড়েছি। আসতে দেরি হবে। আর আমাদের চা দাও।

আপনি চা খান তো?

জ্বি চা খাই।

চা খেতে খেতে বলুন কী ভাবে এটা শুরু হল, প্রথম কখন পিঁপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ট হল।

একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।

গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?

জ্বি আছে।

বেশ। গোপনেই বলবেন। আগে চা খান।

লোকটি চা খেল নিঃশব্দে। চা খাবার সময় একটি কথাও বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছা সম্ভবত ঢেউয়ের মত আসে। ঢেউ যখন আসে তখন প্রচুর বকবক করে, ঢেউ থেমে গেলে চুপচাপ হয়ে যায়। তখন কথা বলে তার সঙ্গী। এখন সঙ্গীই কথা বলছে —

ডাক্তার সাব, সবচে' বেশি ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেইটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই, ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।

তুমি বল।

এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গন্ধে পিঁপড়া সবচে' বেশি আসে। মকবুল ভাই করলেন কি, সারা শইলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাতদিন কোন পিঁপড়া আসে নাই।

মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, সাতদিন না পাঁচদিন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, পাঁচদিন পরে আবার পিঁপড়া আসা শুরু হল?

জ্বি।

পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মনে হয় অনেক কিছু করেছেন।

জ্বি। নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েকদিন ছিলাম। তিন দিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিন পিঁপড়া ধরল।

সেখানে পিঁপড়া গেল কিভাবে?

জানি না জনাব। অভিশাপ।

কিসের অভিশাপ?

আপনারে গোপনে বলতে চাই।

AMARBOI.COM

ডাক্তার সাহেব গোপনে বলার ব্যবস্থা করলেন। পুরো ব্যাপারটায় তিনি এখন উৎসাহ পেতে শুরু করেছেন। শালীর জন্মদিনের কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছেন। এই পর্যন্তই। কোন রুগীর ব্যাপারে এ জাতীয় কৌতূহল তিনি এর আগে বোধ করেননি। অবশ্যি এই লোকটিকে রুগী বলতেও বাঁধছে। কাউকে পিঁপড়া ছেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ-ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মকবুলের সঙ্গীও নেই। দরজা ভেজানো। মকবুল নিচু গলায় কথা শুরু করল —

জনাব, আপনেরে আমি আগেই বলছি আমি টাকা-পয়সাওয়ালা লোক। আমাদের টাকা-পয়সা আইজ-কাইলের না। ব্রিটিশ আমলে আমার দাদাজান পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতী ছিল। একটার নাম ময়না, অন্যটার নাম সুরভি। দুইটাই মাদী হাতী।

ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিঁপড়ার প্রসঙ্গে আসুন।

আসতেছি। আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকা-পয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশি থাকলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে না। আমারো ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র-দোষ বলেন তাই হইল। পনের-ষোল বছর বয়সেই। বিরাট বাড়ি — সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসী-বাঁদি ছিল। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের মেয়ে-বউরা ছিল।

আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে গেছে। লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক খাইছে।

আপনি বিয়ে করেননি?

জ্বি বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানাদি আছে। স্বভাব নষ্ট হইলে বিয়ে-সাদী করলেও ফায়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই . . .

আপনি আসল জায়গায় আসুন। আজেবাজে কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করছেন।

জ্বি আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ্দ পনের বছর বয়স। গায়ের রঙ একটু ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল। আমার চরিত্র তো কারো অজানা না। মেয়ের মা মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মা'র ঘরে মেঝেতে ঘুমায়। এত কিছু কইরাও লাভ হইল না। এক রাতে ঘটনা ঘটে গেল।

কি বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?

জ্বি।

আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

জিনিসটা তুচ্ছই। কিছুই না। হে হে হে।

হাসবেন না। হাসির কোন ব্যাপার না।

জ্বি আচ্ছা। তারপর কি হল — ঐ বজ্জাত মা সেই রাইতেই মেয়েটারে ইঁদুর-মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে একটা দড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনে একটা আমগাছে ফাঁস নিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা, আর কিছু না। মাগী চূড়ান্ত বজ্জাত। আমি চিন্তায় পড়লাম।

AMARBOI.COM

দুইটা মিত্যু সোজা কথা না। থানা-পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা বলবে খুন করা হয়েছে।

আপনি খুন করেননি?

আরে না। খুন করব কি জন্যে। আর যদি খুনের দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জায়গার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রক্ত ধুইয়ে ফেলা যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর বইরা চুন মাখায়ে চার-পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালায়ে দিতে হয়। এই জন্মের জন্যে নিশ্চিন্ত। কোনো সম্বুন্ধির পুত কিছু জানব না।

আপনি খুনও করেছেন?

জ্বি না। দরকার হয় নাই। যেটা বলতেছিলাম সেইটা শুনেন, ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম, খবরদার লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না। যে রকম আছে সে রকম থাক, আমি নিজে গিয়ে থানার ওসি সাহেবেরে আনতেছি, ওসি সাহেব আইয়্যা যা করবার করব।

থানা আমার বাড়ি থাইক্যা পনের মাইল দূর। পানসি নৌকা নিয়া গেলাম। দারোগা সাহেব আর থানা স্টাফের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা নিয়া গেলাম। গিয়া দেখি বিরাট সমস্যা। দারোগা সাব গিয়েছেন বোয়ালখালী ডাকাতি মামলার তদন্তে। ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিন দিন।

বর্ষাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ গেছে পচে। বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে গিয়া দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাগীর সারা শইলে লাল চাদর।

মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ হাত পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিঁপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।

ডাক্তার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, আপনি তো দেখি খুবই বদলোক।

জ্বি না, আমার মত টেকাপয়সা যারার থাকে তারা আরো বদ হয়। আমি বদ না। তারপর কি ঘটনা সেইটাই শুনেন — আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিঁপড়া নড়ল। মনে হল যেন একটা বড় ঢেউ উঠল। তারপর সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড়া মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ মুখ সব খাইয়া ফেলেছে — জায়গায় জায়গায় হাড্ডি বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে বললেন, মাবুদে এলাহী। তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ংকর অবস্থা। আমি দৌড় দিয়ে বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়াগুলি বাইরে আসল। মনে হইল আমারে খুঁজতেছে। সেই থাইক্যা শুরু। যেখানে যাই পিঁপড়া। জনাব, আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গেলে একটা সিগারেট খাইতে চাই।

খান।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মকবুল সিগারেট ধরাল। তার মুখ বিষণ্ণ। সে আনাড়িদের মত ধুঁয়া ছাড়ছে। খুক

AMARBOI.COM

খুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়ে বলল, আমার কাশি ছিল না। এখন কাশি হয়েছে। নাকের ভিতর দিয়া পিঁপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। ক্যামনে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে রক্ত আসে। আর আসে মরা পিঁপড়া।

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সিগারেট খাইতেছি যাতে ভাল মত কাশি উঠে। কাশি উঠলে কাশির সাথে পিঁপড়া আর পিঁপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ঘোষণা দিছি, যে আমারে পিঁপড়ার হাত থাইক্যা বাঁচাইব তারে আমি নগদ দুই লাখ দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না। আমি টাকা সাথে নিয়া আসছি। আপনে আমারে বাঁচান।

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না। তিনি তাঁর বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরের কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মকবুলের বাম হাত টেবিলের উপর। দুই সারি পিঁপড়া টেবিলের দুপ্রান্ত থেকে সেই হাতের দিকে এগুচ্ছে। মকবুলেরও সেই দিকে চোখ পড়ল। সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাক্তার সাব?

হ্যাঁ ঠিক।

আমি জানতাম। আমার মরণ পিঁপড়ার হাতে।

মকবুল মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসা পিঁপড়ার সারি দুটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ চকচক করছে। সে তার বাঁ-হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল,—নে খা।

পিঁপড়ারা মনে হল একটু থমকে গেল। গা বেয়ে উঠল না — কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তায় ভুগল।

মকবুল বলল, নিজ থাইক্যা খাইতে দিলে এরা কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলা-পরামর্শ করে। এই দেহেন ডাক্তার সাব — উঠতেছে না।

তাই তো দেখছি।

দুই এক মিনিটের ব্যাপার। দুই এক মিনিট শলা-পরামর্শ শেষ হইব, তখন শইলে উঠা শুরু হইব।

হলও তাই। ডাক্তার সাহেব লক্ষ্য করলেন, পিঁপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতেই উঠতে শুরু করেছে। দুটি সারি ছাড়াও নতুন এক সারি পিঁপড়া রওনা হয়েছে। এই পিঁপড়াগুলির মুখে ডিম। ডাক্তার সাহেব ভেবে পেলেন না, মুখে ডিম নিয়ে পিঁপড়াগুলি যাচ্ছে কেন? এরা চায় কী? কে তাদের পরিচালিত করছে। কে সেই সূত্রধর?

AMARBOI.COM

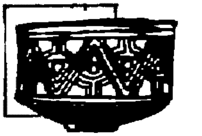

উনিশ শ' একাত্তর

তারা এসে পড়ল সন্ধ্যার আগে আগে।

বিরাট একটা দল। মার্চ টার্চ কিছু না। এলোমেলোভাবে হেঁটে আসা। সম্ভবত, বহু দূর থেকে আসছে। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে একেক জন। ঘামে মুখ ভেজা। ধূলি ধূসরিত খাকি পোশাক।

গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়ল। শুধু বদি পাগলা হাসিমুখে এগিয়ে গেল। মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, বিষয় কি গো?

পুরো দল থমকে দাঁড়াল মুহূর্তে। বদি পাগলার হাতে একটা লাল গামছা। সে গামছা নিশানের মত উড়িয়ে চেঁচাল, কই যান গো আপনেরা? এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনো দেখেনি।

মেজর সাহেবের চোখে সানগ্লাস। তিনি সানগ্লাস খুলে ফেলে ইংরেজীতে বললেন, লোকটা কি বলছে? রফিকউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, লোকটা মনে হচ্ছে পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।

তাই নাকি?

জ্বি স্যার।

বুঝলে কি করে এ পাগল?

রফিকউদ্দীন চুপ করে গেল। মেজর সাহেবের খুব পেঁচানো স্বভাব। একটি কথার দশটি অর্থ করেন। বদি পাগলাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখ ভর্তি হাসি। রফিক ধমকে উঠল, 'এ্যাই, কি চাস তুই?' বদি পাগলার হাসি আরো বিস্তৃত হল। রফিক কপালের ঘাম মুছল। সরু গলায় বলল, লোকটা স্যার পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে . . . ।

এই কথা তুমি আগে একবার বলেছ। একই কথা দু'তিনবার বলার প্রয়োজন নেই।

রফিক ঢোক গিলল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এ জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। সবাই টায়ার্ড।

মাইল পাঁচেক গেলেই স্যার নবীনগর। খুব বড় বাজার, পুলিস ফাঁড়ি আছে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে স্যার নবীনগর চলে যাওয়া ভাল।

কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

জ্বি না স্যার, ভয় পাব কেন?

মেজর সাহেব দলটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। মৃদু সাড়া জাগল। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ল সবাই। মাথা থেকে ভারী হ্যালমেট খুলে ফেলতে লাগল।

AMARBOI.COM

মেজর সাহেব নীচু সুরে বললেন, পাগলটাকে বেঁধে ফেলতে হবে। তিনি কাঠের একটি বাক্সের উপর বসে পাইপ ধরালেন। খাকী পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু এই মেজর সাহেব অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।

পাগলটাকে আম গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। তার কোন আপত্তি দেখা গেল না। বরং কাছাকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্যে তাকে আনন্দিতই মনে হল। কেউ তার দিকে তেমন নজর দিল না। এরা অসম্ভব ক্লান্ত। এদের দৃষ্টি নিরাসক্ত ও ভাবলেশহীন।

মেজর সাহেব পানির বোতল থেকে কয়েক চুমুক পানি খেলেন। বুটজুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়েছে। রফিক বলল, ডাব খাবেন স্যার? মেজর সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, আগে আমরা কোন গ্রামে গেলেই ছোটখাট একটা দল পাকস্তানী পতাকা হাতে নিয়ে আসত। এখন আর আসে না। এর কারণ কি জান?

জানি না স্যার।

ভয়ে আসে না। এই গ্রামের সব ক'টি লোক এখন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। ঠিক না?

রফিক জবাব দিল না। বদি পাগলা বলল, এট্টু বোতলের পানি খাইতে মন চায়।

ও কি চায়?

ওয়াটার বটল থেকে পানি খেতে চায় স্যার।

গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলেও আজীজ মাস্টার যেতে পারেনি। কারণ সোনাপোতা থেকে তার ছোট বোন এসেছিল। আজ সকাল থেকেই তার প্রসবব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম একজন মানুষকে নিয়ে টানাটানি করা যায় না। তবু আজীজ মাস্টার দু'বার বলল, ধরাধরি কইরা নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়। তার জবাবে আজীজ মাস্টারের মা তর কাপুরুষতা নিয়ে কুৎসিত একটা গাল দিয়েছেন। পা ভাঙ্গা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজীজ মাস্টার প্রতিবাদ করেনি। কারণ কথাটি সত্যি। সে বড়ই ভীতু। গ্রামে মিলিটারী ঢুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। সে বসে আছে উঠোনে। এবং সামান্য শব্দেও দারুণভাবে চমকে উঠছে।

মাস্টার বাড়িত আছ?

কেডা?

আমরা। খবর হুনছ? বদি পাগলারে বাইন্ধা রাখছে আম গাছে।

হুনছি।

নীলগঞ্জের মুরুব্বীদের কয়েকজন শংকিত ভঙ্গিতে উঠে এল উঠোনে।

তোমার তো একটু যাওন লাগে মাস্টার।

কই যাওন লাগে?

দবীর মিয়া তার উত্তর না দিয়ে নীচু গলায় বলল, তুমি ছাড়া কে যাইব? তুমি ইংরেজি জান। শুদ্ধ ভাষা জান।

মিলিটারীর কাছে যাইতে কন?

হ।

আমি গিয়া কি করতাম?

AMARBOI.COM

গিয়া কইবা এই গেরামে কোন অসুবিধা নাই। পাকিস্তানের নিশানটা হাতে লইয়া যাইবা। ভয়ের কিছু নাই।

মাস্টার অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। দবীর মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, কথা কওনা যে?

আমি যাই ক্যামনে? বাড়িত অত বড় বিপদ। পুতির বাচ্চা অইব।

তোমার তো কিছু করণের নাই মাস্টার। তুমি ডাক্তারও না, কবিরাজও না।

মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, পাকিস্তানের পতাকা পাইয়াম কই?

ক্যান ইস্কুলের পতাকা কি করলা?

ফালাইয়া দিছি।

ফালাইয়া দিছ? ক্যান?

মাস্টার জবাব দেয় না। দবীর মিয়া রাগী গলায় বলে, আই.এ পাশ করলে কি হইব মাস্টার, তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি অয় নাই। পতাকাটি তুমি ফালাইলা কোন আক্কেলে? অখন কি আর করবা। যাও খালি হাতে।

আমার ডর লাগে চাচাজী।

ডরের কিছু নাই। এরা বাঘও না, ভল্লুকও না। তুমি গিয়া খাতির-যত্ন কইরা দুইটা কথা কইবা। এক মিনিটের মামলা। কি কও আসমত?

নেয্য কথা।

দেরী কইরো না। আন্ধাইর হওনের আগেই যাও।

একলা?

একলা যাওনই বালা। একলাই যাও। তিনবার কুলহু আল্লাহ কইয়া ডাইন পাওডা আগে ফেলবা। পাঁচবার মনে মনে কইবা, "ইয়া মুকাদ্দেমু।" ভয়-ডরের কিছুই নাই মাস্টার। আল্লাহর পাক কালাম। এর মরতবাই অন্য রকম।

আজীজ মাস্টার মাথা নীচু করে বসে রইল। তার আবার প্রস্রাবের বেগ হয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে পুতি কুঁ কুঁ করছে। প্রথম পোয়াতী খুব ভোগাবে।

ভইনটারে এমুন অবস্থায় ফালাইয়া ক্যামনে যাই?

এইটা কি কথা? তুমি ঘরে থাক্যা করবাটা কি? বেকুবের মত কথা কও খালি। উঠ দেহি।

আজীজ মাস্টার উঠল।

মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। তাঁর মুখের ভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বসে আছেন কাঠের একটি বড় বাক্সের উপর। পা দু'টি ছড়ানো। মেজর সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কি চাও?

আজীজ মাস্টার থতমত খেয়ে গেল। এ বাংলা জানে নাকি? কি আশ্চর্য।

কি চাও তুমি?

জ্বি, কিছু চাই না।

মেজর সাহেব এবার ইংরেজীতে বললেন, কিছু না চাইলে এসেছ কেন? তামাশা

AMARBOI.COM

দেখতে? সার্কাস হচ্ছে? আজীজ মাস্টার ঘামতে শুরু করল। মেজর সাহেবের পরবর্তী সমস্ত কথোপকথন হল ইংরেজীতে। আজীজ মাস্টার বেশীরভাগ জবাবই দিল বাংলায়। তাতে অসুবিধা হল না। মেজর সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন।

তুমি কি কর?

আমি এখানকার প্রাইমারী স্কুলের টিচার।

এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি?

জ্বি স্যার।

আর কি আছে?

একটা মসজিদ আছে।

শুধু মসজিদ? মন্দির নেই? পূজা হয় যেখানে?

জ্বি না স্যার।

ঠিক করে বল মন্দির আছে কিনা।

নাই স্যার।

মেজর সাহেব পাইপ ধরালেন। ঠাণ্ডা গলায় কাকে যেন পাঞ্জাবী বা অন্য কোন ভাষায় কি বললেন। সেই লোকটি উঠে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল আজীজ মাস্টারের গালে। আজীজ মাস্টার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আম গাছের সঙ্গে বাঁধা বদি পাগলা দারুণ অবাক হয়ে বলল, ও মাস্টার উঠ উঠ। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মেজর সাহেব বললেন, তোমার নাম কি?

আজীজুর রহমান।

আজীজুর রহমান, তোমাদের এদিকে মুক্তি বাহিনী আছে?

জ্বি না।

সবাই পাকিস্তানী?

জ্বি।

বাহ্, খুব ভাল। তুমি নিজেও একজন খাঁটি পাকিস্তানী ঠিক?

জ্বি স্যার।

সবাই পাকিস্তানী হলে এত ভয় কিসের? অমার তো মনে হয় এ গ্রামের সবাই ভয়ে পালিয়েছে। মেয়েগুলি লুকিয়ে আছে জঙ্গলে, ঠিক না?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। বমি আসছে। বহু কষ্টে সে বমির বেগ সামলাতে লাগল।

তোমাদের কি ধারণা আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাব?

আজীজ মাস্টার চুপ করে রইল।

কি, কথা বলছ না যে? তোমার স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে?

স্যার আমি বিয়ে করিনি।

বিয়ে করনি? বয়স কত তোমার?

চল্লিশ।

চল্লিশ, এখনো বিয়ে করনি? তাহলে চালাও কিভাবে? মাস্টারবেট কর?

AMARBOI.COM

আজীজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। মেজর সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, কথার জবাব দাও। রফিকউদ্দীন ক্ষীণ সুরে বলল, স্যার জানতে চাচ্ছেন আপনি হস্তমৈথুন করেন কিনা। বলে ফেলেন ভাই। স্যার রেগে যাচ্ছেন।

করি না।

বল কি? তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে? দেখি পায়জামা খুলে সবাইকে দেখাও তো।

স্যার কি বললেন?

পায়জামা খুলে তোমার যন্ত্রটা সবাইকে দেখাতে বললাম। ঝটপট কর। দেরী করবে না। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

আজীজ মাস্টার অবাক হয়ে তাকাল রফিকের দিকে। রফিকউদ্দীন অস্পষ্ট স্বরে বলল, খুলে ফেলেন ভাই। ব্যাটা ছেলেদের মধ্যে আবার লজ্জা কি? খুলে ফেলেন, স্যার রাগ করছেন। মেজর সাহেব নীচু গলায় কি একটা বললেন। একজন এসে হ্যাঁচকা টানে আজীজ মাস্টারের পায়জামা নামিয়ে ফেলল। মেজর সাহেব বললেন, জামাটাও খুলে নাও।

আজীজ মাস্টার দু'হাতে তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। একটা মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠল চারদিকে। একজন কে যেন কাগজের দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল আজীজ মাস্টারের দিকে। মেজর সাহেব বললেন, তুমি পাকিস্তানীদের ভালবাস?

জ্বি স্যার।

ভেরী গুড। আমাকেও নিশ্চয়ই ভালবাস। বাস না? বল, বলে ফেল।

বাসি স্যার।

যে তোমাকে নেংটো করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তাকেও তুমি ভালবাসছ। তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক দেখছি।

মেজর সাহেব অনুচ্চ স্বরে কি একটা বলতেই চারদিকে হাসির বান ডেকে গেল। বদি পাগলা চোখ বড় করে বলল, মাস্টার, তোমার কাপড় কই? এ্যাই মাস্টার।

আজীজ মাস্টার ঘোলা চোখে তাকাল তার দিকে। তার বমি-বমি ভাবটা কেটে গেছে। শুধু মাথার পিছন দিকটায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা। মেজর সাহেব বললেন, আজীজুর রহমান তুমি ভয়ে মিথ্যা কথা বলছ প্রাণে বাঁচবার জন্যে। সত্যি কথা বল তোমাকে ছেড়ে দেব, তুমি কি আমাকে পছন্দ কর?

না।

এইতো আসল কথা বেরুচ্ছে। তুমি কি চাও এটা বাংলাদেশ হোক?

জ্বি স্যার।

তুমি তাহলে একজন দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে চাই। নাকি তুমি বাঁচতে চাও?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না।

দেরী করবে না। বলে ফেল বাঁচতে চাও কি-না।

রফিকউদ্দীন ভয়-পাওয়া গলায় বলল, বলেন ভাই, বাঁচতে চাই। এ রকম করছেন কেন? শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

বদি পাগলা আবার কথা বলে উঠল, ও মাস্টার কাপড় পিন্দ। তুমি নেংটা।

AMARBOI.COM

আজীজ মাস্টার নড়ল না। মেজর সাহেব বললেন, কাপড় পর। কাপড় পরে আমার সামনে থেকে বিদেয় হয়ে যাও। ক্লিয়ার আউট।

আজীজ মাস্টার কাপড় পরল না। হঠাৎ এক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের ডান প্যান্টের হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। মেজর সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। চারদিকে কোন শব্দ নেই। আজীজ মাস্টার এগিয়ে এসে আরেক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের সার্টে এসে পড়ল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। এবার আমরা রওনা হব।

সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।

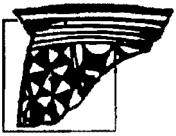

কুকুর

'কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব?'

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, জ্বি ভাল আছি।

ভদ্রলোক হাসি মুখে বললেন, বসব খানিকক্ষণ?

'বসুন। আমি অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুব।'

'আমাকে কি চিনতে পারছেন?'

'জ্বি না।'

'ঐ যে মোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলাপ হল। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।'

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। মোড়ের পানের দোকানে সামান্য আলাপের পর সারাজীবন চিনে রাখব আমার স্মৃতিশক্তি এত ভাল নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'আমার নাম আলিমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম। তিন বছর আগে রিটায়ার করেছি। এইটথ্ মে, মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি। একটা বাগান করেছি।'

'ভাল, খুবই ভাল।'

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমীরায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছে। আমি শংকিত বোধ করছি। এখনি হয়ত বলবেন, আপনার তো অনেক বই। কয়েকটা নিয়ে যাই। পড়ে ফেরত দেব।

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুঁতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এমন কোন মিশুক লোক না যে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গ পছন্দ করব।

AMARBOI.COM

'প্রফেসর সাহেব আপনি কি ভূত-প্রেত এই সব বিশ্বাস করেন?'

'জ্বি না করি না।'

'শুনে ভাল লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খারাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিজিক্সের এক প্রফেসরের হাতে দেখেছি চারটা পাথরের আঙটি।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেলে ভদ্রলোকের আলাপের উৎসাহ হয়ত কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

'প্রফেসার সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনি কি কোইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন?'

'আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কাকতালীয় ঘটনা।'

'আমি এখনো আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তবে ঘটনাটা বলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।'

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার অর্থেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিশ্চয়ই হয়েছি কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারিনি। রিটায়ার্ড মানুষ। একা একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

'প্রফেসার সাহেব, উঠি।'

'উঠবেন?'

'জ্বি। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটায়ার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তাছাড়া মানুষদের সঙ্গ আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি তা না।'

'আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোন অসুবিধা নেই। আজ অবশ্যি একটু ব্যস্ত।'

'গল্পগুজব আমি তেমন পারি না। কোইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে — ঐ গল্পটা ছাড়া আমি কোন গল্প জানি না। গল্পটা খুবই ব্যক্তিগত। এই জীবনে অল্প কয়েকজনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিল।'

'অবশ্যই বলবেন।'

'আপনি যদি দয়া করে একটু বারান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম। হঠাৎ কোন-একদিন চলে এলে ভাল লাগত।'

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরানো বাড়ি। দোতলার কাজ শুরু করা হয়েছিল। শেষ হয়নি। বাড়ির সামনে দুটা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

'একদিন যদি আসেন আপনার ভাল লাগবে। আমার জীবনের কোইনসিডেন্সের ঘটনাটাও শুনবেন।'

AMARBOI.COM

'জ্বি আচ্ছা, একদিন যাব।'

'আমার নামটা আপনার মনে আছে তো?'

'জ্বি আছে।'

'নামটা বলুন তো?'

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ, ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচিত্র যে, আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জবাবের জন্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নামটা বোধ হয় আপনার মনে পড়ছে না, তাই না?'

'জ্বি–না।'

'মনে থাকার কথাও না। আন–কমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন, আলীমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব। শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি যাব। খুব শিগগিরই একদিন যাব।'

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়। লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐদিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলে ছিলেন।

বাসায় ঢুকে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমীরা। খুব কম করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহেই এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বললাম — অপূর্ব!

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, বলেছিলাম না, আমার বাসায় এলে আপনার ভাল লাগবে।

'আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?'

'ষোল হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশকিছু বই আছে। আপনাকে দেখাব।'

'সব আপনার নিজের সংগ্রহ?'

'আমার বাবার সংগ্রহ অনেক আছে। বই কেনার বাতিক বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। বই–পাগল লোক ছিলেন। খুব বই পড়তেন। আমি তাঁর মত পড়তে পারি না। অনেক বই আছে আমি কিনে রেখেছি, এখনো পড়িনি।'

'এখন তো প্রচুর অবসর। এখন নিশ্চয় পড়ছেন।'

'আমার চোখের সমস্যা আছে। বেশিক্ষণ এক নাগাড়ে পড়তে পারি না। আমি খুব খুশি হব যদি আমার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে আপনি পড়েন। বই তো পড়ার জন্যেই। আলমীরায় সাজিয়ে রাখার জন্যে না।'

'আপনি কি সবাইকেই বই পড়তে দেন?'

'জ্বি দেই।'

'তারা বই ফেরত দেয়?'

'অনেকেই দেয় না। সেই সব পরে কিনে ফেলি। আমার সংসার ছোট। একটা মাত্র

AMARBOI.COM

মেয়ে, স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারের তুলনায় টাকা-পয়সা ভালই আছে। বই কেনায় একটা অংশ ব্যয় করি। আপনি ঘুরে ঘুরে বই দেখুন। আমি চা নিয়ে আসছি।'

'চা লাগবে না।'

'কেন লাগবে না? চা খেতে খেতে গল্প করব। আমার ঘটনাটি আপনাকে বলব। আপনাকে বলার জন্যে আমি এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করছি।'

'কেন বলুন তো?

'আপনি বিজ্ঞানের মানুষ। আপনি শুনলে একটা ব্যাখ্যা হয়ত দাঁড় করতে পারবেন। অবশ্যি ব্যাখ্যার জন্যে আমি খুব ব্যস্তও না। প্রতিটি বিষয়ের পেছনে একটা কার্যকারণ যে থাকতেই হবে এমন তো কোন কথা না। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি — এই বিষয়গুলির তো এখনো মীমাংসা হয়নি, কি বলেন প্রফেসর সাহেব . . .'

অন্য সময় হলে এই ভদ্রলোকের কথায় আমি তেমন কোন গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু যার বাড়িতে বইয়ের সংখ্যা ষোল হাজার তার কথা মন দিয়ে শুনতে হয়। তার তুচ্ছতম কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না।

ভদ্রলোকের গল্প সেই কারণেই অতি আগ্রহ নিয়ে শুনলাম। যেভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবে বলার চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক গল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ইংরেজীতে বলা শুরু করেছেন। আমি তা করছি না। কোন রকম ব্যাখ্যা বা টীকা টিপ্পনিও দিচ্ছি না। পুরোটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

ভাই, ঘটনাটা তাহলে বলা শুরু করি।

কিছু কিছু মানুষ আছে পশু-প্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এই সব জন্তুর প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা। রাস্তায় একজন ভিখিরি চিৎকার করে কাঁদলে সে ভিখিরির কাছে এগিয়ে যাবে না কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

AMARBOI.COM

আপনাকে শুরুতেই বলে রাখি — আমি এ রকম কোন পশু-প্রেমিক না। কুকুর-বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না লাগে। তাছাড়া ডিপথেরিয়া, জলাতংক এইসব অসুখ এদের মাধ্যমে ছড়ায় — এটাও আমি সব সময় মনে রাখি।

যাই হোক, মূল গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজে প্রাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে — বুধবার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড় করে আগুন করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। মহা ত্যাঁদড় ছেলে। তার হাতে একটা কুকুরছানা। ছানাটার গায়ে কাপড় জড়ান। শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, কি হচ্ছে রে নান্টু?

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, নান্টু কুকুরকে কম্বল পরিয়েছে। শীত

লাগে তো এই জন্যে। দলের বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সব সময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হয়ত তারা চায় না ছোটদের খেলায় বড়রা অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হল।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ান মাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়ত বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দা-কানুন করতে খুব ভালবাসে।

'কেরোসিন দিয়েছিস না-কি?'

কেউ কোন জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, আপনি চলে যান। তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের কুকুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা ধ্বক করে উঠল। এরা কুকুর ছানাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে না-কি? নতুন কোন খেলা? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো? শিশুরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠে। আমি কড়া গলায় বললাম, এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস?

নান্টু কঠিন মুখে বলল, তাতে আপনার কি?

'কেন কেরোসিন ঢাললি?'

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, কুকুরটাকে আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘুংঘুর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘুংঘুর বাজবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘুংঘুর বাজবে। এইটাই মজা।

আমি হতভম্ব। এরা বলে কি? ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুরছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দৌড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়ত বা সে মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শার্টে আগুন ধরে গেল। প্যান্টে আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র চিন্তা বাচ্চাটাকে আগুন থেকে বের করতে হবে।

আলিমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, বের করতে পেরেছিলেন?

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চাটা বেঁচেছিল?'

'না বাঁচেনি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ড ডিগ্রী বার্ণ হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিকেলে কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠান হল ঢাকা মেডিকেল কলেজে। দু'মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হল। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ণ-এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফেটিং

AMARBOI.COM

হত না। অল্পতেই শরীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।'

আলীমুজ্জামান সাহেব নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামামাত্র আমি বললাম, আপনি একজন অসাধারণ মানুষ।

'মোটেই না। আমাকে বোকা বলতে পারেন। সামান্য একটা কুকুরছানার জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা আলোচনা করত। আমার নিজেরো মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়ত বোকামিই করেছি। একজন মানুষের জীবন কুকুরের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।'

'আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

'এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা — মূল গল্প এখন বলব।'

'ঢাকা থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি। শরীর তখনো খুব দুর্বল। ডাক্তার বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়ে-বসেই দিন কাটছে। আমার ঘর দোতলায়। মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। রাজ্যের কুকুর এসে জড় হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোন সাড়াশব্দ করছে না বা ছোটাছুটি করছে না। সব ক'টা মূর্তির মত বসে আছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি?

এক সঙ্গে এতগুলি কুকুর আমি এর আগে কখনো দেখিনি। এদের এই জাতীয় আচরণের কথাও শুনিনি। আমাকে দেখে এরা সবাই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি — দেখি, হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। এরা একে একে চলে গেল। যেন ওদের কোন গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে — এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল। নির্দিষ্ট কোন সময় না। মাসে একবার কিংবা দু'মাসে একবার এরকম হয়।

এরকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দুপুর রাতে কুকুরের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে। ক্যাপশন ছিল — কুকুরের কাণ্ড।

আমার ছোটবোন আমাকে খুব ক্ষেপাত। সে বলত কুকুরের জন্যে তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে, কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ "কুকুর-রাজা"।

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ্ড। এক মাস দু'মাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কুকুর বাসার সামনে এসে জড় হয়। মূর্তির মত চুপচাপ বসে থাকে। এক সময় মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ্ড ঘটছে। যেন কোন-এক অদ্ভুত উপায়ে কুকুররা আমার খবর পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তাই না, আমার মনে হয় কুকুররা আমাকে পাহারা দেয়। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, একটা দু'টা কুকুর সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষট্টি। আজো এই ব্যাপার ঘটছে।

AMARBOI.COM

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, বলেন কি?

'যা বলছি তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা নেই। তবে কুকুরের সভা আগের মত ঘনঘন হয় না। ছ' মাসে এক বছরে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম, তোমরা কি চাও? এইসব কেন তোমরা কর?'

'ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হয় না?'

'না, পছন্দ হয় না। একদিন দু'দিনের ব্যাপার হলে হয়ত পছন্দ হত। একদিন দু'দিনের ব্যাপরে তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।'

'ভবিষ্যতে আবারো হবে বলে কি আপনার ধারণা?'

'হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি কি দেখতে চান?'

বলতে বলতে আলীমুজ্জামান সাহেবের চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠবেন। আমি বললাম, আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় খুব আপসেট। এতে আপসেট হবার কিছু নেই। পশুরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে -- এতে রাগ হবার কি আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।

'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।'

'এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশ কোনটি?'

'পুরো ব্যাপারটিই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলিনি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'বলুন শুনি।'

'যে কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটার মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুংঘুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দুলায় আর ঘুংঘুরের শব্দ হয়।'

'আপনি ছাড়া অন্যরাও কি এই কুকুরছানাটা দেখে?'

'না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোন কিছুই আমি আমার জীবনে গ্রহণ করিনি। ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুক, পীর-ফকির কিছুই না। অথচ সেই আমাকেই কিনা সারাজীবন একটি অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, আবার কখনো এরকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার পাঁচ মাস পর রাত দুটোয় টেলিফোন বেজে উঠল। আলীমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন?

শ্রাবণ মাসের রাত। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই এক হাঁটু পানি। এমন দুর্যোগের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চাদরের নিচে ঢুকে পড়লাম।

AMARBOI.COM

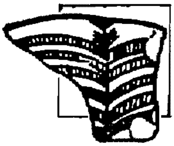

একজন সুখী মানুষ

জাকের সাহেবের বয়স ছাপ্পান্ন।

কিছুদিন আগেও তাঁর বয়স ছাপ্পান্নই মনে হত। এখন হঠাৎ যেন তাঁর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। আয়নার দিকে তাকালেই মনে হয় সত্তর বছরের এক অচেনা বুড়ো। অথচ তিনি একজন সুখী মানুষ। অসম্ভব সুখী। সুখী মানুষের বয়স বাড়ে না। কিন্তু তাঁর বেলায় এরকম হচ্ছে কেন?

তিনি দাড়ি কামাতে কামাতে এইসব ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ঘ্যাস করে তাঁর গাল কেটে গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা রক্ত পড়ল বেসিনে। অনেকখানি কেটেছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ব্যথা লাগছে না। বয়সের লক্ষণ। বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু অসাড় হয়ে আসে। ব্যথাবোধের তীব্রতা কমে আসে।

জাকের সাহেব ডান হাতের আঙুলে গাল চেপে ধরে অভ্যাসের বসেই বলেন, 'উহ'। বলে তিনি নিজে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। 'উহ' বলার কোন দরকারই ছিল না। কেন বললেন?

নাস্তার টেবিলে মিলির সঙ্গে দেখা হল। মিলি তাঁর বড় মেয়ে। নাস্তার সময়টাতে সে বাবার সামনে বসে পরপর দু'কাপ চা খায়। অল্প কিছু কথাবার্তা হয়। আজ মিলি অস্বাভাবিক গম্ভীর। অনেকক্ষণ সে বাবার দিকে তাকালই না।

জাকের সাহেব এক চুমুকে কমলার রসটা খেয়ে ফেললেন। সিরিয়েলের বাটিতে দুধ ঢাললেন। চিনি মেশালেন। শুকনো চোখে তাকালেন রুটি মাখনের প্লেটের দিকে। আরেকটি বাটিতে গাঢ় লাল রঙের কি একটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। টমেটোর স্যুপ নাকি? স্যুপ আগে খাওয়া দরকার ছিল। কোন কিছুই মুখে নিতে ইচ্ছা করছে না। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। বয়সের লক্ষণ। একটা বয়সে ভাল কিছু আর খেতে ইচ্ছা করে না।

বাবা, তোমার গালে কি হয়েছে?

কিছু না।

কিছু না মানে? গাল তো অনেকখানি কেটেছে।

হঠাৎ করে শেভ করতে গিয়ে . . . ।

ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করনি?

জাকের সাহেব চুপ করে রইলেন। এই যন্ত্রটি তাঁর পছন্দ নয়। চালু করলেই বিজবিজ শব্দ হয়। গালে ছোঁয়ালেই সমস্ত শরীর শিরশির করতে থাকে।

বাবা, কাটা জায়গায় কিছু দিয়েছ?

না।

স্যাভলন-ট্যাভলন কিছুই না?

AMARBOI.COM

না।

মিলির মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। জাকের সাহেব খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

একি বাবা, তুমি ডিমটা খাচ্ছ না কেন?

ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলে তো হবে না। দু'দিন পরপর তোমাকে একটা ডিম খেতে হবে। এই বয়সে তোমার ডায়েট ঠিক রাখা খুবই জরুরী।

তাতো ঠিকই।

আজ ডাক্তার সাহেব আসবেন না?

হুঁ আসবেন।

গালটা তাঁকে দেখাবে।

ঠিক আছে।

কোন জিনিস অবহেলা করতে নেই।

তা তো ঠিকই।

তিনি সিদ্ধ ডিমে গোলমরিচের গুঁড়া ঢালতে ঢালতে সেটাকে কালো বানিয়ে ফেললেন। ডিমটা শেষ করতে তাঁর অনেক সময় লাগল। কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চাচ্ছে না। দু'একবার বমির মত হল। চমৎকার সব সুখাদ্য কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না। বয়স দ্রুত বাড়ছে। আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় রেলিং ধরে ধরে উঠতে হয়। অথচ তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন।

জাকের সাহেব হাঁটতে বেরুলেন। গালের কাটাটায় চিনচিনে একটা ব্যথা হচ্ছে। কেন হচ্ছে কে জানে। বেরুবার সময় তার জামাই তাঁকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। চিন্তিত মুখে বলেছে, গাল হচ্ছে শরীরের সবচে' সেনসেটিভ পার্ট, একে মোটেই অবহেলা করা উচিত না। সামান্য ক্ষতেই সেপটিক হয়ে সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে।

জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বিশেষ হয় না। শরীর খারাপ হলে বা অসুখ বিসুখ হলেই সে শুধু খোঁজ নিতে আসে। আজ যেমন নিয়েছে। রাতেও একবার খোঁজ নেবে।

জাকের সাহেব রাস্তার মোড়ের এক পানওয়ালার দোকান থেকে একটা ফাইভ ফাইভ কিনলেন। তখন মিহির বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মিহির বাবু পাশের বাড়িতে থাকেন। অল্পদিন হল রিটায়ার করেছেন। মিহির বাবু অবাক হয়ে বললেন, সিগারেট কিনলেন নাকি?

জ্বি।

আপনি সিগারেট খান জানতাম না তো।

খাই না। এই আজ একটা কিনলাম।

কোন উপলক্ষ-টুপলক্ষ নাকি?

না, না উপলক্ষ কিছু না, এমনি।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মিহির বাবু বললেন, কোথাও যাচ্ছেন না কি?

জ্বি না, একটু হাঁটছি। মর্নিং ওয়াক।

সকাল দশটায় মর্নিং ওয়াক?

না মানে এই হাঁটা আর কি?

AMARBOI.COM

আপনার ছেলেরা ভাল আছে?

জ্বি ভাল।

তারা যেন কোথায় আছে?

জাকের সাহেব অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, দু'জনেই আমেরিকাতে। একজন নর্থ ডাকোটায়, অন্যজন সিয়াটলে।

আরেক মেয়েজামাই জাপান না কোথায় আছে বলেছিলেন যেন।

হনলুলু।

আপনি তো ভাই সুখী মানুষ।

তা ঠিক।

চিন্তা-ভাবনা কিছু নাই। এখন শুধু দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো। আজ জাপান, কাল আমেরিকা, পরশু হনলুলু।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। সিগারেট টানার জন্যেই বোধ হয় তাঁর মাথা হাল্কা হাল্কা লাগছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। একটা পান খেতে পারলে হত। মিহির বাবু বিমর্ষ ভঙ্গিতে বললেন, আমার অবস্থাটা দেখুন, দু'টা মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নাই। এর মধ্যে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেল। যাই কোথায় এখন বলুন? জীবনে একটা বাড়ি-টাড়ি করতে পারলাম না। এখন যাচ্ছি গোরান। পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছি কারণ কি জানেন?

না।

বেশী নিলে যদি খরচ হয়ে যায় সেই ভয়ে। আচ্ছা ভাই গেলাম। বাস ধরতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে জাকের সাহেবও পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছেন। নগদ টাকা তাঁর কাছে থাকে না। অবশ্যি থাকার প্রয়োজনও তেমন নেই। নগদ টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন? প্রতিদিন বাজারে যাবার আগে মোতা মিয়া এসে জিজ্ঞেস করে, আপনার কিছু লাগবে? লাগলে কন।

মিলি সব সময়ই বলে, বাবা তোমার প্রচুর টাকা আছে। তোমার দুই ছেলে প্রতিমাসে যত টাকা পাঠায় সেটা তুমি এই জীবনে খরচ করে শেষ করতে পারবে না। সব আলাদা করা আছে, যখন যা লাগবে বলবে।

তা তো বলবই।

কোন লজ্জা করবে না।

না লজ্জা কি জন্যে?

যদি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে বলবে।

নিশ্চয়ই বলব।

যখন যত টাকা লাগে চাইবে আমার কাছে। ক্যাশ টাকা তোমার ঘরে রাখতে চাই না। পাঁচ ছ'জন কাজের লোক। নগদ টাকা দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না। শেষে স্বভাব নষ্ট হবে।

তা ঠিক।

তোমার যখন যা ইচ্ছা করে আমাকে বলবে।

হুঁ বলব।

AMARBOI.COM

জাকের সাহেব বলার মত তেমন কিছু কখনো খুঁজে পাননি। যে ঘরে তিনি থাকেন সে ঘরে লাল রঙের ছোট এটা ফ্রীজ আছে। বার ইঞ্চি একটি রঙিন টি.ভি আছে। যে খাটে তিনি ঘুমান তার গদিটি আট ইঞ্চি ফোমের।

বিছানার পাশেই বেতের একটা ইজি চেয়ার। হাতের কাছে বইয়ের শেলফ। নিউজ উইক এবং টাইম এই দু'টি পত্রিকা শুধু তাঁর জন্যেই রাখা হয়। একজন ডাক্তার আছেন যিনি সপ্তাহে একবার (বুধবার সন্ধ্যা) এসে তাঁর ব্লাড প্রেসার মেপে যান। মিলি ঘড়ির কাটা ধরে প্রতি রাত দশটায় এসে বাতি নিভিয়ে যায়। রাত জাগলে তাঁর শরীর খারাপ করবে, তাই। তাঁর খাটের পাশে একটা সুইচ আছে যা টিপলেই রান্না ঘরে কলিং বেল বেজে উঠে। তোতা মিয়া ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে কিছু লাগবে কিনা।

গত সপ্তাহেই ছোট মেয়ের চিঠি পেলেন। সে লিখেছে,

বাবা, তুমি কি হনলুলু বেড়াতে আসতে চাও? তিন মাসের ভিজিটার্স ভিসা নিয়ে চলে এসো না। তোমার খারাপ লাগবে না। বড় আপার চিঠিতে দেখলাম তুমি সারাক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে থাক। এর কারণ কি? তোমার কি কোন কিছুর অভাব আছে? মিলি কি তোমার যত্ন-টত্ন ঠিকমত করছে না? কোন রকম সংকোচ না করে লিখবে।

তাঁর কোন অসুবিধা নেই। মিলি তাঁর খুব ভাল যত্ন করছে। তিনি যথেষ্ট সুখে আছেন। তাঁর এখন মনেই পড়ে না এক কালে তিনি দরিদ্র ছিলেন। চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে মাথা খারাপের জোগাড় হয়েছিল। এক সময় এও ভেবেছিলেন ফয়সল আই.এস.সি পাশ করামাত্র তাকে কোন একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। ভাগ্যিস সেরকম কিছু করেননি। অমানুষিক কষ্ট করেছেন ছেলেদের জন্য। তারাও মনে রেখেছে সে সব।

যেবার তাঁর রক্ত আমাশা হল কি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। প্রতিরাতে টেলিফোন। এতদূর থেকে টেলিফোন নিশ্চয়ই ছ'সাত শ' টাকা করে লাগত। বড় ছেলে মাসিক বরাদ্দের টাকা ছাড়াও বাড়তি এক হাজার ডলার পাঠিয়েছিল চিকিৎসা খরচের জন্যে। মিলিকে লিখেছে — বাবার সেবা-যত্নের জন্যে চব্বিশ ঘন্টার একজন নার্স রেখে দেবে। খরচের জন্য চিন্তা করবে না।

AMARBOI.COM

তাঁর দু' ছেলেরই হাত খুব দরাজ। তাদেব কথা মনে হলেই একটা তৃপ্তির ভাব আসে, মন ভাল হয়ে যায়। তারা অনেক কিছু করেছে তাঁর জন্যে কিন্তু তিনি নিজের বাবা-মা'র জন্যে কিছুই করতে পারেননি। তাঁর বাবা শেষ বয়সে বড় ভায়ের সঙ্গে থাকতেন। বড় ভাই ঘন ঘন চিঠি লিখতেন।

"বাবাকে আমার ঘাড়ে ফেলিয়া তোমরা সকলে কি প্রকারে নিশ্চিন্ত আছ তাহা আমি বুঝতে পারি না। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পালন করিবার দায়িত্ব কি আমার একার? তোমার কি কিছুই করিবার নাই? এই পত্র পাওয়ামাত্র বাবার খরচ হিসাবে অতি অবশ্যই পঞ্চাশ টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইবা। আমি বিশেষ অসুবিধায় আছি।"

এ জাতীয় চিঠি তিনি সব সময় উপেক্ষা করেছেন। সে জন্যে অবশ্যি তার মনে কোন অপরাধবোধ নেই। তিনি দরিদ্র ছিলেন। খুবই দরিদ্র। বাবাকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জাকের সাহেব দুপুর এগারোটার দিকে বাসায় ফিরলেন। মিলি বিরক্ত হয়ে বলল,

কোথায় কোথায় ঘুরছিলে রোদের মধ্যে? তিনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসলেন।

কিছু খাবে এখন?

না।

ঠাণ্ড কিছু খাও। বেলের সরবত করে দিক?

ঠিক আছে দিতে বল।

তুমি ঘর থেকে বেরুবার পরপর ফয়সল টেলিফোন করেছিল। গাল কাটার খবর বললাম। সে খুব বিরক্ত হয়েছে। বারবার বলছিল, বাবা এত অসাবধান কেন?

তিনি লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন। মিলি বলল, এখন থেকে তোতা মিয়া তোমার শেভ করে দেবে বুঝলে?

আচ্ছা।

জাকের সাহেব বরফ-দেয়া ঠাণ্ডা বেলের সরবত খুব তৃপ্তি করে খেলেন। জিনিসটা ভালই। মিলি বলল, সিদ্দিক আজ আবার এসেছিল।

তিনি শংকিত বোধ করলেন। সিদ্দিক তাঁর বড় ভায়ের ছেলে। কিছুদিন পরপরই সাহায্যের জন্যে আসে। মিলি বিরক্ত হয়।

আজ এসেই সে একটা মিথ্যা কথা ফেঁদেছে। বলেছে, তুমি নাকি তাকে আসতে বলেছ। তুমি নাকি সেলাই মেশিন কেনবার টাকা দেবে। বলেছ নাকি?

জাকের সাহেব মাথা নাড়লেন, তিনি কিছু বলেননি। মিলি কঠিন স্বরে বলল, ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না।

তাতো বটেই।

আমি আজ কড়া এক ধমক দিয়েছি।

ধমক দেয়ার কি দরকার ছিল?

ধমক দেব না? আমার সামনে এসত্রের মধ্যে কাশ ফেলল। রাগে আমার গা জ্বলে গেছে। তুমি যাও, গরম পানি করা হচ্ছে। গোসল সার। গালে পানি লাগিও না।

রাত আটটায় বড় ছেলে সিয়াটল থেকে টেলিফোন করল।

বাবা তোমার গাল কেমন?

ভাল।

মিলি বলল, তুমি নাকি ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার কর না?

এখন থেকে করব।

আমরা খুব চিন্তিত, বুঝলে বাবা?

বুঝেছি।

নাও, টুকুনের সঙ্গে কথা বল।

টুকুন বাংলা বলতে পারে না। সে একগাদা কথা বলে গেল। জাকের সাহেব শুধু ঘন ঘন মাথা নাড়লেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বললেন, ইয়েস ইয়েস।

রাত দশটার কিছু পরে ছোট মেয়ের টেলিফোন এল হনলুলু থেকে। কানেকশন ভাল নয়। কিছুই প্রায় শোনা যায় না।

বাবা, তুমি এত অসাবধান কেন?

AMARBOI.COM

এখন থেকে সাবধান হব।

ভাইয়া টেলিফোন করে আমাকে জানাল। আমি চিন্তায় অস্থির। খুব বেশী কেটেছে?

না, খুব বেশী না।

বিদেশে থাকি। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন কি খবর এসে পড়ে।

ভয় নাই। আমি অনেকদিন বাঁচব।

কথাটা হয়ত ঠিক। তাঁদের দীর্ঘজীবী বংশ। তাঁর বাবা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন। চোখে দেখেন না, কানে শুনেন না, উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না, তবু বেঁচে আছেন। তাঁর এত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। বেঁচে থেকে তিনি বড় ভাইকে প্রায় পাগল করে দিলেন। আর কিছুদিন বাঁচলে বড় ভাই সত্যি সত্যিই হয়ত পাগল হয়ে যেতেন।

তিনিও কি তাই করবেন? দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে সবাইকে পাগল করে তুলবেন?

জাকের সাহেব বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন। রাত বারোটায় তাঁকে ডেকে তোলা হল। ছোট ছেলে কায়সার টেলিফোন করেছে নর্থডাকোটা থেকে। জাকের সাহেব ঘুম-ঘুম চোখে ওঠে বসলেন। মিলি চমকে ওঠে বলল, কি সর্বনাশ! তোমার গালের এ অবস্থা কেন? সমস্ত মুখ ফুলে উঠেছে, বাম গাল এমন ফুলেছে যে একটা চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা। মিলি এসে বাবার হাত ধরল।

ইস, এ তো অসম্ভব জ্বর। বাবা তুমি শুয়ে থাক।

জাকের সাহেব শুয়ে থাকলেন না। টেলিফোন ধরতে নিচে নেমে গেলেন।

হ্যালো কায়সার?

হ্যাঁ। বাবা তুমি কেমন আছ?

ভাল, খুব ভাল। খুব চমৎকার আছি।

এ পর্যন্ত বলে তিনি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, এত সহজে আমি মরছি না। বুঝলি? আমি দীর্ঘদিন বাঁচব। এক সময় চোখে-টোখে দেখব না। কানে শুনব না। বিছানায় উঠে বসতেও পারব না, তবু বেঁচে থাকব।

এইসব তুমি কি বলছ বাবা?

জাকের সাহেব হাসতে লাগলেন। একজন সুখী মানুষের হাসি। আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।

AMARBOI.COM

জুয়া

থার্ড পিরিয়ডে প্রণব বাবুর কোন ক্লাস নেই।

তিনি কমনরুমে এসে পত্রিকা খুঁজতে লাগলেন। একটিমাত্র পত্রিকা রাখা হয়। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি হেড মাস্টার সাহেবের ঘরে থাকে। আজ হেড মাস্টার সাহেব আসেননি। তাঁর মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। ছেলের বড় ফুপা এসেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি বড় সাইজের কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছেন।

কাজেই কমনরুমের টেবিলে পত্রিকাটি পাওয়া গেল। ভাঁজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। এরকম একটা কড়কড়ে নতুন পত্রিকা পড়ার আনন্দই অন্য রকম। প্রণব বাবু কোণার দিকে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন, 'বশীর মিয়া ও বশীর মিয়া।'

বশীর মিয়া স্কুলের দপ্তরী। সেও হেড মাস্টার সাহেবের সঙ্গে কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছে। কেউ এল না। ফোর্থ পিরিয়ডে আজিজুদ্দীন সাহেব কমনরুমে পানি খেতে এসে দেখেন প্রণব বাবু মরার মতো পড়ে আছেন।

প্রণব বাবু, কি হয়েছে?

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, শরীর খারাপ না-কি? এ্যাই প্রণব বাবু।

শরীর ঠিক আছে।

আজিজুদ্দীন সাহেব কপালে হাত রাখলেন। না কপাল ঠাণ্ডা। জ্বর-জ্বারি কিছু নেই। প্রণব বাবু দুর্বল কণ্ঠে বললেন, পানি খাবো। একটু পানি দেন।

মাথা ঘুরছে নাকি? এ্যাই প্রণব বাবু?

প্রণব বাবু ফিসফিস করে বললেন, 'লটারীর রেজাল্ট দিয়েছে।' আজিজুদ্দীন সাহেবের ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লাগল। রেড ক্রস লটারীর দু'টাকা দামের টিকিট সবাইকে একটি করে কিনতে হয়েছে। হেড মাস্টার সাহেব পঞ্চাশটা টিকিট ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, সবাইকে কিনতে হবে। দেশের কাজ। আমরা শিক্ষকরা যদি না করি কারা করবে? সবার জন্যে একটা এগজাম্পল সেট করতে হবে। পাঁচটা করে কিনবেন সবাই।

থার্ড মাস্টার জলিল সাহেব মুখ কালো করে বললেন, দু'মাস ধরে বেতন নাই, এর মধ্যে এই সব আবার কি ঝামেলা স্যার?

দেশের কাজের মধ্যে আবার ঝামেলার কি দেখলেন? পাঁচটা করে কিনবেন সবাই। আর স্টুডেন্টদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটের ব্যবস্থা করবেন। দেশের কাজ।

AMARBOI.COM

পাঁচটা করে টিকিট কিনতে হল সবাইকে। হেড মাস্টার সাহেব দেশের কাজের জন্য হঠাৎ এতো ব্যস্ত হবার রহস্যও উদ্ধার হল। প্রতি দশটি টিকিটে তাঁর দু'টাকা করে লাভ থাকে।

সেই লটারীর রেজাল্ট দেখে প্রণব বাবুর কপাল ঘামছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে — এর অর্থ কি? আজিজুদ্দীন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার ভাই, কিছু পেয়ে গেলেন নাকি? অ্যাঁ?

প্রণব বাবু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, পেয়েছি।

আজিজুদ্দীন সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্লাস নাইনে তাঁর ইংরেজী গদ্য পড়াবার কথা, তিনি আর সেখানে গেলেন না। প্রণব বাবুর পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন। দুনিয়াতে কত অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটে। প্রণব বাবু পরশু দিন তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন — হাত একেবারে খালি, কোথায় টাকা পাব? গত মাসেও হাফ বেতন হয়েছে।

আজিজুদ্দীন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, এরকম ভ্যাবদার মতো বসে আছেন কেন? ফূর্তি-টুর্তি করেন।

কি ফূর্তি করব?

তাও ঠিক। লোকজন এ-রকম হঠাৎ লক্ষপতি হলে কি করে ফূর্তি করে কে জানে। রেজাল্টটা কোথায় দিয়েছে? দেখি পত্রিকাটা?

ক্লাস নাইনের ছেলেগুলো বড্ড গণ্ডগোল করছে। একজন এসে কমনরুমে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব ভ্রূ কুঁচকে লটারীর খবর দু'তিনবার পড়লেন। তাঁর কাছে কোন টিকিট নেই। তিনি সবগুলো নেজামের চায়ের স্টলে বিক্রি করে ফেলেছেন।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মাস্টারদের কারো আর ক্লাস নেবার উৎসাহ রইল না। সবাই কমনরুমে শুকনো মুখে বসে রইলেন। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছেলেদের জন্য আনা টিফিন বেঁচে গেছে। লুচি আর বুন্দিয়া। অন্য সময় হলে টিফিনের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে উৎসাহী আলোচনা চলতো। আজ আর কিছুই জমছে না। ক্লাস টেনের ছেলেগুলো কমনরুমের দরজার কাছে জটলা পাকাচ্ছিল। আজিজুদ্দীন সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, নাট্যশালা নাকি, অ্যাঁ? যা বাড়ি যা। দু'দিন পরে পরীক্ষা, কোনো হুঁশ নাই। গরুর দল।

হেড মাস্টার সাহেব খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। এবং খুব হৈ-চৈ শুরু করলেন,

স্কুল ছুটি দিয়েছে কে? স্কুল ছুটি দেয়ার মতো কি হয়েছে বলেন তো? একজন লটারীতে ক'টা টাকা পেয়েছে আর ওম্নি স্কুল ছুটি? পেয়েছেনটা কি?

হেড মাস্টার সাহেবের কথায় কারো কোনো ভাবান্তর হল না। এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কি ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন? কে গিয়ে এখন ক্লাস নেবে?

অসুবিধাটা কি? আমি তো এর মধ্যে অসুবিধার কিছু দেখলাম না।

তিন মাস বেতন নাই। এর মধ্যে একজন দু'লাখ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে?

তিন মাস বেতন নাই — কথাটা তো ঠিক বললেন না। হাফ বেতন হয়েছে গত মাসে। এস.এস.সি. পরীক্ষার কালেকশন হলে বাকিটা পাবেন। ভালো কালেকশন হবে এইবার।

বশীর মিয়া হেড মাস্টারের সঙ্গে ফিরে এসেছে। সে একটি বড় গামলায় তেল-মরিচ

AMARBOI.COM

দিয়ে মুড়ি মাখছিল। দুপুরে এটাই স্যারদের টিফিন। কেরোসিন কুকারে চায়ের পানি ফুটছে। হেড মাস্টার সাহেব বিরস মুখে বললেন, আজও মুড়ি? আজ একটা ভালো টিফিনের দরকার ছিল।

কেউ কোনো সাড়া দিল না। টিফিন পর্ব শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। টিচাররা সবাই বাড়ি চলে গেলেন। প্রণব বাবু নড়লেন না। হেড মাস্টাব সাহেব এক সময় বললেন, বাড়ি গিয়ে আমোদ-ফূর্তি করেন। চুপচাপ বসে আছেন কি জন্যে?

ভালো লাগছে না, স্যার।

ভালো লাগবে না কেন? আজ তো আপনার ভালো লাগারই দিন।

হেড মাস্টার সাহেব শুকনো গলায় টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন,

জোর-জবরদস্তি করে কিনিয়েছি বলেই পেলেন। মনে রাখবেন সেটা। হা-হা-হা। উপকারের কথা কারো মনে থাকে না — এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, পরিষ্কার বোঝা গেল না। হেড মাস্টার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, যে টিকিটে পেয়েছেন সেটা আছে তো? অনেক সময় দেখা যায় টিকিটটাই মিসিং। তখন সবই গেল।

প্রণব বাবু মানিব্যাগ থেকে টিকিট বের করে হেড মাস্টার সাহেবের হাতে দিলেন। হেড মাস্টার সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন টিকিটের দিকে। তাঁর মেয়ের এই বিয়ের প্রস্তাবটাও হয়তো ভেঙে যাবে। ছেলের ফুপা বলেছে ছেলের নাকি মোটর সাইকেলের খুব শখ। অজপাড়াগাঁর পোস্ট মাস্টারের ছেলে মোটর সাইকেল দিয়ে করবেটা কি? তেরো টাকার কৈ মাছ জলে গেছে বলাই বাহুল্য। হেড মাস্টার সাহেব ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, প্রণব বাবু, আপনি এইবার একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলেন।

মোটর সাইকেল দিয়ে আমি কি করব?

চড়বেন, চড়বেন। আপনারই তো দিন-কাল।

হেড মাস্টার সাহেব আবার টেনে টনে হাসতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

প্রণব বাবু স্কুল থেকে বেরুলেন সন্ধ্যার পর। তাঁর ধারণা ছিল, বাজারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অসংখ্যবার লটারীর টাকা পাওয়ার খবর তাঁকে বলতে হবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হল না। কেউ কি জানে না খবরটা? আশ্চর্য!

তাঁর ছেলে সুবল যেবার ময়মনসিংহে চুরি কেইসে গ্রেফতার হল সেবার প্রণব বাবুকে অসংখ্যবার ব্যাপারটা বলতে হয়েছে।

ফল্স কেইস বোধহয়। কি বলেন প্রণব বাবু? হাজার হলেও আপনার ছেলে। ভদ্রলোকের সন্তান।

ফল্স কেইস না। চুরি সত্যি সত্যি করেছে।

বলেন কি! ব্যাপারটা ঠিকমতো বলেন তো শুনি। বসেন না। এই বাবুকে চা দে।

আজ প্রণব বাবু নীলগঞ্জ বাজারের প্রায় শেষপ্রান্তে চলে এলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। বাজার থেকে বেরুবার সময় করিম মিয়া চিকন গলায় ডাকল, বাবু একটু শুনে যান তো।

কি ব্যাপার?

মোট দুইশ' এগারো টাকা পাওনা। আমরা গরীব ব্যবসায়ী। এতো টাকা আটকা পড়লে চলে?

দিয়ে দিবো।

এই কথা তো বাবু দু'তিন মাস ধরেই শুনতেছি। নিবারণ সাহার কাছে এই রকম চারশ' টাকা পাওনা। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গেল ইণ্ডিয়া।

আমি ইণ্ডিয়া যাবো না। ইণ্ডিয়াতে আমার কেউ নেই।

প্রণব বাবুর খুব ইচ্ছা হল লটারীর কথাটা বলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না।

তিনি বাড়ি পৌঁছলেন রাত আটটার দিকে! কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সাড়া-শব্দ করার লোকও অবশ্যি নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তিনি হাতড়ে-হাতড়ে তালা খুললেন। হারিকেন জ্বালালেন। টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে। খান কতক রুটি, একটা ভাজি, এক বাটি তেঁতুলের টক। তাঁর রান্না হয় জ্যাঠার বাড়িতে। রান্না হয়ে গেলে তালা খুলে খাবার রেখে যায়। সেই বাবদ জ্যাঠার হাতে যখন যা পারেন দেন।

প্রণব বাবু কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে রুটি গরম করতে বসলেন। তখনই হঠাৎ করে সুবল এসে উপস্থিত। সুবলের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না বললেই হয়। গত ছ'মাসে একবার মাত্র এসেছিল দু'দিনের জন্যে। তিনি কোনো কথা বলেননি। আজ নিজে থেকেই কথা বললেন, আছিস কেমন সুবল?

আছি কোনো মতো? তুমি আছো কেমন বাবা?

খেয়ে এসেছিস নাকি?

হঁ মাটন বিরিয়ানী খেয়েছি ইস্টিশনে। জানি তো এতো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কোনো আয়োজন তোমার নাই। খাচ্ছো কি তুমি, রুটি নাকি?

হুঁ। খাবি একটা?

না।

প্রণব বাবু খেতে বসলেন। সুবল বাইরের বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন সুবলের গায়ে চকচকে একটা শার্ট থাকলেও তার পায়ের চামড়ার জুতো জোড়াতে তালি পড়েছে। যে মোটর সপে মেকানিকের কাজ শিখতো সেখানে পয়সা-কড়ি বোধহয় কিছুই দেয় না।

তাঁর মনে পড়ল দু'মাস আগে আড়াই শ' টাকা চেয়ে ভুল বানানে তিন পাতার একটা চিঠি লিখেছিল সুবল। তিনি জবাব দেননি। এবারো টাকার জন্যেই বোধহয় এসেছে।

বাবা ঘরে চায়ের পাতা আছে?

আছে বোধহয়। দেখ্ তো হরলিক্সের বোতলটার মধ্যে।

সুবল চায়ের পানি চাপিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার কাছে তিনশ' টাকা হবে বাবা? আমার খুবই দরকার।

প্রণব বাবু অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি। একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা।

তাঁর ইচ্ছা হল জিজ্ঞেস করেন, কি ঝামেলা? কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর যে

AMARBOI.COM

মেয়ে কলকাতার শিবপুরে ছিল সেও কি-একটা ঝামেলায় পড়েছিল। এক হাজার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ছোট্ট চিঠি কিন্তু সেই ছোট্ট চিঠি পড়ে তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। মেয়েটি অনেক বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ঘুমাতো। কি বিশ্রী ঘুম। পা দু'টি বুকের কাছে এনে মাথা বাঁকা করে। কতো বকাঝকা কতো কি। লাভ হয়নি কিছুই। অঞ্জুর সেই চিঠির জবাব তিনি দেননি। লজ্জাতেই দিতে পারেননি। দীর্ঘ এক বছর সেই চিঠি পকেটে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ক্লাসে গিয়েছেন। পাটিগণিতের কঠিন সব অংক জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রণব বাবু বারান্দায় এসে বসলেন। কি চমৎকার জ্যোৎস্না!

অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। লেবু ফুলের ঘ্রাণ আসছে। গাছটাতে লেবু হয় না। শুধুই ফুল ফুটে। গাছ-গাছালির কোনো যত্ন নেই আর। কে যত্ন করবে?

সুবল চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাবা খুব বড় একটা ঝামেলার মধ্যে পড়েছি।

সবাই বড় ঝামেলায় পড়ে। তিনিও মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন। বিয়ে দেবেন এমন ছেলে পাওয়া যায় না। শেষটায় কেদারনাথ বাবু কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলেন। বিয়েটা কেমন হয়েছিল কে জানে? বর পছন্দ হয়েছিল পাগলীটার? আজ আর তা জানবার কোনো উপায় নেই। বাবাকে কি আর এইসব কথা কোনো মেয়ে লেখে? বাবাকে লিখতে হয় দারুণ সমস্যার সময়।

সুবল মৃদুস্বরে বলল, বাবা চা খাবে, চা দেই?

দে।

চিনি নাই। চিনি ছাড়া চা।

দে একটু।

সুবল তাকিয়ে দেখল তার বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ব্যাপারটা কি? সে আড়চোখে তাকাতে লাগল। মিনমিন করে বলল, তিনশ' টাকা না পেলে বেইজ্জত হব।

সুবল কথাটা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল। এবং লক্ষ্য করল তার নিজের চোখও ভিজে উঠছে। সে হঠাৎ বলে ফেলল, বড় কষ্ট বাবা।

কষ্ট! হ্যাঁ, কষ্ট তো বটেই। প্রণব বাবু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

টাকাটার কি জোগাড় হবে?

প্রণব বাবু জবাব দিলেন না। চোখ মুছলেন। সুবল বাবার কাছে সরে এল। প্রণব বাবু হঠাৎ কি মনে করে সুবলের একটি হাত চেপে ধরে সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

সুবল বলল, কাঁদবেন না বাবা। দেখি একটা ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। কাঁদবেন না।

মেয়েটারে বড় দেখতে ইচ্ছা হয় সুবল।

তিনি দু'লক্ষ টাকার একটি টিকিট পকেটে নিয়ে একজন নিঃস্ব মানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। সুবল বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। তিনশ' টাকার তার সত্যি খুব প্রয়োজন। তার নিজেরো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সে কাঁদল না। নিচু গলায় বলল, চিন্তার কিছু নাই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, কিছুই ঠিক হয় না।

AMARBOI.COM

তাঁর কথাকে সমর্থন করেই যেন ঘরের ভেতর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। বাইরে মাছের চোখের মত মরা জ্যোৎস্না।

জীবন যাপন

আমার দুলাভাই লোকটি খবিস ধরনের।

খবিস শব্দটির মানে আমি ঠিক জানি না। মনে হয় এর মানে খুব খারাপ ধরনের জানোয়ার। অন্য কিছুও হতে পারে। এই গালিটি আমি শিখি আমার দাদীর কাছে। তিনি কারো উপর খুব রেগে গেলে তাকে খবিস বলেন। তার বলার ধরন থেকেই বোঝা যায় এটা খুবই খারাপ গালাগাল।

যাই হোক, আমার দুলাভাই যে খবিস ধরনের এটা আমি বা বিনু (বিনু আমার বড় বোন। ওর সঙ্গেই খবিসটার বিয়ে হয়েছে) প্রথমে বুঝতে পারিনি। বিনুর বুঝতে পারার কথা নয়। সে কিছুই বুঝে না। খুবই বোকা, বিয়ে হওয়াতে সে আনন্দে গদগদ। বিয়ে হওয়ায় কোন মেয়ে এত খুশি হয় আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, প্রথম কিছুদিন মেয়েগুলির খুব মন খারাপ থাকে। আর না থাকলেও ভান করে যে মন খারাপ। বিনুর এসব কিছু নেই। এই সকালবেলাতেই সে সেজেগুজে বসে আছে। ঠোঁটে আবার বদরঙের কি-একটা লিপস্টিক দিয়েছে। বিনু মহানন্দে তার ঘর-সংসার দেখাতে লাগল এবং নিচু গলায় ক্রমাগত কথা বলতে লাগল। নিচু গলায় কথা বলার কারণ হচ্ছে দুলাভাই এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি। আমি শুকনো মুখে বিনুর কথা শুনতে লাগলাম।

'তিনটা ঘর এই বাড়িটাতে। আর বারান্দাটা কত বড় দেখেছিস? বসার ঘরটা আমরা তালা দিয়ে রাখি। ধুলাবালি যাতে না যায়। মেহমান-টেহমান আসলে তালা খুলে দেই। রান্নাঘরে আয় একটা জিনিস তোকে দেখাই, ময়লা ফেলবার জন্যে আমাদের একটা টিনের ড্রামের মত আছে। ড্রামের মুখটা হাত না দিয়ে খোলা যায়।'

বিনু এমনভাবে কথা বলছে যেন সে দীর্ঘ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। অথচ তার বিয়ে হয়েছে মাত্র পরশু। বিনুটা গাধার গাধা। ভ্যাজর ভ্যাজর করছেই। লজ্জা-শরম নেই।

"দুটো ফ্যান আমাদের। বসার ঘরে আর শোবার ঘরে। আরেকটা কিনব। আর শোন্, আমার এক ফুফা শাশুড়ি আমাকে গলার হার দিয়েছে। বিরাট বড়লোক। আয় তোকে হারটা দেখাই। স্টিলের আলমিরায় রেখে দিয়েছি। আমাদের একটা স্টিলের আলমিরা আছে।"

দুলাভাই ঘুম থেকে উঠলেন দশটার দিকে। আমার দিকে তাকালেন কিন্তু মনে হল চিনতে পারলেন না। গম্ভীর মুখে দাড়ি কামাতে বসলেন। সেই সময়টায় বিনু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল এবং ক্রমাগত বলতে লাগল, ডান গালে এখনো কয়েকটা আছে। থুতনিটা ভালমত হয় নাই। ইশ রক্ত বের হয়ে গেছে।

রক্ত বের হবার কথাটা সে এমনভাবে বলল যেন রক্তপাতের ফলে দুলাভাই

AMARBOI.COM

খানিকক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন। রাগে আমার মুখ তেতো হয়ে গেল। সব মেয়েগুলিই এরকম বেহায়া হয় না — শুধু বিনুটাই হয়েছে? কে বলবে এই মেয়ে বিয়ের দু'দিন আগে পর্যন্ত জালাল ভাইয়ের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করেছে। কি সব ভাষা সেই সব চিঠির — 'ওগো, তোমার ভালবাসার চুম্বনটি আমি গ্রহণ করিলাম।' চিঠিপত্রের চালাচালি বেশিরভাগই আমার মারফত হয়েছে। কাজেই কে কি লিখছে আমার জানা।

দুলাভাই নাশতা খেতে বসলেন এগারোটার সময়। ইতিমধ্যে তাঁর গোসল হয়েছে। তিনি ইস্ত্রী করা একটা পাঞ্জাবী পরেছেন। মুখে ক্রীম দেয়ায় তাঁর চারদিকে মিষ্টি একটা গন্ধ। নাশতার টেবিলে বসেই তিনি আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললেন। আমার দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তারপর কি ব্যাপার, ভাল?

আমি বললাম, জ্বি ভাল। আপনি ভাল?

তিনি তাঁর জবাব দিলেন না। গভীর মনোযোগে ডিমের পোচ থেকে সাদা অংশটি আলাদা করতে লাগলেন। বিনু হাসিমুখে বলল, ও কুসুম খায় না। কুসুম খেলে হার্টের অসুখ হয়। তুই কুসুমটা খেয়ে ফেল্।

আমি চুপ করে রইলাম। একজনের খাওয়া জিনিস আমি খাব কেন? কিন্তু বিনুটা এমন গাধা যে ক্রমাগতই বলতে লাগল, এই খেয়ে ফেল্ না। গোলমরিচ আছে। একটু গোলমরিচ দিয়ে খা মজা লাগবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোর ইচ্ছা হলে তুই খা।

বিনু টপ করে কুসুমটা মুখে দিয়ে ফেলল। খাবার-দাবারের ব্যাপারে ওর লজ্জা-শরম একটু কম। দুলাভাই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন (আমার দিকে না তাকিয়ে), 'বিনু তো তোমার দু'বছরের বড়। তাকে তুই তুই করে বলছ কেন? এটা অসভ্যতা। এখন থেকে আর তুই তুই করবে না। নাম ধরেও ডাকবে না। আপামণি বলবে, বুঝতে পারছ?'

আমি কঠিন মুখ করে বসে রইলাম। দুলাভাই মিহি গলায় বললেন — তুমি এক কাজ কর, চলে আস এ বাড়িতে। বিনু একা থাকে, সঙ্গী পাবে। মেট্রিকের রেজাল্ট হোক, পাস করতে পারলে তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেব।

দুলাভাইয়ের কথায় বিনু এতই আনন্দিত হল যে, হা করে হাসতে গিয়ে ডিমের কুসুমের দু'ফোঁটা তার শাড়িতে ফেলে দিল।

দুলাভাইয়ের এই আহ্বানে আপত্তি থাকার কোনই কারণ নেই। খুশি হবার মতন একটা ঘটনা। কেন তা একটু গুছিয়ে বলি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা চার ভাইবোন এবং মা গভীর গাড্ডায় পড়ে যাই (গাড্ডা শব্দটার মানেও আমি জানি না। সম্ভবত সমুদ্র)। আমাদের সবাইকে ভাগাভাগি করে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের ঘাড়ে ফেলে দেয়া হয়। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে আমাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে। পারে না। কারণ আমরা আঠার মত লেগে থাকি। আমি যার সঙ্গে লেগে আছি তিনি আমার বড় মামা। ইনি ইদানীং আমাকে আর সহ্যই করতে পারছেন না। কয়েক দিন আগে বড় মামার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট চুরি গেল। সম্ভাব্য চোরদের যে তালিকা তিনি প্রস্তুত করলেন তার মধ্যে আছেন আমার মামী, আমি স্বয়ং এবং এ বাড়ির কাজের ছেলে। মামী কোরান শরীফ ছুঁয়ে বললেন টাকার কথা তিনি

AMARBOI.COM

কিছুই জানেন না। মামা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন কি-না বলা মুশকিল (কারণ মামী যে কোন বড় মিথ্যা সাধারণতঃ কোরান শরীফ ছুঁয়ে বলেন)। তবে আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করলেন না। একগাদা লোকের সামনে আমাকে এবং কাজের ছেলেটাকে (কাজের ছেলেটার নাম মুনির) কান ধরে একশ' বার ওঠ-বোস করতে বললেন। বিরাট কেলেংকারি ব্যাপার। মুনির অবশ্য মহা ইন্টেলিজেন্ট ছোকরা। পরদিনই মামার ফিলিপস রেডিও (টু ব্যান্ড) নিয়ে হাওয়া। আমার এরকম কিছু করার উপায় ছিল না। কারণ আমার যাবার জায়গা নেই।

আমি এক শুক্রবারে আমার ইহজাগতিক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দুলাভাইয়ের বাসায় উঠে এলাম। বিনু আনন্দে আত্মহারা। আমার থাকার জায়গা হল স্টোর রুমে। বিনু ছোটাছুটি করে ঘর গুছিয়ে দিতে লাগল। নানা জায়গায় ছেঁড়া মশারি যত্ন করে সারিয়ে দিল এবং নিচু গলায় বলল, তোর দুলাভাইকে বলে তোকে একটা নেটের মশারি কিনে দেব। কয়েকটা দিন যাক।

এখানে আসার কিছুদিনের ভেতরই কিছু নতুন জিনিস জানলাম, যেমন — দুলাভাই লোকটির অনেক বয়স। তিনি সপ্তাহে একদিন (বৃহস্পতিবার, গোসলের সময়) মাথায় কলপ দেন। আগে তাঁর একবার বিয়ে হয়েছিল। লোকটি অসম্ভব কৃপণ।

এসব নিয়ে বিনুর কোন মাথাব্যথা দেখলাম না। মাথার কলপ প্রসঙ্গে বলল, জুলপির দুই একটা মাত্র চুল পেকেছে, বুঝলি? বেশি না। ওদের বংশের ধারা এরকম, অল্প বয়সে চুল পেকে যায়। ওর এক চাচা আছে পচিশ বছর বয়সে মাথার চুল সাদা।

দুলাভাইয়ের প্রথম বিয়ে প্রসঙ্গে তার মত হচ্ছে, বউটা ছিল মহা হারামজাদী। মানুষটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছে। আপদ বিদায় হয়েছে, বাঁচা গেছে।

আমি বললাম, বিয়ের আগে এইসব কথা বলা দরকার ছিল। বিনু বিরক্ত হয়ে বলল, এইসব কি আগ বাড়িয়ে বলার জিনিস? লজ্জাতেই বলতে পারেনি।

বুড়ো ধাড়ি।

আহ্ এসব কি? একটু বয়স না হলে বরদের আমার ভাল লাগে না। চেংড়া জামাই আমার কাছে অসহ্য।

বিনু এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন চেংড়া জামাই তার আগে কয়েকটি ছিল। বিনুটা এমন বোকা।

আমাকে এত আগ্রহ করে এখানে রাখার রহস্যটা আমি দ্বিতীয় দিনেই বুঝলাম। এ বাড়িতে কাজের কোন লোক নেই। সকাল বেলায় একটি ঝি (ময়নার মা, এর কথা পরে বলব) এসে বাসন ধুয়ে দিয়ে যায়, ঘর ঝাঁট দেয় এবং বাজার করে। বাজার করার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ল। আমার দ্বিতীয় দায়িত্ব দুলাভাইয়ের জন্যে সিগারেট আনা। তিনি এক সঙ্গে বেশি সিগারেট কিনেন না, তাতে বেশি খাওয়া হয়। তাঁর জন্য একটি করে সিগারেট কিনতে হয়। এবং সেটা কিনতে হয় অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে, যেমন একবার রাত দুটোর সময় সিগারেট কিনতে পাঠালেন। বিনু ক্ষীণস্বরে বলল, এত রাতে দোকান তো সব বন্ধ।

দুলাভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, ক'টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে তুমি জান? না জেনে কথা বলবে না। এই শহরে বেশিরভাগ দোকান সারারাত খোলা থাকে।

AMARBOI.COM

আমি সিগারেট নিয়ে এসে দেখি বিনু বারান্দায় বসে কাঁদছে এবং দুলাভাই এ-মাথা ও-মাথা করছেন। আমাকে দেখেই গম্ভীর গলায় বললেন, আবার যাও, আরো দু'টা সিগারেট নিয়ে এসো।

এটা বললেন বিনুকে শাস্তি দেবার জন্যে। বিনু আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগল। আমি আবার সিগারেট আনতে গেলাম এবং নিয়ে এসে দেখি তাদের মিটমাট হয়ে গেছে। বিনুর মুখ খুব হাসি-হাসি। সে রান্না ঘরে চা বানাচ্ছে। দুলাভাইয়ের মাঝে মাঝে দুপুররাতে চা খেতে ইচ্ছে করে। বিনু আমাকে বলল, চা খাবি? বানাব তোর জন্যে এক কাপ?

না।

খা একটু। তোর দুলাভাই লোকটা কিন্তু খারাপ না, ভালই।

ভাল হলেই ভাল।

রেগে গেলে মাথার ঠিক থাকে না। রোগা মানুষ তো, রাগ সামলাতে পারে না। বাবার কথা মনে নাই? রেগে গেলে কেমন মারধোর করত।

দুলাভাই তোমাকে মারে নাকি?

আরে না। মারবে কেন? আর ধর্, যদি এক-আধটা চড় দিয়েই বসে তাতে এমন কোন ক্ষতি তো হয় না। বাবা আমাদের মারতো না? আমরা কি কোন দিন রাগ করেছি বাবার ওপর?

রাগে আমার গা জ্বলে যায়। কার সঙ্গে কার তুলনা! কোথায় বাবা আর কোথায় এই বুড়ো ভাম (ভাম শব্দটার মানেও আমি জানি না। দাদীজান সব সময় দাদাজানের প্রসঙ্গে বলতেন)।

বাবা আমাদের মারতেন ঠিকই। হঠাৎ মেজাজ চড়ে গেলে একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে মেঘগর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কয়েক ঘা দেবার পর রাগ পড়ে যেত। তিনি কঞ্চি ছুঁড়ে ফেলে নিজেই কাঁদতে বসতেন এবং বিড়বিড় করে বলতেন — মহাপাষণ্ড আমি, মহাপাষণ্ড। আমার মত পাষণ্ড খোদার আলমে নাই। কিছুক্ষণ এইভাবে বিলাপ করার পর গম্ভীর মুখে শার্ট গায়ে দিয়ে বের হয়ে যেতেন। যে মার খেয়েছে তার মুখে তখন হাসি ফুটতো। কারণ বাবা তার জন্য কিছু-একটা কিনতে গিয়েছেন। মহার্ঘ কোন বস্তু নয়। একটা কাঠ পেনসিল, একটা দু' নম্বরী খাতা কিংবা চারটা আচার (পঁচিশ পয়সা করে প্যাকেট)। অনুতপ্ত পিতা সেই উপহার নিজের হাতে দিতেন না। মা'কে দিয়ে পাঠাতেন। রাতে ভাত খাবার সময় আরেক নাটক অভিনীত হত। বাবা উঁচু গলায় বলতেন — তিনি মহাপাষণ্ড। তিনি জল্লাদ। কাজেই নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যে রাতে তিনি কিছুই খাবেন না। উপবাস দেবেন। তাঁকে খাওয়াবার জন্যে বহু সাধাসাধি করতে হত। যে শাস্তি পেয়েছে সে এক সময় কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে জড়িয়ে ধরবার পর বাবা খেতে বসতেন।

এই বাবার সঙ্গে বুড়ো ভামের তুলনা? বিনুটার মাথায় আল্লাহ কি এক ফোঁটা বুদ্ধিও দেন নি? রাগে আমার কান্না পেয়ে যায়। কি ক্ষতি ছিল তার আরেকটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে? চেহারাটা না হয় আরেকটু খারাপই হতো?

বিনুর যে বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই তার সবচে' বড় প্রমাণ হচ্ছে — ময়নার মা'র ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না অথচ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ময়নার মা'র

AMARBOI.COM

বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের ভেতর। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। শ্যামলা রঙ। চেহারা ভাল। কথায় কথায় গা দুলিয়ে হাসে। আমি বেশ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, সে বিনুর সঙ্গে খারাপ ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করে। যেমন একদিন বলল, সায়েব এখনও ঘুমে? রাইতে ঘুমায় না? বুড়া বয়সে রস থাকে বেশি। হি হি হি।

বলাই বাহুল্য, বিনু এই রসিকতার কিছুই বুঝল না। বিরক্ত হয়ে বলল, শুধু শুধু হাস কেন?

রসের কথায় হাসি।

হাসি বন্ধ করে ঘরের কাজ শেষ কর।

সায়েবের ঘুম ভাঙলে কইয়েন ময়নার মা একখানা ভাল শাড়ি চাইছে। চিকন সুতার টাঙ্গাইলের শাড়ি।

শাড়ি কি জন্যে?

বুড়ো বয়সে সুন্দর বউ পাইছে হেই কারণে। কইয়েন কইলেই দিব। হি হি হি।

আবার কেন হাসছ?

আমার হাসি-রোগ আছে। আপনের সায়েব এই রোগের কথা জানে। এই রোগের কোন চিকিৎসা নাই। হি হি হি।

আমি বিনুকে বললাম, মেয়েটা খারাপ। দুলাভাইকে বলে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দে।

বিনু অবাক হয়ে বলল, খারাপ মানে? কি খারাপ?

তুই বুঝবি না। মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দে।

দুলাভাই বিনুর কথা কানেই তুললেন না। গম্ভীর গলায় বললেন — ফালতু কথা আমার সঙ্গে একেবারেই বলবে না। কাজের লোক কি পাওয়া যায়? ভাল কাজকর্ম করছে। ছাড়িয়ে দেব কেন শুধু শুধু? শাড়ি চেয়েছে, একটা শাড়ি দিলেই হয়। বিয়ে-শাদী উপলক্ষে এরা তো দু'একটা শাড়ি আশা করতেই পারে। এর মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই।

পরদিনই ময়নার মা'র জন্যে শাড়ি চলে এল। টাঙ্গাইলের চিকন পাড় শাড়ি। বিনু গম্ভীর গলায় বলল, কত দাম নিল?

তা দিয়ে তোমার দরকার কি? টাকা-পয়সার কোন ব্যাপারে তুমি থাকবে না, বুঝলে? মেয়েছেলেদের টাকা-পয়সা নিয়ে কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। মেয়েছেলে থাকবে মেয়েছেলের মত।

ময়নার মা শাড়ি পেয়ে খুশি হল কি-না বোঝা গেল না। সে খুব গা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

বিনু বলল, হাস কেন?

খুশি হইয়া হাসি। শাড়ি পাইছি এই জন্যে হাসি। হি হি হি।

এই রকম হাসলে আমার বাসায় কাজ করতে পারবে না।

ওমা এইটা কেমুন কথা? হি হি হি।

ময়নার মার তীক্ষ্ণ হাসি আমাদের বেশি দিন সহ্য করতে হল না। এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা নতুন একটা বাড়িতে গেলাম। বাড়ি বদলের পর্বটি সমাধা হল খুব গোপনে। দুলাভাই বললেন, বাড়ি বদলের ব্যাপারটা ময়নার মা'কে জানিয়ে কাজ নেই।

AMARBOI.COM

বিনু অবাক হয়ে বলল, জানালে অসুবিধা কি?

বেটি মহাহারামী। জানলে ঐখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

উপস্থিত হলে অসুবিধা কি?

আরে কি শুধু মুখের উপর কথা? বললাম জানাবে না। ফুরিয়ে গেল। হেনতেন একশ' কথার দরকার কি?

এক রাতে ময়নার মা'কে কিছু না জানিয়ে এবং বাড়িওয়ালার দু'মাসের বাড়ি ভাড়া না দিয়ে আমরা নতুন বাসায় চলে গেলাম। নতুন বাসাটি আগেরটির চেয়ে বড়। দু'টি বাথরুম। সামনে-পেছনে বারান্দা। বিনুর আনন্দের কোন সীমা রইল না। তার অবশ্যি স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করেছে। চোখের কোণে কালি পড়ছে। মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু। পেট বড় হওয়া শুরু হয়েছে। তবু এই অবস্থাতেও সে বাড়ি গুছিয়ে রাখার জন্যে সারাদিন পরিশ্রম করে। সাবান পানি দিয়ে মেঝে ধোয়। রান্নাবান্না করে। কারণ এখন আমাদের কোন কাজের লোক নেই। যে কোন কারণেই হোক দুলাভাইয়ের মেজাজ এখন খুব খারাপ। রোজ রাতে কর্কশ গলায় ঝগড়া করেন।

সেই সব ঝগড়ার কোন আগামাথা নেই। দুলাভাই নিজেই একতরফা চেঁচিয়ে যান। বিনুর একটি কথাও শোনা যায় না। এক সময় সে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। তখন একটি চড়ের শব্দ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে দুলাভাইয়ের ক্রুদ্ধ গলা, কতবার বলেছি কাঁদবি না।

তুই করে বলছ কেন?

শাট আপ। বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।

তুই তুই করে বলছ কেন?

যা বেরিয়ে যা। ছোটলোকের দল। বিদেয় হ।

আমার ঘরটা দুলাভাইয়ের ঘরের পাশেই। সবকিছু শুনেও না শোনার ভান করে থাকি। রাত বাড়তে থাকে। এক সময় পাশের ঘর থেকে আর কোন সাড়া-শব্দ আসে না। ঝগড়ার মিটমাট হয়ে যায় বোধ হয়। গভীর রাতে বিনু এসে দরজা ধাক্কা দেয়। ফিসফিস করে বলে, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

না। কেন?

তোর দুলাভাইকে একটা সিগারেট এনে দে না।

আমি দরজা খুলি, বিনু আলোতে আসে না। ঘোমটা দিয়ে তার বাঁ গাল আড়াল করে রাখতে চায়। আমি হাল্‌কা গলায় বলি, আবার মেরেছে?

বিনু সহজ স্বরে বলে, না। মারবে কেন শুধু শুধু?

গাল ঢেকে রেখেছিস কেন?

এম্নি।

শ্রাবণ মাসের আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে। আমি সিগারেট আনতে যাই। কোন কোন রাতে ঘরে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছা করে হাঁটতেই থাকি, হাঁটতেই থাকি। কিন্তু তখন মনে হয় বিনু দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। তার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

আমি ফিরে আসি। বিনু উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, সিগারেট ভিজে যায়নি তো? আমি

WWW.AMARBOI.COM

গাঢ় স্বরে বলি, আমি ভিজেছি, সিগারেট ভিজেনি। বিনু হাসে।

বড় ভাল লাগে এই বোকা মেয়েটির হাসি।

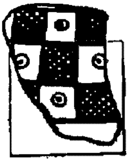

সে

আমার ছোট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ক্রমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করানো হল। শুকনো ভাতের দলা গেলানো, মধু খাওয়ানো, গলায় সেঁক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রাম দেশে না-কি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।

বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়তবা বেড়াল-চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয়নি। কারণ, মনে হলেও লাভ হত না। আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু কিছু খণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দু'টি পেট্রোল পাম্পে না-কি আগুন লাগান হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। শহর ভর্তি গুজব। শোনা যাচ্ছে, এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে রেডি অবস্থায় আছে।

AMARBOI.COM

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পরপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে — বাবা, আমি কি মরে যাচ্ছি?

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরো চোখে পানি এসে গেল।

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে মোড়ে ফার্মেসী দেখা যায়। সেই সব ফার্মেসীতে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কোন ফার্মেসী খোলা নেই। দুজন ডাক্তারের বাসায় গেলাম — একজন বাসায় ছিলেন না, অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, মেডিকেলে নিয়ে যান।

মেডিকেলেই নিয়ে যেতাম তবু কেন জানি সাইনবোর্ড দেখে দেখে তৃতীয় একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইনবোর্ডে লেখা 'স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'। গলায় কাঁটা ফুটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম যদি কিছু করতে পারেন।

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছোটখাট মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছকাছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে যাদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এরকম মনে হল। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হা করালেন।

গলায় টর্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, মা মণি ব্যথা কমেছে?

আমার মেয়ে চুপ করে রইল। সে বোধহয় তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, কি মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

'এখন বল তুমি কি খাবে? আইসক্রিম খাবে? দেব একটু আইসক্রিম?'

'ভ্যানিলা আইসক্রিম থাকলে খাব।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।'

ভদ্রমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, ডাক্তারী যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবোই কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবী করব–এটা কি করে ভাবলেন? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই হাসির দাম লক্ষ টাকা। তাই না?

মিসেস হাসনা বেগমের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নিউক্লিয়ার মেডিসিনে গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছ থেকে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেই ভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি।

WWW.AMARBOI.COM

মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরপর আমি একটা ক্লিনিকে চাকরি নেই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটা ক্লিনিক ছিল — সবই মাতৃসদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নেই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। ধনী পরিবারের মা'রাই শুধু আসতেন। সুযোগ-সুবিধা ভাল ছিল। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাকুল্যে পনেরোটি বেড ছিল। দশটি 'এ' ক্যাটাগরির, পাঁচটি 'বি' ক্যাটাগরির। 'এ' ক্যাটাগরির ঘরগুলিতে এয়ারকুলার বসান ছিল। আমরা ডাক্তার ছিলাম তিনজন। প্রধান ডাক্তার মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা — আমরা দু'জন সদ্য পাস করা ডাক্তার। অবশ্যি সব কাজ আমরা দু'জনই দেখতাম। যেহেতু ছোট্ট ক্লিনিক। আমাদের কোন অসুবিধা হত না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভর্তি হল। প্রথম মা হতে যাচ্ছে। ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনো অনেক দেরি। একেকটা কনট্রেকসানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, ভয়ের কিছু নেই।

মেয়েটি করুণ গলায় বলল, তুমি তো বাচ্চা মেয়ে। তুমি পারবে? তুমি জান সব কিছু?

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, আমি বাচ্চা নই। তাছাড়া আমি একজন খুব ভাল ডাক্তার। আপনার কোন ভয় নেই। আমি ছাড়াও এখানে ডাক্তার আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।

রুগিনী বললেন, ভাই তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ করনি তো?

'না।'

'আমার এমন বদঅভ্যাস যাকে পছন্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।'

আমি কাগজপত্র ঠিকঠাক করবার জন্য ভদ্রমহিলার স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল খুবই ক্ষমতাবান পরিবারের বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমড়া-চোমড়া ধরনের কিছু মানুষ বিরক্ত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অতি বিরক্ত গলায় বলছে, আপনাদের ব্যবস্থা তো মোটেই ভাল না। ইমার্জেন্সী হলে পেশেন্টকে আপনারা কি করবেন? এখানে কি অপারেট করার ব্যবস্থা আছে?

'জ্বি আছে।'

'আপনাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে? ধরুন, হঠাৎ যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তখন? তখন কি করবেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপারেশন হবে না?'

লোকগুলি আমাদের বিরক্ত করে মারল। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের এখান থেকে আমরা বেশকিছু টেলিফোন করব। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। সব পেমেন্ট করা। "মানি উইল নট বি এ প্রবলেম।"

রুগিনী ভর্তি হয়েছেন বিকেলে। রাত ন'টা বাজার আগেই স্রোতের মত মানুষ আসতে লাগল। অনেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ। অনেকের হাতে উপহারের প্যাকেট। বিশ্রী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈর্য হারাই না। আমারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনারা কি শুরু করেছেন? এটাকে একটা বাজার বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে ভীড় পাতলা করুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভারী হোক, তখন আসবেন।

আমার কথায় একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত মেয়ের শাশুড়ি হবেন, চোখ-মুখ লাল করে বললেন, আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন বাড়ির বউ?

আমি বললাম, আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমার পেশেন্ট — এইটুকু শুধু জানি। আর দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখব তাকেও একইভাবে দেখা হবে।

'আর দশটা বউ এবং আমার ঘরের বউ এক?'

'আমার কাছে এক।'

'জান আমি এই মুহূর্তে তোমার চাকরি খেতে পারি।'

আমি শীতল গলায় বললাম, আপনি আমার চাকরি খেতে পারেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমার কোন ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকরি যেতে পারে। তার আগে নয়। আপনি শুধু শুধুই চেঁচামেচি করছেন।

ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে — স্কাউনড্রেল, লোফার এইসব বলতে লাগলেন। একজন ভদ্রমহিলা এমন কুৎসিত ভাষায় কথা বলতে পারেন আমার জানা ছিল না। বিরাট হৈ- চৈ বেধে গেল। আমাদের প্রফেসর এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন। তা বললেন না। আমার উপর অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন — হাসনা, তোমাকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার প্রফেসর জানেন কত আগ্রহ, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ করি অথচ তিনি . . .

AMARBOI.COM

আমি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে আমার চোখে পানি আসে না কিন্তু রিকশায় ফিরবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকাতর।

রাত এগারোটায় প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুণ গলায় বললেন, হাসনা খুব কেলেংকারি হয়ে গেছে। তুমি চলে আসার পর ক্লিনিকের কেউ কোন কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এ রকম যে দাঁড়াবে কল্পনা করিনি। এখন তুমি চল।

আমি বললাম, স্যার, আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রুগীর আত্মীয়দের বলুন তাকে অন্য কোন ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।

'বলেছিলাম। পেশেন্ট যাবে না। সে এখানেই থাকবে।'

'এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকবে। এবং সে বলে দিয়েছে, ডেলিভারীর সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোন খোঁজখবর রাখ না। যদি রাখতে তাহলে বুঝতে এই মেয়ে কোন পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মত দেশে এরা যা ইচ্ছা করতে পারে। তুমি চল।'

'স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছে করুক।'

'হাসনা, অন্য সব কিছু বাদ দাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার উপর নির্ভর করে আছে। আমার উপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড়?'

আমি শাল গায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিং রুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। রুগিনীর কাছে দু'জন। দু'জনের একজন রুগিনীর শাশুড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, রাগের মাথায় কি সব বলেছি কিছু মনে রেখো না মা। রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে রাখিনি।

'বৌমা তখন থেকে বলছিল সে তোমাকে যেন কি বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোন। ও খুব ভয় পেয়েছে।'

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনারা ঘর থেকে যান মা। আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলব। আর কেউ যেন না থাকে।

ভদ্রমহিলা দু'জন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, ভাই তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

'তার কি দরকার আছে?'

'আছে, তুমি লক কর। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে। দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বস।'

আমি তাই করলাম। কনট্রেকসনের সময় কমে এসেছে। ব্যথার ধকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে সে অনেক দূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, ভাই তোমার কি রাগ কমেছে?

'হ্যাঁ কমেছে।'

AMARBOI.COM

'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল যে তোমার রাগ কমেছে।'

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, আমার রাগ কমেছে।

'আমি তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।'

'আমি মোটেই রাগ করিনি।'

'আমি সবাইকেই তুমি তুমি বলি না। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয়, খুব আপন মনে হয় তাদেরকে আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভাল লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।'

'কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি বরং চুপ করে থাক। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নাও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেনটা ভাঙতে শুরু করেছে।'

'আর কত দেরি?'

'এখনো দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'বারোটা একুশ।'

'মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।'

•

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিছু রুটিন কাজ আছে। এগুলি সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারী হবে, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভাল।

মেয়েটি বলল, যে জন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনো বলিনি। তুমি বস। উঠে দাঁড়ালে কেন? আসল কথা তো বলিনি।

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কি বলছে! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-তাবোল বকছে না তো?

'আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।'

'কারা?'

'আমার শ্বশুর বাড়ির লোকরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকেও কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।'

'তুমি এসব কি বলছ?'

'যা সত্যি আমি তাই বলছি।'

'ওরা বাচ্চাটাকে মারবে কেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যথার প্রবল ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হল মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়ত কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তাই না?'

AMARBOI.COM

'না।'

'যা সত্যি তাই আমি বললাম।'

'তুমি জানলে কি করে — ওরা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চায়?'

'আমাকে বলেছে।'

'কে বলেছে?'

'আমার বাচ্চাটা আমাকে বলেছে।'

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সম্ভবত সে পারিবারিক জীবনে খুব অসুখী। শ্বশুরবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকেই সে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করনি, তাই না?

'তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কি করে বলবে?'

'ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না অসংখ্যবার বলেছে।'

'স্বপ্নে বলেছে?'

'হ্যাঁ, স্বপ্নে। গতকাল শেষ রাতেও স্বপ্নে দেখেছি।'

'কি দেখেছ?'

'দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে — মা, সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কি করি?'

বলতে বলতে মেয়েটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, প্রথমবার যে সব মেয়েরা কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন — তারা মারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে — এইসব। এর কোন মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় খুব আতংকগ্রস্ত থাকে বলেই এ রকম স্বপ্ন দেখে।

'আমি জানি আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তাই হবে। আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মত নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব তখন তুমি বুঝবে যে কত মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।

মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, সত্যি তুমি তাই করবে?

'অবশ্যই!'

'তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর। কোরান শরীফ ছুঁয়ে বল, তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।'

'একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি কি বলছ?'

'তুমি কোরান শরীফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।'

'প্রতিজ্ঞার কোন দরকার নেই।'

'দরকার থাকুক বা না থাকুক তুমি প্রতিজ্ঞা কর।'

'কোরান শরীফ এখানে পাবো কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ভেতর। আমি নিয়ে এসেছি।'

AMARBOI.COM

রুগীকে শান্ত করবার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হল। রুগী শান্ত হল না। তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। সে চাপা গলায় বলল, আমি জানি তুমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। যদি না রাখ তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিচ্ছি।

মেয়েটি সত্যি সত্যি একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটাব মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসি-খুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

সব কিছুই ঠিকঠাক মত চলছিল।

রাত দুটায় বাইরের দু'জন পুরুষ ডাক্তার এলেন। ডেলিভারীর সময় এরা থাকবেন। এঁদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভাল ডাক্তার।

আমাদের রুগিনী নতুন ডাক্তার দু'জন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, এরা কারা? এরা আমার বাচ্চাকে খুন করবে।

আমি বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক — আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেণ্ডের জন্যে নড়ব না। তাছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর মত ডাক্তার কম আছে।

'মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।'

'আমার মনে আছে।'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।'

'আমার মনে আছে।'

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্প বয়স্ক একজন যুবক। তাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হল। তবে যে কোন কারণেই হোক তাকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, আপা আমার স্ত্রী সম্ভবত আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। অথচ ওর ধারণা . . .

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, আপনি এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।

'সব ঠিকঠাক আছে তো আপা?'

'সব ঠিক আছে।'

'সিজারিয়ান লাগবে না?'

'না — নরম্যাল ডেলিভারী হবে। তাছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খবুই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।'

'তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে?'

'হ্যাঁ।'

AMARBOI.COM

রাত তিনটার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঠিক চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছে বার্থ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, বাচ্চার পজিসন তো ঠিক নেই। মাথা উপরের দিকে। এতক্ষণ তোমরা কি মনিটর করছ?

আমিও দেখলাম — তাই। এরকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষণ আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কোনই কারণ নেই। টকটকে লাল রঙের রক্ত — যা ধমনী থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায়?

ব্লাড ক্রস ম্যাচিং করা ছিল — রক্ত দেয়া শুরু হল কিন্তু এটা সমস্যার কোন সমাধান নয়। মনে হল রুগিনী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গম্ভীর গলায় বললেন, সামথিং ইজ ভেরী রং। আমাদের সবার গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কি বলছেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল — হঠাৎ করে কনট্রেকসান বন্ধ হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রেকসান সবচে' বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্থ চ্যানেলে মারা গেছে?

রুগিনী ফিসফিস করে বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভারীর প্রস্তুতি নিলেন। আর তখন ইলেকটিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলে উঠে — তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাজাক, মোমবাতি সব সময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোন নতুন ঘটনা নয় — কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। দ্রুত হ্যাজাক জ্বালান হল।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারী করালেন — যে জিনিসটি বেরিয়ে এল আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুৎসিত কদাকার একটা কিছু যার দিকে তাকান যায় না। এ আর যাই হোক মানবশিশু নয়। চেনা-জানা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। এর থেকে হাতীর শুঁড়ের মত আট-দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়গুলি বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণ্ডটিও বড়-ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র মিল — এই জিনিসটিরও দু'টি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছে চারদিকের পৃথিবীকে। চোখ দু'টি সুন্দর। কাজল টানা।

ডাক্তার সেন হতভম্ব গলায় বললেন, হোয়াট ইজ দিস? হোয়াই ইজ দিস? ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্তুটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলবিল করতে লাগল। মনে হচ্ছে শুঁড়গুলিকে পায়ের মত ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গের সহকর্মী হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রুগিনীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হত।

ডাক্তার সেন বললেন, কিল ইট। এক্ষুণি এটাকে মেরে ফেলা দরকার।

WWW.AMARBOI.COM

জন্তুটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? ডাক্তার সেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হলে এল। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউণ্ড যা মানুষের স্নায়ুকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন, অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।

জন্তুটি এগুতে শুরু করেছে। শুঁড়গুলি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে, আর সে এগুচ্ছে তার মা'র দিকে। আমরা দেখছি সে মেঝে বেয়ে বেয়ে তার মা'র খাটের দিকে যাচ্ছে — খাট বেয়ে উপরে উঠছে। আশ্রয় খুঁজছে মা'র কাছে। যেন সে জেনে গেছে এই অকরুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।

আবার আগের মত শব্দ হল। জন্তুটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দু'টি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুণা এবং দয়া ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুণা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ। আমরা আমাদের মাঝে তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ংকর অসুন্দর ও কুৎসিতকে আমরা আশ্রয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসেনি। মানুষের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, এই জন্তুটিকে যে মেরে ফেলতে হবে এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোন দ্বিধা আছে?

আমরা সবাই বললাম — না, আমাদের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা কি মনে করেন এই জন্তুটি হত্যার আগে তার আত্মীয়-স্বজনদের মত নেয়া উচিত?

আমরা বললাম — না, আমরা তাও মনে করি না।

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্তুটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি সুন্দর বড় বড় শান্ত চোখ। কি আছে ঐ চোখে? ঘৃণা, দুঃখ, হতাশা? জন্তুটি খাটের পা বেয়ে অর্ধেক উঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেকে গেল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আর উঠে লাভ নেই।

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মত গলায় ডাকল — মা, মা।

তার মা সাড়া দিল না।

আমরা দেখছি একটি দানবকে। সেও তার করুণ চোখে একদল দানবকেই দেখছে।

আমার হাত থেকে লোহার রডটি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।

ডাক্তার হাসনা বেগমকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই ঘটনার কি কোন ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন?

ডাক্তার হাসনা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন — আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই। তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটি

AMARBOI.COM

শিশুর জন্ম বৃত্তান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের জন্তুটির বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। ঐ শিশুটিকেও জন্মের কুড়ি মিনিটের মাথায় হত্যা করা হয়। এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মা'কে কয়েকবার ডাকে।

'আপনার কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই?'

'না। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় প্রকৃতি ইভোলিউসন প্রক্রিয়ায় হয়ত নতুন কোন প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাণপণে সেই প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছি।'

'আপনার ধারণা এ রকম ঘটনা আরো ঘটবে?'

'হ্যাঁ। প্রকৃতি সহজে হাল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ্য রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাধা দিতে না পারি। ঐ যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন — তার একটিই ব্যাখ্যা — প্রকৃতি শিশুটি রক্ষার চেষ্টা করছে। এক ধরনের প্রোকেটশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না, তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরো কোন ভাল প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন?'

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই ও দেখতে পাই না। বুঝতে পারি ও বুঝতে পারি না। অনুভব করি এবং অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়।

AMARBOI.COM

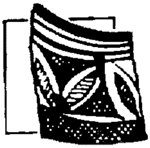

খেলা

খায়রুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলের থার্ড স্যার, বাবু নলিনি রঞ্জন একদিন দুপুরবেলা দাবা খেলা শিখে ফেললেন। এই খেলাটি তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। দু'জন লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বোর্ডের দিকে বিরক্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকবে — মানে হয় কোন? তবু তাঁকে খেলাটা শিখতে হল। জালাল সাহেব জিওগ্রাফী স্যার, তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু। জালাল সাহেবের কথা ফেলত পারলেন না। টিফিন টাইমে তিনি শিখলেন বড়ে কিভাবে চলে, ঘোড়া কি করে আড়াই ঘরের লাফ দেয়, গজ শুঁড় উঁচু করে কোণাকুণি দাঁড়িয়ে থাকে। জালাল সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্রেইনের খেলা, বুঝলে পণ্ডিত? বুদ্ধির চর্চা হয়।

বুদ্ধির চর্চা কি করে হয় নলিনি বাবু সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না কিন্তু প্রথম খেলাতেই জালাল সাহেবকে হারিয়ে দিলেন। জালাল সাহেব ফ্যাকাশেভাবে হাসতে হাসতে বললেন, হেলাফেলা করে খেলেছি বলে এই অবস্থা। হবে নাকি আরেক দান?

আরেক দানের সময় ছিল না। ফোর্থ পিরিয়ডে ইংলিশ কম্পজিশন। নলিনি বাবু উঠে পড়লেন। ক্লাসে ভাল পড়াতে পারলেন না। মাথার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে দাবা খেলাটা ঘুরতে লাগল। এ রকম তাঁব কখনো হয় না।

ছুটির পর দু'হাত খেলা হল। জালাল সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখি চিন্তা-ভাবনা করে ডিফেন্সিভ খেলা দরকার।

তৃতীয় খেলাটিতে জালাল সাহেব প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর আছরের নামাজ ক্বাজা হয়ে গেল। খেলা চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। দফতরী বাচ্চু মিয়া ঘর বন্ধ করতে না পেরে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। খেলার শেষে জালাল সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। নলিনি বাবু বললেন, তুমি দেখি মনমরা হয়ে গেছ।

জালাল সাহেব বললেন, আরেক হাত খেল। লাস্ট দান। এই বার আর পারবে না — খুব ডিফেনসিভ খেলব।

আজ থাক। ট্যুইশনি আছে।

কতক্ষণ আর লাগবে, খেল দেখি।

শেষ খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। জালাল সাহেব ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। নলিনি বাবু বললেন, চল যাওয়া যাক।

আরেক হাত খেল।

আর না, রাত হয়েছে।

খেল তো, রাত বেশী হয় নাই।

নলিনি বাবু আবার বসলেন। তাঁর জয়যাত্রা শুরু হল। নিয়ামতপুরের লোকজন

AMARBOI.COM

কিছুদিনের মধ্যেই জেনে গেল এ শহরে অসম্ভব ভালো একজন দাবাড়ু আছেন। তাঁকে কেউ হারাতে পারে না। তাঁর সেই খ্যাতি পরের পনেরো বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রইল।

পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে তাঁর দু'টি দাঁত পড়ল, বাঁ চোখে ছানি পড়ল। এবং তিনি এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার হিসেবে শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে রিটায়ার করলেন। তাঁর বিদায় উপলক্ষে লেখা মানপত্রে বলা হল।

"বাবু নলিনি রঞ্জন দাবার জগতের একজন মুকুটহীন সম্রাট। তিনি বাংলাদেশ দাবার চ্যাম্পিয়ন জনাব আসাদ খাঁকে পর পর তিন বার পরাজিত করে দাবার জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।"

কথাটা সত্যি। আসাদ খাঁর শালীর বাড়ি নিয়ামতপুর। তিনি কোন এক অশুভ ক্ষণে শালীর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন এবং কৌতূহলী হয়ে খেলতে বসেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল মফস্বলে যা হয়ে থাকে মোটামুটি ধরনের একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে — এও সে রকম। খেলতে বসেও তাঁর সে ভুল ভাঙল না। তিনি দেখলেন রোগা এবং বেঁটে এই লোকটি ওপেনিং সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। যারা সাধারণ দু' একটা বইটই পড়েছে তারাও যেসব জানে, এ লোকটি স্বাভাবিক কারণেই সেসব কিছু জানে না। যার ফলে পঞ্চম চালের মাথায় আসাদ খাঁ নলিনি বাবুর রাজার সামনের বড়েটি নিয়ে নিলেন। তিনি অবহেলার একটা হাসিও হাসলেন। কিন্তু সে হাসি তাঁর ঠোঁটে ঝুলে পড়ল যখন দেখলেন কৃশকায় এই লোকটি তার দু'টি ঘোড়া নিয়ে হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আসাদ খাঁ খুবই অবাক হলেন, কিন্তু নিয়ামতপুরের লোকজন এমন ভাব করতে লাগল যে নলিনি বাবুর কাছে হারার মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই।

আসাদ খাঁর সে বছর শালীর বাড়ি বেড়াতে আসার সমস্ত আনন্দ ধুয়ে-মুছে গেল। নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লেখা হল — নিয়ামতপুর নিবাসী প্রবীণ দাবাড়ু খায়রুন্নেছা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষক বাবু নলিনি রঞ্জন বাংলাদেশ দাবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, নিয়ামতপুরের গৌরব এই কীর্তিমান দাবাড়ু বিগত দশ বৎসরে কাহারো নিকট পরাজিত হন নাই . . . ।

ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি। নলিনি বাবু শুধু জিতেই গেছেন। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন খেলতে আসতো তাঁর সঙ্গে। একবার দাবা ফেডারেশনের সেক্রেটারী এক বিদেশীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এতবড় ঘটনা নিয়ামতপুরে আর ঘটেনি। যারা দাবা খেলার কিছুই বুঝে না, তারাও এসে ভিড় করল। টিফিনের পর খায়রুন্নেছা গার্লস হাই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ফেডারেশনের সেক্রেটারী দু'বার বললেন, আপনি খুব সাবধানে খেলবেন। যাকে নিয়ে এসেছি তিনি বেলজিয়ামের লোক। খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়।

আমি সাবধানেই খেলি।

তাড়াহুড়া করে চাল দেবার দরকার নেই, বুঝলেন?

নলিনি বাবু মাথা নাড়লেন, বুঝেছেন।

এঁর সঙ্গে গিয়াকো পিয়ানো ডিফেন্স খেলাই ভাল। সেই ডিফেন্স জানেন তো?

জ্বি না। জানি না।

সেক্রেটারী সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সেই কুঞ্চন আরো গাঢ় হল যখন দেখলেন, নলিনি

www.amarboi.com

বাবু পিকে ফোর–এর উত্তরে আর ফোর দিয়ে বসে আছেন।

কি করছেন আপনি? এঁর সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করছেন নাকি? এটা কি দিলেন?

সাহেবটিও ইংরেজীতে কি যেন বলল। বাবু নলিনি রঞ্জন ইংরেজীর শিক্ষক, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। সেক্রেটারী সাহেব মুখ কালো করে বললেন, প্রশিক্ষণহীন প্রতিভা দেখাতে নিয়ে এসে বড় বেইজ্জতীর মধ্যে পড়লাম দেখি।

খেলা হল তিনটি। একটি ড্র হল, দু'টিতে নলিনি বাবু জিতে গেলেন। সেক্রেটারী সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আপনি ঢাকায় খেলতে আসেন না কেন?

ট্যুইশনি আছে। তাছাড়া শরীরটা ভাল না। হাঁপানি।

আরে না না। আপনি আসবেন ভাই।

দরিদ্র মানুষ, টাকা–পয়সা নাই।

আরে আপনি আবার কিসের দরিদ্র?

সেক্রেটারী সাহেব জড়িয়ে ধরলেন নলিনি বাবুকে।

কাজেই শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে বাবু নলিনি রঞ্জনের বিদায় সংবর্ধনায় বারবার ঘুরে–ফিরে দাবার কথা এল। এবং সভার শেষে সভাপতি, স্কুল কমিটির সেক্রেটারী ও পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরুজ মিয়া অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন যে, নিয়ামতপুরের গৌরব দাবার অপরাজেয় নক্ষত্র বাবু নলিনি রঞ্জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি একটি ব্যবস্থা করেছেন। পনেরো হাজার টাকার একটি চেক দিচ্ছেন স্কুল ফান্ডকে। যদি কেউ নলিনি বাবুকে হারাতে পারে তাহলে তাকে এই টাকাটি দেয়া হবে। আর যদি কেউ হারাতে না পারে, তাহলে স্কুল ফাণ্ড নলিনি বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকাটা পাবে।

AMARBOI.COM

সভায় তুমুল করতালি হয়। হেড মাস্টার সাহেবকে পনেরো হাজার টাকার চেকটি উঁচু করে সবাইকে দেখাতে হল। সুরুজ মিয়া যে এমন একটি নাটকীয় ব্যাপার করতে পারেন তা কারোর কল্পনাতেও আসেনি।

আশ্বিন মাসের এক সন্ধ্যায় নলিনি বাবুর হাঁপানির টান খুব প্রবল হল। বাতাস তার কাছে ক্ষীণ মনে হল। ফুসফুস ভরাবার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর গলার কাছে একটি রগ বারবার ফুলে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ খেলাটি খেলতে বসলেন। এই খেলাটি তিনি খেলবেন হারবার জন্যে। তিনি আজ হারবেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু জালাল সাহেবের কাছে। জালাল সাহেব পনেরো হাজার টাকা জিতে নেবেন। সেই টাকায় নলিনি বাবুর চিকিৎসা হবে। শীতের জন্যে গরম কিছু কাপড় কিনবেন, শীতে বড় কষ্ট হয় তাঁর। বহু কষ্টে জালাল সাহেব নলিনি বাবুকে এই প্রস্তাবে রাজি করিয়েছেন। একটি পরাজয়ে কিছুই যায় আসে না।

খেলা হচ্ছে স্কুল ঘরে। জালাল সাহেব চ্যালেঞ্জের খেলা খেলছেন। অনেকেই এসেছে কৌতূহলী হয়ে। নলিনী বাবুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। একটা ভুল চালে তাঁর গজ খোয়া গেল। তার কিছুক্ষণ পর একটা নৌকা পিনড হয়ে গেল। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল চারদিকে। নলিনি বাবু দেখলেন জালাল সাহেবের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। পনেরো বছরের অপরাজেয়

দাবা চ্যাম্পিয়ন আজ পরাজিত হতে যাচ্ছেন। জালাল সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। চাল দেবার সময় তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, নলিনি বাবুর অবস্থা তো খুব খারাপ।

জালাল সাহেব ধরা গলায় বললেন, সব আমাদের নলিনির ভান। দেখবেন এখুনি সব ঠিক করে ফেলবে।

নলিনি বাবু ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি কাঁদছ নাকি জালাল?

না। চোখে কি যেন পড়ল।

জালাল সাহেব চোখের সেই অদৃশ্য জিনিসটি বের করবার জন্যে চোখ কচলাতে লাগলেন।

ক্ষীণ একটি হাসির রেখা কি দেখা গেল নলিনি বাবুর ঠোঁটে? তিনি ঘোড়ার একটি কিস্তি দিলেন। রাজা সরে এল এক ঘর। দ্বিতীয় কিস্তি দিলেন বড়ে দিয়ে। রাজা আরো এক ঘর সরল। নলিনি বাবু যেন অদৃশ্য কোন নগরী থেকে তাঁর কালো গজটি বের করে আনলেন। সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বলেন, কী সর্বনাশ। নলিনি বাবু গজটা বড়ের মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিস্তি।

জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা করেও তিনি হারতে পারলেন না। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় নিয়ামতপুরের গৌরবের মৃত্যু হল ১২ই নভেম্বর ১৯৭৫ সন। রোজ মঙ্গলবার। খায়রুন্নেছা গার্লস স্কুল সে উপলক্ষে দু'দিন ছুটি থাকল।

AMARBOI.COM

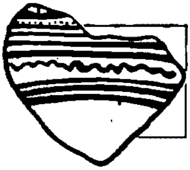

কল্যাণীয়াসু

ট্রেটিয়াকভ আর্ট গ্যালারীতে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। পুরানো দিনের মহান সব শিল্পীদের আঁকা ছবি। দেখতে দেখতে এগুচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। সঙ্গের রাশিয়ান গাইড বলল, কি হয়েছে?

আমি হাত উঁচিয়ে একটি পেইনটিং দেখালাম। প্রিন্সেস্ তারাকনোভার পেইনটিং। অপূর্ব ছবি!

জরী, ছবিটি দেখে তোমার কথা মনে পড়ল। গাইড বলল, সেন্ট পিটার্সবার্গ জেলে প্রিন্সেসের শেষ দিনগুলি কেটেছে। ঐ দেখ সেল-এর অন্ধকূপে কি করে বন্যার পানি ঢুকছে। দেখ, প্রিন্সেসের চোখে-মুখে কি গভীর বিষাদ। প্রগাঢ় বেদনা!

আমি কথা বললাম না। অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গাইড বলল, এসো পাশের কামরায় যাই।

আমি নড়লাম না। মৃদু গলায় বললাম, মিঃ যোশভ আজ আর কিছু দেখব না। চল, কোথায়ও বসে চা খাওয়া যাক।

দু'জনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ শীত বাইরে। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মোটা ওভারকোট ভেদ করে শরীরে বিঁধছে। আমার সঙ্গী হঠাৎ জানতে চাইল, তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

না।

আর্ট গ্যালারী কেমন দেখলে?

চমৎকার! অপূর্ব!

আমি চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বললাম, তোমাদের প্রিন্সেস তারাকনোভাকে দেখে আমার এক পরিচিতা মহিলার কথা খুব মনে পড়ছে।

গাইড কৌতূহলী হয়ে বলল, কে সে? নাম জানতে পারি?

জরী তার নাম।

যোখব বিস্মিত হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, "প্রিন্সেস জরী। প্রিন্সেস জরী।"

জরী, রাজকুমারীর ছবি দেখে আজ বড় অভিভূত হয়েছি। হঠাৎ করে তোমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা করছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে। ক্রমাগতই নস্টালজিক হয়ে পড়ছি। ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। ঘনঘন কফি খাই। চুরুটের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠে। শেষ রাতের দিকে ঘুমুতে গিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। পরশু রাতে কি স্বপ্ন দেখলাম জান? দেখলাম, আমাদের নীলগঞ্জে যেন খুব বড় একটা মেলা বসেছে। বাবার হাত ধরে মেলা দেখতে গিয়েছি (ইশ! কত দিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম)। বাবা বললেন, "খোকা নাগরদোলায় চড়বি?" আমি যতই না করি তিনি ততই জোর করেন। তারপর দেখলাম, ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপছি আর শাঁ-শাঁ শব্দে নাগরদোলা উড়ে চলছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ছাড়িয়ে দূরে দূরে আরো দূরে। ঘুম ভেঙে দেখি চোখের জলে বালিশ ভিজে গেছে। চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কি এমন করে কাঁদে?

আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি জরী। আজকাল খুব নীলগঞ্জে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আগের মত সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে বসে জোনাকি পোকার আলো জ্বালা দেখি।

মস্কোতে আজ আমার শেষ রাত। আগামীকাল ভোর চারটায় রওনা হব রুমানিয়ায়। খুব কষ্ট করে এক মাসের ভিসা জোগাড় করেছি। এই এক মাস খুব ঘুরে বেড়াব। তারপর ফিরে যাব মন্ট্রিলে নিজ আস্তানায়। বেশ একটা গতির জীবন বেছে নিয়েছি, তাই না? অথচ ছোটবেলায় এই আমিই হোস্টেলে যাবার সময় হলে কি মন খারাপ করতাম। হাসু চাচা আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে লাল গামছায় ঘনঘন চোখ মুছত। ধরা গলায় বলত, বড় মিয়া চিঠি দিয়েন গো।

আমার মনে হত — দূর ছাই, কি হবে পড়াশুনা করে। বাবা, হাসু চাচা এদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না।

প্রবল ঘরমুখো টান ছিল বলেই আজ হয়ত যাযাবর বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে। তাই হয়, তোমার জন্য প্রবল তৃষ্ণা পুষেছিলাম বলেই কি তোমাকে পাইনি? টেনটেলাসের গল্প জান তো? তার চারদিকে পানির থৈ-থৈ সমুদ্র অথচ তাকেই কিনা আজীবন তৃষ্ণার্ত থাকতে হল।

জরী, তোমার কি মনে আছে বিয়ের পরদিন তোমাকে নিয়ে যখন নীলগঞ্জে আসি তুমি ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে খুব কেঁদেছিলে। তখন কার্তিকের শুরু। ধানীরঙের রোদে ঝলমল করছে চারদিক। হালকা হিমেল বাতাস। মনে আছে সে সব কথা? আমি বলেছিলাম, মাথাটা ভেতরে টেনে নাও জরী। কয়লার গুড়ো এসে চোখে পড়বে। তুমি বললে, পড়ুক।

কামরায় আমরা দু'টি মাত্র প্রাণী। বরযাত্রীরা আমাদের একা থাকবার সুযোগ দিয়ে অন্য কামরায় উঠেছে। ট্রেন ছুটে চলেছে ঝিকঝিক করে। বাতাসে তোমার লালচে চুল উড়ছে।

কি-একটা সেন্ট মেখেছ। চারপাশে তার চাপা সৌরভ। আমি গাঢ় স্বরে বলেছিলাম, ছিঃ, জরী এত কাঁদছ কেন? কথা বল। আমার কথায় তুমি কি মনে করেছিলে কে জানে। অনেকক্ষণ আমার চোখে চোখে তাকিয়ে কি মনে করে যেন হেসে ফেললে। হেসে ফেলেই লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। সেইদিন কি গভীর আনন্দ আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছিল রহস্যমণ্ডিত এই রমণীটিকে পেয়েছি।

গৌরীপুরে গাড়ী অনেকক্ষণ হল্ট করল। একজন অন্ধ ভিখারী একতারা বাজিয়ে আমাদের কামরার সামনে খুব গান গাইতে লাগল, "ও মনা এই কথাটি না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।"

তুমি অবাক হয়ে বললে, কি সুন্দর গায়। তারপর দু'টি টাকা বের করে দিলে। ট্রেন ছাড়তেই জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করে বললে, দেখুন দেখুন, কতগুলি বক একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে।

বক নয়। শীতের শুরুতে ঝাঁক বেঁধে বালিহাঁস উড়ে আসছিল। আগে দেখনি কখনো, তাই খুব অবাক হয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, বক নয় জরী। ওগুলি বালিহাঁস। আর শোন, আপনি আপনি করছ কেন? আমাকে তুমি করে বলবে।

ঐ হাঁসগুলি কোথায় যাচ্ছে?

বিলের দিকে।

আপনাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

আবার আপনি?

তুমি হেসে বললে, নীলগঞ্জে বিল আছে?

আমি বললাম, বল, তোমাদের নীলগঞ্জে বিল আছে?

তুমি মুখ ফিরিয়ে হাসতে শুরু করলে। আমার মনে হল সুখ কোন অলীক বস্তু নয়। এর জন্যে জীবনব্যাপী কোন সাধনারও প্রয়োজন নেই। প্রভাতের সূর্যকিরণ বা রাতের জ্যোৎস্নার মতই এও আপনাতেই আসে।

কিন্তু প্রিন্সেস তারাকনোভার ছবি দেখতে গিয়ে উল্টো কথা মনে হল। মনে হল সুখটুখ বলে কিছু নেই। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নিয়ে আমাদের কারবার। চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম হতাশ রাজকুমারী পিটার্সবার্গের নির্জন সেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। হু-হু করে বন্যার জল ঢুকছে ঘরে। রাজকুমারীর ঠোঁটের কোণায় কান্নার মত অদ্ভুত এক হাসি ফুটে রয়েছে।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হল রাজকুমারীকে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। জরীর মুখের আদল আসছে নাকি? পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল। না জরীর সঙ্গে এ

AMARBOI.COM

মুখের কোন মিল নাই। জরীব মুখ গোলগাল। একটু আদুরে ভাব আছে। আর রাজকুমারীর মুখটি লম্বাটে ও বিষণ্ন। মনে আছে জরী, একবার তোমার একটি পোট্রেট করেছিলাম। কিছুতেই মন ভরে না। ব্রাশ ঘসি আবার চাকু দিয়ে চেঁছে রঙ তুলে ফেলি। দু'মাসের মত সময় লাগল ছবি শেষ হতে। পোট্রেট দেখে তুমি হতভম্ব। অবাক হয়ে বললে, ও আল্লা চোখে সবুজ রঙ দিয়েছ কেন? আমার চোখ বুঝি সবুজ? আমি বললাম, একটু দূর থেকে দেখ।

তুমি অনেকটা দূরে সরে গেলে এবং চেঁচিয়ে বললে, কি সুন্দর! কি সুন্দর!

ছবি আঁকিয়ে হিসেবে জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই মুগ্ধ কণ্ঠ এখনো কানে বাজে।

সেই পোট্রেটটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। তারপর বিক্রি করে দিলাম। ছবি দিয়ে কি হয় বল? তার উপর সেবার খুব টাকার প্রয়োজন হল। মিলানে গিয়েছি বন্ধুর নিমন্ত্রণে। গিয়ে দেখি বন্ধুর কোন হদিস নেই। ক'দিন আগেই নাকি বিছানাপত্র নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কি করি, কি করি! সঙ্গে সম্বলের মধ্যে আছে ত্রিশটি আমেরিকান ডলার আর মনট্রিলে ফিরে যাবার একটি টুরিস্ট টিকিট। এর মধ্যে আবার আমার পুরানো অসুখ বুকে ব্যথা শুরু হল। সস্তা দরের এক হোটেলে উঠলাম। তবুও দু'দিন যেতেই টাকা-পয়সা সব শেষ। ছবি বিক্রি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এক সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ছবি টাঙিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। কারোর যদি পছন্দ হয় কিনবে। ছবির মধ্যে আছে দু'টি ওয়াটার কালার আর তেল রঙে আঁকা তোমার পোট্রেট। ছবিগুলির মধ্যে "নীলগঞ্জের জ্যোৎস্না" নামের অপূর্ব একটি ওয়াটার কালার ছিল। আমাদের বাড়ীর পেছনে চার-পাঁচটা নারকেল গাছ। দেখনি তুমি? ঐ যে পুকুরপাড়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়েছিল। এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে পুকুরের কালো জলে তাদের ছায়া পড়েছিল — তারই ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন। অথচ বিক্রি হল শুধু তোমার পোট্রেটটি। এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কিনলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বললেন, কেন এই পোট্রেটটা কিনলাম জান?

না ম্যাডাম।

আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন এই ছবিটিতে যে মেয়েটিকে তুমি এঁকেছ তার মত সুন্দর ছিলাম, তাই কিনলাম।

আমি হেসে বললাম, আপনি এখনো সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, এসো না আমার ঘরে। কফি করে খাওয়াব। এমন কফি সারা মিলান শহরে খুঁজেও পাবে না।

ভদ্রমহিলা আশাতীত দাম দিলেন ছবির। শুধু কফি নয়, রাতের খাবার খাওয়ালেন। তাঁর অল্পবয়েসী নানান ছবি দেখালেন। সব শেষে পিয়ানো বাজিয়ে খুব করুণ একটি গান গাইলেন যার ভাব হচ্ছে — "হে প্রিয়তম, বসন্তের দিন শেষ হয়েছে। ভালবাসাবাসি দিয়ে সে দিনকে দূরে রাখা গেল না।"

নিজের হাতে তোমার ছবি টানালাম। কোথাকার ইটালীর মিলান শহরের এক বৃদ্ধা মহিলা, তার ঘরে তোমার হাসিমুখের ছবি ঝুলতে লাগল। কেমন অবাক লাগে ভাবতে।

AMARBOI.COM

একশ' বছর পর এই ছবিটি হয়ত অবিকৃতই থাকবে। বৃদ্ধার নাতি–নাতনীরা ভাববে, এইটি কার পোর্ট্রেট? এখানে কিভাবে এসেছে?

ফেরার পথে বৃদ্ধার হাতে চুমু খেলাম। মনে মনে বললাম, আমার জরী যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

আমরা সব সময় সুখে থাকার কথা বলি। যতবার নীলগঞ্জ থেকে ঢাকার হোস্টেলে যেতাম — বাবা বলতেন, 'সুখে থাক'। তুমি যখন লাল বেনারসীতে মুখ ঢেকে ট্রেনে উঠলে তোমার মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সুখে থাক।

জরী, আমরা কাছে তুমি সুখে ছিলে না? কিসে একটি মানুষ সুখী হয়? নীলগঞ্জে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখে তোমার কি মন ভরে উঠেনি? তুমি কি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠনি, ওমা এ যে রাজপ্রাসাদ! জ্যোৎস্না রাত্রিতে হাত ধরাধরি করে যখন আমরা পুকুরপাড়ে বেড়াতে যেতাম তখন কি গভীর আবেগ তোমাকে এতটুকু আচ্ছন্ন করেনি? তোমাকে আমি কি দেইনি জরী? নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসার দেয়ালে তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম। রাখিনি?

তবু এক রাত্রিতে তুমি বিছানা ছেড়ে চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলে। আমি দেখলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মত কার্নিস ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছ। বুকে ধ্বক করে একটা ধাক্কা লাগল। বিস্মিত হয়ে বললাম, কি হয়েছে জরী?

তুমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললে, কই কিছু হয়নি তো। তারপর নিঃশব্দে নীচে নেমে এলে।

তোমার মধ্যে গভীর একটি শূন্যতা ছিল। আমি তা ধরতে পারিনি। শুধু বুঝতে পারছিলাম তোমার কোন কিছুতেই মন লাগছে না। সে সময় "এসো নীপবনে" নাম দিয়ে আমি চমৎকার একটি পেইনটিং করছিলাম। আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। একটি ভাঙা বাড়ীর পাশে একটি প্রকাণ্ড ছায়াময় কদম গাছ। এই নিয়ে আঁকা। আমার শিল্পী জীবনের ভাল ক'টি ছবির একটি। ভেবেছিলাম বিয়ের বছরটি ঘুরে এলে তোমাকে এই ছবি দিয়ে মুগ্ধ করব। কিন্তু ছবি তোমাকে এতটুকুও মুগ্ধ করল না। তুমি ক্লান্ত গলায় বললে, এক বছর হয়ে গেছে বিয়ের? ইশ কত তাড়াতাড়ি সময় যায়।

তোমার কণ্ঠে কি সেদিন একটি চাপা বিষাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল? ক্রমে ক্রমে তুমি বিষণ্ন হয়ে উঠতে লাগলে। প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম তুমি জেগে বসে আছ। অবাক হয়ে বলেছি, কি হয়েছে জরী?

কই? কিছু হয়নি তো।

ঘুম আসছে না?

আসছে।

বলেই তুমি আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লে। কিন্তু তুমি জেগে রইলে। অথচ ভান করতে লাগলে যেন ঘুমিয়ে আছ। আমি বললাম, জরী সত্যি করে বল তো তোমার কি হয়েছে?

কিছু হয়নি।

কোথাও বেড়াতে যাবে?

কোথায়?

AMARBOI.COM

কক্সবাজার যাবে? হোটেল ভাড়া করে থাকব।

উহুঁ, ভাল্লাগে না।

তারও অনেকদিন পর এক সন্ধ্যায় ঘন ঘোর হয়ে মেঘ করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ঝড়। দরাম শব্দে একেকবার আছড়ে পড়ছে জানালার পাট। বাজ পড়ছে ঘনঘন। ঘরের লাগোয়া জাম গাছে শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে। দু'জনে বসে আছি চুপচাপ। তুমি হঠাৎ এক সময় বললে, তোমাকে একটা কথা বলি, রাখবে?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কি কথা?

আগে বল রাখবে?

নিশ্চয়ই রাখব।

তুমি তখন আমাকে তোমার আনিস স্যারের গল্প বললে। যিনি কলেজে তোমাদের অংকের প্রফেসর ছিলেন। খামখেয়ালীর জন্যে যাঁর কলেজের চাকরিটি গেছে। এখন খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। কোন রকমে দিন চলে। তুমি আমাকে অনুরোধ করলে নীলগঞ্জে নতুন যে কলেজ হচ্ছে সেখানে তাঁকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে।

তুমি উজ্জ্বল চোখে বললে, আনিস স্যার মানুষ নন। সত্যি বলছি ফেরেশতা। তুমি আলাপ করলেই বুঝবে।

আমি বললাম, নীলগঞ্জের কলেজের এখনো তো অনেক দেরী। মাত্র জমি নেয়া হয়েছে।

হোক দেরী। আনিস স্যার ততদিন থাকবে আমাদের এখানে। নীচের ঘর তো খালিই থাকে। একা মানুষ কোন অসুবিধা হবে না।

একা মানুষ?

হুঁ। মেয়ে আর বউ দু'জনের কেউই বেঁচে নেই। একদিনে দু'জন মারা গেছে কলেরায়। আর মজা কি জান? তার পরদিনই আনিস স্যার এসেছেন ক্লাস নিতে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার বললেন, আজ বাড়ী যান। ক্লাস নিতে হবে না। আনিস স্যার বললেন, বাড়িতে গিয়ে করবটা কি? কে আছে বাড়ীতে?

আমি বললাম, চিঠি লিখলেই কি তোমাদের স্যার আসবেন এখানে?

হ্যাঁ, আসবেন। আমি লিখলেই আসবেন। লিখব স্যারকে?

বেশ, লেখ।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখতে উঠে গেলে। সে চিঠি শেষ হতে অনেক সময় লাগল। বসে বসে দেখলাম অনেক কাটাকুটি করলে। অনেক কাগজ ছিঁড়ে ফেললে। এবং এক সময় চিঠি শেষ করে হাসিমুখে উঠে এলে। তোমাকে সে রাতে ভীষণ উৎফুল্ল লাগছিল।

আহ্, লিখতে লিখতে কেমন যেন লাগছে। এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু ইচ্ছে হচ্ছে রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াই। নিশি রাতে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার বেশ লাগল। তুমি কি দস্তয়োভস্কির "রূপালী রাত্রি" পড়েছ? রূপালী রাত্রিতে আমার মত একজন নিশি-পাওয়া লোকের গল্প আছে।

জরী, তোমাদের স্যার কবে যেন উঠলেন আমাদের বাড়ীতে? দিন-তারিখ এখন আর মনে পড়ছে না। শুধু মনে পড়ছে মাঝবয়েসী একজন ছোটখাট মানুষ ভোরবেলা এসে খুব হৈ চৈ শুরু করেছিলেন। চেঁচিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ডাকছিলেন, সুলতানা, সুলতানা। তুমি ধড়মড়

করে জেগে উঠলে। "ও আল্লা, কি কাণ্ড, স্যার এসে পড়েছেন" — এই বলে খালি পায়েই ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে গেলে। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম তুমি পা ছুঁয়ে সালাম করছ, আর তোমাদের স্যার বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন। খানিক পরে দেখলাম তিনি খুব হাসছেন। সেই সঙ্গে লাজুক ভঙ্গিতে তুমিও হাসছ।

তুমি খুশী হয়েছিলে তো? নিশ্চয়ই হয়েছিলে। আমি স্টুডিওতে বসে তোমার গভীর আনন্দ অনুভব করতে পারছিলাম। একটি তীব্র ব্যথা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেদিন আমার আত্মহত্যার কথা মনে হয়েছিল।

অথচ তোমার স্যার ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। এমন সহজ, এমন নির্লোভ লোক আমি খুব কমই দেখেছি। কোন কিছুর জন্যেই কোন মোহ নেই। এমন নির্লিপ্ততা কল্পনাও করা যায় না। জরী, তুমি ঠিক লোকের প্রেমেই পড়েছিলে। এমন মানুষকে ভালবেসে দুঃখ পাওয়াতেও আনন্দ। তোমার স্যার ফেরেশতা ছিলেন কিন্তু জরী আমি তো ফেরেশতা নই। আমার হৃদয়ে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি ও ঘৃণা আছে। আমি সত্যি একজন সাধারণ মানুষ।

সময় কাটতে লাগল। আমি শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। অনেকগুলি ছবি আঁকলাম সে সময়। তোমার পোট্রেটটিও সে সময়ই করা। পোট্রেটে সিটিং দেবার জন্যে ঘন্টাখানিক বসতে হত তোমাকে। তুমি হাসিমুখে এসে বসতে কিন্তু অল্পক্ষণ পরই ছটফট করে উঠতে, "এই রে, স্যারকে চা দেয়া হয়নি। একটু দেখে আসি। এক মিনিট, প্লীজ।" আমি তুলি হাতে তোমার ফেরার প্রতীক্ষা করতাম। এক কাপ চা তৈরী করতে প্রচুর সময় লাগত তোমার।

মাঝে মাঝে আসতেন তোমার স্যার। অর্ধ সমাপ্ত ছবিগুলি দেখতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং বলতেন, ছবি আমি ভাল বুঝি না। কিন্তু আপনি যে সত্যিই ভাল আঁকেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাঁর প্রশংসা আমার সহ্য হত না।

আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম। তিনি বলতেন, আপনি আঁকুন। আমি দেখি কি করে ছবি আঁকা হয়।

আমি কারো সামনে ছবি আঁকতে পারি না।

তবু তোমার স্যার বসে থাকতেন। তীব্র ঘৃণায় আমি কতবার তাঁকে বলেছি, এখানে বসে আছেন কেন? বাইরে যান।

কোথায় যাব?

নদীর ধারে যান। জরীকে সঙ্গে নিয়ে যান। কাজের সময় বিরক্ত করছেন কেন আপনি?

অপমানে তোমার মুখ কালো হয়ে উঠত। থমথমে স্বরে বলতে, চলুন স্যার আমরা যাই।

ক্রমে ক্রমেই তুমি সরে পড়তে শুরু করলে। পরিবর্তনটা খুব ধীরে হচ্ছিল। সে জন্যেই ঠিক বলতে পারব না কখন থেকে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলে। ব্যক্তিগত হতাশা ও বঞ্চনা — এই দুই মিলিয়ে মানসিক দিক দিয়ে অনেক আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অসুখ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। একনাগাড়ে জ্বর চলল দীর্ঘদিন। ঘুম হয় না, বুকের মধ্যে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করি। তীব্র যন্ত্রণা।

অসুখ-বিসুখে মানুষ খুব অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় একটি সুখকর স্পর্শের জন্যে মন

AMARBOI.COM

কাঁদে। কিন্তু তুমি আগের মতই দূরে দূরে রইলে। যেন ভয়ানক একটি ছোঁয়াচে রোগে আমি শয্যাশায়ী। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে না চললে সমূহ বিপদ

তোমার স্যার আসতেন প্রায়ই। আমি তাঁর চোখে গভীর মমতা টের পেতাম। তিনি আমার কপালে হাত রেখে নরম গলায় বলতেন, একটি গল্প পড়ে শুনাই আপনাকে? আপনার ভাল লাগবে।

আমি রেগে গিয়ে বলতাম, একা থাকতেই আমার ভাল লাগবে। আপনি নীচে যান। কেন বিরক্ত করছেন?

এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আমি একটু বসি এখানে। কথা বলি আপনার সঙ্গে?

না, না অসহ্য। আপনি জরীর সঙ্গে কথা বলুন।

আমার অসুখ সারে না কিছুতেই। বাবার বন্ধু শশধর ডাক্তার রোজ দু'বেলা আসেন আর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, হাঁপানির টান উঠে না-কি বাবা? হাঁপানি তোমাদের বংশের অসুখ। তোমার দাদার ছিল, তোমার বাবারও ছিল। শ্বাস নিতে কোন কষ্ট টের পাও?

একটু যেন পাই।

ডাক্তার চাচা একটি মালিশের শিশি দিলেন। "শ্বাসের কষ্ট হলে অল্প অল্প মালিশ করবে। সাবধান, মুখে যেন না যায়। তীব্র বিষ।" ছোট্ট একটি শিশিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ তরল বিষ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাক্তার চাচা চলে যেতেই তোমাকে ডেকে বললাম, জরী এই শিশিটিতে কি আছে জান?

জানি না কি আছে?

তীব্র বিষ! সাবধানে তুলে রাখ।

তোমাকে কেন বললাম এ কথা কে জানে। কিন্তু বলবার পর দারুন আত্মপ্রসাদ হল। দেখলাম তুমি সরু চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। কি ভাবছিলে?

অসুখ সারল না। ক্রমেই বাড়তে থাকল। চোখের নীচে গাঢ় হয়ে কালি পড়ল। জণ্ডিসের রুগীর মত গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে গেল। দিনরাত শুয়ে শুয়ে থাকি। কত কি মনে হয়। কত সুখ-স্মৃতি, কত দুঃখ-জাগানিয়া ব্যথা। শ্লথ সময় কাটে। এক এক রাতে ঘন ঘোর হয়ে বৃষ্টি নামে। ঝমঝম শব্দে গাছের পাতায় অপূর্ব সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। শুয়ে শুয়ে শুনি তুমি নীচের ঘরে বৃষ্টির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করছো। আহ্, কিসব দিন কেটেছে!

একটি প্রশস্ত ঘর। তার এক প্রান্তে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড একটি পালঙ্ক। সেখানে শয্যা পেতে রাতদিন খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকা। কি বিশ্রী জীবন। ডাক্তার চাচা কতবার আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছেন, কেন তোমার অসুখ সারে না? বল, কেন?

আমি কি করে বলব?

যাও হাওয়া বদল করে আস। বৌমাকে নিয়ে ঘুরে আস কক্সবাজার থেকে।

আচ্ছা যাব।

আচ্ছা নয়, কালই যাও। সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসে।

এত তাড়া কিসের?

AMARBOI.COM

তাড়া আছে। আমি বলছি বৌমাকে সব ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার চাচা সেদিন অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ও বৌমা, বৌমা।

তুমি তো প্রায় সময়ই থাকতে না, সেদিনও ছিলে না।

ডাক্তার চাচা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সেদিন।

শুধু কি তিনি? এ বাড়ীর সব ক'টি লোক কৌতূহলী হয়ে দেখত আমাকে। আবুর মা গরম পানির বোতল আমার বিছানায় রাখতে রাখতে নেহায়েত যেন কথার কথা এমন ভঙ্গিতে বলত, বিবি সাহেব নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেছেন।

আমি বলতাম না কিছুই। অসহ্য বোধ হলে বিষের শিশিটির দিকে তাকাতাম। যেন সেখানে প্রচুর সান্ত্বনা আছে।

জরী, আমাদের এ বংশে অনেক অভিশাপ আছে। আমার দাদা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের হাতে খুন হয়েছিলেন। আমার মা'র মৃত্যুও রহস্যময়। লোকে বলে তাঁকে নাকি বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। আমার সারাক্ষণ মনে হত পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে।

জরী, আমার জরী, আহ! কতদিন তোমাকে দেখি না। তোমার গোলগাল আদুরে মুখ কি এখনো আগের মত আছে? না, তা কি আর থাকে? জীবন তো বহতা নদী। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে খুব কষ্ট হয়। ইচ্ছে হয় আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে। ট্রেনে করে তুমি প্রথমবারের মত নীলগঞ্জে আসছ সেখান থেকে। ঐ যে গৌরীপুরে ট্রেন থেমে থাকল অনেকক্ষণ। একজন অন্ধ ভিখিরি একতারা বাজিয়ে করুণ সুরে গাইল,

ও মনা
এই কথাটি না জানবে
প্রাণে বাঁচতাম না,
ও মনা। ও মনা।

তুমি ভিখিরিকে দু'টি টাকা দিলে।

তোমার কথা মনে হলেই কষ্ট হয়। ভালবাসার কষ্ট, আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বল? তোমার ব্যথা আমি সত্যি সত্যি অনুভব করেছিলাম।

তোমার স্যার যেদিন নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, "সুলতানা, আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাও। আমি ভোরে যাচ্ছি।" তখন তোমার চোখে জল টলমল করে উঠল। তোমার স্যার সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসলেন আমার বিছানার পাশে। গাঢ়স্বরে বললেন, আপনি জরীকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে কিছুদিন থাকুন। ভাল হয়ে যাবেন।

আমি বললাম, না — না আমি যাব না। সমুদ্র আমার ভালো লাগে না। আপনারা দু'জনে যান। সমুদ্রতীরে সব সময় দু'জন করে যেতে হয়। এর বেশীও নয়, এর কমও নয়।

তোমার স্যার তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন। তুমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলে। একটি কথাও বললে না। আমি দেখলাম, খুব শান্ত ভঙ্গিতে তুমি তোমার স্যারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে। রাস্তায় ক্ষিদে পেলে খাবার জন্যে একগাদা কি-সব তৈরী করে দিলে। তিনি বিদায়

AMARBOI.COM

নিলেন খুব সহজভাবেই। ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না। তুমি মূর্তির মত গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে।

জরী, তুমি ভুল লোকটিকে বেছে নিয়েছিলে। এইসব লোকের কোন পিছুটান থাকে না। নিজ স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পরদিন যে ক্লাস নিতে আসে তাকে কি আর ভালবাসার শিকলে বাঁধা যায়?

তোমার স্যার চলে যাবার দিন আমি তোমাকে তীব্র অপমান করলাম। বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে করিনি। তোমার স্যার যখন বললেন, আপনার কাছে আমার একটি জিনিস চাইবার আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কি জিনিস?

আপনার আঁকা একটি ছবি আমি নিতে চাই। হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি।

নিশ্চয়ই। আপনার পছন্দমত ছবি আপনি উঠিয়ে নিন। যে কোন ছবি। যেটা আপনার ভাল লাগে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে আমার স্টুডিওর দিকে চলে গেলেন। আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বললাম, স্যার কোন ছবিটি নেবেন জান তুমি?

না।

স্যার নেবেন তোমার পোর্ট্রেট।

তিনি কিন্তু নিলেন অন্য ছবি। জলরঙে আঁকা 'এসো নীপবনে'। তাকিয়ে দেখি অপমানে তোমার মুখ নীল হয়ে গেছে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকালে।

সেই সব পুরানো কথা তোমার কি মনে পড়ে? বয়স হলে সবাই তো নস্টালজিক হয়, তুমি হওনি? কুটিল সাপের মত যে ঘৃণা তোমার বুকে কিলবিল করে উঠেছিল তার জন্যে তোমার কি কখনো কাঁদতে ইচ্ছা হয় না? তুমি কাঁদছ এই ছবিটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার স্যার চলে যাবার পর তুমি কি করবে তা কিন্তু আমি জানতাম জরী। তোমার তো এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। মিছিমিছি তুমি সারা জীবন লজ্জিত হয়ে রইলে।

আমি তোমাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। তুমি বলেছ, "না"। তোমাকে কিছুদিন তোমার বাবা-মা'র কাছে রেখে আসতে চেয়েছি। তুমি কঠিন স্বরে বলেছ, "না।" কতবার বলেছি, বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার মন ভালো থাকবে। তুমি শান্ত স্বরে বলেছ, আমার মন ভালই আছে।

আমি জানতাম ঘৃণার দেয়ালে বন্দী হয়ে একজন মানুষ বেশীদিন থাকতে পারে না। তোমার সামনে দু'টি মাত্র পথ। এক — মরে যাওয়া, আর দুই . . . । কিন্তু মরে যাওয়ার মত সাহস তোমার ছিল না। কাজেই দ্বিতীয় পথ যা তুমি বেছে নেবে তার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। এও এক ধরনের খেলা। আমি জানতাম তুমি এবারও পরাজিত হবে। পরাজয়ের মধ্যেই আসবে জয়ের মালা। উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল। কখন আসবে সেই মুহূর্তটি? সেই সময় আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারব তো?

সেই মুহূর্তটির কথা তোমার কি মনে পড়ে কখনো? ঘন হয়ে শীত পড়ছে। শরীর খানিক সুস্থ বোধ হওয়ায় আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি।

www.amarboi.com

সন্ধ্যা মিলাতেই ঘরে আলো দিয়ে গেল। তারও কিছু পর তুমি এলে চা নিয়ে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে গিয়ে চা ছলকে পড়ল মেঝেতে। বিড়বিড় করে তুমি কি যেন বললে। আমি তাকালাম টেবিলের দিকে। বিষের সেই শিশিটি নেই। তুমি অপলকে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলাম চায়ের পেয়ালার জন্যে। তুমি জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়লে মেঝেতে। হেরে গেলে জরী।

তোমাকে এরপর খুব সহজেই জয় করা যেত। কিন্তু আমি তা চাইনি, সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এলাম। অল্প ক'দিন আমরা বাচি। তবু এই সময়ে কত সুখ-দুঃখ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কত গ্লানি, কত আনন্দ আমাদের চারপাশে নেচে বেড়ায়। কত শূন্যতা বুকের ভেতরে হা হা করে।

জরী, এখন গভীর রাত্রি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পোর্টার এসে দরজায় নক করবে। বিমান কোম্পানীর মিনিবাস এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। আবার যাত্রা শুরু।

আমার হয়তো কোন এক পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কথা মনে পড়বে। আবার এরকম লম্বা চিঠি লিখবো। কিন্তু সেসব চিঠি কখনো পাঠাবো না তোমাকে। যৌবনে হৃদয়ের যে উত্তাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আজ কি আর তা পারবে? কেন আর মিছে চেষ্টা।

নিমধ্যমা

AMARBOI.COM

মতিনউদ্দিন সাহেবকে কেন জানি কেউ পছন্দ করে না। অফিসের লোকজন করে না, বাড়ির লোকজনও না। এর যে কি কারণ মতিন সাহেব জানেন না। প্রায়ই তাঁর ইচ্ছা করে পরিচিত কাউকে জিজ্ঞেস করেন — 'আচ্ছা আপনি আমাকে পছন্দ করেন না কেন?' জিজ্ঞেস করা হয় না। তাঁর লজ্জা লাগে। মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন — থাক, কি হবে জিজ্ঞেস করে?

তাঁর স্ত্রীকে অবশ্যি একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। নাশতা খেতে খেতে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা, তুমি আমাকে পছন্দ কর না কেন?

মতিন সাহেবের স্ত্রী রাহেলা বেগম তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তুমি কি বললে?

'না — কিছু বলিনি।'

'পছন্দের কথা কি যেন বললে?'

'মানে জানতে চাচ্ছিলাম — তুমি আমাকে পছন্দ কর কি-না।'

'তোমার কি ভীমরতি হয়ে গেল না-কি, আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছ।'

'আর করব না।'

তাঁর স্ত্রী যে তাঁকে দু'চোখে দেখতে পারেন না তা মতিন সাহেব জানেন। তিনি থাকেন একা একটা ঘরে। সেই ঘরটাও বাড়ির সবচে' খারাপ ঘর। আলো-বাতাস ঢুকে না বললেই হয়। দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে কোন মেহমান চলে এলে এই ঘরও তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তখন কোথায় শোবেন তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বড় ছেলের ঘরটা সুন্দর। খাটটাও বড়। অনায়াসে দু'জন শোয়া যায়। কিন্তু শোয়া সম্ভব না — বড় ছেলে বিরক্ত হয়। ছোট দুই মেয়ে এক ঘরে শোয়, সেখানে জায়গা নেই। তিনি খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত বসার ঘরের সোফায় ঘুমুতে যান। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

গত পূজার ছুটিতে বাসার সবাই ঠিক করল দল বেঁধে কক্সবাজার যাবে। তাঁকে অবশ্যি কেউ বলল না। তিনি খাবার টেবিলে আলোচনা শুনলেন। সব খরচ দিচ্ছে তাঁর বড় ছেলে। ব্যবসায় তার ভাল লাভ হয়েছে। কিছু টাকা খরচ করতে চায়। সে হাসি মুখে বলল, "এখান থেকে একটা মাইক্রবাস ভাড়া করে, মাইক্রবাসে যাব। নিজেদের কনট্রোলে একটা গাড়ি থাকার খুব সুবিধা। ধর, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যেতে ইচ্ছা করল, হুট করে চলে গেলাম।"

মেজো মেয়ে নীতু বলল, কিন্তু ভাইয়া ট্রেন জার্নির আলাদা মজা। একটা পুরো কামরা রিজার্ভ করে যদি যাই . . . গাড়ি তুমি কক্সবাজারে ভাড়া কর। ওখানে ভাড়া পাওয়া যায় না?

ছোট মেয়ে বলল, আমার প্লেনে যেতে ইচ্ছা করছে ভাইয়া। ঢাকা থেকে চিটাগাং পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকে প্লেনে কক্সবাজার।

এই সব আলোচনা শুনতে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছিল। অবশ্যি তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন না। কারণ তিনি জানেন কিছু বলতে গেলেই রাহেলা বলবেন, চুপ কর তো, তুমি জান কি?

মতিন সাহেব কিছু বললেন না ঠিকই কিন্তু জোগাড়-যন্ত্র করে রাখলেন। কাপড়-চোপড় ধুয়ে ইস্ত্রী করিয়ে রাখলেন। অফিসে বড় সাহেবকে বললেন, আমার কয়েকদিন ছুটি লাগবে স্যার। পরিবারের সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি।

বড় সাহেব বললেন, হঠাৎ কক্সবাজার। ব্যাপার কি?

'বাচ্চারা ধরল — বেড়াতে যাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে চল। ওদের আনন্দের জন্য যাওয়া। অবশ্যি আমি নিজেও কোনদিন সমুদ্র দেখিনি। ভাবলাম দেখেই আসি . . . '

বলতে বলতে আনন্দে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। বড় সাহেব সাতদিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

কক্সবাজার রওনা হবার আগের দিন রাহেলা এসে বললেন, আমরা সবাই কক্সবাজার যাচ্ছি জান তো? তোমার তো আবার কোন হুঁশ থাকে না। ঘরে কি আলোচনা হয় তাও জান না। কাল রওনা হচ্ছি। মাইক্রবাসে যাচ্ছি। বাস চলে আসবে ভোর ছ'টায়।

মতিন সাহেব হাসি মুখে বললেন, জানি। আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। অফিস থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়েছি। আর্নড লিভ।

AMARBOI.COM

রাহেলা অবাক হয়ে বললেন, তোমাকে ছুটি নিতে কে বলল? আগ বাড়িয়ে যে এক একটা কাজ কর রাগে গা জ্বলে যায়। আমি কি বাসা খালি রেখে যাব না-কি? রোজ চুরি হচ্ছে। তুমি থাকবে এখানে।

'আচ্ছা।'

'ফ্রীজে এক সপ্তাহের মত গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। চারটা চাল ফুটিয়ে খেয়ে নেবে। পারবে না?'

'পারব।'

'শোবার আগে সব ঘর বন্ধ হয়েছে কি-না ভাল করে দেখবে। তোমার উপর কোন দায়িত্ব দিয়েও তো নিশ্চিন্ত হতে পারি না।'

এ জাতীয় ব্যাপার যে শুধু বাড়িতে ঘটে তাই না। অফিসেও নিয়মিত ঘটে। তাঁদের অফিসের এক সহকর্মী কোন-এক সিনেমায় ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। নায়িকার খুব জ্বর। ডাক্তার জ্বর দেখে বললেন — "হুঁ, জ্বর একশ তিন। পেশেন্টকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে।" নায়িকা তখন কাতর গলায় বলে, আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তার। মৃত্যুই আমার জন্যে ভাল। পৃথিবীর এ আলো হাওয়া, এ আনন্দ আমি সহ্য করতে পারছি না। ডাক্তার তখন বলেন, ছিঃ এমন কথা বলবেন না।

এইটুকুই পার্ট। তবু তো সিনেমার পার্ট। পরিচিত একজন সিনেমায় পার্ট করছে এটা দেখায়ও আনন্দ। যে পার্ট করছে সে বলল, বৃহস্পতিবার সে সবার জন্য পাস নিয়ে আসবে। অফিসের শেষে সবাই তার বাসায় চা-টা খেয়ে সন্ধ্যাবেলা এক সঙ্গে ছবি দেখতে যাবে।

মতিন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতিবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছবিঘরে অনেকদিন ছবি দেখা হয় না। ছবি দেখা হবে, তাছাড়া দলবল নিয়ে ছবি দেখার আনন্দও আছে। উত্তেজনায় বৃহস্পতিবারে তিনি অফিসের কাজও ঠিকমত করতে পারলেন না। ছুটির পর সবাই এক সঙ্গে বেরুচ্ছেন, সিনেমার ডাক্তার অভিনেতা মতিন সাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। তেরটা পাস এনেছি, এখন দেখি মানুষ চৌদ্দজন। কি করা যায় বলুন তো!

মতিন সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর খুব যেতে ইচ্ছা করছে। নিজ থেকে বলতে ইচ্ছা করছে না, 'আপনারা যান। আমি থাকি।'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনি বরং থাকুন। আপনাকে পরে পাস এনে দেব। আর ছবিও খুব আজেবাজে। পুরা ছবি দেখলে হলের মধ্যে বমি করে দেবেন। না দেখাই ভাল।'

মতিন সাহেব বললেন, আচ্ছা।

'মনে কিছু করলেন না তো আবার?'

'জ্বি – না।'

'বাসা পর্যন্ত চলুন। এক সঙ্গে চা খাই। অসুবিধা নেই তো?'

'জ্বি-না।'

শেষ পর্যন্ত বাসায় যাওয়া হল না। একটা জীপ জোগাড় হয়েছিল, সেই জীপে সবার জায়গা হল মতিন সাহেবের হল না।

AMARBOI.COM

'মতিন সাহেব, আপনি বরং একটা রিকশা নিয়ে চলে আসুন। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া। অসুবিধা হবে না তো?'

'জ্বি –না।'

ঠিকানা নিয়ে তিনি রিকশা করে মালিবাগে নামলেন। বাসা খুঁজে পেলেন না কারণ ঠিকানায় সবই দেয়া আছে বাসার নম্বর দেয়া নেই। মতিন সাহেবের একবার ক্ষীণ সন্দেহ হল — ইচ্ছা করেই বাসার নাম্বার দেয়নি। পরমুহূর্তেই সেই সন্দেহ তিনি ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তা কি করে হয়। সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বাড়ি খুঁজে বের করবার। পারলেন না।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর চাকরির পর তিনি রিটায়ার করলেন। জুনিয়র অফিসার হিসেবে ঢুকেছিলেন, রিটায়ার করলেন সিনিয়র অফিসার হিসেবে। ত্রিশ বছরে একটিমাত্র প্রমোশন। বর্তমান অফিসের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর সঙ্গেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন তাঁকে স্যার ডাকতে হয়। মতিন সাহেবের লজ্জা লজ্জা করে। উপায় কি?

রিটায়ার করা উপলক্ষে অফিসে বিদায় সভার আয়োজন করা হয়েছে। অফিস শেষে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সভা হবে। মতিন সাহেব কি বলবেন সব ভেবে রেখেছেন। ভেবে রাখা কথা সব বলতে পারবেন কি–না তা জানেন না। হয়ত চোখে পানি এসে যাবে, গলা ধরে যাবে। বিকাল পাঁচটা বাজতেই তিনি হল্‌-ঘরে বসে রইলেন। আশ্চর্য তিনি একা — একটি লোকও নেই। ছ'টা পর্যন্ত তিনি একা একাই বসে রইলেন। লক্ষ্য করলেন অফিসের লোকজন একে একে চলে যাচ্ছে। এদিকে কেউ উঁকিও দিচ্ছে না।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় জি.এম. অফিস থেকে বেরুবার সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে মতিন সাহেব আপনি? বসে আছেন কেন?

মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, বিদায় সভা হবে এই জন্যে . . .'

'আজ তো হবে না। আজ আমি ব্যস্ত, এই জন্যে ক্যানসেল করে দিয়েছি। আপনি নোটিস পাননি?'

'জ্বি–না।'

'আরে বলেন কি? আচ্ছা বাড়ি চলে যান। পরে এক সময় ফেয়ার ওয়েল হবে। আপনাকে খবর দেয়া হবে।'

'জ্বি– আচ্ছা স্যার।'

চাকরি জীবন শেষ হয়ে অবসর জীবন শুরু এই ভেবে মতিন সাহেব এক কেজি সন্দেশ কিনে ফেললেন। হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। বাড়ি ফিরে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বাড়ি খালি। জনপ্রাণী নেই — আসবাবপত্র নেই। সব ধুধু করছে। রোগা একটা ছেলে বালতি ভর্তি পানি দিয়ে মেঝে ধুচ্ছে। মতিন সাহেব বললেন, ওরা কোথায়?

ছেলেটি বলল, কারা?

'এই বাড়িতে যারা থাকত?'

'বাড়ি ছাইড়া নতুন বাড়িতে গেছে।'

AMARBOI.COM

'কোথায় গেছে?'

'আমি ক্যামনে কই?'

বাড়িওয়ালার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলেন — তার পল্লবীতে বাড়ি নিয়েছে। বড় বাড়ি। সে বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন না।

অনেক যন্ত্রণা করে রাত দশটায় পল্লবীর বাড়িতে তিনি উপস্থিত। রাহেলা খড়খড়ে গলায় বললেন, এতক্ষণে তোমার সময় হল? আজ বাড়ি বদল হচ্ছে, কোথায় সকাল সকাল ফিরবে। সাহায্য করবে। আর তুমি কি-না উদয় হয়েছ মাঝরাতে।

'বাড়ি বদল করছ জানতাম না। তুমি আমাকে কিছু বলনি।'

'সব কিছু তোমাকে জানিয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে করতে হবে?'

'না — তা না। মানে আমি জানতাম না যে বাড়ি বদল করছ।'

'রোজ এই নিয়ে কথা হচ্ছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হচ্ছে — আর তুমি বলছ তুমি জানতে না।'

'কিছু তো বলনি . . . '

'আর কিভাবে বলব? মাইক ভাড়া করে বলতে হবে?'

'নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানতাম না — খুব যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করেছি।'

'যন্ত্রণা করে ঠিকানা বের করতে হয়েছে? কি এমন যন্ত্রণা করেছ শুনি। হাতে ওটা কি?'

'সন্দেশ।'

'সন্দেশ কিনলে কেন?'

'এম্নি কিনলাম।'

'জান এই বাড়িতে মিষ্টি কেউ খায় না — তারপরেও সন্দেশ কিনে আনলে কি মনে করে?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

নতুন বাসায় মতিন সাহেবের ঘর হল ছাদের চিলেকোঠায়। এই ঘরটা আগের চেয়েও ছোট তবে প্রচুর আলো-বাতাস। সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে যে কোন সময় ছাদে আসা যায়। রাতে কোন কারণে তাঁর ঘুম ভাঙলেই তিনি ছাদে এসে বসে থাকেন। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, কেন সবাই তাঁকে এত অপছন্দ করে? তিনি কি মানুষটা খারাপ?

তা তো না। কখনো কোন অন্যায় করেছেন বলে তো মনে পড়ে না। সৎ ভাবে থেকেছেন। সৎ জীবন যাপন করেছেন।

তাহলে কি তাঁর চেহারা খারাপ? কিংবা চেহাবাটা এমন যে দেখলেই সবার রাগ লাগে?

তাও বোধ হয় না। আয়নায় তিনি দীর্ঘ সময় নিজকে দেখেছেন। একবার না, অনেকবার দেখেছেন। খারাপ বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া চেহারা কি খুব বড় ব্যাপার? কত কুৎসিত-দর্শন মানুষ পৃথিবীতে আছে। তাদের প্রতি কত ভালবাসা সবাই দেখায়। তাঁদের অফিসেই তো একজন আছেন, পরিমল বাবু। আগুনে পুড়ে মুখের একটা দিক ঝলসে গেছে, বাঁ চোখটা নষ্ট। তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অথচ সবার মুখে — পরিমলদা, পরিমলদা। অফিসের পিকনিক হবে, ব্যবস্থা করবে পরিমলদা। নাটক দেখতে যাবে, ডাকো পরিমলদাকে।

AMARBOI.COM

তাহলে ব্যাপারটা কি? তিনি খানিকটা বোকা বলেই কি সবাই তাকে এড়িয়ে চলে? বোকাদের কেউ পছন্দ করে না — কিন্তু তিনি কি সত্যি বোকা? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। কাকে জিজ্ঞেস করবেন? জিজ্ঞেস করবার মত কোন বন্ধু তাঁর নেই। কাজেই তিনি গভীর রাতে ছাদে বসে আকাশের তারা গুনেন।

দিনের বেলাটা তাঁর অবশ্যি খুব ভাল কাটে। সকালে নাশতা শেষ করেই বের হয়ে পড়েন। এগারোটা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করেন। বাচ্চাদের স্কুলগুলির সামনে দাঁড়ান। এক একদিন এক এক স্কুল। ছোট ছোট বাচ্চরা হৈচৈ করে স্কুলে ঢুকে। তাঁর দেখতে বড় ভাল লাগে। এগারোটার দিকে রোদ কড়া হয়ে গেলে ঘুরতে আর ভাল লাগে না — কোন-একটা পার্কে চলে যান। দুপুরটা কাটে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে। দুপুরের খাবার তিনি পার্কেই খান। এক ছটাক বাদাম, এক গ্লাস পানি আর এক কাপ চা। কোন কোন দিন দুটা সিঙাড়া, একটা কলা। সবই পার্কে পাওয়া যায়। দুপুরে তিনি যে বাড়িতে খেতে যান না এ নিয়ে কেউ তাকে কখনো কিছু বলে না।

রোদ একটু কমে গেলে বেলা চারটার দিকে তিনি আবার ঘুরতে বের হন। বাসায় ফিরে যান সন্ধ্যার দিকে — এই হচ্ছে মতিন সাহেবের রুটিন। বাসায় ফিরে জিজ্ঞেস করেন অফিস থেকে কোন চিঠি এসেছে কি-না। বিদায় সভার খবরের জন্য তিনি এখনো মনে মনে অপেক্ষা করেন।

এক রোববারের কথা। চৈত্র মাস। ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে। মতিন সাহেব যথারীতি রমনা পার্কে উপস্থিত হয়েছেন। পছন্দসই একটা বেঞ্চ বের করে লম্বা হয়ে শুয়েছেন। আকাশ ঘন নীল — আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন হঠাৎ কেমন যেন হল। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ ঝাঁকুনি অনুভব করলেন। পেটের নাড়ীভুড়ি মনে হল হঠাৎ একটা পাক দিয়েছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেল লালায়। চোখের সামনে তীব্র নীল আলো ঝলসে উঠল।

তিনি চোখ বন্ধ করে তিনবার বললেন, ইয়া মাবুদ। ইয়া মাবুদ, ইয়া মাবুদ।

চোখ খুললেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। যা দেখলেন তার জন্যে তাঁর কোন রকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তিনি দেখলেন — তাঁর চারপাশে ছ'সাতটি শিশু। বয়স সাত থেকে বারোর মধ্যে। প্রতিটি শিশুর মুখ এত সুন্দর যে মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। গায়ের রঙ গোলাপী, পাতলা ঠোঁট, গা লাল রঙের। চোখের পল্লব দীর্ঘ। চোখগুলি বড় বড়। সেই চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

মতিন সাহেব চোখ মেলতেই সবগুলি বাচ্চা এক সঙ্গে কলকল করে উঠল। তারা কথা বলছে। অতি বিচিত্র কোন ভাষায় কথা বলছে। সেই বিচিত্র ভাষার এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন না। তারা কথা বলছে অতি মিষ্টি সুরে। খানিকটা টেনে টেনে। এক-একটা বাক্য বলার পর তারা বাঁ হাত চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে — এটাই বোধ হয় এদের কথা বলার ভঙ্গি।

এরা যে মানবশিশু এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু কোথাকার মানবশিশু? এদের পোশাকও অতি বিচিত্র। সবারই গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক। যার রঙ কোন স্থায়ী রঙ না — ক্ষণে ক্ষণে তা বদলাচ্ছে।

AMARBOI.COM

মতিন সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বাচ্চাদের কলকল শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। চারদিক পুরোপুরি নিঃশব্দ। এধরনের নীরবতা সহ্য করাও মুশকিল। মতিন সাহেব চোখ মেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাবা আবার কলকল শুরু করল। এরা সবাই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার কি ঘটছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মতিন সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন। যদিও এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।

তিনি শুয়ে ছিলেন সিমেন্টের বেঞ্চে। এখন তিনি শুয়ে আছেন ঘাসের উপর। ঘাসগুলি অবশ্যি অন্য রকম। সবুজ নয়, হালকা নীল। ঘাসের পাতা সুতার মত সূক্ষ্ম। সিমেন্টের বেঞ্চে যখন শুয়েছিলেন তখন সূর্য ছিল মাথার উপর। এখন কোন সূর্য নেই। তিনি সূর্যের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালেন। বাচ্চারাও তার মত ওদিক-ওদিক দেখছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন — সূর্যটা কোথায়? বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারল বলে মনে হল না — তারাও অবিকল তাঁর মত হাতের ইশারা করল। এরা যেন একদল পুতুল। তিনি যা করবেন এরাও তাই করবে। মতিন সাহেব বললেন,'তোমরা কারা?'

এরা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর সবাই একসঙ্গে মিষ্টি করে বলল, "তোমরা কারা?"

এর মানে কি? কি হচ্ছে এসব? তিনি কোথায়? আগে রমনা পার্কে শুয়ে ছিলেন — এখন যেখানে আছে এটাও মনে হয় কোন পার্ক তবে একটা গাছও চিনতে পারছেন না। অচেনা সব গাছ তবে বড় গাছ না সবই লতানো গাছ। পাতাগুলি বেশির ভাগই গোলাকার। প্রতিটি গাছ ফুলে ভর্তি। ফুলের রঙ নীল এবং বেগুনীতে মেশানো। চৈত্র মাসের ঝাঁঝালো রোদ নেই তবু চারদিক আলো হয়ে আছে। যে বাচ্চা ক'টি তাকে ঘিরে আছে তাদের কারো পায়ে জুতো নেই। এত সুন্দর পোশাক কিন্তু এরা দাঁড়িয়ে আছে খালি পায়ে। মতিন সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব ক'টি বাচ্চা আগের মত এক সঙ্গে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মতিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বাচ্চারাও তাঁর মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এদের সব ক'জন ছেলে না মেয়ে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সবার চেহারাই দেখতে এক রকম। চুল ছোট ছোট করে কাটা।

মতিন সাহেব বুঝতে পারছেন — পুরো জায়গাটাই বিরাট একটা বাগান। এত বড় বাগানে এই ক'টি মাত্র শিশু। আর কেউ নেই। এরা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ হাসি-হাসি। চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। এরা তাঁকে দেখে কি ভাবছে? কোন জন্তু যে দেখতে মানুষের মত। এরকম হলে ছুটে গিয়ে বড় কাউকে নিয়ে আসা উচিত। তা তারা করছে না। কিংবা কে জানে হয়ত করেছে। তাদের ভেতর থেকে কেউ গেছে বড়দের খবর দিতে। এরা অপেক্ষা করছে। তবে এরা খুব যে ভয় পাচ্ছে তা না। ভয় পেলে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকত না। দূর থেকে দেখত। চোখে চোখ পড়ামাত্র চোখ নামিয়ে নিত। মতিন সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। আসুক, বড় কেউ আসুক।

তাঁর ক্ষিধে পেয়ে গেল। আজ ভোরে তিনি নাশতা না খেয়ে বের হয়েছেন। দুপুরেও কিছু খাননি। দু'ছটাক বাদাম কিনেছিলেন। সেই বাদামের ঠোঙা এখনো হাতে আছে। যার কাছ থেকে বাদাম কিনেছেন তাকে দাম পর্যন্ত দেননি। বাদামের ঠোঙাটা হাতে আছে। তিনি

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা বাদাম ভেঙে মুখে দিলেন। সবাই কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। মতিনউদ্দিন ঠোঙাটি ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও, বাদাম। ঝাল মরিচ দিয়ে খেতে খুব ভাল। এবার আর তাঁর কথা শুনে সবাই এক সঙ্গে কথা বলে উঠল না। কেউ বাদামও নিল না। শুধু একজন একটু এগিয়ে এসে ঠোঙা থেকে বাদাম নিল। খোসা ছাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে মুখে দিল। সে এত ভয় পাচ্ছিল যে তার হাত-পা রীতিমত কাঁপছে। অন্য বাচ্চাগুলি শংকিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না — এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। বাদাম কি তারা আগে কখনো দেখেনি?

যে সাহস করে বাদাম খেয়েছে তার দিকে তাকিয়ে মতিন সাহেব বললেন, আমার নাম মতিনউদ্দিন। এই জায়গাটা কোথায় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাচ্চাগুলি এবারো ঠিক আগের মত করল। তিনি যা বললেন তারাও তাই বলল। তবে এবার একটু ব্যতিক্রম হল। কথা শেষ হওয়ামাত্র তারা সরে গেল। অনেকটা দূরে সরে গেল। যে ছেলেটি বাদাম খেয়েছে শুধু সে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেব তিনজন বয়স্ক মানুষকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। এদের ভেতর দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই অদ্ভুত-দর্শন কিছু যন্ত্রপাতি। যন্ত্রগুলি থেকে মৌমাছির পাখা নাড়ার শব্দের মত শব্দ আসছে। বয়স্ক মানুষ তিনটির চোখে-মুখে গভীর বিস্ময়।

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই জায়গাটা কি তাও জানি না। এখানে কি করে আসলাম তাও জানি না। যদি অপরাধ করে থাকি, আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মতিন সাহেব দু'হাত জোড় করলেন। বয়স্ক মানুষ তিনজনের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। তারা কি তাঁর কথা বুঝতে পেরে হাসছে না মতিন সাহেবকে হাত জোড় করতে দেখে হাসছে?

"স্যার আমার বাসা পল্লবীতে। এখন রিটায়ার করেছি তো। কিছু করার নেই তাই ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে রমনা পার্কে এসে বেঞ্চিতে বসেছি — তারপরেই এই কাণ্ড। স্যার, এখন আমার অসম্ভব পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। জানি আমার কথা আপনারা কিছুই বুঝতে পারছেন না তবু পানির তৃষ্ণার কথা না বলে পারলাম না।'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তিনি তাদের কোন কথা বুঝতে না পারলেও তারা তাঁর কথা বুঝতে পারছে। কারণ পানির কথা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় মেয়েটি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁর কাঁধে ঝুলানো বস্তু, যাকে মতিন সাহেব যন্ত্রপাতি বলে ভাবছেন, তার এক ফাঁক দিয়ে দু'টি খুব ছোট ছোট কফির কাপের মত বাটি বের করল। বাটি ভর্তি তরল পদার্থ যা পানি নয়। পানির চেয়ে অনেক হালকা। রঙ, হালকা সবুজ। খেতে চমৎকার। মুখে নেয়ামাত্র সমস্ত মুখে ঠাণ্ডা ভাব হল। তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। মতিন সাহেব দু'টি কাপই শেষ করলেন। অন্য কাপটির তরল বস্তুর স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝাঁঝালো — টক টক।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আপনাদের ধন্যবাদ।

পুরুষদের একজন এগিয়ে এসে মতিন সাহেবকে হাতের ইশারায় বলল, তিনি যেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

AMARBOI.COM

প্রথমবারেই মতিন সাহেব তা বুঝলেন। তবু সে বারবার এটা বুঝাতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন, আপনার কথা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। শুধু যদি একটু বুঝিয়ে দেন আমি এখানে কিভাবে আসলাম — আপনারা কারা — তাহলে মনটা শান্ত হবে। আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে।

তারা এই কথায় একসঙ্গে হাসল। মতিন সাহেব ভেবে পেলেন না — তিনি এমন কি বলেছেন যাতে এদের হাসি আসবে। বোঝাই যাচ্ছে তিনি কোন ভয়ংকর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এতে হাসির তো কিছু নেই।

আরো তিনজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। এরা আগের তিনজনের মত হেঁটে আসেনি — গাড়িতে করে এসেছে। গাড়িগুলিকে কি গাড়ি বলা যায়? হাওয়া গাড়ি? কারণ গাড়িগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসেছে। গাড়ি ভর্তি নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। নতুন তিনজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমেই মতিন সাহেবের চারদিকে যন্ত্রপাতি বসাতে লাগল। এমন সব বিকট আকৃতির যন্ত্র যে তাকালেই বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগে।

মতিন সাহেবের চোখের ঠিক সোজাসুজি দশ ফুটের মত দূরে টিভি পর্দার মত পাতলা একটি পর্দা বসানো হয়েছে। মনে হচ্ছে এইটিই সবচে' জটিল যন্ত্র কারণ ছয়জন মানুষের মধ্যে চারজনই এটি নিয়ে ব্যস্ত।

মতিন সাহেব বাচ্চাগুলিকে কোথাও দেখতে পেলেন না। এরা নিঃশব্দে সরে গেছে। শুধু যে বাচ্চাটি বাদাম খেয়েছে সে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তাকেও নড়াচড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তার চারপাশে গোল করে সাদা রঙের দাগ দেয়া হয়েছে। ছেলেটি এই দাগের বাইরে যাচ্ছে না। বাচ্চাটাকে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি কি বসতে পারি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পায়ে ঝি-ঝি ধরে গেছে।

এরা তার কথা বুঝতে পারল। সম্ভবত যন্ত্রপাতিগুলি ভাষা অনুবাদ করে দিচ্ছে কিংবা কে জানে হয়ত তারা মনের কথা বুঝতে পারে।

সবচে' বয়স্ক মানুষটি তাঁকে বসতে ইশারা করল। মতিন সাহেব বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পর্দাটা নিচে নেমে এল। চোখের সোজাসুজি স্থির হয়ে গেল। তিনি ডান দিকে ফিরলেন। পর্দাও ডান দিকে সরে গেল। মজার ব্যাপার তো।

বয়স্ক লোকটি ইশারায় বলল, পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পর্দায় কিছু দেখা যাবে। অথচ তিনি কিছুই দেখছেন না। লোকগুলি মনে হয় এতে খুব হতাশ হচ্ছে। মতিন সাহেবের আবার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। একটু আগে পানি চেয়েছেন। আবার চাইতে লজ্জা লাগছে। তাছাড়া এরা সবাই পর্দাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাওয়া গাড়িতে আরো তিনজন মানুষ এল। এখানকার ছ'জন থেকে তিনজন ফিরে গেল। এই তিনজন সম্ভত পর্দার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। এখন নতুন তিনজনই কাজ করছে। আগের তিনজন একটু দূরে হতাশ মুখে দাড়ানো। মনে হচ্ছে পর্দাটা ঠিকঠাক করা তাদের কাছে খুব জরুরী।

AMARBOI.COM

মতিন সাহেব মাথায় আচমকা একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। নিজের ছবি। দু' হাত মেলে দশটি আঙুল বের করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এর মানে কি।

মতিন সাহেব বললেন, স্যার আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি। নিজের ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবি মুছে গেল। পর্দায় দেখা গেল তার পাশে বসে থাকা বাচ্চাটির ছবি। সেও আঙুল মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার — এই ছেলেটির প্রতি হাতে চারটি করে মোট আটটি আঙুল। তিনি পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিকে তাকালেন। আসলেও তাই। এর হাতে চারটি করে আঙুল। পায়েও তাই।

তিনি চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির দিকে তাকালেন। এদেরও সবার হাতে চারটি করে আঙুল। পর্দার ছবির অর্থ এখন পরিষ্কার হচ্ছে — এরা বলতে চাচ্ছে — আমরা দেখতে অবিকল তোমাদের মত হলেও কিছু পার্থক্য আছে। এই হচ্ছে সেই পার্থক্য।

এখন আরো সব পার্থক্য দেখানো হচ্ছে — এগুলি মতিন সাহেব কিছুই বুঝছেন না। তারা চলে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডি এন এ, আর এন এ তে। পুরো জিনিসটি যদিও দেখানো হচ্ছে ছবিতে তবু মতিন সাহেব কিছু বুঝলেন না। লাজুক গলায় বললেন,

'স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আর্টস-এর ছাত্র। বি.এ-তে আমার ছিল লজিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাস।

পর্দার ছবি মুছে গেল — এখন অন্য ছবি আসছে। এই ছবিতে বাদাম খাওয়া বাচ্চাটিকে বাগানে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই বাগান। বাচ্চাটি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে সে কিছু-একটা দেখে ভয় পেয়েছে — সে উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে। আরো কয়েকটি শিশুর সঙ্গে তার দেখা হল। এবার সে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। অন্য শিশুরাও আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তারা যে জিনিসটি দেখে ভয় পেয়েছে এবার সেটিকে দেখা যাচ্ছে — জিনিসটি হচ্ছে মতিন সাহেব।

AMARBOI.COM

পর্দায় দেখানো হচ্ছে মতিন সাহেবের এই জায়গায় আসার ছবি। মনে হচ্ছে দূরে ক্যামেরা বসিয়ে পুরো জিনিসটারই ছবি তোলা হয়েছে। এখন সে ছবি দেখানো হচ্ছে।

মতিন সাহেব দ্বিতীয় দফায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন — এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদের কথা বুঝতে পারলেন। পরিষ্কার শুনলেন মাথার ভেতরে কে যেন বলছে—

'আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন? আমরা নানান ভাবে চেষ্টা করছি যাতে আপনি আমাদের কথা বুঝেন। আমরা আপনার চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পারছি না। শেষ চেষ্টা হিসাবে ইরিওক্রোম পর্দা ব্যবহার করছি। এই পর্দায় তীব্র শক্তির রেডিয়েশন ব্যবহৃত হয় যা আপনার মস্তিষ্কের নিওরোনের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই এই পর্দা আমরা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারব না। আপনি কি আমাদের কথা বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

'আপনারা কারা?'

'আপনি এবং আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তের অধিবাসী। আপনার বাসস্থান যাকে আপনি পৃথিবী বলেন তার দূরত্ব আমাদের এখান থেকে প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ।'

'আমি এখানে কি করে এলাম?'

'এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানীরা একটি থিওরী দিয়েছেন — সেই থিওরী আপনি চাইলে আপনাকে বলতে পারি।'

'আমি থিওরী বুঝব না — আমি বলতে গেলে একজন মূর্খ মানুষ। বি.এ. পাস করেছি থার্ড ডিভিশনে। তাও প্রথমবারে পাস করতে পারিনি, ইংরেজীতে রেফার্ড ছিল।'

'এই থিওরী যে-কেউ বুঝতে পারবে। আপনি পারবেন। বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিছু থিওরী তৈরি করেন। এটিও সে জাতের থিওরী। বিজ্ঞানীরা বলছেন — প্রকৃতির অতি সুশৃঙ্খল নিয়মেও মাঝে-মধ্যে ভুল হয়ে যায়। ভুল করে প্রকৃতি। আপনার ক্ষেত্রেও এরকম ভুল হয়েছে। যার জন্যে অকল্পনীয় দূরত্ব থেকে আপনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে। তবে প্রকৃতি অতি দ্রুত তার ভুল ঠিক করে। আপনার ক্ষেত্রেও তাই করবে বলে আমাদের ধারণা। আপনি যেখান থেকে এসেছেন আবার সেখানে ফিরে যাবেন। প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করবে। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারছি না।'

'যদি প্রকৃতি তার ভুল ঠিক করতে না পারে তাহলে কি হবে?'

'আপনাকে এখানেই থেকে যেতে হবে।'

'স্যার, আমার কোন অসুবিধা নেই। দেশ-বিদেশ দেখার আমার খুব শখ।'

'আপনার এই শখ আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি। পর্যায় আপনি আমাদের এই গ্রহ দেখতে পাবেন। তার প্রতিটি সুন্দর জায়গা আপনাকে দেখানো হবে। তবে যে কোন মুহূর্তে আপনি হয়ত আপনার জায়গায় ফিরে যাবেন। দয়া করে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আপনার দেশের বিজ্ঞানীদের বলবেন আমাদের কথা।'

'আমি বললে লাভ হবে না, স্যার। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া আমি কোন বিজ্ঞানীকে চিনি না। একজনকে শুধু চিনি — আব্দুস সোবহান — খিলগাও হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক। বোটানীতে এম.এসসি. ফার্স্ট ক্লাস।'

'শুনুন মতিন সাহেব, আপনার এই গ্রহে আগমন একটি বিরাট ঘটনা। এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রহে একদিনের ছুটি দেয়া হয়েছে। এই গ্রহের প্রতিটি প্রাণী বসে আছে ত্রিমাত্রিক টিভি সেটের সামনে। এই মুহূর্তে সবাই দেখছে আপনাকে। এই গ্রহে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এই গ্রহের সবচে' বড় সড়কটির নাম রাখা হচ্ছে আপনার নামে — সড়কের দু'মাথায় থাকবে আপনার দুটি ইরিডিয়ামের মূর্তি।'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না, স্যার।'

'লজ্জা দেয়ার কোন ব্যাপার নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার এই গ্রহে আগমন যে কত বড় ঘটনা তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছায়াপথে একই ধরনের দু'টি প্রাণের উদ্ভব হয়েছে — এটা যে কত বড় ঘটনা আপনি অনুমান ও করতে পারবেন না।'

'একই ধরনের প্রাণী না স্যার — আঙুলে বেশকম আছে।'

'এই তফাৎ সামান্য — অতি সামান্য।'

'একটা ছোট কথা জিজ্ঞেস করি, স্যার?'

AMARBOI.COM

'করুন।'

'আপনি বলেছেন প্রকৃতি ভুল করে। প্রকৃতির কি ভুল করা উচিত?'

'না উচিত নয়। হয়ত প্রকৃতি কোন ভুল করেনি। সে ইচ্ছা করেই আপনাকে এখানে এনেছে। অন্য কোথাও আপনাকে নিতে পারত। তা নেয়নি। এমন এক গ্রহে এনেছে যার তাপমাত্রা আপনার পৃথিবীর মত। যার অক্সিজেনের পরিমাণও আপনার গ্রহের অক্সিজেনের কাছাকাছি।'

মতিন সাহেব পর্দা থেকে দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে ফিরিয়ে নিলেন — তাকালেন চারদিকে। আশ্চর্য! কেউ নেই। শুধু বাদাম খাওয়া বাচ্চাটি বসে আছে। যে লোকগুলি যন্ত্র ঠিক করছিল তারাও নেই। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, স্যার, ওরা কোথায়?

'সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'কারণ আমাদের বিজ্ঞানীদের ধারণা — আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আপনার চারপাশের চৌম্বকক্ষেত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। বায়ুতে আয়নের পরিমাণ বাড়ছে।'

'ছোট বাচ্চাটিকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন কেন?'

'আপনাকে যখন এখানে পাঠানো হয় তখন ছোট বাচ্চাটি আপনার পাশে ছিল। অবিকল আগের অবস্থা বজায় রাখার জন্য বাচ্চাটিকে আপনার পাশে রাখা হয়েছে।'

'এর কোন ক্ষতি হবে না তো?'

'সম্ভবত না। আপনাকে আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞানের কিছু কথা শিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। আপনি আপনার পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের তা শেখাতে পারতেন ক্যানসারের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেব?

'দরকার নেই, স্যার। ওরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'তারচেয়েও বড় কথা আপনি কিছু মনে রাখতে পারবেন না।'

'সত্যি কথা বলেছেন। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।'

'চৌম্বকক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে — আপনি সম্ভবত চলে যাচ্ছেন। পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকুন। দেখুন, আমাদের গ্রহ দেখুন — শেষবারের মত দেখুন।'

মতিন সাহেব পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই বিচিত্র গ্রহ দেখলেন — দেখলেন তার ভূগর্ভস্থ বিশাল নগরী, দেখলেন তুষারঢাকা পর্বতমালা, দেখলেন বনভূমি, দেখলেন এই গ্রহের প্রাণদায়িণী সূর্য — যার আলো কিঞ্চিৎ নীলাভ।

তাকে শুনানো হল তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত। দেখানো হল মহান সব শিল্পকর্ম। আহ্ কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা! মতিন সাহেব ইরিডিয়ামের তৈরি তাঁর দু'টি মূর্তিও দেখলেন। কি বিশাল মূর্তি। আগামী লক্ষ বছর এই মূর্তির কিছু হবে না। এই গ্রহের অদ্ভুত সুন্দর মানুষগুলি তাঁর মূর্তির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাবে।

'হে ভিন গ্রহের মানুষ, আমাদের ধারণা আপনার বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত। চৌম্বকক্ষেত্র সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। বিদায়, বিদায়।

AMARBOI.COM

এই গ্রহের সব ক'টি মানুষ এক সঙ্গে বলল — বিদায়, বিদায়!

মতিন সাহেব হঠাৎ এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করলেন। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকা এক সঙ্গে কেঁপে উঠল। তারপর সব আগের মত হয়ে গেল। তিনি দেখলেন রমনা পার্কের বেঞ্চিতে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। হাতে বাদামের ঠোঙা। বাদামওয়ালা টাকার ভাংতি নিয়ে এসেছে। তিনি বাদামওয়ালাকে চারটা টাকা দিলেন। তাঁর রুটিনের ব্যতিক্রম হল না। দুপুরে বেঞ্চিতে ঘুমালেন। বিকেলে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে বাসায় ফিরলেন।

নামাজের সময় হয়েছে তিনি বারান্দায় বসে বদনার পানিতে অজু করছেন। তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন — ওকি! ওকি!

মতিন সাহেব বললেন, কি হল?

'তোমার হাতে চারটা আঙুল কেন?'

মতিন সাহেব হাতের দিকে তাকালেন। আসলেই তাই। দু'টি হাতেই চারটি করে আঙুল। শুধু হাতে নয়। পায়েও তাই।

'কি হয়েছে তোমার? এসব কি?'

মতিন সাহেব উদাস গলায় বললেন, জানি না।

'কি বলছ তুমি! কি সর্বনাশের কথা!'

মতিন সাহেব বললেন, সর্বনাশের কি আছে? চারটা আঙুলে অসুবিধা তো হচ্ছে না।

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে অজু করে যাচ্ছেন। আঙুল চারটা হয়ে যাওয়ায় তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। তিনি জানেন প্রকৃতি ভুল করে তাঁকে ঐ গ্রহ থেকে এখানে ফিরিয়ে আনার সময় প্রকৃতি এই সামান্য পরিবর্তন করেছে। নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন ছিল। অন্তত তিনি নিজে তো বুঝছেন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে তা স্বপ্ন নয় — বাস্তবেই ঘটেছে। প্রকৃতি তার প্রমাণ রেখে গেল।

তাছাড়া চার আঙুলে হাতটাকে দেখাচ্ছেও সুন্দর!

AMARBOI.COM

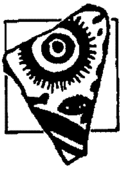

শিকার

সে হাঁটে নিঃশব্দে।

যখন হাঁটে বাতাস পর্যন্ত কাঁপে না। নৈঃশব্দের চলাফেরা। কিন্তু মতি মিয়া টের পায়। অন্ধ মানুষদের এই একটি সুবিধা। এরা বাতাস শুঁকে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। আজও পারল। মাথা ঘুরিয়ে বলল, কেডা যায়? আজরফ নাহি?

আজরফ জবাব দিল না। যে নিঃশব্দে হাঁটে সে ফস করে জবাব দেবে এটা আশা করা যায় না। মতি মিয়া আশাও করে না। দ্বিতীয়বার ডাকে, "আজরফ ও আজরফ মিয়া।"

আজরফ এবারও জবাব দেয় না। জবাব দেয় তার পোষা বক। বকটির বয়স মাত্র পাঁচ মাস কিন্তু সে নব্বুই বছরের বুড়োর মত ডাকে কক কক ককর। বড় কুৎসিত ডাক। মতি মিয়া নড়েচড়ে উঠে।

আজরফ বক ধরতে যাস নাহি?

হ।

যাইস না বাজান। সোনা চান আমার!

আজরফ চুপ করে থাকে।

পক্ষী ধরন বালা না। বদদোয়া লাগে। আমারে দেইখ্যা বুঝস না? ও আজরফ! আজরফ মিয়া!

কি?

ব' তুই। তরে একটা গফ কই। ক্যামনে বদদোয়া লাগে হেই গফ।

আজরফ বসে না। গল্পের প্রসঙ্গ আসায় খাঁচার বকটি সম্ভবত উৎসাহী হয়। সে ডানা ঝাপ্টায় এবং দ্বিতীয়বার ডাকে, কক কক কক। মতি মিয়া জুত হয়ে বসে। কার্তিক মাসের নরম রোদ তার পিঠে। রোদের মধ্যে নেশা জাতীয় কিছু কি আছে? কেমন যেন নেশা-নেশা ভাব হয়। বড় ভাল লাগে মতি মিয়ার। এই বয়সে শরীর বাড়তি উত্তাপ চায়। মতি মিয়ার সব রাতেই ইচ্ছা করে চারপাশে আগুন করে মাঝখানে বসে থাকতে। কিন্তু এখন মাত্র কার্তিক মাস। শীতও ভাল করে পড়েনি।

AMARBOI.COM

আজরফ আছস?

হ।

বক পক্ষীর কথা কই। বড় হারামি পক্ষী। বুঝছস?

বুঝলাম।

যে বক ধরে তার চউখ থাকে না। চউখ তার যায়। আইজ হউক কাইল হউক চউখ যায়। আমারে দেইখ্যা বুঝস না?

বক পক্ষীর হারামিপনা বুঝাবার জন্যে মতি মিয়া তার বুজে যাওয়া চোখ মেলতে চেষ্টা করে। মেলতে অবশ্যি পারে না।

অ আজরফ!

কও হুনতাছি।

ব' আজরফ।

আজরফ বসে না। মতি মিয়ার পিঠে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। মতি মিয়া গানের মত সুরে কথা বলে,

বক পক্ষী মরণঠোকর দেয় বুঝছস? আর ঠোকর দেয় জায়গামত। পরথম ধাক্কায় যায় ডাইন চউখ, পরের ধাক্কায় বাঁও। দুনিয়া হয় আন্ধাইর। নয়নের মত জিনিস নাই রে বাজান।

আজরফ শুনছে কিনা মতি মিয়া বুঝতে পারে না। খাঁচায় বন্দী বক ডানা ঝাপ্টায়। মতি মিয়া তাতেই উৎসাহ বোধ করে।

বক-মারার চউখ থাকে না রে আজরফ। আমারে দেইখ্যা বিবেচনা কর। নেজামের ভাইস্তার কথা মনে আছে?

কোন নেজাম?

মতি মিয়া উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে। নেজামের ভাইস্তার গল্প সবিস্তারে শুরু করে। কথা বলতে তার বড় আরাম লাগে। তা ছাড়া পিঠের উপর কার্তিক মাসের রোদ। রোদের মত ভাল জিনিস আছে? এক পর্যায়ে ঝিমুনী এসে যায় মতি মিয়ার।

আজরফ বসে থাকে উত্তর বন্দের নাবালে একটা জলা জায়গায়। তার এক হাতে বক ধরার ফাঁদ। কাঁচা বেত পাতা দিয়ে ঢাকা গোল করে বাঁধা একটা চাটাই। বক ক্ষীণ দৃষ্টির পাখি। ফাঁদটাকে তাদের কাছে মনোরম একটা ঝোপের মত লাগে। দড়ি দিয়ে বাঁধা পোষা বকটি বসে থাকে চাটাইয়ের মাথায়। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘনঘন ডাকে। সেই কর্কশ ডাকে বকদের প্রতি কোন করুণ আবেদন থাকে নিশ্চয়ই। কারণ মুক্ত বকের দল তখন মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। পোষা বকটি ক্রমাগত ডাকে। বকরা নীচে নেমে আসে। সন্দেহ ভরা চোখে তাকায়। তবু নেমে আসে। এবং এক সময় পোষা বকটির পাশে এসে বসে। গভীর মমতায় কিছু হয়ত বলতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ হয় না। বক-শিকারী এক হাতে খপ করে তার পা ধরে বিদ্যুৎগতিতে তাকে নামিয়ে এনে পায়ের নীচে চাপা দেয়। দ্রুত তাকে হাত খালি করতে হয়। কারণ অন্য আরেকটি বক নামতে শুরু করেছে। সময় নেই মোটেই। বক নীচে নামানোর সময়টাই ভয়াবহ। হকচকিত পাখিটি একবার হলেও মরণঠোকর দিতে চেষ্টা করে। সে তখন খুঁজে মানুষের চোখ। একটা নরম তুলতুলে জায়গা যেখানে ঠোঁট অনেকখানি বসিয়ে দেয়া যায়। বক মারার চোখ যায় বকের ঠোঁটে। প্রথমে ডানটি তারপর বাঁটি।

AMARBOI.COM

আজ পাখিরা আসছে না। বেলা হয়ে গেছে বোধ হয়। রোদ চড়ে গেলে পাখিরা নীচে নামতে চায় না। আজরফ তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ শূন্য এবং ঘন নীল। এমন নীল যে দৃষ্টি পিছলে যায়। তাকিয়ে থাকলে মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। শূন্য নীল আকাশের মত অদ্ভুত জিনিস আর আছে নাকি?

কিছু পাইছ আজরফ?

আজরফ তাকিয়ে দেখল মেম্বর সাব। মেম্বর জাতীয় লোকরা সবার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলে। এরা কথা বলতে বড় পছন্দ করে।

এখনো মনে হয় কিছু পাও নাই?

জ্বি না।

কেমন ধরা পড়ে ও আজরফ?

ঠিক নাই, কোন দিন আট-দশটাও পাই।

কও কি। দুই টেকা কইরা বেচলেও তো বিশ টাকা। কত কইরা বেচ?

ঠিক নাই।

আজরফের কথা বলতে ভাল লাগে না। সে তাকায় আকাশের দিকে। দূরে বহু দূরে একটি বক চক্কর খাচ্ছে। এটি কি নামবে? পোষা বকটি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ডানা

ঝাপটাচ্ছে। আজরফ নিজের মনেই বলে — আইতাছে। ডাক দেরে অনুফা। তর বন্ধুরে ডাক দে দেহী। পোষা বক (যার গোপন নাম অনুফা) ডাকে না, তৃষ্ণার্ত চোখে তাকায় আকাশের দিকে। মেম্বর সাহেবও তাকান। তারপর এক সময় রবারের জুতায় জলাভূমিতে ছপছপ শব্দ তুলে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছাতা নেড়ে নেড়ে বলেন, যাইরে আজরফ।

আজরফ তাকায় তাঁর দিকে, ঠিক তখনি তাঁর বাঁ চোখ টনটন করে উঠে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বাঁ চোখটির সময় শেষ হয়ে এসেছে। ধরা পড়া বকগুলির কোন-একটি ঠোকরে তুলে নেবে বাঁ চোখ। কিংবা হয়ত পোষা বকটি মরণ ঠোকর দেবে। বড় হারামি পাখি। আজরফ তাকাল অনুফার দিকে। ফাঁদের মাথায় শান্ত ভঙ্গিতে সে বসে আছে। আজরফের চোখে জল জমে আছে বলেই সব কিছু অন্য রকম দেখাচ্ছে। ছোট্ট অনুফাকে দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড সারস পাখির মত। তার ঠোঁট দু'টি সুবিশাল।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল, কিন্তু জল পড়া বন্ধ হল না। যাবে, এবার বাঁ চোখটা যাবে। আজই বোধ হয় যাবে।

সফদর আলির এরকম হল। কথা নেই বার্তা নেই শুধু ডান চোখ দিয়ে জল পড়ে। সফদর ভাই দেখা হলেই বলতো, ডাইন চউখটা এইবার যাইব। বুঝছস আজরফ? এইটা নিশানা।

ক্যামনে কন?

চউখের নিজের একটা জীবন আছে। হে বুঝে।

কথা ঠিক। তাঁর চোখ সত্যি সত্যি গেল। ভয়াবহ ব্যাপার! সফদর ভাইয়ের ভয়ংকর চিৎকারে নবীনগরের সমস্ত মানুষের বুক কাঁপতে লাগল। পাখিরা কি কিছু বুঝতে পারে? সফদর ভাইয়ের পোষা বক (যার নাম সোনা) ক্রমাগত ডাকতে লাগল, "কক কক কক।" সেই ডাক বেদনার ডাক না আনন্দ-উল্লাসের ডাক? — কোনদিন জানা যাবে না।

সদর হাসপাতাল নেত্রকোনায়, নৌকায় যেতে লাগে দু'দিন। ন্যাকড়া পোড়া ছাই দিয়ে চোখ বেঁধে নৌকায় তোলা হল সফদর আলিকে। মাথার কাছে বসে রইল আজরফ আর সফদর আলির ছোট ছেলেটা, যার নামও সোনা। বড় খারাপ যাত্রা ছিল সেটি। একেকবার মাথা তুলে হো হো করে চিৎকার করে উঠতো সফদর। তার ছেলেটাও তখন অবিকল বাবার মত চেঁচাত, হো হো।

সদর হাসপাতালের বারান্দায় চারদিন শুয়ে থেকে পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হল। চোখ বিষিয়ে গিয়েছিল।

আজরফ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কেন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। দু'একটা সঙ্গীহীন বক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এরা এখন ঘুরবে। একা একা। ঝাঁক বাঁধার সময় এখনো হয়নি। ঝাঁক বাঁধা হবে আরো দু'মাস পর। তখন বকগুলি অন্য রকম হয়ে যাবে। পোষা বকের ডাকে আর নিচে নামবে না। কেন নামবে না? জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। এ জগৎ বড় রহস্যময়। চোখ যাবার সময় হলে চোখ কাঁদে। কেন কাঁদে? আজরফ লুঙ্গির এক প্রান্ত টেনে চোখ মুছল। বড্ড জল পড়ছে। বেচারা খুব কাঁদছে। বোধ হয় মরতে চায় না।

AMARBOI.COM

অনুফা মাথাটা কাত করে তাকে দেখছে। তার ছোট্ট চোখ দু'টি টকটকে লাল। সে হঠাৎ কক কক করে ডেকে উঠল। সে কি কিছু বুঝে ফেলেছে? বুঝে ফেলেছে যে আজ পাখী–মারা আজরফের বাঁ চোখটি যাবে। আর সে আসবে না ফাঁদ নিয়ে। উত্তর বন্দের নাবাল জমিটায় চুপচাপ এসে বসে থাকবে না।

পশু–পাখিরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। মতি মিয়ার ধারণা — ওরা মানুষের চেয়েও অনেক বেশী জানে। বেশী জানে বলেই গৃহস্থের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কুপাখি আসে। কুডাক ডেকে বার বার উড়ে উড়ে যায়। গৃহস্থের পোষা কুকুর কাঁদে উউ করে। দীর্ঘদিনের বাস্তুসাপ হঠাৎ করে ঘর ছেড়ে যায়। মতি মিয়া বলে, বুঝছস আজফর, পশুপাখি খুব বুঝদার। এইডা আমার কথা না, হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামের কথা। তারা সব বুঝে। সব না বুঝলে চউক্কে ক্যান ঠোকর দেয়? শইলে জায়গা তো আরো আছে। আছে না? তুই ক' দেহি?

আকাশে বকগুলি চক্কর দিতে দিতে নীচে নামতে শুরু করেছে। অনেকগুলি পাখি এক সঙ্গে। এরকম তো হয় না। তাছাড়া রোদ চড়ে গেছে। এই সময় ওরা নীচে নামে না। এখন নামছে কেন? ওরা কি সত্যি সত্যি টের পেয়েছে কিছু।

আজরফের মনে হল আজ বেশ কিছু সাহসী পাখি স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েই নীচে নামতে শুরু করেছে। এদের ঠোঁট অসম্ভব ধারাল এবং নিশানা অব্যর্থ। আজ এরা একের পর এক ধরা দেবে। কোনই বাধা দেবে না। এতটুকুও চমকাবে না। তারপর তাদের একজন বিদ্যুৎগতিতে ঠোঁট বসাবে চোখের তরল মাংসে। সেই পাখিটি হবে সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি। তার বসার ভঙ্গি হবে ঋজু ও গর্বিত। তার পালক হবে দুধের মত সাদা। আজরফের পোষা বকটির মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। সে ডাকল এবং ডাকতেই থাকল। পাখিরা চক্রাকারে নেমে আসছে। আজই সেই দিন। আজরফের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তৃষ্ণা বোধ হল। নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘনঘন। পেটের মধ্যে কিছু–একটা পাক খাচ্ছে। বমি আসছে।

পাখি ধরা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? ছেড়ে দেয়া কি যায় না? এই মুহূর্তেই তো সে অনুফার বাঁধন খুলে দিতে পারে। পারে না কি? ছেড়ে দিলেই অবশ্যি অনুফা যাবে না। ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকবে। বন্দী জীবনেরও একটা মায়া আছে। গত বছরও সে একবার তার বক ছেড়ে দিল। সেই বকটির নাম ছিল অস্তু। অস্তু ছাড়া পেয়েও উড়ে গেল না। ভীষণ অবাক হয়ে বারবার আজরফের মাথার উপর দিয়ে উড়তে লাগল। আজরফ বলল — যারে বেটা যা। পাখি ধরা ছাড়লাম। তুই যা।

অস্তু গেল না। চাটাইয়ের মাথায় বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে থাকল। "যারে বেটা পাখি–মারার কাম করতাম না। তুই যা।" অস্তু তবু বসেই রইল। তারপর এক সময় খুবই অবাক হয়ে উড়ে গেল।

মতি মিয়ার ধারণা বকশিকারী কখনো শিকার ছাড়তে পারে না। বড় পাজী নেশা। জীবন্ত কিছু ধরে ফেলার মত কড়া নেশা আর কিছু নেই। তাই প্রতি বছরই সে একবার বলত, "পাখি ধরা ছাড়লাম গো। আর না। বহুত হইছে।" তারপর দিন কাটাত খুবই বিষণ্ন ভাবে। কিছুতেই তখন আর মন বসে না। পরের বৈশাখে আবার সে বকের ছানা এনে পুষতে শুরু করত।

AMARBOI.COM

কার্তিক মাসে সেই পোষমানা বক নিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বের হত। লোকজন বলত, কি মিয়া আবার শুরু করলা?

এই এট্টু।

পাখি–মারারা চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না। প্রথমে যায় একটি। নেশা তখন আরো বাড়ে। রক্তের মধ্যে ঝমঝম শব্দ হতে থাকে। কক কক ডাক শুনলেই স্নায়ু কাঁপতে থাকে উল্লাসে। তারপর যায় দ্বিতীয় চোখ। জগৎ অন্ধকার হয়। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত এদের মুক্তি নেই। যখন সব অন্ধকার হয় তখন নেশা কেটে যায়। তখন তারা রাত জেগে পাখির ডানা ঝাপ্টানি শোনে। সুযোগ পেলেই তত্ত্ব কথা বলে। অন্ধরা তত্ত্ব কথা বলতে বড় ভালবাসে।

আজরফ অনুফাকে ছেড়ে দিল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। অনুফা একটু উড়ে গিয়েই আবার এসে বসল চাটাইয়ের মাথায়। আজরফ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'হুস হুস যা ভাগ।' অনুফা গেল না। তার বসার ভঙ্গি ঋজু ও গর্বিত। তার পালক দুধের মত সাদা। একটি সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি।

যা ভাগ ভাগ। যা।

কক কক।

ভাগ ব্যাটা ভাগ।

কক কক ককর।

পাখি মারা ছাড়ছি, তুই যা।

কক কক।

অনুফা তার ধবধবে সাদা পালকে ঠোঁট ঘসল। এর মানে কী? এইটিই কি সেই পাখি? কড়া রোদ। আকাশ ঘোলাটে। অনেকগুলি পাখি চক্রাকারে উড়ছে। যেন সাহস দিচ্ছে অনুফাকে। আছি, আমরা আছি। আজরফের হৃদপিণ্ড লাফাতে লাগল। শরীর ঝনঝন করছে। স্নায়ু টানটান হয়ে উঠছে। সময় নেই। আজই সেই বোঝাপড়ার দিন। অতি দ্রুত এখন অনুফার হলুদ পা ঝাপ্টে ধরে ফেলতে হবে। বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনতে হবে নীচে। আজরফ ঘাড় উঁচু করে তাকাল। অনুফাও তাকাল। আজরফের চোখে আবার জল আসছে। পাখিটিকে আবার প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। যেন সাদা পালকের অতিকায় একটি অচেনা পাখি। এর জন্ম অদেখা এক ভুবনে। মাথার উপর উড়তে থাকা বকগুলি দ্রুত নীচে নেমে আসছে। আজরফ হাত বাড়াল। আসছে ওরা নেমে আসছে। এ–প্রান্ত থেকে ও–প্রান্ত কাঁপিয়ে তারা ডাকল — কক কক।

AMARBOI.COM

অসুখ

নয়া পল্টনের এক গলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার রিফ্লেক্স এ্যাকশান খুব ভাল। চট করে একটা দোকানের আড়ালে চলে গেলাম। কিন্তু তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে রঞ্জু না? তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, কেমন আছেন স্যার?

অতিরিক্ত উত্তেজনায় স্যারের হাঁপানির টান এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্বাস টানতে লাগলেন। দম ফিরে পাওয়ামাত্র প্রথম যে কথাটি বললেন, তা হচ্ছে — চল আমার সঙ্গে।

এখন তো স্যার যেতে পারব না। জরুরী কাজ আছে মতিঝিলে। একজন বসে থাকবে।

স্যার আরো জোরে আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাব। আমি বললাম, স্যার আমি বরং কাল সকালে একবার আসব। বাসায় থাকবেন তো? সকাল দশটার মধ্যে চলে আসব।

আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি। তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় কয়েকবার গেছি। সেখানে তো কেউ থাকে না।

আমি জবাব দিলাম না। স্যার বললেন, খোকনের মা'র অবস্থা খুব খারাপ। তোমাকে খুঁজছি এই জন্যেই।

অসুখ বেড়েছে নাকি?

বাড়া-কমা আর কি। বেশীদিন বাঁচবে না। মরাই এখন ভাল।

আমি কিছু বললাম না। স্যার মৃদুস্বরে বললেন, এখন খুব বিরক্ত করে। চেঁচামেচি করে। আর ভাল্লাগে না। তোমাকে অনেক খুঁজছি। কেউ ঠিকানা বলতে পারে না।

তারপর আর না যাওয়া ভাল দেখায় না। আমি বিরক্ত মুখে হাঁটতে শুরু করলাম। মতিঝিলে ফজলু আমার জন্য সত্যি সত্যি অপেক্ষা করবে। তার আমাকে নিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার কথা। সেই ইঞ্জিনিয়ার নাকি ইচ্ছা করলেই দু'তিনটা চাকরি দিয়ে ফেলতে পারেন। এইসব গালগল্প আজকাল আমি আর বিশ্বাস করি না। তবু যে যা বলে করি। এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে গিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে। আমি সম্ভবত তাও করব। ফজলু করবে তার চেয়েও বেশী। সে হয়ত বিশটা ডিগবাজি খাবে।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। রাস্তায় হাঁটলেই আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। এখন সেটা সম্ভব নয়। কারণ আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে যিনি হাঁটছেন তিনি স্কুলে আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। এবং তাঁর বড় ছেলেটির সঙ্গে এককালে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল।

AMARBOI.COM

স্যার, বাসার অন্য সবাই ভাল?

স্যার জবাব দিলেন না। সম্ভবত এখন আর তিনি কানে তেমন ভাল শুনেন না। স্কুলে থাকতেও কম শুনতেন। একই কথা তিনবার চারবাব বলতে হত। আমি আরেকবার বললাম, বাসার সবাই ভাল তো স্যার?

পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

ভাল।

নীলুর বিয়ে হয়েছে?

কি বললে?

নীলুর বিয়ে হয়েছে নাকি?

হয়েছে।

ছেলে কি করে?

ব্যবসা করে।

আমার অল্প একটু মন খারাপ হল। নীলু মেয়েটি অসম্ভব রূপসী। এককালে নীলুর জন্যে আমার বেশ দুর্বলতা ছিল। বেনামীতে কয়েকটি চিঠিও লিখেছিলাম। সেই সব আমার লেখা টের পেয়ে নীলু কেঁদে-কেটে অস্থির।

আমি ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললাম। স্যার বললেন, রিকশা নিব নাকি? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

না, না কষ্ট কিসের। চাচীর চিকিৎসা করাচ্ছেন?

মৃত্যুই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

বিলু কেমন আছে?

ভাল। ওরও বিয়ে হয়েছে। জামাই সিলেটের চা বাগানে কাজ করে।

খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিলেন মনে হয়।

অল্প কোথায়? তাছাড়া ঝামেলা কমল। ঝামেলা এখন আর ভাল লাগে না।

স্যার আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় দু'বছর পর এলাম এ বাড়িতে। কিছুই বদলায়নি। কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলি সব সময় আগের মত থাকে। পর্দার রঙ পর্যন্ত পাল্টায় না। কিংবা হয়তো সব সময় একই রঙের পর্দা কেনা হয়।

আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলু এসে ঢুকল। মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে হয়তো। বেশ সেজেগুজে আছে। বিয়ে হবার জন্যেই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর। নীলু এসেই ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলল, আপনি বাবাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছিলেন কেন?

ভুল না। আমি এক ঠিকানায় বেশিদিন থাকি না।

রঞ্জু ভাই, আপনি একটা মিথ্যা কথা বললেন।

যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় রঞ্জু নামের কেউ কোনদিন ছিল না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, মা'র জন্যে তো অন্তত এক-আধবার আপনার আসা উচিত। উচিত না?

সময় পাই না।

সময় পান না কেন? কি এমন রাজকার্য?

AMARBOI.COM

নানান ধান্ধায় থাকি।

আজ কিন্তু সন্ধ্যার আগে যেতে পারবেন না। সন্ধ্যাবেলা আমার বর আসবে। সে আপনার সঙ্গে যাবে। দেখে আসবে আপনি কোথায় থাকেন.

নীলু এমনভাবে বর কথাটি বলল যে, তাকে আরো সুখী-সুখী মনে হল। বোধহয় বেশ ভাল বিয়ে হয়েছে। গলায় ভারী একটা হার। হাতে মোটা মোটা বালা। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, বেনামী চিঠিগুলির কথা মনে আছে?

জিজ্ঞেস করবার আগেই স্যার এসে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মৃদুস্বরে বললেন, কাপড়-চোপড় এখন আর ঠিক থাকে না। ঠিকঠাক করতে সময় লাগে।

ঘরটি অন্ধকার। কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। স্যার বললেন, আলো সহ্য করতে পারে না তার জন্যে এই ব্যবস্থা। আমি বললাম, চাচী, ভাল আছেন? কোন উত্তর এল না। নীলু বলল, মা চিনতে পারছ? ভাইয়ার বন্ধু। রঞ্জু ভাই।

বিছানার উপর কিছু-একটা যেন নড়ল। পরিষ্কার গলায় চাচী বললেন, জানালাটা খুলে দে নীলু। ঘরে আলো হয়ে উঠতেই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাটিকে আবার দেখলাম। কি ঝকঝকে চোখ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, চাচী, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি খোকনের বন্ধু।

চাচী কোন জবাব দিলেন না। স্যার বললেন, রঞ্জু আগাগোড়াই খোকনের সঙ্গে ছিল। খোকন কিভাবে মারা গেছে সেটাও খুব ভাল জানে। রঞ্জু তুমি বল তো খোকন কিভাবে মারা গেল?

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, রঞ্জু ভাই আপনি বলুন। মা কথা সব বুঝতে পারেন। আর আপনাকে মা চিনতে পেরেছেন।

যে গল্প আরো কয়েকবার এই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাকে শুনিয়েছি সেই গল্প আবার শুরু করলাম। চাচী তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

"মেথিকান্দা অপারেশনে খোকনের তলপেটে গুলি লাগে। ওকে নিয়ে আমরা পালিয়ে আসি। খোকন মারা যায় নৌকায়। নৌকায় করে আমরা পালাচ্ছিলাম।"

চাচী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, এটা কি সত্যি কথা?

জ্বি সত্যি।

চাচীর গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, এটা কি সত্যি?

জ্বি চাচী, সত্যি। শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন?

চাচী এবার কেঁদে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, তবে যে ওরা বলে খোকনকে মিলিটারীরা ধরে ফেলেছিল, তারপর মাঠের মধ্যে নিয়ে জবাই করেছে।

চাচী, এটা মিথ্যা কথা।

কেন আমার ছেলেকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে?

যুদ্ধের সময় এ রকম মিথ্যা গুজব রটে চাচী। তাছাড়া ওরা মানুষ কিভাবে জবাই করবে? ওরা নিজেরাও তো মানুষ।

AMARBOI.COM

বলতে বলতে আমি ফ্যাকাশে ভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম। চাচী আর কিছু বললেন না। তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। এখন বেশ কিছুদিন শান্ত থাকবেন। কয়েক রাত তাঁব সুনিদ্রা হবে। তারপর আবার অস্থির হয়ে পড়বেন। স্যার খুঁজতে থাকবেন আমাকে।

মিথ্যা কথা বলতে আমার কখনো খারাপ লাগে না। একটি মা'কে প্রবোধ দেবার জন্য আমি একলক্ষ মিথ্যা অনায়াসে বলতে পারি। কিন্তু তবুও কখনো এ বাড়িতে আসতে চাই না। অপ্রকৃতিস্থ এই মহিলাটির সামনে এসে বসলেই আমি নিজেও কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি। সীমাহীন ক্রোধ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে কোন-একটি ভয়ংকর অপরাধ করি। যে অপরাধের কথা এর আগে কেউ কখনো শুনেনি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না।

আমি অন্য দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। একটি ছোট্ট ঘর। একজন মমতাময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশী কিছু তো কখনো চায় না।

নীলু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে খুব কাঁদল। নীলুর স্বামী এল আমার পিছু পিছু। আমি কোথায় থাকি তা জেনে আসবে। লোকটি ভাল মানুষ ধরনের। রাস্তায় নেমেই আমি তাঁকে বললাম, নীলুর সঙ্গে যে আমার প্রেম ছিল সেটা আপনি জানেন নাকি ভাই? ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, দারুণ লদকা-লদকি ছিল।

আমি অপ্রকৃতিস্থ হতে শুরু করেছি।

AMARBOI.COM

খাদক

আমি লোকটির বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। তার তেমন প্রয়োজন ছিল না। লোকটির বয়সে আমার কিছু যায় আসে না। তবু প্রথম দর্শনেই কেন যেন বয়স জানতে ইচ্ছে করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লোকটিকে বেশ ঘটা করে আনা হয়েছে। দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে আমার সামনে। আমাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়। লোকটি জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ হাসি হাসি। সেই হাসির আড়ালে গোপন একটা অহংকারও আছে। কিসের অহংকার কে জানে।

খোন্দকার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন — এই সেই লোক।

আমি বললাম, কোন্ লোক?

খাদক।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, খাদক মানে ?

খোন্দকার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেছেন? রাতে আপনাকে বললাম না — আমাদের গ্রামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি আছে। নামকরা খাদক।

আমার কিছুই মনে পড়ল না। খোন্দকার সাহেব লোকটি ক্রমাগত কথা বলেন। তাঁর সব কথা মন দিয়ে শোনা অনেক আগেই বন্ধ করেছি। কাল রাতে খাদক খাদক বলে কি সব যেন বলছিলেন। এ-ই তাহলে সেই বিখ্যাত খাদক।

ও আচ্ছা।

আমি ভাল করে খাদকের দিকে তাকালাম।

রোগা বেঁটেখাটো একজন মানুষ। মাথায় চুল নেই। সামান্য গোঁফ আছে। গোঁফ এবং ভুরুর চুল সবই পাকা। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবী গায়ে। শুধু যে পরিষ্কার তাই না, ইস্ত্রী করা। পরনের লুঙ্গি গাঢ় নীল রঙের। পায়ে রবারের জুতা।

জুতা জোড়াও নতুন। সম্ভবত বাক্সে তুলে রাখা হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পায়ে দেয়া হয়। যেমন আজ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, আপনার নাম কি?

আমার নাম মতি। খাদক মতি।

এই বলেই সে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। বুড়ো একজন মানুষ আমরা পা ছুঁয়ে সালাম করবে, আমি এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তি না। খুবই হকচকিয়ে গেলাম। অপ্রস্তুত গলায় বললাম, এসব কি করছেন?

লোকটি বিনয়ে নিচু হয়ে বলল, আপনি জ্ঞানী লোক, আমি আপনার পায়ের ধুলা। বলেই সে হাত কচলাতে লাগল। তার বলার ধরন থেকেই বুঝা যাচ্ছে এ-জাতীয় কথা সে প্রায়ই বলে। অতীতে নিশ্চয়ই অনেককে বলেছে। ভবিষ্যতেও বলার ইচ্ছা রাখে।

হুজুর, আপনি অনুমতি দিলে পায়ের কাছে একটু বসি।

আরে আসুন বসুন। অনুমতি আবার কিসের।

লোকটি বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ তুলল না। তার বিনয় একটা দেখার মত ব্যাপার।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। গত দু'দিন ধরে আমি এই অজ পাড়াগাঁয়ে আটকা পড়ে আছি। লঞ্চে এখান থেকে আটপাড়া যাওয়ার কথা। লঞ্চের দেখা নেই। আছি খোন্দকার সাহেবের পাকা দালানে। ইনি এই অঞ্চলের একজন পয়সাওয়ালা মানুষ। নিজের মায়ের নামে স্কুল দিয়েছেন। খোন্দকার সাহেব আমার অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয় কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা নেই। আদর-যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্রামের দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার পালা। অনেক দর্শনীয় জিনিস এর মধ্যে দেখে ফেলেছি। ভাঙা কালীমন্দির, যেখানে কিছুদিন আগেও নাকি নরবলি হয়েছে। একটা অচিন বৃক্ষ। সে অচিন বৃক্ষটি নাকি এক যাদুকর কামরূপ থেকে এনে পুঁতেছেন। যার ফল খেয়ে যৌবন স্থির থাকে। তবে এই ফল এখনো কেউ খায়নি, কারণ গাছটায় ফল হচ্ছে না। তেঁতুল গাছের মত গাছ — দর্শনীয় কিছু নয়, তবু ভাব দেখালাম যে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখছি।

একজন দর্শনীয় বস্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসে আছে। লোকটি নাকি বিখ্যাত খাদক। এক বৈঠকে আধমণ গোশ্‌ত খেতে পারে।

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করছি না। কিন্তু খোন্দকার সাহেবের উৎসাহ সীমাহীন। তিনি অহংকার মেশানো গলায় বললেন, মতি মেডেল পেয়েছে তিনটা। এই, প্রফেসার সাহেবকে মেডেল দেখা।

AMARBOI.COM

মতি মিয়া পাঞ্জাবীর পকেট থেকে মেডেল বের করল। মনে হচ্ছে মেডেল তার পকেটেই থাকে কিংবা আমাকে দেখানোর জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা মেডেল দিয়েছেন নেত্রকোনার সি.ও. রেভিন্যু, একটা আজিজিয়া স্কুলের হেড মাস্টার। অন্যটিতে নাম-ধাম কিছু লেখা নেই। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল — একজন লোক পরিমাণে বেশি খায় বলেই তাকে মেডেল দিতে হবে? দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে?

খোন্দকার সাহেব বললেন, অনেক দূর দূর থেকে লোক এসে মতিকে হায়ার করে নিয়ে যায়।

কেন?

বাজির খাওয়া হয়। মতি যায়, বাজি জিতে আসে। বরযাত্রীরা সাথে করে নিয়ে যায়। মতি সঙ্গে থাকলে মেয়ের বাড়িতে খাওয়া শর্ট পড়ে। মেয়ের বাপের একটা অপমান হয়। মেয়ের বাপের অপমান সবাই চায়।

কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম — ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, মতির রোজগারও খারাপ না। হায়ার করতে হলে তার রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা। দূরে কোথাও নিতে হলে নৌকায় আনা-নেয়ার খরচ দিতে হয়।

আমি বললাম, এইটাই কি প্রফেশন নাকি? আর কিছু করে না?

জবাব দিল মতি মিয়া। বিনয় বিগলিত গলায় বলল, খাওয়ার কাম ছাড়া কিছু করি না।

কর না কেন?

এক সাথে দুই তিনটা কাম করলে কোনটাই ভাল হয় না। আল্লাহতালা একটা বিদ্যা দিছে। খাওনের বিদ্যা। অন্য কোন বিদ্যা দেয় নাই।

আল্লাহতালার প্রদত্ত বিদ্যার অহংকারে মতি মিয়ার চোখ চিকচিক করতে লাগল। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। পাগলের প্রলাপ না-কি? খোন্দকার সাহেব দরাজ গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলায় মতি মিয়ার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নিজের চোখে দেখেন। শহরের দশজনের কাছে গল্প করতে পারবেন। গ্রাম দেশেও দেখার জিনিস আছে প্রফেসার সাব।

তাতো নিশ্চয়ই আছে। তবে ভাই, আমাকে দেখানোর জন্যে কিছু করতে হবে না। শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম।

না দেখলে কিছু বুঝবেন না। আধমণ রান্না করা গোশ্‌ত যে কতখানি সেটা দেখার পর বুঝবেন মতি মিয়া কোন পদের জিনিস। কি রে মতি, পারবি তো?

মতি হাসি মুখে বলল, আপনাদের দশজনের দোয়া।

খাওয়ার পর দুই সের চমচমও খাবি। বিদেশী মেহমান আছে, দেখিস, বেইজ্জত যেন না হই। গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার।

আলহামদুলিল্লাহ। দরকার হইলে জেবন দিয়া দিমু।

একটা লোক জীবন বাজি রেখে খাবে আর আমি বসে বসে দেখব, এর মধ্যে আনন্দের কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা কুৎসিত। যদিও অনেক কুৎসিত দৃশ্য আমরা আগ্রহ করে দেখি। মেলায় বা সার্কাসে বিকলাঙ্গ বিকট দর্শন শিশুদের অনেকে আগ্রহ করে দেখতে আসে। এখানেও তাই হবে। মতি মিয়াকে ঘিরে ধরবে একদল মানুষ। তার সাথে আমাকেও বসে

AMARBOI.COM

থাকতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্যামেরা নেই। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলতে হত।

গ্রামে বেশ সাড়া পড়ল বলে মনে হল। খোন্দকার সাহেব একটা গরু জবাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। চমচম আনতে লোক চলে গেল। খোন্দকার সাহেব বললেন, মতি আস্ত গরু খেতে পারবি? বিশিষ্ট মেহমান আছে। তাঁর সামনে একটা রেকর্ড হয়। ঢাকায় ফিরে উনি কাগজে লিখে দেবেন।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আস্ত গরু খাবার দরকার নেই। একটা কেলেংকারি হবে।

আরে না, মতিকে আপনি চেনেন না। ও ইচ্ছা করলে হাতী খেয়ে ফেলতে পারে। বিরাট খাদক। অতি ওস্তাদ লোক।

এরকম ওস্তাদ বেশি না থাকাই ভাল। খেয়েই সব শেষ করে দেবে।

আরে না, খাওয়াবে কে বলেন ভাই? খাওয়ানোর লোক আছে? লোক নেই। খাওয়া-খাদ্যও নেই। এই যে গরু জবাই দিলাম তার দাম তিন হাজার টাকা। দেশের অবস্থা খুব খারাপ রে ভাই।

রান্নার আয়োজন চলছে। মতি মিয়া বসে আছে আমার সামনে। হাসি হাসি মুখে। মাঝে মাঝে বিড়ি খাবার জন্যে বারান্দায় উঠে যাচ্ছে আবার এসে বসছে। আমি বললাম, এত যে খান, খাওয়ার টেকনিকটা কি?

মতি মিয়া নড়েচড়ে বসল, উৎসাহের সঙ্গে। বলল — গোশ্‌ত চিপা দিয়া রস ফেলাইয়া দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর পর একটু কাঁচা লবণ মুখে দিতে হয়। পানি খাওয়া নিষেধ।

তাই নাকি?

জ্বি। আর চাবাইতে হয় খুব ভাল কইরা। গোশত যখন মুখের মধ্যে তূলার মত হয় তখন গিলতে হয়।

কায়দা-কানুন তো অনেক আছে দেখি।

বসারও কায়দা আছে। বসতে হয় সিধা হইয়া যেন পেটের উপর চাপ না পড়ে।

এই সব শিখেছেন কোত্থেকে?

নিজে নিজে বাইর করছি জনাব। ওস্তাদ কেউ ছিল না। আমারে তুমি কইরা বলবেন। আমি আপনার গোলাম।

মতি মিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে নানা ধরনের গল্প শুরু করল। সবই খাদ্য বিষয়ক। দু'বছর আগে কোন-এক প্রতিমন্ত্রী নাকি নেত্রকোনা এসেছিলেন। মতি মিয়া তাঁর সামনে আধমণ জিলেপী খেয়ে তাঁকে বিস্মিত করেছে।

খাইতে খুব কষ্ট হইছে জনাব।

কষ্ট কেন?

জিলাপীর ভিতরে থাকে রস। রসটা গণ্ডগোল করে।

মন্ত্রী সাহেব খুশি হয়েছিলেন?

জ্বি খুব খুশি। ছবি তুলেছিলেন। দুইশ' টেকাও দিছেন। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বলছিলেন ঢাকায় নিয়া যাবেন, পেসিডেন সাহেবের সামনে খাওনের ব্যবস্থা করবেন। প্রেসিডেন সাহেবরে খুশি করতে পারলে কপাল ফিরত। কথা ঠিক না?

AMARBOI.COM

খুব ঠিক। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কবি মানুষ। খুশি হলে হয়তো আপনাকে নিয়ে কবিতাও লিখে ফেলতেন। মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, আপনার ছেলেমেয়ে কি? তারাও কি খাদক নাকি?

জ্বি–না। তারা না-খাওন্তির দল। খাইতে পায় না। কাজকাম তো কিছু করি না, খাওয়ামু কি? তারা হইল গিয়ে আফনের দেখক।

সেটা আবার কি?

তারা দেখে। আমি যখন খাই, তখন দেখে। দেখনের মধ্যেও আরাম আছে।

মতি মিয়া বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই প্রথম বারান্দায় না গিয়ে আমার সামনেই বিড়ি ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগল।

খাওয়া শুরু হল রাত দশটার দিকে। একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে উঠোনে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই প্রচণ্ড শীতে কাঁথা গায়ে গ্রাম ভেঙে লোকজন এসেছে। মতি মিয়া খালি গায়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। ধ্যানস্থ মূর্তির মতি মিয়ার ছেলেমেয়েগুলিকেও দেখলাম। পেট বের হওয়া হাড় জিরজিরে কয়েকটি শিশু। চোখ বড় বড় করে বাবার খাবার দেখছে। শিশুগুলি ক্ষুধার্ত। হয়ত রাতেও কোন কিছু খায় নি। মতি একবারও তার বাচ্চাগুলির দিকে তাকাচ্ছে না।

খোন্দকার সাহেব গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজনকে এই উপলক্ষে দাওয়াত করেছেন। স্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার, থানার ও.সি. সাহেব, পোস্টমাস্টার সাহেব। সামাজিক মেলামেশার একটি উপলক্ষ। বিশিষ্ট মেহমানদের জন্যে খাসী জবেহ্ হয়েছে। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলোচনার প্রধান বিষয় ইলেকশন। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খোন্দকার সাহেব ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। এর আগেরবার হেরেছেন। এবার হারতে চান না। জিততে চান এবং দেশের কাজ করতে চান।

অতিথিরা রাত বারটার দিকে বিদেয় হলেন। জাঁকিয়ে শীতে পড়েছে। মতি মিয়াকে ঘিরে যারা বসে আছে তাদেরকে শীতে কাবু করতে পারছে না। খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনের চারপাশে সবাই বসে আছে। শুধু মতি মিয়ার ছেলেমেয়েরা তার বাবার চারপাশে বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার খাওয়া দেখছে। মতি মিয়া ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার গা দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। চোখ দু'টি মনে হচ্ছে একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় পিতলের এই বিশাল হাঁড়ির মাংস শেষ করবার আগেই লোকটা মারা যাবে। আমি হব মৃত্যুর উপলক্ষ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটাই কুৎসিত। একদল ক্ষুধার্ত মানুষ একজনকে ঘিরে বসে আছে। সে খেয়েই যাচ্ছে।

খোন্দকার সাহেব এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, কেমন দেখছেন?

ভালই।

বলছিলাম না বিরাট খাদক।

তাই তো দেখছি।

শুয়ে পড়েন। শেষ হতে দেরি হবে। সকাল দশটার আগে শেষ হবে না। এখন খাওয়া স্লো হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

AMARBOI.COM

হ্মি। শেষের দিকে এক টুকরা গোশত গিলতে দশ মিনিট সময় নেয়।

আমি মতির দিকে তাকিয়ে বললাম, কি মতি খারাপ লাগছে?

জ্বে না।

খারাপ লাগলে বাদ দাও। বাকিটা তোমার বাচ্চারা খেয়ে নেবে।

খোন্দকার সাহেব বললেন, অসম্ভব — একটা রেকর্ড করছে দেখছেন না? তুমি চালিয়ে যাও মতি। ভাই, আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলাম মতি মিয়ার চরিত্রে কিছু মানবিক গুণ ঢুকিয়ে দিতে। নানাভাবেই তা সম্ভব। রাত একটার দিকে যদি মতি মিয়া ঘোষণা করে — বাকি গোশ্‌ত আমি আর খাব না। হার মানলাম। এখানে যারা আছে তারা খাক। তাহলেই হয়।

কিংবা দৃশ্যটা আরো হৃদয়স্পর্শী হয় যদি শেষ দৃশ্যটি এরকম হয় — মতি মিয়ার বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, একজন শুধু জেগে আছে। মতি মিয়া গোশতের শেষ টুকরাটি মুখে তুলে দিয়ে থমকে যাবে। মুখে না দিয়ে এগিয়ে দেবে শিশুটির দিকে। সবাই তখন চেঁচিয়ে উঠবে — কর কি কর কি? বাজিতে হেরে যাচ্ছ তো। এটাও খাও।

মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলবে — হারলে হারব।

আমি জানি বাস্তবে তা হবে না। সকাল দশটা হোক, এগারোটা হোক, মতি মিয়া খাওয়া শেষ করবে। কোন দিকে ফিরেও তাকাবে না। এত কিছু দেখলে খাদক হওয়া যায় না।

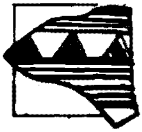

AMARBOI.COM

ফেরা

খেতে বসে জরীর রাগ হয়ে গেল। ভাতের থালা সরিয়ে তেজি গলায় বলল, মা আমি ভাত খাব না।

দীপু বসেছিল জরীর পাশে। বড় আপা যা করে তারও তাই করা চাই। সেও হাত গুটিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, মা আমিও ভাত খাব না।

হাসিনা কিছু বলল না। জরীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। জরী মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আগের মত তেজি গলায় বলল, রোজ রোজ এক জিনিস। ঘেন্না লাগে মা।

বড় আপার দেখাদেখি দীপু বলল, আমারও ঘেন্না লাগে। রোজ রোজ এক জিনিস।

হাসিনার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল। দীপুর আব্বা কত রাতে ফিরে তার ঠিক নেই। হাসিনা খানিক ইতস্তত করে নিজের জন্যে ভাত বাড়ল। দীপুর মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বলল, ভাত খেয়ে ফেল, লক্ষ্মী সোনা।

বড় আপা খাবে না?

না। সে রাজকন্যা কি-না পোলাও-কোর্মা ছাড়া খেতে পারে না।

আমিও পোলাও-কোর্মা খাব মা।

আচ্ছা খেয়ো।

দীপু আড়চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে ভাত মাখতে শুরু করল। জরী বলল, ডিম ভেজে দিলে খাবো।

ডিম নেই।

তাহলে কিন্তু আমি খাবো না।

হাসিনা কিছু বলল না। জরী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফের বলল, আমি কিন্তু মা কাল সকালেও কিছু খাব না।

আচ্ছা, না খেলে কি করব আমি?

আমি তাহলে ঘুমুতে যাচ্ছি।

জরী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। হাসিনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। তাঁর এই মেয়েটি বড্ড অভিমানী হয়েছে। খাওয়া নিয়ে কেউ এরকম করে? অন্য ছেলেমেয়েগুলি খুব লক্ষ্মী। কোন কিছু নিয়েই কোন আব্দার নেই। গত ঈদে দীপুকে কোন কাপড় দিতে পারেনি। দীপুর আব্বা শুধু একজোড়া লাল মোজা দিয়েছিল ছেলেকে। তাই নিয়ে কি খুশী ছেলের। আর জরী গাল ফুলিয়ে বলেছে,

বাবা তোমাকে সিল্কের কাপড় আনতে বলেছি, তুমি এটা কি এনেছ? না, এ জামা আমি পরবো না।

সে কি কান্না মেয়ের! দীপুর আব্বা ভীষণ মন খারাপ করেছিল সেবার। হাসিনাকে বলেছিল, মরে যেতে ইচ্ছে করে গো। ছেলেমেয়েগুলির সামান্য শখও মেটাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ।

হাসিনা ভেবে পায় না জরী এমন অবুঝ হল কি করে? বাবার রোজগারটাও তার চোখে পড়ে না? বছর না ঘুরতে মেট্রিক দিবে যে মেয়ে।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। দীপু বলল, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে ভাত খেয়েছ মা?

হ্যাঁ।

কি জন্যে খেয়েছ?

তোমরা যে লক্ষ্মী সোনা — এই জন্যে।

ও বুঝেছি।

দীপুটা এমন করে কথা বলে। বড়ো মায়া লাগে হাসিনার।

খাওয়া হয়ে যেতেই হাসিনা অসুস্থ পরীর জন্য দুধ গরম করতে বসল। পরী খুব অসুখে ভোগে। কিছুদিন আগেই মাত্র হাম থেকে উঠল। এখন আবার জ্বর। বড় একজন ডাক্তারকে না দেখালেই নয়। দীপুর বাবাকে না জানিয়ে বড়দা'র কাছে চিঠি লিখলে কেমন হয়? এই ভাবতে ভাবতে হাসিনা পরীর কাছে গেল। পরী মা'কে দেখেই বলল, একটু ভাত খাব মা। কাঁচা মরিচ দিয়ে ঝাল করে।

কাল খেয়ো মানিক।

না মা, আজ খাব। অল্প, মাত্র তিন লোকমা।

AMARBOI.COM

দীপু বলল, মা, পরী আপার জন্যে আমি ভাত বেড়ে আনব?

না, তুমি ঘুমাও।

পরীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে দুধ খাওয়াতে হল। হাসিনার ঘুম পাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলটায় খুব সকাল সকাল রাত বাড়ে। ন'টাও বাজেনি, এর মধ্যে কেমন নীরব হয়ে গেছে চারদিক। কুলী পট্টির দিকে মাঝে মাঝে হল্লার শব্দ উঠছে — এ ছাড়া চারদিক ভীষণ নীরব।

রাত আরো বাড়তেই গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকতে লাগল। বিজলী চমকাতে লাগল ঘন ঘন। আজ সারাদিন খুব গুমোট গিয়েছে। ঝড়টড় হবে কিনা কে জানে। ঝিঁঝি ডাকছে। মেঘের ডাক আর ঝিঁঝির শব্দ এই দুই মিলিয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে। হাসিনা জেগে জেগে ঝিঁঝির ডাক শুনতে লাগল।

দীপুর বাবা এল ঠিক ঝড় আসার আগে আগে। আরেকটু দেরি হলে ভিজে চুপসে যেত। সে এসে ঘরে ঢুকছে ওম্নি ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি। দমকা বাতাস। হাসিনা বলল, আর কিছুক্ষণ পরে এলেই গোসল সেরে আসতে পারতে।

গোসল এখন সারব, তুমি ভাত চড়াও দেখি।

হাসিনা অবাক হয়ে বলল, ভাত চড়াব কি? ভাত তো রাঁধাই আছে।

সে তো শুধু আমার জন্যে। সবাই মিলে আজ আবার খাব। দেখ কি এনেছি।

হাসিনা দেখল বড়সড় একটি রুই মাছ দড়ি দিয়ে কানকোর সঙ্গে বাঁধা। হাসিনা বলল, ওমা হঠাৎ এত বড় মাছ। কি ব্যাপার?

আছে একটা ব্যাপার।

দীপুর বাবা রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল।

আজ থেকে আমার চল্লিশ টাকা বেতন বেড়েছে। তোল তোল সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোল। ওরে ও জরী, ওঠ তো মা।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সব ক'টি ছেলেমেয়ে উঠোনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। অসুস্থ শরীরে পরীও উঠে এসে তার বাবার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে। দীপু বসেছে তার বাবার কোলে। পরী বলল, আমিও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ভাত খাব বাবা।

আচ্ছা খাবি।

দীপু বলল, আমরা আজ দু'বার করে খাব তাই না বাবা?

হ্যাঁ।

দু'বার করে কেন খাব বাবা?

বড় মাছ এনেছি তো সেই জন্যে।

ও বুঝেছি।

জরী মাছ ভেজে ভেজে থালায় রাখছিল। আনন্দে তার চোখ ঝলমল করছে। সে বলল, রোজ এরকম বড় মাছ হলে বেশ হয়। তাই না বাবা?

হুঁ। আমার জরী মা তাহলে খুব খুশী হয়।

পরী বলল, রঞ্জু মামা গত বছর এরচে' বড় একটা মাছ এনেছিল না মা? সেটা আরো কত বড়।

AMARBOI.COM

তোর বাবা একবার একটা চিতল মাছ এনেছিল। মাপ দিয়ে দেখেছি আমার চেয়েও লম্বা।

দীপু চোখ কপালে তুলে বলল, তুমি ভয় পেয়েছিলে, তাই না মা?

হেসে উঠল সবাই। ভাত তখনো হয়নি। কাজেই অনেকক্ষণ ধরে মাছ মারার গল্প হতে থাকল। দীপুর বাবা এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে বড় মাছের কি নাম দীপু?

চিতল মাছ বাবা।

জরী বলল, দূর বোকা, তিমি মাছ।

রাত বাড়তেই থাকল। খাওয়া-দাওয়া অনেক আগেই সারা হয়েছে। তবু ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে বসে রয়েছে। সামান্য সব কথায় হা হা করে হেসে উঠছে।

বাসন-কোসন কলতলায় রাখতে গিয়ে হাসিনা অবাক হয়ে দেখে মেঘ কেটে অপরূপ জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টি-ভেজা গাছপালায় ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। অকারণেই তার চোখে জল এসে যায়।

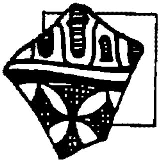

তুচ্ছ

AMARBOI.COM

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটি। এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে পরিচিত কারো সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়। একজনের সঙ্গে অন্যজনের একটা স্বাভাবিক আড়াল তৈরী হয়। কেউ কেউ তা বুঝতে পারেন না। ভদ্রতা দেখাবার জন্যে এগিয়ে এসে বলেন স্লামালিকুম, ভাল আছেন?

এইসব ক্ষেত্রে আমি প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে না তাকিয়েই অল্প একটু হেসে বলি, ভাল। এই বলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। এতে প্রশ্নকর্তা একটা সমস্যায় পড়ে যান। আমাকে কি বলবেন ভেবে পান না। গায়ে পড়ে কথাবার্তা শুরু করার যন্ত্রণা আমি তাঁকে পেতে দেই। পরিষ্কার বুঝতে পারি ভদ্রলোক মনে মনে বলছেন, কী যন্ত্রণা! কেন যে কথা বলতে গেলাম।

সব সময় এই অবস্থা হয় তা নয়। কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা কথা বলতে খুব পছন্দ করেন। 'দেশের কি হচ্ছে বলুন দেখি ভাই?' এই বলে নিজেই দেশের কি হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে থাকেন। এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজ কোন উপায় নেই।

বদরুল আলম সাহেব এই রকম একজন মানুষ। সরকারী কর্মচারী। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। হঠাৎ এসে পড়া অবসর নিয়ে কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। দু'টি কাজ খুব মন দিয়ে করছেন — শরীরচর্চা এবং দেশচর্চা। সকাল-বিকাল দু'বেলা জগিং করেন। জগিংয়ের জন্য একটা পোশাকও তৈরী করেছেন — সাদা হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট এবং ক্রিকেটের আম্পায়ারদের মত সাদা টুপী। দেশচর্চার মধ্যে আছে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা।

দেখা হলেই বলবেন — প্রফেসর সাহেব, কিছু-একটা তো করতে হয়, কি বলেন? ভেজিটেবলের মত বেঁচে থাকার তো কোন মানে হয় না। কি বলেন?

'তা তো ঠিকই।'

'প্রতিদিন পৃথিবীতে কতজন শিশু মারা যায় জানেন?'

'জ্বি না।'

'চল্লিশ হাজার। বাংলাদেশে প্রতিদিন কতজন মারা যায় আন্দাজ করুন তো দেখি?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'ইউনিসেফের একটা রিপোর্ট আছে আমার কাছে। আপনাকে পড়তে দেব। পড়লে মাথা ঘুরে যাবে। ভয়াবহ অবস্থা। আমাদের কিছু-একটা করা দরকার। কি বলেন?'

'তা তো বটেই।'

'এই যে ছোট ছোট শিশু রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করছে, এদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। হবে না?'

'তা তো হবেই।'

'আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, প্রতিদিন পঞ্চাশটা করে হাতে-গড়া রুটি তৈরী করে দেবে। আমি ডিসট্রিবিউট করব। সে রাজি হয়েছে। আপনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। একার পক্ষে তো সম্ভব না। কি বলেন?'

'তা তো বটেই।'

যত গর্জে তত বর্ষে না — এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। বদরুল আলম সাহেবের বেলায় নিয়মের একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। তিনি সত্যি-সত্যি রুটি বিতরণ সমিতি সংক্ষেপে 'রুবিস' স্থাপন করে বসলেন। সমিতির তিন চারটা সভাও হয়ে গেল। আমি ঐ সমিতির একজিকিউটিভ কমিটির একজন সদস্য। পাড়ায় থাকতে গেলে কত রকম যন্ত্রণা যে সহ্য করতে হয়। এই জাতীয় সমিতিগুলির আয়ু লিটন ম্যাগাজিনের আয়ুর চেয়েও কম হয় — এটাই হচ্ছে ভরসার কথা। দু'একদিন রুটি বিলিয়েই সবার উৎসাহ মরে যাবে এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া যায়।

আমাদের সমিতির সভায় ঠিক হল 'রুবিসে'র কার্যকলাপ বর্ষা মৌসুমে শুরু হবে। সেই সময়েই খাবার-দাবারের আকালটা একটু বেশী দেখা যায়। বর্ষার আগ পর্যন্ত সমিতির সদস্যরা রুটি বিতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন এবং চিন্তা-ভাবনা করবেন।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বর্ষা আসতে দেরী আছে। 'রুবিস' ততদিন টিকবে না। বর্ষা বাদলায় রুটি নিয়ে বের হবার উৎসাহ কারো থাকার কথা না। তবে বদরুল আলম সাহেব যে রকম উৎসাহী ব্যক্তি — কিছুই বলা যায় না।

বৈশাখ মাসের কথা। বিকালের দিকে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে। নির্ঘাৎ একটা কালবৈশাখী হবে। দ্রুত পা চালিয়ে বাসায় ফিরছি — দোয়েল চত্বরের কাছে এসে বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে দেখা। মাথা নীচু করে চলে যাব ভাবছি, সম্ভব হল না। বদরুল আলম সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, ভাই একটু এদিকে আসুন তো। বিরাট বিপদে পড়েছি।

গিয়ে দেখি সত্যি বিরাট বিপদ। চারজন শিশুর একটা দলের মধ্যে তিনি নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দলটির সঙ্গে বিছানা, একটা পাটি এবং হাড়ি-কুড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা

গ্রাম ত্যাগ করে সদ্য শহরে এসে পৌঁছেছে। চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ানক হকচকিয়ে গেছে। সবচেয়ে ছোটটি তিন-চার বছরের মেয়ে। সে ক্রমাগত ফ্রকের হাতায় চোখ মুছছে। সবচেয়ে বড়টিও মেয়ে। বার-তের বছর হবে। এও কাঁদছে। মাঝের দু'টি ছেলে, এরা কাঁদছে না। আমি হাসিমুখে বললাম, আলম সাহেব, আপনি মনে হচ্ছে আপনার রুটি বিতরণের সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন।

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, আরে ভাই, হাসবেন না। বিরাট ঝামেলা। আপনি এসেছেন ভাল হয়েছে। এদের সমস্যাটা একটু মন দিয়ে শুনুন। কোন স্যলিউশন বের করা যায় কি-না দেখুন। আমি একটা সেকেন্ডও থাকতে পারছি না। জরুরী একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট। অলরেডি আধা ঘন্টা লেট। আকাশের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কালবৈশাখী শুরু হয়ে যাবে।

তিনি আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ দিলেন না। অতি দ্রুত রাস্তার ও-পাশে তাঁর মরিস মাইনরের দিকে ছুটে গেলেন।

বাচ্চাগুলির সমস্যা তেমন বিচিত্র কিছু না। বরং বলা চলে খুবই সাধারণ সমস্যা। এদের বাড়ি ময়মনসিংহের ত্রিশালে। মা নেই। বাবার সঙ্গে থাকতো। সেই বাবা একদিন কাউকে না বলে উধাও। কোন খোঁজ নেই। বাচ্চাগুলি বুদ্ধি করে চলে গেল নবীনগর। তাদের মামার বাড়ি। সেই মামা বর্তমানে তাদের ঢাকায় নিয়ে এসেছে। মামা নাকি খোঁজ পেয়েছে এদের বাবা থাকে ঢাকা শহরে। পাকা সংবাদ। মামা বড় মেয়েটির হাতে একটা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলেছে অপেক্ষা করতে। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। এরা অপেক্ষা করছে কিন্তু মামার খোঁজ নেই। আমি বললাম, মামা কখন গেছে?

বড় মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, সকালে। মেয়েটি মন খারাপ করিয়ে দেবার মত সুন্দর। ছোট বাচ্চাটিও পুতুলের মত। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। এরা দেখতে কদাকার হলে কোন কথাবার্তা না বলে চলে যাওয়া যেত। এখন যাওয়া যাচ্ছে না।

'বাবা কি করত?'

'গাতক।'

'সেটা আবার কি?'

'গান গায়। সারি গান, মুর্শিদী গান।'

আরেক সমস্যা। সংগীতজ্ঞের পরিবার। এদের বাবা যদি কামলা-টামলা জাতীয় কিছু হত তাহলে মনের উপর চাপ পড়ত না। বাচ্চাগুলি এখনো বুঝতে পারছে না — মামা নামক মানুষটি এদের ফেলে পালিয়েছে। এখনো আশা করে আছে। আমি বললাম, তোমরা খেয়েছ কিছু? বড় মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানাল, তিন টাকার বাদাম কিনে সবাই মিলে খেয়েছে। হাতে এখনো সাত টাকা আছে। আমি পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে বললাম, নাও রাখ।

বড় মেয়েটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ভিক্ষা নিয়ে তার হয়ত অভ্যাস নেই। বিপদের উপর বিপদ। ছেলে দু'টিও কাঁদতে শুরু করেছে। বড় মেয়েটি একজনকে কোলে তুলে নিয়েছে। অন্য ছেলেটি বোনের ফ্রক ধরে আছে। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি শুকনো গলায় কিছু কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করলাম, যেমন — নাম কি? স্কুলে পড়ে কি-না।

AMARBOI.COM

তারাও কি বাবার মত গান জানে কি-না — এইসব। কোন আলাপই বেশী দূর আগায় না। এরা হা করে চেয়ে থাকে এবং ক্রমাগতই চোখ মুছে। ছোট বাচ্চাটি কেঁদেই অস্থির।

একবার ইচ্ছা হল মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করি। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলাম। বাড়তি আদর দেখানো মানে নিজের ঘাড়ে ঝামেলা টেনে আনা। আকাশের অবস্থাও দ্রুত খারাপ হচ্ছে। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে দৌড়ে আশ্রয় নেবারও জায়গা নেই। একি মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল।

আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করতে লাগলাম — যদি কোন ভদ্রলোক এই রাস্তায় আসে তাঁকে বলব, আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। আমি থাকতে পারছি না। একজন ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট . . .।

সত্যি সত্যি একজনকে আসতে দেখা গেল। মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। ঝড় আসছে দেখে ছুটে যাচ্ছেন। আমাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কি হয়েছে?

আমি করুণ গলায় বললাম, ওদের একটা সমস্যা হয়েছে। একটু কাইণ্ডলি শুনুন। অ্যাই, তোমরা উনাকে বল তো ব্যাপারটা কি?

আমি আর দাঁড়ালাম না। লম্বা পা ফেলতে শুরু করলাম। বড় মেয়েটি খুবই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এতে অবাক হবার কি আছে কে জানে? মানুষের কাজ থাকবে না?

বদরুল আলম সাহেবের সঙ্গে পরদিন দেখা। বাজার করে ফিরছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, কি ভাল?

আমিও হাসিমুখে বললাম, জ্বি ভাল।

'ইলিশ মাছ আজ খুব সস্তা যাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকায় যে জিনিস এনেছি অন্যদিন তার দাম পড়ত একশ'। এই দেখেন সাইজ।'

তিনি ইলিশ মাছ বের করে দেখালেন। বিশাল সাইজ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বদরুল আলম সাহেব বললেন, 'রুবিসে'র কাজকর্ম তো শুরু করা উচিত। বর্ষা তো এসে গেল, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই। এবার বর্ষা আগে ভাগে নামবে।'

'এ বছরেও ফ্লাড হলে তো সর্বনাশ। ফ্লাডের ব্যাপারটাও কনসিডারেশনে রাখতে হবে।'

আর কোন কথা হল না। তিনি ঐ বাচ্চাগুলির কথা কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না । আমিও কিছু বললাম না। যেন ঐ জাতীয় কোন ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেনি। আর ঘটলেও সেটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

তুচ্ছ কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় আমাদের?

AMARBOI.COM

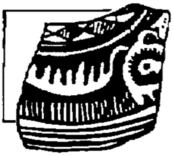

দ্বিতীয় জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবশ্যি বলা যায় — জাভেদকে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হয়নি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনো প্রিয়াংকার 'তুমি' বলা রপ্ত হয়নি। মুখ ফসকে 'আপনি' বলে ফেলে। এরকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে 'তুমি' বলাও অবশ্যি খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে 'আপনি' 'তুমি' কোনটাই না বলে চালাতে ; যেমন —'তুমি চা খাবে? না বলে সে বলে — চা দেব? এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালান যায় না, তার চেয়েও বড় কথা — মানুষটা খুব বুদ্ধিমান। ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো। তাও পুরোপুরি সতেরো হয়নি। জুন মাসে হবে। এখনো দু'মাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরো বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া দেখালে ভাল লাগে না। তাছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভাল। ভাল এবং বুদ্ধিমান। কম বয়েসী বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক বর ভাল।

বিয়ের রাতে নানা কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতংকে অস্থির হয়েছিল। ধ্বকধ্বক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমত ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভারী গলায় বলল, ভয় করছে? ভয়ের কি আছে বল তো?

প্রিয়াংকার বুকের ধ্বকধ্বকানি আরো বেড়ে গেল। সে 'হাঁ' 'না' কিছুই বলল না। একবার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়। বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তাঁর গলার স্বরে কিছু- একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা ভাল, বেশ ভাল। এরকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়।

AMARBOI.COM

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এই কারণেই তাঁকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার। নয়ত সে পাগল হয়ে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধ হয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ংকর চমকে উঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কপাট নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অস্থির হয়ে গোঙানির মত শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিস আশেআশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হত। প্রিয়াংকার ছোট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, তোর কি হয়েছে রে? প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, কিছু হয়নি তো। তুমি কেমন আছ মামা?

'আমার কথা বাদ দে। তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কি ব্যাপার?'

'কোন ব্যাপার না মামা।'

'গালটাল ভেঙে কি অবস্থা। তুই কথাও তো কেমন অন্য রকমভাবে বলছিস।'

'কি রকম ভাবে বলছি?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে তার সত্যি সত্যি কাশি হয়েছে; অন্য কিছু না। মামা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন,

'আর কিছু না তো?'

'না।'

'ঠিক করে বল।'

'ঠিক করেই বলছি।'

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। চায়ের কাপে দু'টা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাইরে মা।' বলেই কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মামী এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামী প্রিয়াংকাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, এক সপ্তাহ আগে তোকে কি দেখেছি আর এখন কি দেখছি? কি ব্যাপার তুই খোলাখুলি বল তো? কি সমস্যা?

প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল, কোন সমস্যা না। মামী কঠিন গলায় বললেন,

তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন?

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামী। আমি বলছি।'

'বল। কিছু লুকুবি না।'

AMARBOI.COM

প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমি ভয় পাই, মামী।

'কিসের ভয়?'

'কি যেন দেখি।'

'কি দেখিস?'

'নিজেও ঠিক জানি না কি দেখি।'

'ভাসা ভাসা কথা বলবি না। পরিস্কার করে বল কি দেখিস।'

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, মামী আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি কি সব যেন দেখি।

সে কি দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কি দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

'তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?'

'কি যে তুমি বল মামী, আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

'রাতে কি তোরা এক সঙ্গে ঘুমাস?'

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনী হয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ।

'সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?'

'কি সব প্রশ্ন তুমি কর মামী?'

'আমি যা বলছি তার জবাব দে।'

'না, জাগিয়ে রাখে না।'

মামী অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিয়া। তার বয়স নয়-দশ। এদের দু'জনের কাছ থেকেও খবর বার করার চেষ্টা করা হল।

'আচ্ছা মরিয়ম তুমি কি ভয়-টয় পাও ?'

'না। ভয় পামু ক্যা?'

'রাতে কিছু দেখ-টেখ না?'

'কি দেখমু?'

'আচ্ছা ঠিক আছে — যাও।'

প্রিয়াংকার মামী কোন রহস্য ভেদ করতে পারলেন মা। তার খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মামী তুমি যদি তাকে কিছু বল তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহ্‌র কসম বিষ খাব। নয়ত ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ, প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়" — এই কথা লিখে একবার সে এক বোতল ডেটল

AMARBOI.COM

খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাটান উচিত নয়।

জাভেদ এল রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প করে প্রিয়াংকার স্বামী ফিরে গেলেন। তাঁর মনের মেঘ কাটল না। হল কি প্রিয়াংকার? সে কি দেখে?

প্রিয়াংকা নিজেও জানে না তার কি হয়েছে। স্বামী চলে যাবার পর তার বুক ধ্বক- ধ্বক করা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পর পর মনে হচ্ছে বোধহয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়া-দাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজো তাই হল। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথমবার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভাল হত। তার মত ভীতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার জন্যে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘুমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা আরাম করে ঘুমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে উঠানামা করা ঠিক হচ্ছে না-হয়ত পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি। প্রিয়াংকা ঘুমায় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সারারাতই জ্বলে। ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরী ঘর। এই ঘরেই জাভেদ পরীক্ষার খাতা দেখে, পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুক শেলফে কিছু বই, পুরানো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে তবুও ঘরটা অন্ধকার — স্যাণ্ডেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাতড়াতে হল। স্যাণ্ডেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হল।

AMARBOI.COM

ভারী অথচ মৃদু গলায় কেউ-একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল। তবু প্রিয়াংকা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না — আর কোন শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তাহলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অবিকল নিঃশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জমে পাথর হয়ে গেল। ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, কিছু বলবে?

কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেণ্ডের একশ' ভাগের এক ভাগ না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে — ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে — সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে। চারদিকের বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, কি?

প্রিয়াংকা বলল, কিছু না। জাভেদ ঘুম জড়ান স্বরে বলল, ঘুমাও। জেগে আছ কেন? বলতে বলতেই ঘুমে জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাট শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয় সে রকম শব্দ, গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ-একজন বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এই সব কি কল্পনা? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না।

AMARBOI.COM

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন'টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। জাভেদ চলে গেছে কলেজে। মরিয়ম, জীতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মত উড়ে গেল। রাতে সে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এরচেয়েও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল — সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কি ভয়ংকর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, মরিয়ম।

'জ্বে আম্মা।'

'ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম?'

'জীতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।'

'চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।'

'জিনিসের উপর কোন মায়া নাই . . . মহব্বত নাই . . . '

'ঠিক আছে, তুমি চুপ কর। তোমার স্যার কি চলে গেছেন?'

'জ্বে।'

'বাজার করে দিয়ে গেছেন?'

'জ্বে।'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?'

'দুপুরে খাইতে আসবেন।'

'আচ্ছা যাও। তুমি আমার জন্যে খুব ভাল করে এক কাপ চা বানিয়ে আন।'

'নাশতা খাইবেন না আম্মা?'

'না। তোমার স্যার নাশতা করেছে?'

'জ্বে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দু'জন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসারে কাজ-কর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালমতই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোন কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে — গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংকার ভাল লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভাল লাগে না। কারণ প্রিয়াংকা জানে পড়ে লাভ হবে না। সে পাস করতে পারবে না। কোন-একটা কলেজেই তাকে বি.এ. পড়তে হবে। কে জানে হয়ত জাভেদের কলেজেই। যদি তাই হয় তাহলে জাভেদ কি তাকে পড়াবে? ক্লাসে তাকে কি ডাকবে — স্যার?'

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মরিয়ম?'

'স্যার দিয়া গেছে।'

চিঠি না — চিরকুট। জাভেদ লিখেছে — প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হল। তৈরি হয়ে থেকো। আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল। মানুষটা ভাল। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কত রকম অন্যায় দাবী থাকে — তাঁর তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি মীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী যার উপর ভরসা করা যায়।

যে যাই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আট মাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়েনি। দু'বছর অপেক্ষা করেছে। মামা-মামী যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোন ক্ষোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ। তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করেছেন। মামী নিজের গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক'জন মানুষ এরকম করে? আট ন'টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারশ' টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব সৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিং টেবিল ভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয়নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধান ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

AMARBOI.COM

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল — যেমন হাসি মুখে বলল, ভাবীকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা। বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেননি তো?

দু'সপ্তাহও হয়নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কি এরকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, ভাবীকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না? দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন। নয়ত শরীর খারাপ করবে — হা-হা-হা।

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হল। সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয়। বারান্দায় যেতে ভয়। হাতমুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে— বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনা-আপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল — মরিয়ম, ও মরিয়ম। মরিয়ম।

রাতে আবার ঐ দিনের মত হল। জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনছে স্যাণ্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াংকা নিজেকে বুঝাল — ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাঁটছে। ছোট ছোট পা ফেলছে। মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে? নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যাণ্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জাভেদ যখন স্যাণ্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে? কি হবে উঁকি দিলে? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে। রাত একটা বাজে — এমন কিছু রাত হয়নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকান-পাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামল। তার হাত-পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ান মানুষটা বলল, প্রিয়াংকা এক গ্লাস পানি দাও তো।

বিছানায় যে মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ। তার পরনে জাভেদের মতই লুঙ্গি, হাতকাটা গেঞ্জী। মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এল। কোনমতে বিছানায় উঠল — ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে। গায়ে চাদর টানা — এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি। যা শুনেছি তাও ভুল। কিছু-একটা আমার হয়েছে। ভয়ংকর কোন অসুখ। সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না। আল্লাহ, তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। সব মানুষ জেগে উঠুক। সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক। সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জাভেদ ঘুমঘুম গলায় বলল, কি হয়েছে?

সকাল বেলা সত্যি সত্যি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এ রকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল। জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটায় সাহায্য করতে গেল। মরিয়ম বলল,

'আফার শইল কি খারাপ?'

'না।'

'আফনের কিছু করণ লাগত না আফা। আফনে গিয়া হুইয়া থাকেন।'

'এইমাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম এখন আবার কি শুয়ে থাকব?'

'চা বানায়া দেই?'

'দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মত চা খেত?'

'হ। তয় আফনের মত চুপচাপ থাকত না। সারাদিন হৈচৈ করত। গান-বাজনা করত।'

'মারা গেলেন কিভাবে?'

'হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টা-পাল্টা কথা কওয়া শুরু করল — কি জানি দেখে।'

প্রিয়াংকা শংকিত গলায় বলল, কি দেখে?

'দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোনটা আসল কোনটা নকল বুঝতে পারে না।'

'তুমি কি বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'পাগল মাইনষের কথার কি ঠিক আছে আফা? নেন চা নেন।'

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কারণ তার কিছুই হয়নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেরেও যায়। তারটাও সারবে।

AMARBOI.COM

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল — ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল — এই — এই।

ঘুম ভেঙে জাভেদ বলল, কি?

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, না কিছু না। তুমি ঘুমাও।

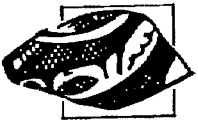

সাদা গাড়ী

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরেফিরে দেখা হয়। হয়ত খুব জমিয়ে গল্প করছি — কাজের ছেলেটি এসে বলল, 'কে জানি আইছে, আপনারে বুলায়।' বাইরে উঁকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে এক সময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, আরে আরে কি খবর? তারপর কেমন চলছে? এক সময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই-তোকারি করতাম। এখন দূরত্ব রাখার জন্যে ভাববাচ্যে কথা বলতে হয়। বাংলা ভাষার ভাববাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আড্ডা জমে উঠেছে। বাংলা বানান নিয়ে খুব তর্ক বেঁধে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বলল আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাব্বির। আমি হাসিমুখেই বললাম, বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

আসুন ভেতরে।

না, না ঠিক আছে।

আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে। গল্প-গুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।

অন্য আরেকদিন আসব।

আজ অসুবিধা কিসের? আসুন ভেতরে।

সাব্বির চোখ-মুখ লাল করে ভেতরে ঢুকল। পুরুষ মানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখিনি। নাকের পাতায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, 'ধুলি বানান কর দেখি? হ্রস্বউকার না দীর্ঘউকার?' রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে থুথু পড়ছে। বিশ্রী অবস্থা।

সাব্বির নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং মৃদুস্বরে বলল, 'আজ যাই, অন্য আরেক দিন আসব?'

বসুন না। তাশ হবে। তাশ খেলতে পারেন তো?

জ্বি-না। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে।

আমি সাব্বিরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। সেখানে সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মুশকো জোয়ান এক ড্রাইভার সাব্বিরকে দেখে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে বের হল এবং দ্রুত দরজা খুলে মূর্তির মত হয়ে গেল। আমাদের বয়সী একটা ছেলের জন্যে এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি তীব্র একটা ঈর্ষা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে

WWW.AMARBOI.COM

সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মত জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে বুকে খচখচ করতে লাগল।

সাব্বিরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এ রকম — পুরানা পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিনতে। পয়সা দিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম ঘটাঘট শব্দে সব দোকানের ঝাপ পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কি হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকওয়ালাদের সঙ্গে বাসওয়ালাদের কি নাকি একটা ঝামেলা। একদল লোক নাকি রাম দা নিয়ে বের হয়েছে। ব্যাপারটা গুজব হবারই কথা। এ যুগে রাম দা নিয়ে কেউ বের হয় না। তবে সাবধানের মার নেই। দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে দেখি গলির মাথায় একটা পাঞ্জাবী গায়ে দারুণ ফর্সা ছেলে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি গিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বিড়বিড় করে বলল, 'চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়োপিয়া চোখের পাওয়ার সিক্স ডাইওপটার।' চশমার একটা কাঁচ খুলে পড়ে গিয়েছিল। এক কাচের চশমা পরে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে বাড়ী না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখল। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব।

কোন পুরুষ মানুষের এমন মেয়েদের মত চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মত ছোট্ট চিবুক। আমি বললাম, আপনি কি করেন?

ইংরেজীতে এম.এ. পরীক্ষা দেব।

তাই নাকি? ভাল।

গত বৎসর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। দেইনি। আমার হার্টের অসুখ, হার্টবিটের রিদমে গণ্ডগোল আছে।

চিকিৎসা করছেন তো?

এর কোন চিকিৎসা নেই।

এই বলেই সে ফ্যাকাশে ভাবে হাসতে লাগল। আমি সিগারেট বের করলাম, নেন, সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হার্টের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবারগুলি শক্ত করে দেয়।

এতসব জানলেন কিভাবে?

আমার মা ডাক্তার।

নিউ ইস্কাটনের যে বাড়ির সামনে রিকশা থামল সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা একটা হুলস্থুল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছোটাছুটি পড়ে গেল। সাব্বিরের মত দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে? আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলে না?

সাব্বির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ভদ্রমহিলা অভিমানী স্বরে বললেন, কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও?

আর যাব না মা।

AMARBOI.COM

তোমার দুর্বল হার্ট। যে কোন সময় কিছু-একটা যদি হয়ে যেত। তখন?

মা আর যাব না।

এ ছেলেটাই সাব্বির।

রাত ৮ টার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেরুতে পারলাম না। সাব্বিরের বাবা এবং মা এমন একটা ভাব করতে লাগলেন যেন আমি সাব্বিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এ রকম বড় একটা কাজের যোগ্য পুরস্কার দিতে না পেরে তারা দু'জনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসবার জন্যে একজন লোক চলল আমার সঙ্গে। ছোট গলিতে বড় গাড়ী ঢুকবে না — এইজন্য টেলিফোন করে একটা ছোট গাড়ী আনানো হল।

সাব্বির মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এলো গেট পর্যন্ত। নীচু স্বরে বলল, বাবা-মা আমার জন্যে খুব ব্যস্ত। একটামাত্র ছেলে তো।

আপনি একাই নাকি?

জ্বি। পাঁচ ভাইবোন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।

বাকিরা কোথায়?

সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশি দিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন। তাঁরও চার ছেলেমেয়ে ছিল। সবাই ত্রিশ হবার আগেই মারা গেছে।

বলেন কি?

জ্বি। আমিও বাঁচব না।

আরে, এসব কি বলছেন?

জ্বি, সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হার্টের অসুখ হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

আমার বন্ধু-বান্ধবরা সব আমার মত। পাস করবার পর সবাই কিছু-একটাতে ঢুকে পড়েছি। ব্যাংক, ট্রাভেল এজেন্সি, নাইট কলেজের পার্ট টাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু না পেয়ে ল'তে ভর্তি হয়েছে। ছুটি-ছাটার দিনে তাশ-টাশ খেলি। মাঝে-মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভিসিআর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আড্ডাটা শেষ হয় একটা ঝগড়ার মধ্যে। কোন কোন সময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। আবার যখন দেখা হয় পুরানো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত এই সময়টা বেশ ভাল। চায়ের দোকানে বসে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেয়ামাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুদের ভাড়াটেদের ছোট মেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশি আহত করে।

এ রকম সুখের সময় উপদ্রবের মত মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় সাব্বির। তাদের গাড়ীর মুশকো ড্রাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সাব্বির লজ্জায় লাল হয়ে বলে, চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে?

হুঁ আড্ডা দিচ্ছি, আসুন না।

জ্বি-না, আমি চা খাই না।

চা না খেলে না খাবেন, বসে গল্প করুন।

আরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তা না। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়, তবু ভদ্রতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কি নিয়ে এত গল্প করেন?

গল্প করার টপিকের অভাব আছে নাকি? রাজনীতি, মেয়েমানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনুন না। শুনতে না চাইলে বলুন।

কি বলব?

প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

সাব্বির টমেটোর মত লাল হয়ে বলল, মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোন মেয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি বসে কথা বলিনি।

বলেন কি?

জ্বি সত্যি। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হার্টের অসুখ।

তাতে কি?

মানে ইয়ে — সামান্যতম এক্সাইটমেন্টে রিদমে গণ্ডগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।

আমি ঝামেলামুক্ত হবার জন্য বলি, আজ তাহলে যান। রোদ লাগছে। সাব্বির তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কুৎসিত ব্যাপার।

মেয়েলী চেহারার এই যুবকের সুখ-দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখের কোন মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। আমি সাব্বিরকে এড়িয়ে চলবার জন্য নানা রকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলেটিকে বলে পাঠাই — বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারো ঠিক নেই। কোন কোন দিন নিজেই গিয়ে বলি, আমি এক্ষুণি বেরুব। হাসপাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাবার কথা। আজ তো কথা বলতে পারছি না।

আসুন, হাসপাতালে পৌঁছে দেই। কোন্ হাসপাতাল?

না না, তার দরকার নেই।

আমার কোন অসুবিধা হবে না, আসুন না।

মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোন সাদা রঙের গাড়ী দেখলেই মনে হয় — এই বুঝি গাড়ী থামিয়ে ফর্সা পাঞ্জাবী-পরা সাব্বির বেরিয়ে আসবে। মোটা কাচের আড়ালে যার চোখ ঢাকা বলে মনের ভাব বোঝা যাবে না। কথা বলবে এমন ভাল মানুষের মত যে রাগ করা যাবে না আবার সহ্যও করা যাবে না।

রাস্তায় বেরুলেই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি লেগে থাকে। এই বুঝি দেখা হল। অস্বস্তিটা সবচে' বেশি হয় নীলু সঙ্গে থাকলে। নীলু তার কারণ বুঝতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, এরকম কর কেন? দেখা হলে কি হবে? আমার তো ভদ্রলোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে। একদিন অবশ্যি দেখা হলো। গ্রীন রোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি। হঠাৎ রাস্তার পাশে সাদা

গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ীর ভিতর থেকে সাব্বির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি না দেখার ভান করলাম। এবং অতি দ্রুত একটা রিকশা ঠিক করে নীলুকে নিয়ে উঠে পড়লাম। সারাক্ষণই ভয় করতে লাগল এক্ষুণি হয়ত সে গাড়ী নিয়ে সামনে এসে থামবে। লাজুক গলায় বলবে, কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি। সে রকম কিছু ঘটল না। নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, হুট করে রিকশা নিলে কেন? আমি কতবার বলেছি পাশাপাশি রিকশায় চড়তে আমার ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না কেন?

হুড তুলতে হয়। হুড তুললেই আমার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।

হুড না তুললেই হয়।

পাগল, হুড না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব!

বিকালটা আমার চমৎকার কাটল। দু'জনে খুব ঘুরলাম। সন্ধ্যাবেলা ঢুকে পড়লাম একটা চাইনীজ রেস্টুরেন্টে। নীলু সারাক্ষণই বলল, ইশ, বাসার সবাই দুশ্চিন্তা করছে। তবু উঠবার কোন তাড়া দেখাল না।

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাব্বির আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কি ব্যাপার?

কোন ব্যাপার না, এম্নি এলাম। দিনে এলে তো আপনাকে পাওয়া যায় না।

কোন বিশেষ কাজে এসেছেন, না শুধু গল্প করবার জন্য?

না কোন কাজে না, এম্নি । সাব্বির রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। আমি বললাম, চা খান। চা দিতে বলি?

জ্বি না, চা-টা না। আমি এখন যাব। মা চিন্তা করছেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে কখনো থাকি না।

আজই বা থাকলেন কেন?

আপনাদের দু'জনকে আজ দেখলাম। বড় ভাল লাগল। সেইটা বলবার জন্যে।

সাব্বির লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেল।

আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি?

জ্বি। বড় ভাল লাগল। আমি একবার ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে বলি, কোথায় যাবেন বলুন পৌঁছে দেই। আপনারা কি মনে করেন এই ভেবে গেলাম না।

আমি নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালাম। সাব্বির মৃদুস্বরে বলল, আমি অবশ্যি আপনাদের পেছনে পেছনে গিয়েছি।

তাই নাকি?

জ্বি, ড্রাইভারকে বললাম দূর থেকে ঐ রিকশাটাকে ফলো করো।

তারপর ফলো করলেন?

জ্বি। শাহবাগ পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভার আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন?

না।

AMARBOI.COM

আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দু'জনকে এত সুন্দর লাগছিল। কি সুখী-সুখী লাগছিল। আমার মনে হল এটা বলা উচিত, আপনি রাগ করেননি তো?

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, না রাগ করিনি। রাত অনেক হয়ে গেছে এখন বাসায় যান। নয়ত আপনার মা আবার রাগ করবেন।

জ্বি তা ঠিক।

সাব্বির চলে গেল কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রইল না। লোকটি কি নির্বোধ না অন্য কিছু? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হল। এরকম ঘটনা আবার ঘটবে, ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে আবারো তার সাদা গাড়ী আসবে পেছনে পেছনে। কি অসহ্য অবস্থা।

ঘটলোও তাই। দিন সাতেক পর সাব্বির এসে হাসিমুখে বলল, আপনারা কি বুধবার বিকালে শিশু পার্কের সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন?

মনে নেই।

আপনার পরনে ছিল একটা চেকচেক শার্ট আর আপনার বান্ধবীর গায়ে লাল রঙের চাদর। হাতে একটা চটের ব্যাগ, মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, পড়েছে।

আমি কিন্তু ফুচকা খাবার পর থেকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক ঘন্টা আপনাদের ফলো করেছি।

তাই নাকি?

জ্বি।

এত ভাল লাগছিল আমার। ড্রাইভারকে বললাম তারা দেখতে পায় না এমনভাবে তাদের ফলো করো। আপনি অবশ্যি একবার পেছনে তাকিয়েছেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেননি।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, নীলুর সঙ্গে থাকলে আমি একটু অন্যমনস্ক থাকি।

সাব্বির গভীর আগ্রহে বলল, আচ্ছা এলিফেন্ট রোডের ঐ দোকানটা থেকে কি কিনলেন আপনারা?

আমি তার জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুর পরিচয় করিয়ে দেই।

না না, তার কোন দরকার নেই। আপনাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতেই আমর ভাল লাগে। কি রকম অদ্ভুত সুখী-সুখী চেহারা। জানেন আমি মা'কে আপনাদের কথা বলেছি?

ভাল করেছেন।

আমি যে মাঝে মাঝে আপনাদের পেছনে পেছনে যাই আপনি রাগ করেন না তো?

আমি উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালাম। একটা সাদা গাড়ী সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করছে এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

সাব্বির বসে আছে আমার সামনে। তার ফর্সা কিশোরীদের মত মুখে উত্তেজনার ছাপ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ চক্‌চক্ করছে। বোধ হয় কেঁদেই ফেলবে। সে অনেকখানি ঝুঁকে এসে বলল, পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুন তো?

AMARBOI.COM

সাব্বিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে আসেনি। হয়ত শরীর খুব বেশি খারাপ। ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। কিংবা গিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্য কিছু। গিয়ে খোঁজ নেবার মত ইচ্ছা কখনো হয়নি।

সাব্বির আর কখনো আসেনি কিন্তু তার সাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে আমাদের। যখনই নীলু মজার একটা-কিছু বলছে কিংবা যখনই আমার নীলুর হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছি বিশাল সাদা গাড়িটা আশেপাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মত নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয় আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনি মনে হয় কাছেই কোথাও সাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা অসুস্থ যুবক ভুরু কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুখী কেন?

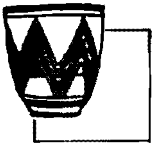

অসময়

ঘরে ঢুকেই দেখি বসার ঘরের সোফায় হলুদ চাদর গায়ে দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে রগ-উঠা ময়লা পা বের হয়ে আছে। সোফার হাতলে যে গোলাকার দাগ তা ঐ পা থেকে এসেছে, বলাই বাহুল্য। রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রান্নাঘরে জরী চা বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, চায়ের সঙ্গে কি খাবে? ঘরে কিছুই নেই। লুচি ভেজে দেব?

আমি শুকনো গলায় বললাম, কে এসেছে?

আমি জানি না। মগবাজার থেকে এসে দেখি উনি শুয়ে আছেন। করিম দরজা খুলে দিয়েছে। তোমার নাকি কি রকম আত্মীয় হন।

অনেকক্ষণ আমার মুখে কোন কথা এল না। দু'দিন পরপর একি যন্ত্রণা! গত সপ্তাহেই এসেছে দু'জন। এর মধ্যে একজনের আবার ফিরে যাওয়ার ভাড়া ছিল না। তাকে নেত্রকোনায় ফিরে যাওয়ার ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা দিতে হয়েছে। আমার হিসেব করা বেতনে ত্রিশ টাকার দাম আছে। মাসের বিশ তারিখে অফিস থেকে ফিরে নতুন একজন মেহমানকে দেখলে আমার সঙ্গত কারণেই মন খারাপ হয়।

তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বস। আমি চা নিয়ে আসছি।

কতদিন থাকবেন কিছু জানো নাকি?

না। তবে বিছানাপত্র নিয়ে এসেছেন। কাজেই দীর্ঘ পরিকল্পনা থাকা বিচিত্র নয়।

জরী মুখ নিচু করে হাসল। এর মধ্যে হাসির কি আছে কে জানে। জরীকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

বিয়ের পর থেকেই সে মেহমানদারী করছে। সবই আমার গ্রামের বাড়ির গরীব আত্মীয়-স্বজন। কেউ চাকরির সন্ধানে, কেউ চিকিৎসার জন্যে। আবার কেউ কেউ নিছক বেড়াবার জন্যে। নতুন এয়ারপোর্ট দেখবে, চিড়িয়াখানায় যাবে, শিশুপার্কে যাবে। জরী নির্বিকার। যেন এইসব ঝামেলা বিচলিত হওয়ার মতো কোন ঝামেলা নয়।

আমি প্রথম-প্রথম ভেবেছিলাম জরীর এই ব্যাপারটি লোক-দেখানো। আমার কাছে প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে সে যদিও অনেক বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তবু আমার গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সে মোটেই অবহেলা করে না। এখন বুঝতে পারছি আমার ধারণা ঠিক নয়। কোন-এক বিচিত্র কারণে জরীর মধ্যে বিরক্ত হবার ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। আমি যখন দেখি আমার কোন ফুপাতো ভাই কিংবা খালাতো ভাই কার্পেটের ওপর নাক ঝেড়ে টেবিল ক্লথে হাত মুছছে তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। অথচ জরীকে দেখি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক যেন কার্পেটে নাক ঝাড়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

বারান্দায় ফুরফুরে হাওয়া। তবু আমার বিরক্ত ভাব কাটল না। জরী চা নিয়ে আসতেই বললাম, এই রকম মেহমানদারী করলে তো চলবে না জরী।

যতক্ষণ চলছে চলুক। তুমি চা খেয়ে ভদ্রলোককে ডেকে তুলে আলাপ-পরিচয় কর। রাগ করার কি আছে বল?

রাগ করার কিছু নেই?

উঁহু।

সময়-অসময় নেই স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পরে মাথায় একটা কাঁঠাল নিয়ে লোকজন আসতে থাকবে আর আমি গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরবো?

জরী খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন এরকম মজার কথা সে বহুদিন শুনেনি। চা খেতে-খেতেই জানা গেল মেহমানের ঘুম ভেঙেছে এবং মেহমান আমার খোঁজ করেছেন। আমি গিয়ে দেখি হাসু চাচা! প্রায় এগারো বছর পরে দেখা। ডান গালে লাল জডুল না দেখলে চিনতেই পারতাম না। কি চেহারা হয়েছে! মাথার চুল উঠে গেছে, সরু-সরু হাত-পা। আমাকে দেখেই বললেন, বিয়ে করলি, খবর তো দিস নাই।

আপনিও তো আমাকে কোনদিন কোন খবর দেননি চাচা?

তা ঠিক। খুব ঠিক কথা।

আপনার শরীরের একি অবস্থা হয়েছে?

মরণ রোগ। মরবার সময় যে-সব অসুখ-বিসুখ হয় সেইসব। ভাবলাম মরবার আগে একবার দেখে যাই। বৌমাকেও দেখি। বৌমার খুব প্রশংসা শুনি লোকের কাছে।

আমি জরীকে গিয়ে বললাম, ইনি আমাদের হাসু চাচা।

তুমি যার বাড়িতে থেকে মেট্রিক পাস করেছিলে?

হ্যাঁ।

এই প্রথমবার দেখলাম মেহমান দেখে বিরক্ত হওনি।

হাসু চাচা না থাকলে আমার পড়াশোনা হত না জরী।

জরী হাসতে হাসতে বলল, পড়াশোনা না হলে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হতো না। কাজেই আমাদের দু'জনের দেখা হওয়ার পেছনেও তোমার হাসু চাচা।

রাতে হাসু চাচার অবস্থা খারাপ হল। আকাশ-পাতাল জ্বর। আমাদের পাড়ার আফজল ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম রাত এগারোটায়। ডাক্তার বললেন,

এতো সিরিয়াস রোগী হাসপাতালে দিতে হবে।

হাসু চাচা শ্বাস টানতে-টানতে বহু কষ্টে বললেন, হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন নেই বললে তো হবে না। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

জরী আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, ইনার আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়া প্রয়োজন মনে হয়। কেমন করে তাকাচ্ছেন দেখো না। তুমি আমার ফুপার কাছেও একবার যাও। ফুপাকে নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

ফুপা অবশ্যি এলেন না। জরীর আত্মীয়-স্বজনরা কেউ কখনো আসেন না আমার এখানে। তবে তিনি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। রাগী রাগী গলায় বললেন, শুধু-শুধু বাড়িতে ঝামেলা করবেন না। হাসপাতালে দিন। আমি বলে দেবো ভালো খোঁজখবর করবে।

বাসায় ফিরে দেখি হাসু চাচার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আমাকে চিনতে পারেন না, কথা বললে জবাব দেন না, মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চারদিকে তাকান।

জরী একবার পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকতেই অবাক হয়ে ডাকতে লাগলেন, ও মিনু ও মিনু।

জরী ফ্যাকাশে হয়ে বললো, মিনু কে? আমি বললাম, হাসু চাচার মেয়ে। অনেকদিন আগে মারা গেছে। হাসু চাচা টেনে টেনে বললেন, ও মিনু ও মিনু, বেটি কাছে আয়। আয় না।

রাত একটার সময় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত দু'টা বেজে গেল। জরী দেখি একা একা জেগে বসে আছে। তার মুখ রক্তশূন্য। একদিনের পরিশ্রমে চোখের নিচে কালি পড়েছে।

অবস্থা কি তাঁর?

বেশি ভালো না। স্যালাইন দিচ্ছে।

তুমি কি চা খাবে এক কাপ?

না, এতো রাতে ইচ্ছা করছে না।

খাও না। আমার খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসো। আমি নিয়ে আসছি।

আমরা ঘুমুতে গেলাম প্রায় শেষরাতে। বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠতেই জরী মৃদুস্বরে বলল, তোমার হাসু চাচার যে একটি মেয়ে ছিল মিনু — এই কথা কিন্তু তুমি আমাকে কখনো বলোনি।

এটা এমন কোনো দরকারী কথা না জরী।

জরী অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর হঠাৎ বলল, মাঝে মাঝে তুমি যখন আমাকে খুব আদর করো তখন কিন্তু আমাকে 'মিনু' ডাকো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। জরী বলল, হাসু চাচার মেয়েটি কখন মারা গিয়েছিল?

ক্লাস নাইনে পড়ার সময়।

AMARBOI.COM

মেয়েটি কেমন ছিল দেখতে?

আমি জবাব দিলাম না। দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে জরী আমার হাত ধরল। ভালোবাসার গাঢ় স্পর্শ। বাইরের অস্পষ্ট আলোয় জরীর মুখ অবিকল সেই বালিকা মিনুর মুখের মতো দেখাতে লাগল। সেই মুখ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

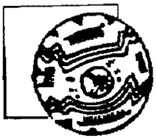

পাখির পালক

হ্যালো জরী?

হুঁ্যা।

কেমন আছ?

আপনি কে বলছেন?

আমি একটু থমকে গেলাম। জরী কি সত্যি সত্যি আমরা গলা চিনতে পারছে না? তা কেমন করে হয়?

হ্যালো, কথা বলছেন না যে? কে আপনি?

আমি। আমি আনিস।

ও, তাই বলুন। আপনার কি ঠাণ্ডা লেগেছে?

না তো।

গলার স্বর ভারী।

আমি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করলাম। আমার গলার স্বর ঠিকই থাকে কিন্তু জরীর কাছে কখনো মনে হয় ভারী, কখনো ভাঙা ভাঙা। কোনদিন চিনতে পারে না।

হ্যালো জরী, তুমি কী আজ বাসায় থাকবে?

কখন বলুন তো?

এই ধর বিকেলে?

উঁহু, বিকেলে থাকব না। কেন?

একটু দরকার ছিল। সন্ধ্যাবেলা থাকবে?

না, সন্ধ্যাবেলা জুনু খালাদের বাসায় যাব।

কখন ফিরবে?

তা কি করে বলব? জুনু খালা কি সহজে ছাড়বে। রাতে হয়ত ফিরবোই না।

জরী খিলখিল করে হাসল। যেন রাতে না ফেরাটা খুব-একটা হাসি-তামাশার ব্যাপার।

হ্যালো আনিস ভাই, একটু ধরুন তো, কে যেন আমাকে ডাকছে। আসছি এক্ষুণি।

আমি টেলিফোন কানে লাগিয়ে বসে রইলাম। গ্রীন ফার্মেসীর ছেলেটা আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। তার মুখে বিরক্তির রেখা গাঢ় হতে শুরু করেছে। সে গম্ভীর স্বরে

AMARBOI.COM

বলল, কতক্ষণ ফোন ধরে বসে থাকবেন? ইম্পর্টেন্ট কল-টল আসতে পারে। লাইন আটকে রাখলে চলে নাকি?

এই যে ভাই একটু।

একটু একটু করে তো এক ঘণ্টা নিয়ে নিলেন।

আমি না শোনার ভান করে সামান্য ঘুরে দাঁড়ালাম। লাইনের ও-পাশ থেকে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম কিছুক্ষণ পোঁ-পোঁ শব্দ হচ্ছিল। এখন তাও নেই। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। জরী নিশ্চয়ই ভুলে বসে আছে। জরীর মা হয়তো রিসিভার উঠিয়ে রেখেছেন। ঘন্টা খানেক পর আবার করলে কেমন হয়?

কি রে ভাই, আপনার হয়েছে না কানে নিয়ে আরো খানিকক্ষণ বসে থাকবেন?

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা ময়লা এক টাকার নোটও বাড়িয়ে দিলাম। পয়সা দিয়ে ফোন করি, তবু এমন যন্ত্রণা। ইচ্ছা করছিল একটা চড় দিয়ে ছেলেটার মুখে আঙুলের দাগ বসিয়ে দেই — হারামজাদা ছোটলোক। কিন্তু সে রকম কিছুই করি না। সারা মুখে একটা তেলতেলে ভাব এনে নরম সুরে বলি, বিজনেস কেমন? সে জবাব দেয় না।

নিন, একটা সিগারেট নিন।

সে নিতান্ত অবহেলায় সিগারেট ধরায়। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। রহমানকে বলে এই শালাকে একটা ধোলাই দিয়ে দিলে কেমন হয়? শালা হারামি।

আজ আমার কিছু করবার নেই। কোনদিনই অবশ্যি থাকে না। তবে আজ আমি বিশেষ রকম ফ্রি। বাজার করতে যেতে হয়নি। বাবা বাজারে গিয়েছেন। তিনি সপ্তাহে দু'দিন বাজারে যান। আজ হচ্ছে সেই দু'দিনের একদিন। আজ তিনি দুপুর পর্যন্ত মাছের বাজারে ঘুরবেন। অসংখ্য মাছ টিপে টিপে দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু পচা মাছ কিনে অন্ধকার মুখে বাড়ি ফিরবেন। লেবু পাতা দিয়ে সেই মাছ রান্না হবে। বাড়িওয়ালার একটি লেবু গাছ আছে। তার পাতাগুলি আমরা পচা মাছ দিয়ে দ্রুত খেয়ে ফেলছি। সেদিন বাড়িওয়ালার মেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, একি গোটা গাছটাই দেখি মুড়িয়ে ফেলেছে। এখন থেকে কেউ গাছে হাত দিতে পারবে না। এইসব সহ্য হবে না। গাছ তোলা সহজ ঝামেলা?

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটা দারুণ ক্যাটক্যাট করে। মেয়েটার অনেক বয়স। কিন্তু রোগা এবং বেঁটে বলে বয়সটা চোখে পড়ে না। মেয়েটির দাঁত ভাসা তবে গায়ের রং দারুণ ফর্সা। ফর্সা রঙের যে কোন মেয়ে দেখলেই আমার মা মনে মনে সেই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এবং মা'র চোখে তার নানা রকম গুণাবলী ধরা পড়তে থাকে। এই পুরুষালী মেয়েটি সম্পর্কে মা'র মন্তব্য হচ্ছে — বড় তেজী মেয়ে। আজকালকার যুগে তেজী মেয়েই দরকার, পুতু পুতু মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। আর চুল দেখেছিস? হাঁটু পর্যন্ত। একবার চুল বাঁধতেই এই মেয়ের আধা সের তেল লাগে।

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তা হয় না। সে আমাকে বখা ছেলে হিসেবে জানে। চোখে চোখ পড়লেই সে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি গায়ে মাখি না। এই যুগে কোন কিছু গায়ে মাখতে নেই। এটা হচ্ছে গায়ে না-মাখার যুগ। সফিকের ভাষায়, "মুমে লাথ মার ফিন ভি হাসে ঙ্গি।" সে ইদানীং উর্দুতে বাতচিত করছে।

AMARBOI.COM

কখন যে পাবলিকের হাতে মার খাবে। দিনকাল খারাপ। পাবলিক আজকাল সহজেই চেতে যায়।

আমি মতিঝিলের দিকে রওনা হলাম। গন্তব্য জলীলের অফিস। সেখান থেকেই জরীকে আবার একটা ফোন করা যাবে। বাসে গাদাগাদি ভীড়। সবগুলি মানুষের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। হানড্রেড হর্স পাওয়ারের গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে। তবু তার মধ্যেই জরীর সঙ্গের কথাবার্তাগুলি রিহার্সেল দিয়ে রাখলাম।

হ্যালো জরী?

হ্যাঁ, ইশ টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন কেন? আমরা যা রাগ লাগছিল।

লাইনটা হঠাৎ করে কেটে গেল।

আমি তখন থেকে ফোনের সামনে বসে আছি।

সে কি? কোথায় যে যাবার কথা ছিল। যাওনি?

যাব কিভাবে? আপনি যদি ফোন করেন।

শোন জরী, হ্যালো।

বলুন, শুনছি।

আমার পাশের লোকটি হঠাৎ করেই তার কোমর ঝাঁকুনি দিল। কাল্পনিক ফোনের কথাবার্তা থেমে গেল। জরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমার মনটা অস্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে বলে আমি কিছুই বললাম না। তবে আমার পাশের রোগামত লোকটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ভাইজান, আপনার পাছাটা সামলে রাখেন। বেশী নড়াচড়া করছে।" পাছা নাড়ানো লোকটি চোখ লাল করে তাকাল। লোকটি বিশাল। সে থমথমে স্বরে বলল, কী কইলেন?

শুনলেন তো কি বললাম। পাছা সাবলান।

খবর্দার।

কাকে খবর্দার বলেন? ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব, বুঝলেন? এটা পাবলিক বাস। আপনার মামার গাড়ি না।

পাছা দুলানো লোকটি থমকে গেল। রোগা লোকটির সাহসের তারিফ করতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছিল বোধহয়। আমি একটু সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিলাম। বোঝাপড়া করতে চাইলে করুক। কিন্তু মোটা লোকটি ভড়কে গেছে। লোকটির দেহটাই বিশাল, সাহস নেই। সে প্রেসক্লাবে অন্য একজনের পা মাড়িয়ে নেমে গেল।

জলীল অফিসেই ছিল। সাধারণত থাকে না। এটা তার নিজের অফিস। নিজের অফিসে না থাকলে কিছু যায় আসে না। জলীল আমাকে দেখেই ভ্রূ কুঁচকাল। এটা সে নতুন শিখেছে। পয়সা হবার পর মানুষ যে জিনিসটা প্রথম শিখে তা হচ্ছে ভ্রূ কুঁচকানো। তারপর শিখে কাঁধ ঝাঁকানো। জলীল কাঁধও ঝাঁকাল। এটা বিশেষ ভাল হল না। ঠিকমত শিখে উঠতে পারেনি বোধ হয়।

কি রে, তুই কি মনে করে?

আসলাম।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চাস কি?

AMARBOI.COM

চাই না কিছু।

টাকা-পয়সা চাইলে পাবি না। বন্ধু-বান্ধবদের ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ঐদিন শফিক এসে দু'শ টাকা নিয়ে গেল। না দিয়ে পারলাম না। খুব ঝোলাঝুলি।

দিয়ে ভালই করেছিস।

আর ভাল ঐ পয়সা কী আর ফেরত পাব? জলে গেছে।

এত পয়সা তোর। যাক না কিছু জলে।

জলীল খুশী হল। এই প্রথম তার মুখে হাসির একটা আভাস দেখলাম। জলীলকে খুশী করবার সবচে' ভাল বুদ্ধি হচ্ছে ওর টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলা।

কী লাল হয়ে যাচ্ছিস?

দূর, কি যে বলিস। বহু কষ্টে পাঁচ লাখ টাকার একটা কাজ ম্যানেজ করেছি। একটা কালভার্ট। তবে মারজিন থাকবে না। নানান লোকদের খাওয়াতে হবে।

শালা তুইই উঠে গেলি আমাদের মধ্যে।

উঠে গেল কথাটা ঠিক না। জলীল বরাবর উঠেই ছিল। তাদের দু'পুরুষের ব্যবসা। ইটের ব্যবসা। তিন-চারটা নাকি ব্রিক ফিল্ড আছে। ব্যবসাদারের ছেলেপুলেরাও পড়াশোনা করে। এবং দেখা গেল ভালই করে। এম.এ-তে দিব্যি সেকেণ্ড ক্লাস ম্যানেজ করে ফেলল। তারপর একদিন শুনলাম বিজনেস শুরু করেছে। মতিঝিলে অফিস। শফিককে নিয়ে দেখতে এলাম। তেমন কিছু না। ময়লা ময়লা আসবাব। সোফার গদি ছেঁড়া। একটা স্টেনো আছে, শাকচুন্নীর মত দেখতে। কথা বলে নাকে। তবে জলীল জমিয়ে ফেলল। ওদের রক্তের মধ্যে ব্যবসা। ধাই ধাই করে উঠে গেল। শাকচুন্নীর মত স্টেনোটা পর্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। শফিক একদিন বলেই ফেলল, বেটি দেখতে খারাপ না। লদকা লদকি করব? প্রথম লদকা লদকি তারপর হাম তোম। তবে স্টেনোটা আমাদের মোটেই পাত্তা দিল না। তার বড় সাহেবের আমরা হচ্ছি বোসম ফ্রেণ্ড। তাতে তার কোন মাথাব্যথা নেই। চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। শালী।

জলীল বলল, চা টা কিছু খাবি?

দিতে বল।

নাকি কফি দিতে বলবো? ভাল কফি আছে।

শালা কফি ধরেছিস নাকি?

ধরতে হয়। নানান ধরনের লোকজন আসে। বাংলাদেশে ব্যবসা করা মুশকিল আছে।

মুশকিল থাকবেই। মাগনা কেউ পয়সা দিবে নাকি?

জলীল সিগারেট বের করে ধরাল। দামী জিনিস। কিন্তু প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়াল না। ইচ্ছা হলে তুলে নিতে পার এই ভাব। নিজ থেকে দেবে না। ইংগিতও করবে না। এই কায়দাটিও সে নতুন শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে দেদার বিলাতো। তার সঙ্গে আমাদের খাতিরের মূল কারণই ছিল ফ্রি সিগারেট।

কফি চলে এল। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ওর প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। জলীল গম্ভীর হয়ে বলল, করছিস কি এখন ?

কিছু করছি না।

না করলে হবে নাকি ? কিছু-একটাতে লেগে পর।

দেখি।

দেখতে দেখতে তো চুল পাকিয়ে ফেলেছিস। পাবলিক ওয়ার্কসের ঐ চাকরিটা কি হল? হয় নাই?

এটাতে আমার ইন্টারেস্ট নাই। বোগাস জিনিস।

বোগাস কেন?

অমি জবাব না দিয়ে বললাম, একটা টেলিফোন করব। জলিল সঙ্গে সঙ্গে মুখ অন্ধকার করে ফেলল।

আমার এখানে যেই আসে তারই দেখি টেলিফোন করা লাগে। ঐদিন শফিক এসে চিটাগাং-এ কল করল। এটা কি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নাকি?

পয়সা দেব শালা। মাগনা করব না।

পয়সার গাছ হয়েছে তো তোর। কোথায় করবি? সেই তোর জরিনা না কি যেন — তার কাছেই নাকি?

আমি জবাব দিলাম না।

কেন খামাখা ঝুলাঝুলি করছিস। ঐ মেয়ে তোর সাথে ভিড়বে নাকি? শুধু খেলাবে।

বুঝলি কি করে খেলাবে?

ঐসব বোঝা যায়।

জলীল হাই তুলল। শালা হামবাগ দু'টা পয়সা হাতে আসতেই সব কিছু বুঝে ফেলছে। জলীল বলল, ঐসব চিন্তা বাদ দে। চোখ বুজে কোন একটা কিছুতে লেগে পর। বিজনেস করতে চাস তো সুযোগ সন্ধান দিতে পারি।

চুপ থাক। বিজনেস আমি করব না। ছোটলোকের কাজ। ঐসব পোষায় না।

জলীল মুখ কালো করে ফেলল। ব্যাটাকে আরেকটু ঘায়েল করবার জন্যে আমি সরু গলায় বললাম, বিজনেসওয়ালাকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দেয় না। মেয়ের বাপ মেয়ে দেয় না। বাংলাদেশে বিজনেসম্যানরা হচ্ছে শিডিউল কাস্ট। কই দেখি টেলিফোনটা। জলীল ফোন এগিয়ে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। তার মুখ কালো। আমি তার আঁতে ঘা দিয়েছি। নীলুফার নামের একটি মেয়ের প্রতি তার কিছু রস সঞ্চার হয়েছিল। মেয়ের বাবা রাজি হননি। সোজা বলে দিয়েছেন — বিজনেসম্যানের কাছে মেয়ে দিব না। মাসখানেক জলীল খুব গম্ভীর ছিল। অফিসে গেলে কথা বলতো না। চা খাওয়াতে বললে বলতো — চা হবে না, চিনি নেই। খসরুকে একদিন তো চূড়ান্ত অপমান করল। খসরু ঘরে ফিরবার জন্যে দশটা টাকা চেয়েছিল রিকশা ভাড়া। জলীল বলেছে, হেঁটে হেঁটে বাড়ি যা। ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চাপতে লজ্জা লাগে না?

ভিক্ষা কোথায়? ফিরত দেব।

বড় বড় বাত দিয়ে লাভ নাই। ফিরত দেবার মুরাদ তোর নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভিক্ষাই করবি সারা জীবন। ভিক্ষা করবি আর ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চড়বি। তোদের আমার চেনা আছে।

AMARBOI.COM

মুখ সামলে কথা বল শালা। একটা ফর্টি নাইন বসিয়ে দেব মুখে।

সেটা পারলেও তো কাজ হতো। সেটাও পারবি না। চোটপাট যা করবার মুখেই করবি। তোদের আমি চিনি।

সহজেই লাইন পাওয়া গেল। আমি বললাম, হ্যালো জরী?

হ্যাঁ। কে কথা বলছেন?

আমি, আমি আনিস।

বুঝতে পারছি। কিছু বলবেন?

তুমি আমাকে টেলিফোন ধরিয়ে রেখে কোথায় গেলে, তারপর আর এলে না।

ওমা কখন?

আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। সত্যি কি তার মনে নেই? না ইচ্ছা করে ভান করছে। জরী ভান করার মেয়ে নয়।

হ্যালো জরী?

বলুন।

তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

কথা থাকলে বলুন। শুনছি।

টেলিফোনে বলা যাবে না।

এমন কি কথা যা টেলিফোনে বলা যাবে না?

আমি সামনা-সামনি বলতে চাই। কবে তুমি ফ্রি থাকবে বল তো।

আমি ফ্রি নেই। বাড়ি ভর্তি মেহমান, নানান ঝামেলা। এদিকে সামনের সপ্তাহে নেপাল যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ?

নেপাল। দুলাভাই নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে কথা ছিল কক্সবাজার যাব। পরে হিসাব করে দেখলাম কক্সবাজার যেতে যে খরচ নেপাল যেতেও একই খরচ। শেষে নেপাল যাওয়া ঠিক হল।

কতদিন থাকবে?

বেশীদিন থাকা যাবে না। এক সপ্তাহ। ওখানে থাকার খরচ খুব বেশী। টুরিস্ট স্পট তো। আমেরিকানরা এসে এসে সব জিনিসের দাম বাড়িয়ে ফেলেছে। আচ্ছা রাখি?

হ্যালো জরী?

বলুন। একটু তাড়াতাড়ি বলুন, মা আমাকে ডাকছে। হ্যালো, বলুন কি বলবেন। হ্যালো।

আমি কিছু বললাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে বলার কিছু পাওয়া গেল না। জলীল বলল, কী কথা শেষ?

হুঁ।

আমি টেলিফোন রাখতেই জলীল বিরস মুখে বলল, কি করবি এখন? বাড়ি যাবি?

হুঁ।

আমি উঠে পড়লাম। জলীল বলল, চল নিউ মার্কেট পর্যন্ত লিফট দেই। সোবাহান, গাড়ি

AMARBOI.COM

বের করতে বল তো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ি কিনেছিস নাকি ?

এখনো পুরোপুরি কিনিনি। ট্রায়াল দিয়ে দেখছি। এক সপ্তাহের জন্যে ট্রায়াল দিতে এনেছি। তবে বোধ হয় কিনব।

দাম কত?

এক লাখ চায়। পুরানো গাড়ি, কিছু কমাবে। আমি সত্তরে আছি। এর বেশী হলে — নো। খুব টাইট অবস্থা আমার।

জলীল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। গাড়িতে উঠে নিজ থেকেই সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

দেখিস ভাই গাড়িতে ছাই ফেলিস না। একটু টিপটপ কণ্ডিশনে রাখতে চাই। দেখ, হাতলের কাছে ছাইদান আছে।

আমি খুব সাবধানে ছাইদানে ছাই ফেলতে লাগলাম। জলীল গম্ভীর গলায় বলল, সোবাহান সরোদটা দাও তো।

দারুণ আরামের গাড়ি। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জলীল বলল, কালারটা কেমন দেখছিস? সোবার না?

হুঁ। খুব সোবার।

আরেকটা পেয়েছিলাম লাল। লাল আমার পছন্দ না। এত দাম দিয়ে একটা জিনিস কিনব, কি বলিস ?

তা তো ঠিকই।

এই লাইনে গাড়িটা হচ্ছে একটা নেসিসিটি। নানান ধরনের পার্টির কাছে যেতে হয়। সব জায়গায় রিকশা চেপে গেলে মান থাকে না।

তা তো ঠিকই। তুমি এখন মানী লোক।

ঠাট্টা করছিস নাকি?

না ঠাট্টা করব কেন?

সরোদ কেমন লাগছে?

ভালই।

ভাল বললে হয় না। বুঝলি ক্লাসিক জিনিস।

হুঁ।

নে নে আরেকটা সিগারেট নে।

থাক। এই মাত্র তো খেলাম।

তাহলে রেখে দে একটা। ভাত খাওয়ার পর খাস।

জলীল আমাকে যথেষ্ট খাতির করল। বাসার সামনে এনে নামিয়ে দিল।

খেতে বসে দেখি বাবা আজ ভালই বাজার করেছেন। মাছ পচা নয়। টাটকা সরপুঁটি। মা হাসিমুখে বললেন, বাজারে আজ মাছ সস্তা গেছে।

AMARBOI.COM

তাই নাকি?

হুঁ। খুব সস্তা।

বাবা আজ অফিসে যাননি দেখলাম।

তাঁর শরীরটা ভাল না।

কি হয়েছে?

বুকে নাকি ব্যথা করছে। শুয়ে আছেন। বয়স হয়েছে তো।

দুপুরের খাওয়াটা ভালই হল। তবে বেচারা বাবা খেতে পারলেন না। বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে রইলেন। মা বললেন, বিকালে তোর বাবাকে মগবাজারে নিয়ে যাস।

ঠিক আছে। নিয়ে যাব।

মগবাজারে আমার এক মামা থাকেন। ডাক্তার। বিনা পয়সায় আমাদের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা ভালই করেন। রোগ সারে।

পান খাবি?

দাও একটা।

মা পান এনে দিলেন। তাঁকে হাসি-খুশীই মনে হল। তিনি বিছানায় পা উঠিয়ে বসলেন,

বাড়িউলীর বউ এসেছিলো আজকে, বুঝলি।

কেন?

নানান গল্প-গুজব করল। শেষে বলল আমার মেয়েটার জন্যে একটা ছেলে দেখেন না আপা। ভাল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে হলেই হবে। চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা কিছু ব্যবস্থা আমরাই করব। নজরটা তোর দিকে বুঝলি তো?

তুমি কি বললে?

আমি কিছু বলি নাই। আগ বাড়িয়ে কিছু বললে ভাববে আমাদের গরজ। কি দরকার।

আমি চুপ করে রইলাম। মা বললেন, কথায় কথায় আবার শুনিয়ে দিল মেয়ের নামে পঁচিশ হাজার টাকা জমা আছে। তা আছে ঠিকই। টাকার কুমীর।

মা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে জলীলের সিগারেটটা ধরালাম। খাবার পর একটা দামী সিগারেট বেশ লাগে। মনের মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ভাব আসে।

বাড়িওয়ালার মেয়েটা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দূর থেকে তার ফর্সা হাত দেখা যাচ্ছে। চুলগুলি ছাড়া। মা ঠিকই বলেছেন লম্বা চুল মেয়েটির। জরীর চুলও কি লম্বা? আমি কখনো লক্ষ্য করিনি। জরীর মত মেয়েদের কখনো খুঁটিয়ে দেখা যায় না। এদের সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন সব সময়ই অস্পষ্ট।

AMARBOI.COM

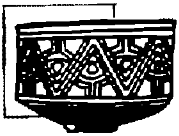

বেবি রুথ

আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা —সত্তুর বছরের বুড়ি, এলিজাবেথ এণ্ডারসন একটা সাপ কিনে এনেছে। সে নাকি পুষবে। প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করিনি — বুড়ির ঘরে ঢুকতেই দেখি সত্যি সত্যিই সাপ। চৌকো ধরনের কাচের বাক্সে অজগর সাপের মত দেখতে প্রকাণ্ড এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আমেরিকানদের কোন কাণ্ডকারখানায় অবাক হব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত ভুলে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বুড়ি হাসিমুখে বলল, কত দিয়ে কিনেছি বল তো?

আমি শীতল গলায় বললাম, এই সাপ তুমি কিনে এনেছ?

'হ্যাঁ, বিনে পয়সায় আমাকে কে দেবে?'

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। পাশের ঘরে অজগর সাপ বাস করবে ভাবতেই বুক শুকিয়ে আসছে, একি যন্ত্রণায় পড়লাম।

'আহমেদ, তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'ভয় না পাওয়ার কোন কারণ আছে কি?'

'অবশ্যই আছে। নির্বিষ সাপ। তুমি ওর গায়ে হাত দাও — দেখবে কিছুই করবে না। ওর স্বভাব-চরিত্র শান্ত ধরনের। দাও, গায়ে হাত দাও।'

আমি শুকনো গলায় বললাম, তুমি কিছু মনে করো না, সাপের গায়ে হাত দিতে আমার ইচ্ছা করছে না।

বুড়ি উজ্জ্বল চোখে বলল, কত সস্তায় কিনলাম তোমাকে বলি। মাত্র কুড়ি ডলার। অবশ্যি এই কুড়ি ডলারে কাচের বাক্সটা পড়ছে না। বাক্স ফেরত দিতে হবে।

'বাক্স ফেরত দিলে সাপ রাখবে কোথায়?'

'পোষা সাপ তো, ঘুরেফিরে বেড়াবে।'

'বল কি?'

আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল। কি সর্বনাশের কথা! আমি শুকনো গলায় বললাম, বাড়িওয়ালী কি তোমাকে সাপ পুষতে দেবে?

অবশ্যই দেবে। তার সঙ্গে রুমিং হাউস ভাড়া নেবার সময় যে কনট্রাক্ট হয়েছিল তাতে কোথাও লেখা নেই — সাপ পোষা যাবে না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই। তোমরা তো কনট্রাক্টে কি লেখা থাকে না পড়েই সই দিয়ে দাও। ভালমত

AMARBOI.COM

পড়ে তারপর সই দিতে হয়। ধর, এখন তুমি যদি সাপের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে দিতে চাও — তোমাকে ছ'মাসের ভাড়া পেনাল্টি হিসেবে দিতে হবে।'

'এই কথা লেখা আছে?'

'অবশ্যই লেখা আছে। ছ'পয়েন্টের টাইপে লেখা। চোখে না পড়ার মত।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আমার গতি রইল না। ক্যাম্পাসের কাছে এবং অসম্ভব সস্তা দেখে এই রুমিং হাউসে থাকছি। একতলায় বাড়িওয়ালী, দোতলার পাঁচটি রুমে আমরা পাঁচজন। শুধু শোবার ব্যবস্থা। রান্নার ব্যবস্থা নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতে এসে ঘুমিয়ে থাকা। এর নাম — রুমিং হাউস।

আমি থাকি বাথরুমের মুখোমুখি ঘরে। আমার পাশের ঘরে থাকে ভারতীয় ছাত্র অনন্ত নাগ। একটা করিডোরের মত আছে। করিডোরের ওপাশে ফিলিপিনো ছাত্রী তোহা। অসম্ভব রূপবতী। তার দিকে তাকালে আপনা থেকেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠে আসে। তোহার পাশের কামরায় থাকে কোরিয়ান ছাত্র হান। ইয়েস এবং নো ছাড়া অন্য কোন ইংরেজী শব্দ সে গত ছ'মাসে শিখতে পারেনি — এরকম ধারণা প্রচলিত আছে। হানের মুখোমুখি ঘরটায় এলিজাবেথের বাস। এতদিন এলিজাবেথ একাই থাকত। এখন এলিজাবেথের সঙ্গে থাকবে প্রকাণ্ড এক সাপ, যার নাম মেক্সিকান পাইথন।

বিপজ্জনক জীবজন্তু পোষার ব্যাপারে আমেরিকানদের নাম-ডাক আছে। এদেশে বেশকিছু মানুষ আছে যারা কাচের বোতলে ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা পুষে। এই মাকড়সাগুলো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। মানুষকে কামড়ানো মানেই মৃত্যু। যারা এদের পুষে তাদের ক্লাবের মত আছে — ব্ল্যাক উইডো ক্লাব। সেই ক্লাব থেকে নিয়মিত পত্রিকা বের হয়। অনেকের আছে বিষাক্ত সাপ পোষার হবি। কুমির পোষা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কবে যেন পত্রিকায় পড়লাম পোষা কুমির কামড়ে ঠ্যাং খেয়ে ফেলেছে। আমেরিকান ছোট-বড় সব শহরেই 'পেট হাউস' আছে, যেখানে তক্ষক থেকে শুরু করে মাকড়সা পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়।

বুড়ি সাপ কিনে আনার পর রুমিং হাউসের সদস্যদের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমে এল। কেউ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছে না আবার থাকতেও ভরসা পাচ্ছে না। প্রথম রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হল না। এদেশে মশারি বলে কিছু নেই। মশারি থাকলে মশারি ফেলে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতাম। সারারাত বিছানায় বসে পার করে দিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি মেক্সিকান পাইথন গা বেয়ে উঠে আসছে।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। ফিলিপিনো তরুণী তোহা বাথরুম থেকে চেঁচিয়ে কি যেন বলতে লাগল। তার নিজস্ব টেগালোগ ভাষা, আমরা কিছুই বুঝছি না। তবে চিৎকারের ধরন দেখে মনে হচ্ছে — বাবারে, মারে, খেয়ে ফেলল রে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা হবে কিনা যখন ভাবা হচ্ছে তখন তোহা নিজেই দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বের হয়ে এল। গায়ে কাপড়ের বংশও নেই। তোহা হড়বড় করে বলল, সে শাওয়ার নেয়ার জন্যে বাথটাবে নেমেই দেখে পানিতে গা ডুবিয়ে মেক্সিকান পাইথন শুয়ে আছে।

অনন্ত নাগ দাঁত বের করে বলল, দয়া করে ঘটনাটা আরেকবার বল। কাপড় পরার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বিনা কাপড়েই তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে। আমার কথা বিশ্বাস

না হলে অন্যদের জিজ্ঞেস কর। তোহা একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অনন্ত নাগ বলল, ঘরে একটা সাপ থাকা নেহায়েত মন্দ না। কি বল তোমরা? সাপ না থাকলে এই জিনিস দেখতে পেতে?

আমাদের দিন এবং রাত কাটতে লাগল দুঃস্বপ্নের মধ্যে। সাপটাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় পাওয়া যেতে লাগল। হান একদিন ওভারকোট গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে — হঠাৎ তার মনে হল, গা বেয়ে হুড়হুড় করে কি যেন নেমে যাচ্ছে।

অনন্ত নাগ এক রাতে জেগে ওঠে দেখে, সে কোল বালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে। তার হঠাৎ মনে হল, আমেরিকায় তো কোল বালিশ থাকার কথা না, তারপরই তার বিকট চিৎকার শোনা যেতে লাগল।

আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, একমাত্র এলিজাবেথেরই কোন বিকার নেই। সাপ যতই যন্ত্রণা করে সে ততই মধুর ভঙ্গিতে বলে — মাই নটি গার্ল। মাই নটি গার্ল। নটি গার্ল বলার কারণ — সাপটি স্ত্রী জাতীয়।

বুড়ি তার নটি গার্ল নিয়ে নানান ধরনের আহ্লাদিও করতে লাগল। সেই আহ্লাদির একটা নমুনা হচ্ছে ইনস্যুরেন্স। সাপের জন্যেও যে ইনস্যুরেন্স কিনতে পাওয়া যায় তা আমাদের জানা ছিল না। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

আমি ঠিক করে ফেললাম, ছ'মাসের পেনাল্টি দিতে হলেও আমি এই রুমিং হাউসে থাকব না। সারাক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে বাস করা যায় না। অনন্ত নাগ এবং হানেরও একই মত। শুধু তোহা বলল, সাপটা বড় হলেও তার মুখটা ছোট। সেই মুখে সাপটা তাকে গিলে খেতে পারবে না। কাজেই অসুবিধা কি, থাকুক না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে মাসখানিক যেতেই আমাদেরও তোহার মতই মনে হতে লাগল — সাপ এমন ভয়াবহ কিছু না। বরং প্রাণী হিসেবে বেশ মজার।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মস্তিষ্ক অতি ক্ষুদ্র হয়। সে কারণে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নপর্যায়ের হওয়ারই কথা। দেখা গেল আমাদের এই সাপের বুদ্ধিবৃত্তি বেশ উচ্চপর্যায়ের। সে টিভি দেখে। আমাদের মধ্যে একমাত্র তোহার ঘরেই টিভি আছে। টিভি অন করামাত্র মেক্সিকান পাইথন উপস্থিত হয়। সুবিধামত একটা জায়গা দেখে সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। যতক্ষণ টিভি চলে ততক্ষণ সেখান থেকে নড়ে না। তোহার ধারণা, টিভির কিছু বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম যেমন 'বার্নি মিলার', 'থ্রি ইজ কোম্পানি' তার খুব পছন্দ। এই সময় তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়। ফোঁস ফোঁস জাতীয় শব্দ করতে থাকে।

এলিজাবেথ তার পোষা সাপের নাম রাখল রুথ। রুথ বলে ডাকলে সে অবশ্যি ছুটে উপস্থিত হয় না, তবে মেঝেতে আঙুল দিয়ে কয়েকবার টোকা দিলেই ছুটে আসে।

রুথের রসবোধ বেশ প্রখর বলেই আমাদের মনে হল। তার রসবোধের উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। ধরা যাক, বাইরের কোন গেস্ট এসেছে, পা নাচিয়ে বসে জমিয়ে গল্প করছে। রুথ তার নজর এড়িয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হবে। তার পায়ের কাছে এসে হঠাৎ নিমিষের মধ্যে গেস্ট বেচারার দু'পা সে তার শরীর দিয়ে জড়িয়ে ফেলবে। গেস্ট বেচারা ভয়ে-আতঙ্কে যতই চেঁচাবে আমরা ততই হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ব।

অন্যান্য প্রাণী পোষার চেয়ে সাপ পোষার ঝক্কিটি অনেক কম — এ সত্যও সহজেই টের

AMARBOI.COM

পেলাম। তাকে খাওয়ানোর যন্ত্রণা নেই। সপ্তাহে একদিন সে একটা ইঁদুর খায়। সে ইঁদুর আমাদের খাওয়াতে হয় না। আমরা তাকে 'পেট-সপে' নিয়ে যাই। পেট-সপের কর্মচারিরা খাইয়ে দেয়। বিনিময়ে এক ডলার দিতে হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

স্প্রীং কোয়ার্টার শেষ হবার আগে আগে রুথ উধাও হয়ে গেল। আমরা খোঁজাখুঁজির চূড়ান্ত করলাম — লাভ হল না। রুমিং হাউসের সদস্যদের যে কি পরিমাণ মন খারাপ হল বলার না। সবচেয়ে মন খারাপ করল তোহা। প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা। সে গির্জায় মোম জ্বালিয়ে এল। রুথ ফিরল না।

রুথের উপস্থিতিতে যেমন অভ্যস্ত হয়েছিলাম অনুপস্থিতিতেও একসময় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। রুমিং হাউসের সদস্যদের মধ্যে হান চলে গেল নিজের দেশে। হানের জায়গায় থাকতে এল আমেরিকান ছাত্র কার্ল। তোহা এক আমেরিকান কোটিপতিকে বিয়ে করে চলে গেল আটলান্টায়। দিন আগের মতই কাটতে লাগল। বুড়ি এলিজাবেথ ব্যাঞ্জো নামের একটা বাদ্যযন্ত্র কিনে নিয়ে এল। সময়ে অসময়ে সে যন্ত্র বেজে ওঠে। বিরক্তির একশেষ। আমার কোয়ার্টার ফাইনাল মাথার উপর। দম ফেলার সময় নেই। বেবি রুথের কথা আমরা ভুলে গেলাম। মনে রাখার ক্ষমতার মত ভুলে যাবার ক্ষমতাও মানুষের অস্বাভাবিক।

এক সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে উবু হয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি জটিল সমাধান করার চেষ্টা করছি — একেক বার একেক উত্তর হচ্ছে। নিজেকেই নিজে গাধা বলে গালাগালি করছি। তখন বিকট হৈচৈ শুরু হল। বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে সবাই যেমন একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে সেরকম অবস্থা। বই বন্ধ করে ঘরের বাইরে এসে থমকে গেলাম। রুথ ফিরে এসেছে, তবে একা ফেরেনি। তার সঙ্গে কিলবিল করছে গোটা বিশেক সাপের ছানা। সব ক'টি প্রায় এক ফুটের মত লম্বা। বোঝাই যাচ্ছে, রুথ কোথাও গিয়ে ডিম দিয়েছে। বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের খানিকটা বড় করে নিয়ে এসেছে আমাদের দেখাতে।

সাপের ছানাগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। আমরা সবাই বিছানায় পা উঠিয়ে বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। এলিজাবেথ নিজে 'হেল্প, হেল্প' বলে চিৎকার করে গলা ভেঙে ফেলল। বাড়িওয়ালী দমকল বাহিনীকে টেলিফোন করল — আমাদের উদ্ধার করার জন্য।

দমকল বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

সাপ ধরার কলাকৌশল তাদের জানা নেই। তারা খবর দিয়ে অন্য কাদের যেন আনল। সাপ ধরে ধরে পলিথিনের ব্যাগে ভরা শুরু হল। রুথ কোন রকম প্রতিবাদ করল না। সে হয়ত গভীর ভালবাসায় তার বাচ্চগুলোকে আমাদের দেখাতে এনেছিল। বেচারী জানে না — মানুষ শুধু মানুষের ভালবাসাই গ্রহণ করতে পারে — অন্য কারোর ভালবাসা গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

AMARBOI.COM

চোখ

ভোর ছ'টায় কেউ কলিং বেল টিপতে থাকলে মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। মিসির আলির মেজাজ তেমন বিগড়াল না। ভোর দশটা পর্যন্ত কেন জানি তাঁর মেজাজ বেশ ভাল থাকে। দশটা থেকে খারাপ হতে থাকে, চূড়ান্ত রকমের খারাপ হয় দু'টার দিকে। তারপর আবার ভাল হতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে অসম্ভব ভাল থাকে। তারপর আবার খারাপ হতে শুরু করে। ব্যাপারটা শুধু তাঁর বেলায় ঘটে না সবার বেলায়ই ঘটে তা তিনি জানেন না। প্রায়ই ভাবেন একে ওকে জিজ্ঞেস করবেন— শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়ে উঠে না। তাঁর চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিক হচ্ছে পরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন, কথা বলতে ভালও লাগে। সেদিন রিকশা করে আসতে আসতে রিকশাওলায়ার সঙ্গে অতি উচ্চ শ্রেণীর কিছু কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। রিকশাওয়ালার বক্তব্য হচ্ছে— পৃথিবীতে যত অশান্তি সবের মূলে আছে মেয়েছেলে।

মিসির আলি বললেন, এই রকম মনে হওয়ার কারণ কি?

রিকশাওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, চাচামিয়া এই দেহেন আমারে। আইজ আমি রিকশা চালাই। এর কারণ কি? এর কারণ বিবি হাওয়া। বিবি হাওয়া যদি কুবুদ্ধি দিয়া বাবা আদমরে গন্ধম ফল না খাওয়াইতো তা হইলে আইজ আমি থাকতাম বেহেশতে। বেহেশতে তো আর রিকশা চালানীর কোন বিষয় নাই, কি কন চাচামিয়া? গন্ধম ফল খাওয়ানির কারণেই তো আইজ আমি দুনিয়ায় আইসা পড়লাম।

মিসির আলি রিকশাওয়ালার কথাবার্তায় চমৎকৃত হলেন। পরবর্তী দশ মিনিট তিনি রিকশাওয়ালাকে যা বললেন, তার মূল কথা হল — নারীর কারণে আমরা যদি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকি তাহলে নারীই পারে আবার আমাদের স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

রিকশাওয়ালা কি বুঝল কে জানে। তার শেষ বক্তব্য ছিল — যাই কন চাচামিয়া, মেয়েমানুষ আসলে সুবিধার জিনিস না।

কলিং বেল আবার বাজছে।

মিসির আলি বেল টেপার ধরন থেকে অনুমান করতে চেষ্টা করলেন — কে হতে পারে।

ভিখিরি হবে না। ভিখিরিরা এত ভোরে বের হয় না । ভিক্ষাবৃত্তি যাদের পেশা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে গভীর রাতে ঘুমুতে যায়, ঘুম ভাঙতে সেই কারণেই দেরি হয়। পরিচিত কেউ হবে না। পরিচিতরা এত ভোরে আসবে না। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারে এমন ঘনিষ্ঠতা তাঁর কারো সঙ্গেই নেই।

যে এসেছে, সে অপরিচিত। অবশ্যই মহিলা। পুরুষরা কলিং বেলের বোতাম অনেকক্ষণ

AMARBOI.COM

চেপে ধরে থাকে। মেয়েরা তা পারে না। মেয়েটির বয়স অল্প তাও অনুমান করা যাচ্ছে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ছটফটে ভাব থাকে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার বেল টিপবে। নিজেদের অস্থিরতা ছড়িয়ে দেবে কলিং বেলে।

মিসির আলি, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে দরজা খুললেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে–মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাট একজন মানুষ। গায়ে সাফারি। চোখে সানগ্লাস। এত ভোরে কেউ সানগ্লাস পরে না। এই লোকটি কেন পরেছে কে জানে।

'স্যার স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনার নাম কি মিসির আলি?'

'জ্বি।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি কি বলবেন মনস্থির করতে পারলেন না। লোকটিকে তিনি পছন্দ করছেন না, তবে তার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ করছেন — যা তাঁর ভাল লাগছে। আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা আজকাল আর দেখাই যায় না।

লোকটি শান্ত গলায় বলল, আমি আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করব ঠিকই তবে তার জন্যে আমি পে করব।

'পে করবেন?'

'জ্বি। প্রতি ঘণ্টায় আমি আপনাকে এক হাজার করে টাকা দেব। আশা করি আপনি আপত্তি করবেন না। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন।'

লোকটি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, মনে হচ্ছে আপনার এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।

মিসির আলি বললেন, ঘণ্টা হিসেবে আপনি যে আমাকে টাকা দেবেন — সেই হিসেব কি এখন থেকে শুরু হবে? না-কি হাত-মুখ ধুয়ে আপনার সামনে বসার পর থেকে শুরু হবে?

লোকটি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, টাকার কথায় আপনি কি রাগ করেছেন?

'রাগ করিনি। মজা পেয়েছি। চা খাবেন?'

'খেতে পারি। দুধ ছাড়া।'

মিসির আলি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, এক কাজ করুন — রান্নাঘরে চলে যান। কেতলি বসিয়ে দিন। দু'কাপ বানান। আমাকেও এক কাপ দেবেন।

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আমাকে ঘণ্টা হিসেবে পে করবেন বলে যেভাবে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও ঠিক একই ভাবে আপনাকে হকচকিয়ে দিলাম। বসুন, চা বানাতে হবে না। সাতটার সময় রাস্তার ওপাশের রেস্টুরেন্ট থেকে আমার জন্যে চা- নাশতা আসে। তখন আপনার জন্যেও চা আনিয়ে দেব।

AMARBOI.COM

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'আপনি কথা বলার সময় বারবার বাঁ দিকে ঘুরছেন, আমার মনে হচ্ছে আপনার বাঁ চোখটা নষ্ট। এই জন্যেই কি কালো চশমা পরে আছেন?'

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললনে, হ্বি। আমার বাঁ চোখটা পাথরের।

ভদ্রলোক সোফার এক কোণে বসলেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, লোকটি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে। চাকরির ইন্ট্যারভ্যু দিতে এলে ক্যানডিডেটরা যে ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে অবিকল সেই ভঙ্গি। মিসির আলি বললেন, আজকের খবরের কাগজ এখনো আসেনি। গতদিনের কাগজ দিতে পারি। যদি আপনি চোখ বুলাতে চান।

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না। একা একা বসে থেকে আমার অভ্যাস আছে। আমার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। শুরুতে টাকা দেয়ার কথা বলে যদি আপনাকে আহত করে থাকি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।'

মিসির আলি টুথব্রাশ হাতে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। লোকটিকে তার বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর সমস্যা নিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। আজকাল অকারণেই কিছু লোকজন এসে তাঁকে বিরক্ত করা শুরু করেছে। মাসখানিক আগে একজন এসেছিল ভূতবিশারদ। সে না-কি গবেষণাধর্মী একটি বই লিখছে, যার নাম "বাংলার ভূত"। এ দেশে যত ধরনের ভূত পেত্নী আছে সবার নাম, আচার-ব্যবহার বই-এ লেখা। মেছো ভূত, গেছো ভূত, জলা ভূত, শাকচুন্নি, কন্ধকাটা, কুনী ভূত, আঁধি ভূত . . . । সর্বমোট একশ' ছ'রকমের ভূত।

মিসির আলি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ভাই আমার কাছে কেন? আমি সারাজীবন ভূত নেই এইটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি . . . ।

সেই লোক মহা উৎসাহী হয়ে বলল, কোন্ কোন্ ভূত নেই বলে প্রমাণ করেছেন— এইটা কাইগুলি বলুন। আমার কাছে ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। আমি টেপ করে নেব।

সানগ্লাস পরা বেঁটে ভদ্রলোক সেই পদের কেউ কিনা কে বলবে?

AMARBOI.COM

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মিসির আলি বললেন, ভাই বলুন কি ব্যাপার।

'প্রথমেই আমার নাম বলি — এখনো আমি আপনাকে আমার নাম বলিনি। আমার নাম রাশেদুল করিম। আমেরিকার টেক্সাস এম এণ্ড এন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের আমি একজন অধ্যাপক। বর্তমানে এক বছরের স্যাবোটিক্যাল লীভে দেশে এসেছি। আপনার খোঁজ কিভাবে এবং কার কাছে পেয়েছি তা কি বলব?'

'তার দরকার নেই। কি জন্যে আমার খোঁজ করছেন সেটা বলুন।'

'আমি কি ধূমপান করতে পারি? সিগারেট খেতে খেতে কথা বললে আমার জন্যে সুবিধা হবে। সিগারেটের ধোঁয়া এক ধরনের আড়াল সৃষ্টি করে।'

'আপনি সিগারেট খেতে পারেন, কোন অসুবিধা নেই।'

'ছাই কোথায় ফেলব? আমি কোন এসট্রে দেখতে পাচ্ছি না।'

'মেঝেতে ফেলুন। আমার গোটা বাড়িটাই একটা এসট্রে।'

রাশেদুল করিম সিগারেট ধরিয়েই কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর গলার স্বর ভারী এবং

স্পষ্ট। কথাবার্তা খুব গোছানো। কথা শুনে মনে হয় তিনি কি বলবেন তা আগে- ভাগেই জানেন। কোন্ বাক্যটির পর কোন্ বাক্য বলবেন তাও ঠিক করা। যেন ক্লাসের বক্তৃতা। আগে থেকে ঠিকঠাক করা। প্রবাসী বাঙালীরা একনাগাড়ে বাংলায় কথা বলতে পারেন না — ইনি তা পারছেন।

'আমার বয়স এই নভেম্বরে পঞ্চাশ হবে। সম্ভবত আমাকে দেখে তা বুঝতে পারছেন না। আমার মাথার চুল সব সাদা। কলপ ব্যবহার করছি গত চার বছর থেকে। আমার স্বাস্থ্য ভাল। নিয়মিত ব্যায়াম করি। মুখের চামড়ায় এখনো ভাঁজ পড়ে নি। বয়সজনিত অসুখ-বিসুখ কোনটাই আমার নেই। আমার ধারণা শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে আমার কর্মক্ষমতা এখনো একজন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকের মত। এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আজ আমার গায়েহলুদ। মেয়ে পক্ষীয়রা সকাল নটায় আসবে। আমি ঠিক আটটায় এখান থেকে যাব। আটটা পর্যন্ত সময় কি আমাকে দেবেন?'

'দেব। ভাল কথা, এটা নিশ্চয়ই আপনার প্রথম বিবাহ না। এর আগেও আপনি বিয়ে করেছেন?'

'জ্বি। এর আগে একবার বিয়ে করেছি। এটি আমার দ্বিতীয় বিবাহ। আমি আগেও বিয়ে করেছি তা কি করে বললেন?'

'আজ আপনার গায়েহলুদ তা খুব সহজভাবে বললেন। দেখে অনুমান করলাম। বিয়ের তীব্র উত্তেজনা আপনার মধ্যে দেখতে পাইনি।'

'সব মানুষ তো এক রকম নয়। একেক জন একেক রকম। উত্তেজনার ব্যাপারটি আমার মধ্যে একেবারেই নেই। প্রথমবার যখন বিয়ে করি তখনো আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না। সেদিনও আমি যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি। গ্রুপ থিওরীর উপর এক ঘণ্টার লেকচার দিয়েছি।'

'ঠিক আছে আপনি বলে যান।'

রাশেদুল করিম শান্ত গলায় বললেন, আপনার ভেতর একটা প্রবণতা লক্ষ করছি — আমাকে আর দশটা মানুষের দলে ফেলে বিচার করার চেষ্টা করছেন। দয়া করে তা করবেন না। আমি আর দশজনের মত নই।

'আপনি শুরু করুন।'

'অংকশাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রী নিয়ে আমি আমেরিকা যাই পি-এইচ.ডি. করতে। এম.এ-তে আমার রেজাল্ট ভাল ছিল না। টেনেটুনে সেকেণ্ড ক্লাস। প্রাইভেট কলেজে কলেজে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন বন্ধুদের দেখাদেখি জি-আর-ই পরীক্ষা দিয়ে ফেললাম। জি-আর-ই পরীক্ষা কি তা কি আপনি জানেন? গ্রাজুয়েট রেকর্ড একজামিনেশন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে হলে এই পরীক্ষা দিতে হয়।'

'আমি জানি।'

'এই পরীক্ষায় আমি আশাতীত ভাল করে ফেললাম। আমেরিকান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণ চলে এল। চলে গেলাম। পি-এইচ.ডি. করলাম প্রফেসর হোবলের সঙ্গে। আমার পি-এইচ.ডি. ছিল গ্রুপ থিওরীর একটি শাখায় — নন এ্যাবেলিয়ান

AMARBOI.COM

ফাংশানের উপর। পি-এইচ.ডি.-র কাজ এতই ভাল হল যে আমি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। অংক নিয়ে বর্তমান কালে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা সবাই আমার নাম জানেন। অংকশাস্ত্রের একটি ফাংশান আছে যা আমার নামে পরিচিত। আর কে এক্সপোনেনশিয়াল। আর কে হচ্ছে রাশেদুল করিম।

পি-এইচ.ডি.-র পরপরই আমি মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলাম। সেই বছরই বিয়ে করলাম। মেয়েটি মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের ছাত্রী — স্প্যানীশ আমেরিকান। নাম, জুডি বারনার।

'প্রেমের বিয়ে?'

'প্রেমের বিয়ে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। বাছাবাছির বিয়ে বলতে পারেন। জুডি অনেক বাছাবাছির পর আমাকে পছন্দ করল।'

'আপনাকে পছন্দ করার কারণ কি?'

'আমি ঠিক অপছন্দ করার মত মানুষ সেই সময় ছিলাম না। আমার একটি চোখ পাথরের ছিল না। চেহারা তেমন ভাল না হলেও দু'টি সুন্দর চোখ ছিল। আমার মা বলতেন, রাশেদের চোখে জন্ম-কাজল পরানো। সুন্দর চোখের ব্যাপারটা অবশ্য ধর্তব্য নয়। আমেরিকান তরুণীরা প্রেমিকদের সুন্দর চোখ নিয়ে মাথা ঘামায় না — তারা দেখে প্রেমিক কি পরিমাণ টাকা করেছে এবং ভবিষ্যতে কি পরিমাণ টাকা সে করতে পারবে। সেই দিক দিয়ে আমি মোটামুটি আদর্শ স্থানীয় বলা চলে। ত্রিশ বছর বয়সে একটি আমেরিকান বিশবিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছি। ট্যানিউর পেতেও কোন সমস্যা হবে না। জুডি স্বামী হিসেবে আমাকে নির্বাচন করল। আমার দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। জুডি চমৎকার একটি মেয়ে। শত বৎসর সাধনার ধন হয়ত নয় তবে বিনা সাধনায় পাওয়ার মত মেয়েও নয়।

বিয়ের সাতদিনের মাথায় আমরা হানিমুন করতে চলে গেলাম সানফ্রান্সিসকো। উঠলাম হোটেল বেডফোর্ডে। দ্বিতীয় রাত্রির ঘটনা। ঘুমুচ্ছিলাম। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি জুডি পাশে নেই। ঘড়িতে রাত তিনটা দশ বাজছে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা ধাক্কা দিয়ে বললাম, কি হয়েছে? জুডি কি হয়েছে? কান্না থেমে গেল। তবে জুডি কোন জবাব দিল না।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সে দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, কি হয়েছে?

সে ক্ষীণ স্বরে বলল, ভয় পেয়েছি।

'কিসের ভয়?'

'জানি না কিসের ভয়।'

'ভয় পেয়েছ তো আমাকে ডেকে তোলনি কেন? বাথরুমের দরজা বন্ধ করেছিলে কেন?'

জুডি জবাব দিল না। এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, ব্যাপারটা কি আমাকে খুলে বল তো?

'সকালে বলব।'

AMARBOI.COM

'না, এখনি বল। কি দেখে ভয় পেয়েছ?'

জুডি অস্পষ্ট স্বরে বলল, তোমাকে দেখে।

'আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ মানে? আমি কি করেছি?'

জুডি যা বলল তা হচ্ছে — রাতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। হোটেলের ঘরে নাইট লাইট জ্বলছিল, এই আলোয় সে দেখে তার পাশে যে শুয়ে আছে সে কোন জীবন্ত মানুষ নয়। মৃত মানুষ। যে মৃত মানুষের গা থেকে শবদেহের গন্ধ বেরুচ্ছে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে তবু সাহসে হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করেই চমকে উঠে, কারণ মানুষটার শরীর বরফের মতই শীতল। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমি মারা গেছি। তার জন্যে এটা বড় ধরনের শক হলেও সে যথেষ্ট সাহস দেখায় — টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দেয় এবং হোটেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করবার জন্যে টেলিফোন সেট হাতে তুলে নেয়। ঠিক তখন সে লক্ষ্য করে মৃতদেহের দু'টি বন্ধ চোখের একটি ধীরে ধীরে খুলছে। সেই একটিমাত্র খোলা চোখ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জুডি টেলিফোন ফেলে দিয়ে ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এই হল ঘটনা।

রাশেদুল করিম কথা শেষ করে সিগারেট ধরালেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। আমি বললাম, থামলেন কেন?

'সাতটা বেজেছে। আপনি বলেছেন সাতটার সময় আপনার জন্যে চা আসে। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। চা খেয়ে শুরু করব। আমার গল্প শুনতে আপনার কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং। এই গল্প কি আপনি অনেকের সঙ্গে করেছেন? আপনার গল্প বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে, অনেকের সঙ্গেই এই গল্প করেছেন।'

'আপনার অনুমান সঠিক। ছ' থেকে সাতজনকে আমি বলেছি। এর মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। পুলিশের লোক আছে।'

'পুলিশের লোক কেন?'

'গল্প শেষ করলেই বুঝতে পারবেন পুলিশের লোক কি জন্যে।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে পরোটা ভাজি। মিসির আলি নাশতা করলেন। রাশেদুল করিম সাহেব পর পর দু'কাপ চা খেলেন।

'আমি কি শুরু করব?'

'জ্বি, শুরু করুন।'

"আমাদের হানিমুন মাত্র তিনদিন স্থায়ী হল। জুডিকে নিয়ে পুরানো জায়গায় চলে এলাম। মনটা খুবই খারাপ। জুডির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। রোজ রাতে সে ভয়ংকর চিৎকার করে উঠে। ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমি যখন জেগে উঠে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাই তখন সে এমনভাবে তাকায় যেন আমি একটা পিশাচ কিংবা মূর্তিমান শয়তান। আমার দুঃখের কোন সীমা রইল না। সেই সময় নন এবেলিয়ান গ্রুপের উপর একটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলাম। আমার দরকার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার মত পরিবেশ। মানসিক শান্তি। সব দূর হয়ে গেল। অবশ্যি দিনের বেলায় জুডি স্বাভাবিক। সে

AMARBOI.COM

বদলাতে শুরু করে সূর্য ডুবার পর থেকে। আমি তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাইকিয়াট্রিস্ট প্রথমে সন্দেহ করলেন সমস্যা ড্রাগঘটিত। হয়ত জুডি ড্রাগে অভ্যস্ত। সেই সময় বাজারে হেলুসিনেটিং ড্রাগ এল এস ডি প্রথম এসেছে। শিল্প সাহিত্যের লোকজন শখ করে এই ড্রাগ খাচ্ছেন। বড় গলায় বলছেন — মাইণ্ড অলটারিং ট্রিপ নিয়ে এসেছি। জুডি ফাইন আর্টস-এর ছাত্রী। ট্রিপ নেয়া তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক না।

দেখা গেল ড্রাগঘটিত কোন সমস্যা তার নেই। সে কখনো ড্রাগ নেয়নি। সাইকিয়াট্রিস্টরা তার শৈশবের জীবনে কোন সমস্যা ছিল কি-না তাও বের করতে চেষ্টা করলেন। লাভ হল না। জুডি এসেছে গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে। এ ধরনের পরিবারে তেমন কোন সমস্যা থাকে না। তাদের জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বাভাবিক।

সাইকিয়াট্রিস্ট জুডিকে ঘুমের অষুধ দিলেন। কড়া ডোজের ফেনোবারবিটন। আমাকে বললেন, আপনি সম্ভবত লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ করে নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি যতটা সময় দেয়া দরকার তা দিচ্ছেন না। আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর এক ধরনের ক্ষোভ জন্মগ্রহণ করেছে। সে যা বলছে তা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।

জুডির কথা একটাই — আমি ঘুমুবার পর আমার দেহে প্রাণ থাকে না। একজন মৃত মানুষের শরীর যেমন অসাড় পড়ে থাকে আমার শরীরও সে রকম পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে মানুষ হাত নাড়ে, পা নাড়ে — আমি তার কিছুই করি না। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলি না। গা হয়ে যায় বরফের মত শীতল। এক সময় গা থেকে মৃত মানুষের শরীরের পচা গন্ধ বেরুতে থাকে এবং তখন আচমকা আমার বাঁ চোখ খুলে যায়। সেই চোখে আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই চোখের দৃষ্টি সাপের মত কুটিল।

জুডির কথা শুনে আমার ধারণা হল হতেও তো পারে। জগতে কত রহস্যময় ব্যাপারই তো ঘটে। হয়ত আমার নিজেরই কোন সমস্যা আছে। আমিও ডাক্তারের কাছে গেলাম। স্লীপ এ্যানালিস্ট। জানার উদ্দেশ্য একটিই — ঘুমের মধ্যে আমার কোন শারীরিক পরিবর্তন হয় কি-না। ডাক্তাররা পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করলেন। একবার না বারবার করলেন। দেখা গেল আমার ঘুম আর দশটা মানুষের ঘুমের চেয়ে আলাদা নয়। ঘুমের মধ্যে আমিও হাত-পা নাড়ি। অন্য মানুষদের যেমন ঘুমের তিনটি স্তর পার হতে হয়, আমারো হয়। ঘুমের সময় আর দশটা মানুষের মত আমার শরীরের উত্তাপও আধ ডিগ্রী হ্রাস পায়। আমিও অন্য সবার মত স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখি।

জুডি সব দেখেশুনে বলল, ডাক্তাররা জানে না। ডাক্তাররা কিছুই জানে না। আমি জানি। তুমি আসলে মানুষ না। দিনের বেলা তুমি মানুষ থাক — সূর্য ডোবার পর থাক না।

আমি কি হই?

তুমি পিশাচ বা এই জাতীয় কিছু হয়ে যাও।

আমি বললাম, এইভাবে তো বাস করা সম্ভব না। তুমি বরং আলাদা থাক।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, জুডি তাতে রাজি হল না। অতি তুচ্ছ কারণে আমেরিকানদের বিয়ে ভাঙে। স্বামীর পছন্দ হলুদ রঙের বিছানার চাদর, স্ত্রীর পছন্দ নীল রঙ। ভেঙে গেল

AMARBOI.COM

বিয়ে। আমাদের এত বড় সমস্যা কিন্তু বিয়ে ভাঙলো না। আমি বেশ কয়েকবার তাকে বললাম, জুডি তুমি আলাদা হয়ে যাও। ভাল দেখে একটা ছেলেকে বিয়ে কর। সারা জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে। তুমি এইভাবে জীবনটা নষ্ট করতে পার না।

জুডি প্রতিবারই বলে, যাই হোক, যত সমস্যাই হোক আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, I love you. I love you.

আমি গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষ অংশটি বলার আগে আমি আপনাকে আমার চোখের দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। দয়া করে আমার চোখের দিকে তাকান।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস খুলে ফেললেন। মিসির আলি তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনার চোখ সুন্দর। সত্যি সুন্দর। আপনার মা যে বলতেন — চোখে জন্ম-কাজল, ঠিকই বলতেন।

রাশেদুল করিম বললেন, পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর চোখ কার ছিল জানেন?

'ক্লিওপেট্রার'।

'অধিকাংশ মানুষের তাই ধারণা। এ ধারণা সত্যি নয়। পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর চোখ ছিল বুদ্ধদেবের পুত্র কুনালের। ইংরেজ কবি শেলীর চোখও খুব সুন্দর ছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর চোখ আমার। জুডি বলত এই চোখের কারণেই সে কোনদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

রাশেদুল করিম সানগ্লাস চোখে দিয়ে বললেন, গল্পের শেষ অংশ বলার আগে আপনাকে ক্ষুদ্র ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, কি জন্যে বলুন তো?

'কাউকে যখন আমি আমার চোখের দিকে তাকাতে বলি, সে আমার পাথরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি প্রথম ব্যক্তি যিনি একবারও আমার পাথরের চোখের দিকে তাকান নি। আমার আসল চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। So nicc of you, Sir.'

রাশেদুল করিমের গলা মুহূর্তের জন্যে হলেও ভারী হয়ে গেল। তিনি অবশ্যি চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আটটা প্রায় বাজতে চলল, গল্পের শেষটা বলি–

"জুডির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কড়া ডোজের ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমুতে যায়, দু'এক ঘণ্টা ঘুম হয়, বাকি রাত জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এমনি এক রাতের ঘটনা। জুলাই মাস। রাত সাড়ে তিনটার মত হবে। জুডির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল — সে আমার বাঁ চোখটা গেলে দিল।

আমি ঘুমুচ্ছিলাম, নারকীয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। সেই ভয়াবহ কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।"

রাশেদুল করিম চুপ করলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, কি দিয়ে চোখ গেলে দিলেন?

'সুঁচালো পেনসিল দিয়ে। আমার মাথার বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল থাকে। তখন গ্রুপ থিওরী নিয়ে গভীর চিন্তায় ছিলাম। মাথায় যদি হঠাৎ কিছু আসে — তা লিখে ফেলার জন্যে বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল রাখতাম।'

AMARBOI.COM

'আপনার স্ত্রী এ ঘটনা প্রসঙ্গে কি বক্তব্য দিয়েছেন।'

'তার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই বলেনি, শুধু চিৎকার করেছে। তার একটিই বক্তব্য — এই লোকটা পিশাচ। আমি প্রমাণ পেয়েছি। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

'কি প্রমাণ আছে তা-কি কখনো জিজ্ঞেস করা হয়েছে?'

'না। একজন উন্মাদকে প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া আমি তখন ছিলাম হাসপাতালে। আমি হাসপাতালে থাকতে থাকতেই জুডির মৃত্যু হয়।'

'স্বাভাবিক মৃত্যু?'

'না। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সে মারা যায় ঘুমের অষুধ খেয়ে। এইটুকুই আমার গল্প। আমি আপনার কাছে একটাই অনুরোধ নিয়ে এসেছি, আপনি সমস্যাটা কি বের করবেন। আমাকে সাহায্য করবেন। আমি যদি পিশাচ হই তাও আমাকে বলবেন। এই ফাইলের ভেতর জুডির একটা স্কেচ বুক আছে। স্কেচ বুকে নানান ধরনের কমেন্টস লেখা আছে। এই কমেন্টসগুলি পড়লে জুডির মানসিক অবস্থা আঁচ করতে আপনার সুবিধা হতে পারে। আটটা বাজে, আমি তাহলে উঠি?'

'আবার কবে আসবেন?'

'আগামীকাল ভোর ছ'টায়। ভাল কথা, আমার এই গল্পে কোথাও কি প্রকাশ পেয়েছে জুডিকে আমি কতটা ভালবাসতাম?'

'না— প্রকাশ পায় নি।'

'জুডির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল সীমাহীন। আমি এখন উঠছি।'

'ছিল বলছেন কেন? এখন কি নেই?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

রাশেদুল করিম চলে যাবার পর মিসির আলি ফাইল খুললেন। ফাইলের শুরুতেই একটা খাম। খামের উপর মিসির আলির নাম লেখা।

মিসির আলি খাম খুললেন। খামের ভেতর ইংরেজীতে একটা চিঠি লেখা। সঙ্গে চারটি একশ' ডলারের নোট। চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সার্ভিসের জন্য সম্মানী বাবদ সামান্য কিছু দেয়া হল। গহণ করলে খুশি হব।

বিনীত

আর করিম।

।।২।।

মিসির আলি স্কেচ বুকের প্রতিটি পাতা সাবধানে ওল্টালেন। চারকোল এবং পেনসিলে স্কেচ আঁকা। প্রতিটি স্কেচের নিচে আঁকার তারিখ। স্কেচের বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, সবই ঘরোয়া জিনিস — এক জোড়া জুতা, মলাট ছেঁড়া বই, টিভি, বুক শেলফ। স্কেচ বুকের শেষের দিকে শুধুই চোখের ছবি। বিড়ালের চোখ, কুকুরের চোখ, মাছের চোখ এবং মানুষের

AMARBOI.COM

চোখ। মানুষের চোখের মডেল যে রাশেদুল করিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না । না বললেও ছবির নিচের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। মন্তব্যগুলি বেশ দীর্ঘ। যেমন একটি মন্তব্য —

আমি খুব মন দিয়ে আমার স্বামীর চোখ লক্ষ্য করছি। মানুষের চোখ একেক সময় একেক রকম থাকে। ভোরবেলার চোখ এবং দুপুরের চোখ এক নয়। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম চোখের আইরিশের ট্রান্সপারেন্সি মুডের উপর বদলায়। বিষাদগ্রস্ত মানুষের চোখের আইরিশ থাকে অস্বচ্ছ। মানুষ যতই আনন্দিত হতে থাকে তার চোখের আইরিশ ততই স্বচ্ছ হতে থাকে। আমার এই অবজারভেশন কতটুকু সত্য তা বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি মাঝে মাঝে তার মনের অবস্থাও লিখেছে — অনেকটা ডায়েরী লেখার ভঙ্গিতে। মনে হয় হাতের কাছে ডায়েরী না থাকায় স্কেচ বুকে লিখে রেখেছে। সব লেখাই পেনসিলে। প্রচুর কাটাকুটি আছে। কিছু লাইন রাবার ঘষে তুলেও ফেলা হয়েছে।

১৮.৪.৮২

আমি ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। নিজেকে বুঝানোর চেষ্টা করছি — এই ভয় অমূলক। বুঝাতে পারছি না। আমি আমার স্বামীকে ভয় পাচ্ছি এই তথ্য স্বভাবতই স্বামী বেচারার জন্য সুখকর না। সে নানাভাবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু চেষ্টা বেশ হাস্যকর। আজ আমাকে বলল, জুডি আমি ঠিক করেছি — এখন থেকে রাতে ঘুমুব না। আমার অংকের সমস্যা নিয়ে ভাবব। লেখালেখি করব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। আমি দিনের বেলায় ঘুমুব। একজন মানুষের জন্যে চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। নেপোলীয়ান মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমুতেন।

আমি এই গম্ভীর, স্বল্পভাষী লোকটিকে ভালবাসি। ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আমি চাই না, আমার কোন কারণে সে কষ্ট পাক। কিন্তু সে কষ্ট পাচ্ছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। হে ঈশ্বর, তুমি আমার মন শান্ত কর। আমার ভয় দূর করে দাও।

AMARBOI.COM

২১.৪.৮২

যে জিনিস খুব সুন্দর তা কত দ্রুত অসুন্দর হতে পারে — বিস্মিত হয়ে আমি তাই দেখছি। রাশেদের ধারণা আমি অসুস্থ। সত্যি কি অসুস্থ? আমার মনে হয় না। কারণ এখনো ছবি আঁকতে পারছি। একজন অসুস্থ মানুষ আর যাই পারুক — ছবি আঁকতে পারে না। গত দু'দিন ধরে ওয়াটার কালারে বাসার সামনের চেরী গাছের ফুল ধরতে চেষ্টা করছিলাম। আজ সেই ফুল কাগজে বন্দি করেছি। অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাল হয়েছে। রাশেদ ছবি তেমন বুঝে বলে মনে হয় না — সেও মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর বলল, আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব, বিশবিদ্যালয় থেকে অবসর নেব, তখন তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে। এই কথাটি সে আজ প্রথম বলেনি। আগেও বলেছে। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেছে। কেউ যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলে তখন তা টের পাওয়া যায়। আমার মনে হয় না সে কোনদিন ছবি আঁকবে। তার মাথায় অংক ছাড়া কিছুই নেই।

২১.৫.৮২

আমি ছবি আঁকতে পারছি না। যেখানে নীল রঙ চড়ানো দরকার সেখানে গাঢ় হলুদ রঙ বসাচ্ছি। ডাক্তার সিডেটিভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ মাথা ঝিম ধরে থাকে। কেন জানি খুব বমি হচ্ছে।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমুলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেললাম । সুন্দর স্বপ্ন আমি অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। অনেকদিন দেখি না। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? শুনেছি পাগলরাই একই কথা বার বার লেখে। কারণ তাদের মাথায় একটি বাক্যই বার বার ঘুরপাক খায়।

বৃহস্পতিবার কিংবা বুধবার —

আজ কত তারিখ আমি জানি না। বেশ কয়েকদিন ধরেই দিন–তারিখে গণ্ডগোল হচ্ছে। আজ কত তারিখ তা জানার কোন রকম আগ্রহ বোধ করছি না। তবে মনের অবস্থা লেখার চেষ্টা করছি যাতে পরবর্তী সময়ে কেউ আমার লেখা পড়ে বুঝবে যে মাথা খারাপ হবার সময় একজন মানুষ কী ভাবে। কী চিন্তা করে।

মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, আলো অসহ্য হওয়া। আমি এখন আলো সহ্য করতে পারি না। দিনের বেলায় দরজা–জানালা বন্ধ করে রাখি। ঘর অন্ধকার বলেই প্রায় অনুমানের উপর নির্ভর করে আজকের এই লেখা লিখছি। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, সারাক্ষণ শরীরে এক ধরনের জ্বালা অনুভব করা। মনে হয় সব কাপড় খুলে নগ্নভাবে শুয়ে থাকতে পারলে ভাল লাগত। আমার আগে যারা পাগল হয়েছে তাদেরও কি এমন হয়েছে? জানার জন্যে পাবলিক লাইব্রেরীতে টেলিফোন করেছিলাম। আমি খুব সহজভাবে বললাম, আচ্ছা আপনাদের এখানে পাগলের লেখা কোন বই আছে?

যে মেয়েটি টেলিফোন ধরেছিল সে বিস্মিত হয়ে বলল, পাগলের লেখা বই বলতে কি বুঝাচ্ছেন?

'মানসিক রুগীদের লেখা বই।'

'মানসিক রুগীরা বই লিখবে কেন?'

'কেন লিখবে না। আমি তো লিখছি, বই অবশ্যি নয় — ডায়েরীর আকারে লেখা।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে আপনার বই ছাপা হোক। ছাপা হবার পর অবশ্যই আমরা আপনার বই–এর কপি সংগ্রহ করব।'

আমি মনে মনে হাসলাম। মেয়েটি আমাকে উন্মাদ ভাবছে। ভাবুক উন্মাদকে উন্মাদ ভাববে না তো কি ভাববে?

রাত দু'টা দশ —

আমার মা, এই কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করলেন। দুপুর রাতে তাঁর টেলিফোন করার বদঅভ্যাস আছে। আমার মা'র অনিদ্রা রোগ আছে। কাজেই তিনি মনে করেন পৃথিবীর সবাই অনিদ্রা রুগী। যাই হোক, আমি জেগে ছিলাম। মা বললেন, জুডি তুই আমার কাছে চলে আয়। আমি বললাম, না রাশেদকে ফেলে আমি যাব না।

AMARBOI.COM

মা বললেন, আমি তো শুনলাম ওকে নিয়েই তোর সমস্যা।

'ওকে নিয়ে আমার কোন সমস্যা নেই মা। **I love him, I love him, I love him.**

'চিৎকার করছিস কেন?'

'চিৎকার করছি না। মা' টেলিফোন রাখি। কথা বলতে ভাল লাগছে না।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। রাশেদকে ফেলে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আমার ধারণা রাশেদ নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেও এখন রাতে ঘুমায় না। গ্রুপ থিওরীর যে সমস্যাটি নিয়ে সে ভাবছিল, সেই সমস্যার সমাধান অন্য কে না-কি বের করে ফেলেছে। জার্নালে ছাপা হয়েছে। সে গত পরশু ঐ জার্নাল পেয়ে কুচি কুচি করে ছিড়েছে। শুধু তাই না — বারান্দার এক কোণায় বসে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে শুরু করেছে। আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য তার কাছে গিয়ে চমকে উঠলাম। সে কাঁদছে ঠিকই কিন্তু তার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ডান চোখ শুকনো।

আমি তাকে কিছু বললাম না। কিন্তু সে আমার চাউনি থেকেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। নীচু গলায় বলল, জুডি, ইদানীং এই ব্যাপারটা হচ্ছে — মাঝে মাঝেই দেখছি বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

কথাগুলি বলার সময় তাকে এত অসহায় লাগছিল যে আমার ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে বলি — **I love you, I love you, I love you.**

হে ঈশ্বর। হে পরম করুণাময় ঈশ্বর। এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে তুমি আমাদের দু'জনকে উদ্ধার কর।

স্কেচ বুকের প্রতিটি লেখা বার বার পড়ে মিসির আলি খুব বেশি তথ্য বের করতে পারলেন না, তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা জানা গেল তা হচ্ছে — মেয়েটি তার স্বামীকে ভালবাসে। যে ভালবাসায় এক ধরনের সারল্য আছে।

স্কেচ বুকে কিছু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কথাবার্তাও আছে। স্প্যানিশ ভাষা না জানার কারণে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হল না। তবে এই লেখাগুলি যেভাবে সাজানো তাতে মনে হচ্ছে — কবিতা কিংবা গান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটে স্কেচ বুক নিয়ে গেলেই ওরা পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবে — তবে মিসির আলির মনে হল তার প্রয়োজন নেই। যা জানার তিনি জেনেছেন। এর বেশি কিছু জানার নেই।

AMARBOI.COM

।।৩।।

রাশেদুল করিম ঠিক ছ'টায় এসেছেন। মনে হচ্ছে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক ছ'টা বাজার পর কলিং বেলে হাত রেখেছেন। মিসির আলি দরজা খুলে বললেন, আসুন।

রাশেদুল করিমের জন্যে সামান্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তার জন্যে টেবিলে দুধ ছাড়া চা। মিসির আলি বললেন, আপনি কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় আসবেন বলে ধারণা করেই চা বানিয়ে রেখেছি। লিকার কড়া হয়ে গেছে বলে আমরা ধারণা। খেয়ে দেখুন তো।

রাশেদুল করিম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

মিসির আলি নিজের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, আপনাকে একটা কথা শুরুতেই বলে নেয়া দরকার। আমি মাঝে মাঝে নিজের শখের কারণে — সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি। তার জন্যে কখনো অর্থ গ্রহণ করি না। আমি যা করি তা আমার পেশা না— নেশা বলতে পারেন। আপনার ডলার আমি নিতে পারছি না। তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই আমি সমস্যার কোন সমাধানে পৌঁছতে পারি না। আমার কাছে পাঁচশ' পৃষ্ঠার একটা নোট বই আছে। ঐ নোট বই ভর্তি এমন সব সমস্যা — যার সমাধান আমি বের করতে পারিনি।

'আপনি কি আমার সমস্যাটার কিছু করেছেন?'

'সমস্যার পুরো সমাধান বের করতে পারিনি — আংশিক সমাধান আমার কাছে আছে। আমি মোটামুটিভাবে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি। সেই সম্পর্কে আপনাকে আমি বলব, আপনি নিজে ঠিক করবেন — আমার হাইপোথিসিসে কি কি ত্রুটি আছে। তখন আমরা দু'জন মিলে ত্রুটিগুলি ঠিক করব।'

'শুনি আপনার হাইপোথিসিস।'

'আপনার স্ত্রী বলেছেন, ঘুমুবার পর আপনি মৃত মানুষের মত হয়ে যান। আপনার হাত-পা নড়ে না। পাথরের মূর্তির মত বিছানায় পড়ে থাকেন। তাই না?'

'হ্যাঁ — তাই।'

'স্লীপ এ্যানালিস্টরা আপনাকে পরীক্ষা করে বলেছেন — আপনার ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুমের মতই। ঘুমের মধ্যে আপনি স্বাভাবিক ভাবেই নড়াচড়া করেন।'

'জ্বি — কয়েকবারই পরীক্ষা করা হয়েছে।'

'আমি আমার হাইপোথিসিসে দু'জনের বক্তব্যই সত্য ধরে নিচ্ছি। সেটা কিভাবে সম্ভব? একটিমাত্র উপায়ে সম্ভব — আপনি যখন বিছানায় শুয়েছিলেন তখন ঘুমুচ্ছিলেন না। জেগে ছিলেন।'

রাশেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, কি বলছেন আপনি?

মিসির আলি বললেন, আমি গতকালও লক্ষ্য করেছি — আজও লক্ষ্য করছি আপনার বসে থাকার মধ্যেও এক ধরনের কাঠিন্য আছে। আপনি আরাম করে বসে নেই — শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। আপনার দু'টা হাত হাঁটুর উপর রাখা। দীর্ঘ সময় চলে গেছে আপনি একবারও হাত বা পা নাড়ান নি। অথচ স্বাভাবিকভাবেই আমরা হাত-পা নাড়ি। কেউ কেউ পা নাচান।

রাশেদুল করিম চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ঐ রাতে আপনি বিছানায় শুয়েছেন — মূর্তির মত শুয়েছেন। চোখ বন্ধ করে ভাবছেন আপনার অংকের সমস্যা নিয়ে। গভীরভাবে ভাবছেন। মানুষ যখন গভীরভাবে কিছু ভাবে তখন এক ধরনের ট্রেন্স স্টেটে ভাবজগতে চলে যায়। গভীরভাবে কিছু ভাবা হচ্ছে এক ধরনের মেডিটেশন। রাশেদুল করিম সাহেব।

'জ্বি।'

'অংক নিয়ে ঐ ধরনের গভীর চিন্তা কি আপনি প্রায়ই করেন না?'

'জ্বি, করি।'

AMARBOI.COM

'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন এই সময় আশেপাশে কি ঘটছে তা আপনার খেয়াল থাকে না।'

'লক্ষ্য করেছি।'

'আপনি নিশ্চয়ই আরো লক্ষ্য করেছেন যে, এই অবস্থায় আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দিচ্ছেন। লক্ষ্য করেননি?'

'করেছি।'

'তাহলে আমি আমার হাইপোথিসিসে ফিরে আসি। আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আপনার মাথায় অংকের জটিল সমস্যা। আপনি ভাবছেন, আর ভাবছেন। আপনার হাত-পা নড়ছে না। নিঃশ্বাস এত ধীরে পড়ছে যে মনে হচ্ছে আপনি মৃত।'

রাশেদুল করিম সাহেব সানগ্লাস খুলে — এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, ভাল কথা আপনি কি লেফট হ্যানডেড পারসন? ন্যাটা?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

'আমার হাইপোথিসিসের জন্যে আপনার লেফট্ হ্যানডেড পারসন হওয়া খুবই প্রয়োজন।'

'কেন?'

'বলছি। তার আগে — শুরুতে যা বলছিলাম সেখানে ফিরে যাই। দৃশ্যটি আপনি দয়া করে কল্পনা করুন। আপনি এক ধরনের ট্রেন্স অবস্থায় আছেন। আপনার স্ত্রী জেগে আছেন — ভীত চোখে আপনাকে দেখছেন। আপনার এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হল আপনি মারা গেছেন। তিনি আপনার গায়ে হাত দিয়ে আরো ভয় পেলেন। কারণ আপনার গা হিমশীতল।'

'গা হিমশীতল হবে কেন?'

'মানুষ যখন গভীর ট্রেন্স স্টেটে চলে যায় তখন তার হার্ট বিট কমে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে বয়। শরীরের টেম্পারেচার দুই থেকে তিন ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায়। এইটুক নেমে যাওয়া মানে অনেকখানি নেমে যাওয়া। যাই হোক আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি তাকালেন — তাকালেন, কিন্তু এক চোখ মেলে। বাঁ চোখে। ডান চোখটি তখনো বন্ধ।'

'কেন?'

'ব্যাখ্যা করছি। রাইট হ্যানডেড পারসন যারা আছে তাদের এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে তাকাতে বললে তারা বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে তাকাবে। ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখে তাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব শুধু যারা ন্যাটা তাদের জন্যেই। আপনি লেফট্ হ্যানডেড পারসন — আপনি এক ধরনের গভীর ট্রেন্স স্টেটে আছেন। আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত রেখেছেন। আপনি কি হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন। চোখ মেলছেন। দুটি চোখ মেলতে চাচ্ছেন না। গভীর আলস্যে একটা চোখ কোনমতে মেললেন — অবশ্যই সেই চোখ হবে বাঁ চোখ। আমার যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

রাশেদুল করিম হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার স্ত্রী আরো ভয় পেলেন। সেই ভয় তাঁর রক্তে মিশে

AMARBOI.COM

গেল। কারণ শুধুমাত্র একবার এই ব্যাপার ঘটেনি, অনেকবার ঘটেছে। আপনার কথা থেকেই আমি জেনেছি সেই সময় অংকের একটি জটিল সমাধান নিয়ে আপনি ব্যস্ত। আপনার সমগ্র চিন্তা-চেতনায় আছে — অংকের সমাধান — নতুন কোন থিওরী। নয়-কি?

'হ্যা'।

'এখন আমি আমার হাইপোথিসিসের সবচে' জটিল অংশে আসছি। আমার হাইপোথিসিস বলে আপনার স্ত্রী আপনার চোখ গেলে দেননি। তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। তিনি আপনার চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। একজন শিল্পী মানুষ কখনো সুন্দর কোন সৃষ্টি নষ্ট করতে পারেন না। তবুও যদি ধরে নেই তাঁর মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গিয়েছিল এবং তিনি এই ভয়াবহ কাণ্ড করেছেন — তাহলে তাঁকে এটা করতে হবে ঝোঁকের মাথায় — আচমকা। আপনার চোখ গেলে দেয়া হয়েছে পেনসিলে — যে পেনসিলটি আপনার মাথার বালিশের নিচে রাখা। যিনি ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করবেন তিনি এত যন্ত্রণা করে বালিশের নিচ থেকে পেনসিল নেবেন না। হয়তবা তিনি জানতেনও না বালিশের নিচে পেনসিল ও নোট বই নিয়ে আপনি ঘুমান।'

রাশেদুল করিম বললেন, কাজটি তাহলে কে করেছে?

'সেই প্রসঙ্গে আসছি, আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন? বানিয়ে দেব?'

'না।'

'এ্যাকসিডেন্ট কিভাবে ঘটল তা বলার আগে আপনার স্ত্রীর লেখা ডায়েরীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, আপনার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ত। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'কেন পানি পড়তো? একটি চোখ কেন কাঁদতো? আপনার কি ধারণা?'

রাশেদুল করিম বললেন, 'আমার কোন ধারণা নেই। আপনার ধারণাটা বলুন। আমি অবশ্যি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ডাক্তার বলেছেন' এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। যে গ্ল্যান্ড চোখের জল নিয়ন্ত্রণ করে সেই গ্ল্যান্ড বাঁ চোখে বেশি কর্মক্ষম ছিল।'

মিসির আলি বললেন, এটা 'একটা মজার ব্যাপার। হঠাৎ কেন বাঁ চোখের গ্ল্যাণ্ড কর্মক্ষম হয়ে পড়ল। আপনি মনে মনে এই চোখকে আপনার সব রকম অশান্তির মূল বলে চিহ্নিত করার জন্যেই কি এটা হল? আমি ডাক্তার নই। শরীরবিদ্যা জানি না। তবে আমি দু'জন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, এটা হতে পারে। মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গ্ল্যাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। একটি চোখকে অপছন্দও করছে মস্তিষ্ক।

'তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে?'

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তাতে একটি জিনিসই প্রমাণিত হচ্ছে — আপনার বাঁ চোখ আপনি নিজেই নষ্ট করেছেন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাশেদুল করিম ভাঙ্গা গলায় বললেন, কি বলছেন আপনি?

'কনসাস অবস্থায় আপনি এই ভয়ংকর কাজ করেননি। করেছেন সাব কনসাস অবস্থায়। কেন করেছেন তাও বলি, আপনি আপনার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালবাসেন। সেই স্ত্রী আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কেন দূরে সরে যাচ্ছেন? কারণ তিনি ভয় পাচ্ছেন

AMARBOI.COM

আপনার বাঁ চোখকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে হারাচ্ছেন বাঁ চোখের জন্যে। আপনার ভেতর রাগ, অভিমান জমতে শুরু করেছে। সেই রাগ আপনার নিজের একটি প্রত্যঙ্গের উপর। চোখের উপর। এই রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড হতাশা। আপনি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন সেই গবেষণা অন্য একজন করে ফেলেছেন। জার্নালে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে। আপনার চোখ সমস্যা তৈরি না করলে এমনটা ঘটতো না। নিজেই গবেষণাটা শেষ করতে পারতেন। সব কিছুর জন্যে দায়ী হল চোখ।'

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমার এই হাইপোথিসিসের পেছনে আরেকটি শক্ত যুক্তি আছে। যুক্তিটি বলেই আমি কথা শেষ করব।

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রী পুরোপুরি মস্তিষ্কবিকৃত হবার পরে যে কথাটা বলতেন, তা হল — এই লোকটা পিশাচ। আমার কাছে প্রমাণ আছে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রমাণ আছে। তিনি এই কথা বলতেন কারণ পেনসিল দিয়ে নিজের চোখ নিজের গেলে দেয়ার দৃশ্য তিনি দেখেছেন। আমার হাইপোথিসিস আমি আপনাকে বললাম। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।'

রাশেদুল করিম দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন।

মিসির আলি আরেকবার বললেন, ভাই চা করব? চা খাবেন?

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সানগ্লাস পরলেন। শুকনো গলায় বললেন, যাই?

মিসির আলি বললেন, মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আহত করেছি — কষ্ট দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিজের উপরেও রাগ করবেন না। আপনি যা করেছেন—প্রচণ্ড ভালবাসা থেকেই করেছেন।

রাশেদুল করিম হাত বাড়িয়ে মিসির আলির হাত ধরে ফেলে বললেন, আমার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম — আপনি দেখতেন সে কি চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। এবং সেও দেখতো — আপনি কত অসাধারণ একজন মানুষ। ঐ দুর্ঘটনার পর জুডির প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে আমি বেঁচে ছিলাম। আপনি এই অন্যায় ঘৃণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। জুডির হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভদ্রলোকের গলা ধরে এল। তিনি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলে বললেন, মিসির আলি সাহেব। ভাই দেখুন — আমার দু'টি চোখ থেকেই এখন পানি পড়ছে। চোখ পাথরের হলেও চোখের অশ্রুগ্রন্থি এখনো কার্যক্ষম। কুড়ি বছর পর এই ঘটনা ঘটল। আচ্ছা ভাই, যাই।

দু' মাস পর আমেরিকা থেকে বিমান ডাকে মিসির আলি বড় একটা প্যাকেট পেলেন। সেই প্যাকেটে জল রঙে আঁকা একটা চেরী গাছের ছবি। অপূর্ব ছবি।

ছবির সঙ্গে একটি নোট। রাশেদুল করিম সাহেব লিখেছেন, আমার সবচে' প্রিয় জিনিসটি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম। এই ছবিটির চেয়ে প্রিয় কিছু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। কোনদিন হবে বলেও মনে হয় না।

AMARBOI.COM

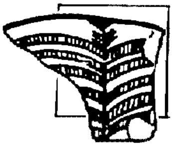

একজন ক্রীতদাস

কথা ছিল পারুল ন'টার মধ্যেই আসবে।

কিন্তু এল না। বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম একা একা। চোখে জল আসবার মত কষ্ট হতে লাগল আমার। মেয়েগুলি বড্ড খেয়ালি হয়।

বাসায় এসে দেখি ছোট্ট চিরকুট লিখে ফেলে গেছে। "সন্ধ্যায় ৬৯৭৬২১ নম্বরে ফোন করো — পারুল।" তদের পাশের বাড়ীর ফোন। আগেও অনেকবার ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ তাক ফোনে ডাকতে হবে কেন? অনেক আলাপ আলোচনা করেই কি ঠিক করা হয়নি আজ সোমবার বেলা দশটায় দু'জন টাঙ্গাইল চলে যাব। সেখানে হারুনের বাসায় আমাদের বিয়ে হবে।

সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। হোটেল থেকে ভাত এনেছিল। সেগুলি স্পর্শও করলাম না। ছোটবেলায় যে রকম রাগ করে ভাত না খেয়ে থেকেছি আজও যেন রাগ করবার মত সে রকম একটি ছেলেমানুষী ব্যাপার হয়েছে। 'পারুলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়েছে' — এই ভাবতে ভাবতে নিজেকে খুব তুচ্ছ ও সামান্য মনে হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন করবার জন্যে যখন বেরিয়েছি তখন অভিমানে আমার ঠোঁট ফুলে রয়েছে। গ্রীন ফার্মেসীর মালিক আমাকে দেখে আঁৎকে উঠে বললেন, অসুখ নাকি ভাই?

আমি শুকনো গলায় বললাম, একটা টেলিফোন করব।

পারুল আশেপাশেই ছিল। রিনরিনে ছয়-সাত বছর বয়েসের ছেলেদের মত গলা যা শুনলে বুকের মধ্যে সুখের মত ব্যথা বোধ হয়।

হ্যালো শোন, কিন্ডারগার্টেনের মাস্টারীটা পেয়েছি। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? বড্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে লাইনে।

পারুলের উৎফুল্ল সতেজ গলা শুনে আমি ভয়ানক অবাক হয়ে গেলাম। তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বললাম, আজ ন'টার সময় তোমার আসবার কথা ছিল . . .।

মনে আছে, মনে আছে। শোন তারিখটা একটু পিছিয়ে দাও। এখন তো আর সে রকম ইমার্জেন্সি নেই। তা ছাড়া . . .

তা ছাড়া কি?

তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা বিয়ে করলে দু'জনকেই একবেলা খেয়ে থাকতে হবে।

হড়বড় করে আরো কি কি যেন সে বলল। হাসির শব্দও শুনলাম একবার। আমি বুঝতে পারলাম পারুল আর কখনোই আমাকে বিয়ে করতে আসবে না। কাল তাকে নিয়ে ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। সারা নিউ মার্কেট ঘুর ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে কেনাকাটা করেছে। দোকানীকে ডবল বেডসীট দেখাতে বলে সে লজ্জায় মুখ লাল করেছে। এবং আজ সন্ধ্যাতেই

AMARBOI.COM

খুব সহজ সুরে বলছে, 'তোমার ব্যবসার এখন যা অবস্থা'। আঘাতটি আমার জন্যে খুব তীব্র ছিল। আমাব সাহস কম নয় তো সে রাতেই আমি বিষ খেয়ে ফেলতাম কিংবা তিনতলা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়তাম। আমি বড় অভিমানী হয়ে জন্মেছি।

সে বৎসর আরো অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটল। ইরফানের কাছে আমার চার হাজার টাকা জমা ছিল। সে হঠাৎ মারা গেল। রামগঞ্জে এক ওয়াগন লবণ বুক করেছিলাম। সেই ওয়াগনটি একেবারে উধাও হয়ে গেল। পাথরকুচি সাপ্লাইয়ের কাজটায় বড় রকমের লোকসান দিলাম। ভদ্রভাবে থাকবার মত পয়সাতেও শেষ পর্যন্ত টান পড়ল। মেয়েরা বেশ ভাল আন্দাজ করে। পারুল সত্যি সত্যি আমার ভবিষ্যৎটা দেখে ফেলেছিল। পারুলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। আমি নিজে কখনো যেতাম না তার কাছে। তবু তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হয়ে যেত। হয়ত বাস স্টপে দু'জন একসঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছি। পারুল আমাকে দেখামাত্রই আন্তরিক সুরে বলেছে, কি আশ্চর্য, তুমি! একি স্বাস্থ্য হয়েছে তোমার? ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?

চলছে ভালই।

ইস বড় রোগা হয়ে গেছ তুমি। চা খাবে এক কাপ? এসো তোমাকে চা খাওয়াবো।

দুপুরবেলা সিনেমা হলের সামনে একদিন দেখা হয় গেল। আমি তাকে দেখতে পাইনি এরকম একটা ভান করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কিন্তু সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, এই এই। সিনেমা দেখতে এসেছিলে নাকি?

না।

শোন, একটা কথা শুনে যাও।

কি?

আমার এক বান্ধবীর ছেলের আজ জন্মদিন। প্লীজ একটা উপহার আমাকে চয়েস করে দাও। চল আমার সাথে।

পারুলকে যতবার দেখি ততবারই অবাক লাগে। তিনশ' টাকার স্কুল মাস্টারী তাকে কেমন করে এতটা আত্মবিশ্বাসী আর অহংকারী করে তুলেছে, ভেবে পাই না। ভুলেও সে আমাদের প্রসঙ্গ তুলে না। এক সোমবারে আমরা যে একটি বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম তা যেন বান্ধবীর ছেলের জন্মদিনের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। তার উজ্জ্বল চোখ, দ্রুত কথাবলার ভঙ্গি স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় জীবন অনেক অর্থবহ ও সুরভিত হয়ে হাত বাড়িয়েছে তার দিকে।

এপ্রিল মাসের তের তারিখে পারুলের বিয়ে হয়ে গেল। নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে সে যে আমাকে তার আর একটি নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখায়নি সেই জন্যে আমি তাকে প্রায় ক্ষমা করে ফেললাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি একটি ভাল রেস্টুরেন্টে খেয়ে অনেকদিন পর সিনেমা দেখতে গেলাম। সিনেমার শেষে বন্ধুর বাড়ীতে অনেক রাত পর্যন্ত হৃষ্টমনে গল্প করতে লাগলাম। এমন একটা ভাব করতে লাগলাম যেন পারুলের বিয়েতে আমার বিশেষ কিছুই যায় আসে না। একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে অন্য একজনকে বিয়ে করা যেন খুব একটা সাধারণ ব্যাপার, অহরহই হচ্ছে।

সে রাতে ঘরের বাতাস আমার কাছে উষ্ণ ও আর্দ্র মনে হতে লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত ভাবলাম ব্যবসার অবস্থাটা অল্প একটু ভালো হলেই একটি

সরল দুঃখী-দুঃখী চেহারার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলব। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পারুলের হৃদয়হীনতার গল্প করতে করতে হা হা করে হাসবো।

কিন্তু দিনদিন আমার অবস্থা আরো খারাপ হল। একটা ছোট খাট কনট্রাকট নিয়েছিলাম। তাতে সঞ্চিত টাকার সবটাই নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে ডুবে যাবার মত অবস্থা। চাকর ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দিতে হল। দু'একটি সৌখিন জিনিসপত্র (একটি থ্রি বেণ্ড ফিলিপস্ ট্রানজিস্টার, একটি ন্যাশনাল রেকর্ড প্লেয়ার, একটি দামী টেবিল ঘড়ি) যা বহু কষ্ট করে কৃপণের মত পয়সা জমিয়ে জমিয়ে কিনেছি, বিক্রি করে দিলাম। এবং তারপরও আমাকে একদিন শুধু হাফ পাউণ্ডের একটি পাউরুটি খেয়ে থাকতে হল।

সহায় সম্বলহীন একটি ছেলের কাছে এ শহর যে কি পরিমাণ হৃদয়হীন হতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। নিষ্ঠুর এবং অকরুণ এই শহরে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে সময় সারাক্ষণই ক্ষিধের কষ্ট লেগে থাকতো। ফুটপাতের পাশে চটের পর্দার আড়ালে ভাতের দোকানগুলি দেখলেই মন খারাপ হয়ে যেত। দেখতাম রিকশাওয়ালা শ্রেণীর লোকরা উবু হয়ে বসে গ্রাস পাকিয়ে মহানন্দে ভাত খাচ্ছে। চুম্বকের মত সেই দৃশ্য আমাকে আকর্ষণ করত। 'আহ্ ওরা কি সুখেই না আছে!' — এই রকম মনে করে আমার চোখ ভিজে উঠত। আমি বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। 'নিউ ইংক' কালি কোম্পানীর সেলসম্যানের চাকরি নিলাম একবার। একবার কাপড়কাঁচা সাবানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজ নিলাম। পারুলকে আমার মনেই রইল না। বেমালুম ভুলে গেলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মোহাম্মদপুর বাজারের কাছ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি পারুল। সঙ্গে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। পায়ে লাল জুতো, মুখটি ডল পুতুলের মত গোলগাল। পারুলের শাড়ীর আঁচল ধরে টুকটুক করে হাঁটছে। পারুল যাতে আমাকে দেখতে না পায় সেই জন্যেই আমি সুঁট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। অথচ তার কোন প্রয়োজন ছিল না। পারুলের সমস্ত ইন্দ্রিয় তার মেয়েটিতে নিবদ্ধ ছিল। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল এই চমৎকার ডল পুতুলের মত মেয়েটি আমার হতে পারতো। কিন্তু পরক্ষণেই সোবহান মিয়া হয়ত আমাকে কাজটা দেবে না। এই ভাবনা আমাকে অস্থির করে ফেলল।

আমার ভাগ্য ভাল। কাজটা হয়ে গেল। রোজ সকালে সেগুন বাগিচা থেকে হেঁটে হেঁটে মোহাম্মদপুরে আসি। সমস্ত দিন সোবহান মিয়ার ইনডেন্টিং ফার্মের হিসাব নিকাশ দেখে অনেক রাতে সেগুন বাগিচায় ফিরে যাই। নিরানন্দ একঘেঁয়ে ব্যবস্থা। গভীর রাতে মাঝে মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল মরে যেতে ইচ্ছে করে।

রাস্তায় আমি মাথা নীচু করে হাঁটি। পরিচিত কেউ আমাকে উচ্চস্বরে ডেকে উঠুক তা এখন আর চাই না। কিন্তু তবু পারুলের সঙ্গে আরো দু'বার আমার দেখা হয়ে গেল। একবার দেখলাম হুড-ফেলা রিকসায় সে বসে, চোখে বাহারি সানগ্লাস। তারপাশে চমৎকার চেহারার একটি ছেলে (খুব সম্ভব এই ছেলেটিকেই সে বিয়ে করেছে কারণ সফিকের কাছে শুনেছি পারুলের বর হ্যাণ্ডসাম এবং বেশ ভাল চাকরি করে)। দ্বিতীয়বার দেখলাম অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। কোনবারই সে আমাকে দেখতে পায়নি। অবশ্যি দেখতে পেলেও সে আমাকে চিনতে পারত না। অভাব, অনাহার ও দুর্ভাবনা আমার চেহারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। তাছাড়া পুরানো বন্ধুদের করুণা ও কৌতূহল থেকে বাঁচবার জন্যে আমি

AMARBOI.COM

দাড়ি রেখেছিলাম। লম্বা দাড়ি ও ভাঙা চোয়ালই আমার পরিচয়কে গোপন রাখবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তবু আমি হাত দুলিয়ে অন্য রকম ভঙ্গিতে হাঁটা অভ্যাস করলাম। যার জন্যে সফিক (যার সঙ্গে এক বিছানায় অনেকদিন ঘুমিয়েছি) পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। চেহারা পরিচিত মনে হলে মানুষ যে রকম পিট পিট করে দু'একবার তাকায় তাও সে তাকায়নি।

আমি নিশ্চিত, পারুলের সঙ্গে কোন একদিন চোখাচোখি হবে। এবং সেও চিনতে না পেরে সফিকের মত ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে যাবে। কিন্তু পারুল আমাকে এক পলকে চিনে ফেলল। আমাকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু' এক মুহূর্ত সে কোন কথা বলতে পারল না। আমি খুব স্বাভাবিক গলায় বললাম, ভাল আছ পারুল? অনেকদিন পরে দেখা। আমার খুব একটা জরুরী কাজ আছে। যাই তাহলে কেমন?

পারুল আশ্চর্য ও দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন সে কথা বলল, তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?

আমি অল্প হাসির ভঙ্গি করে হাল্কা সুরে বলতে চেষ্টা করলাম, ব্যবসাটা ফেল মেরেছে পারুল। আচ্ছা যাই তাহলে?

পারুল সে কথার জবাব দিল না। আমি বিস্মিত হয়ে দেখি তার চোখে পানি এসে পড়েছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

পারুলকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যে জীবন আমার শুরু হয়েছে সেখানে প্রেম নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু সামান্য কয়েক ফোঁটা মূল্যহীন চোখের জলের মধ্যে পারুল নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করল। সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে তাকে হারানোর দুঃখই নতুন করে অনুভব করলাম।

আমার জন্যে এই দুঃখটার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল।

AMARBOI.COM

অপরাহ্ণ

রিকশাওয়ালাটাকে ইসহাক সাহেবের পছন্দ হল না।

কেমন উদ্ধত ভাবভঙ্গি। ঘামে ভেজা চক্‌চকে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। দেখেই মনে হচ্ছে এ নির্বিকার ভঙ্গিতে ট্রাকের সামনে রিকশা নিয়ে চলে যাবে। লালবাতির দিকে ফিরেও তাকাবে না এবং ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে। ভাড়া দেয়ামাত্র তেড়িয়া হয়ে বলবে, সাত টেকা ঠিক কইরা পাঁচ টেকা দেন কেন?

অবশ্যি এই লোক এ রকম নাও করতে পারে। মানুষের চেহারা দেখে তার মনের ভাব টের পাওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু লোকটির চুল লম্বা। লম্বা চুল মানেই একটা ফ্যাশনের

ব্যাপার। একজন রিকশাওয়ালা যখন ফ্যাশন করে তখন বুঝতে হবে তার ভেতরে কোন ঝামেলা আছে।

ইসহাক সাহেব বললেন, ঝিকাতলা কত নিবে? রিকশাওয়ালা পিচ করে তার ঠিক সামনেই থুথু ফেলে বলল, যা ন্যায্য ভাড়া হয় দিবেন।

নায্য ভাড়াটা কত, শুনি?

রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে তাকাল। কোন উত্তর দিল না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে সে ঝামেলাটা করবে নায্য ভাড়া নিয়ে। যখন তাকে ভাড়া দেয়া হবে সে থমথমে গলায় বলবে, এইটা কি দিলেন? এমন হৈচৈ শুরু করবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে।

ইসহাক সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা দেব — যাবে? রিকশাওয়ালা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। পিচ করে আবার থুথু ফেলল। মনে হচ্ছে তার যাবার ইচ্ছা নেই।

আকাশে জুন মাসের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। আগে এই রোদে রাস্তার পিচ গলে যেত। এখন গলে না। এরা বোধ হয় রাস্তায় নতুন ধরনের কোন পিচ ব্যবহার করে।

কি যাবে নাকি ?

উঠেন।

পাঁচ টাকায় রাজি হওয়া একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। এই কড়া রোদে ভাড়া পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যাটা রাজি হয়ে গেল কেন? অন্য কোন মতলব আছে নাকি? একবার তিনি গুলিস্তান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন — রিকশাওয়ালা তিন টাকায় রাজি হয়ে গেল। রহস্যটা টের পেলেন কিছুদূর যাবার পর। রিকশাওয়ালা বিরাট এক কাহিনী ফেঁদে বসল। যে কাহিনী বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আজই নাকি তার মেয়ের বিয়ে। সন্ধ্যাবেলা বরযাত্রী আসবে। তাদের দু'টা ডালভাত খাওয়াতে হবে। কিন্তু সেই পয়সা এখনো জোগাড় হয়নি। রিকশার জমার টাকা উঠতে এখনো বাকি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত ফালতু কথা। তবু ইসহাক সাহেব তাকে একটা চকচকে দশ টাকার নোট দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন ,এখন থেকে যারা কম ভাড়ায় যেতে চায় তাদের রিকশায় উঠবেন না।

এই ব্যাটাও কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে। এর কারণটা কি? ইসহাক সাহেব মনে মনে গল্পের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গল্পটা শুরু হবে কখন? কিন্তু শুরু হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা মাথা নিচু করে, মাথার বাবড়ি চুল হাওয়ায় উড়িয়ে এক মনে চালাচ্ছে। লোকটা হয়ত খারাপ নয়। ইসহাক সাহেব বললেন, এই তোমার নাম কি? রিকশাওয়ালা মাথা ঘুরাল।

আমারে কন?

হ্যাঁ। কি নাম?

ইসহাক।

বলে কি এ? এর নামও ইসহাক? ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি হতে লাগল। যদিও অস্বস্তি বোধ করার কোনই কারণ নেই। মুসলমানদের নামের সংখ্যা অল্প। অল্প কিছু নামই ঘুরে ফিরে আসে। একবার এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখেন বাবুর্চির নাম ইসহাক। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই ইসহাকের সঙ্গে তাঁর চেহারারও খানিকটা মিল ছিল। বড়ই অস্বস্তির ব্যাপার। অবশ্যি এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে তাঁর আর কোন মিল নেই।

বাড়ি কোথায় তোমার?

AMARBOI.COM

আমারে কন?

হ্যাঁ। কোথায় তোমার বাড়ি?

বাড়ি–ঘর কিছু নাই। বাড়ি–ঘর থাকলে কি রিকশা চালাই?

ঘুমাও কোথায়? রিকশার উপর তো নিশ্চয়ই ঘুমাও না।

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। এই ব্যাটার থুথু ফেলার রোগ আছে। অসম্ভব রোদ। ব্যাটার রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে। ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি বাড়তে লাগল। অস্বস্তির কারণ কি দু'জনের একই নাম? নামের প্রতি আমাদের কি অন্য এক ধরনের মমতা আছে? হয়তো বা।

তোমার ছেলেপুলে আছে নাকি ইসহাক মিয়া?

আছে।

কয়জন?

দুই মাইয়া।

কি সর্বনাশ, বলে কি এই লোক? তাঁরও দুই মেয়ে, লোপা এবং ইন্দ্রানী। তিনি দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এদের নাম কি?

নাম দিয়া কি করবেন?

আহ্ বল না।

একজনের নাম হইল গিয়া . . .

বলতে বলতে সে রাস্তার পাশে হঠাৎ রিকশা দাঁড় করিয়ে দিল।

এ্যাই কি হয়েছে?

শইলটা খারাপ। পেটে ব্যথা।

নতুন ধরনের কোন চাল কি? শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়তি কিছু লাভের চেষ্টা? হয়ত এই রোদে তার আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ইসহাক সাহেবকে এখানেই নেমে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচ টাকাই দিতে হবে। বিচিত্র কিছু না। এরা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

ইসহাক সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে রিকশাওয়ালার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। শরীর খারাপের কতটা ভান কতটা সত্যি এটা ধরতে চান। তিনি দেখলেন সে ফুটপাতে শুয়ে পড়েছে। দু'হাতে খামচি দিয়ে তার পেট ধরে রেখেছে। কোন রকম শব্দ বা চিৎকার করছে না। কাজেই সম্ভবত ভান নয়। ভান হলে উঃ আঃ করে লোক জমিয়ে ফেলত। এখানে কোন লোকজন জমছে না। পাঁচ ছ' বছর বয়সের একটি টোকাই শ্রেণীর বালিকা কৌতূহলী চোখে দেখছে। বালিকাটির মুখ হাসি হাসি, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে।

ইসহাক সাহেব রিকশা থেকে নামলেন। কি যন্ত্রণায় পড়া গেল। পাঁচটা টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবেন কি? এ রকম হৃদয়হীন কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

তোমার অসুবিধাটা কি?

পেটে ব্যথা।

এ রকম আগেও হয়েছে?

জ্বি, হইছে।

এমন অসুখ নিয়ে রিকশা চালাও কেন? পাগল নাকি?

AMARBOI.COM

রিকশাওয়ালা লাল চোখে তাকাল। চোখ দুটি এখন লাল হয়েছে না আগেই লাল ছিল তিনি লক্ষ্য করেননি।

সাব, আপনে আমার রিকশাটা দেখবেন। গরীব মানুষ রিকশা গেলে সর্বনাশ।

রিকশা যাবে কেন?

সাব একটু দেখবেন। রিকশাটা দেখবেন সাব। আপনার পায়ে ধরি।

বলতে বলতে সত্যি সত্যি তার পায়ে ধরবার জন্যে রিকশাওয়ালা এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। তিনি চমকে পেছনে সরে গেলেন। ঠিক তখন লোকটি একগাদা রক্তবমি করল। ইসহাক সাহেব কপালের ঘাম মুছে কাঁপা গলায় ডাকলেন, এ্যাই এ্যাই। এ্যাই ইসহাক মিয়া।

সাব আমার রিকশা। আমার রিকশা।

দেখতে দেখতে চারদিকে ভিড় জমল। মানুষের হৃদয় থেকে মমতা বোধহয় পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি। দু'টি যুবক ছেলে তাকে ধরাধরি করে বেবী টেক্সীতে তুলল। নিয়ে যাবে পিজিতে। তার রিকশার দায়িত্ব নিতে অনেককেই আগ্রহী দেখা গেল। ইসহাক সাহেব কাউকে সে দায়িত্ব দিতে রাজি হলেন না। জুন মাসের প্রচণ্ড রোদে নিজেই রিকশা টেনে টেনে নিয়ে গেলেন সায়েন্স ল্যাবোরেটরীর পুলিশ ফাঁড়িতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? রিকশা জমা দিয়ে যে বাসায় চলে যাবেন সে উপায় নেই। যেতে হবে পিজিতে। ইসহাক মিয়াকে বলতে হবে — রিকশা জায়গামত আছে। সে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তার রিকশা ফেরত পাবে। অথচ আজ তাঁর সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার। ইস্রাত্রীর দাঁত ব্যথা। ছ'টার সময় তাকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে।

মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা। ইসহাক সাহেব পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত যেতেই ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তাঁর বড় বড় নিঃশাস পড়তে লাগল। খালি রিকশা এত ভারী হয় তাঁর ধারণা ছিল না। কৌতূহলী লোকজন দু'পাশ থেকে তাঁকে দেখছে। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। একটা গর্ত খুঁড়ে রাখলেও তার চারদিকে ভীড় জমে যায়। কর্মহীন লোকজন গভীর আগ্রহে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এই মুহূর্তে গর্তের ভেতর থেকে অদ্ভুত কোন জন্তু লাফিয়ে বের হবে। ইসহাক সাহেবের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। বুক খা খা করতে লাগল। আহ্ কি যন্ত্রণা! পরিচিত কেউ না দেখলে বাঁচা যায়। চেনা-জানা কারো সঙ্গে দেখা হলে খুব কম করে হলেও এক লক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অফিসের নিজামুদ্দিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় সে নির্ঘাৎ বলবে, আপনি অফ টাইমে রিকশা চালান তা তো জানতাম না। হা হা হা। এখান থেকে আজিমপুর যেতে কত নেবেন? নিজামুদ্দিনের স্বভাবই হচ্ছে বদ রসিকতা করা। ছোটলোক কোথাকার! ইসহাক সাহেব 'পিচ' করে থুথু ফেললেন এবং দারুণ চমকে উঠলেন। তিনিও রিকশাওয়ালার মত থুথু ফেলতে শুরু করেছেন। কি সর্বনাশের কথা।

পিজিতে ইসহাক মিয়াকে খুঁজে বের করতে দেরী হল না। ইমার্জেন্সিতে একটি বেঞ্চের উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার উপর একটা ফ্যান। ফ্যান প্রবল বেগে ঘুরছে এবং বাতাসে ইসহাক মিয়ার লম্বা চুল উড়ছে। দীর্ঘ সময় তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গেলেন অল্প বয়েসী এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ছেলেটি ক্লান্ত এবং কোনকিছু নিয়ে খুবই চিন্তিত। তার বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবু তিনি বললেন, ঐ রিকশাওয়ালা কখন মারা গেছে?

AMARBOI.COM

ডাক্তার ছেলেটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, জানি না কখন।

ওর রিকশাটি আমি থানায় দিয়েছি। এখন কি করব? কাকে খবর দেব?

আমাকে এই সব বলছেন কেন?

তিনি বারান্দায় সরে এলেন। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলেন একা একা। রোদ মরে আসছে। আকাশে মেঘ। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঠাণ্ডা এক বোতল পেপসি খেলেন। ছ'টা বাজতে দেরী নেই। ইন্দ্রানীকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে। তিনি একটা রিকশায় উঠে পড়লেন।

রিকশাওয়ালাটির বয়স খুবই কম। উৎসাহ বেশি। সে রিকশা নিয়ে ছুটছে। অকারণে বেল বাজাচ্ছে। খুব কায়দা করে সে দু'টি রিকশা অভারটেক করে দাঁত বের করে হাসল। ইসহাক সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, নাম কি তোমার?

সামসু।

ইসহাক সাহেব কোমল স্বরে বললেন, তুমি কেমন আছ সামসু ?

সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোন জবাব না দিয়ে দ্রুত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেকক্ষণ সবুজ বাতি জ্বলছে। ওটি লাল হবার আগেই তাকে পার হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দেবার তার সময় নেই।

জ্বীন-কফিল

AMARBOI.COM

জায়গাটার নাম, ধুন্দুলনাড়া।

নাম যেমন অদ্ভুত, জায়গাও তেমন জঙ্গুলে। একবার গিয়ে পৌঁছলে মনে হবে সভ্য সমাজের বাইরে চলে এসেছি। সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি — প্রথমে যেতে হবে ঠাকরাকোনা। ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট স্টেশন। ঠাকরাকোনা থেকে গয়নার নৌকা যায় হাতীর বাজার পর্যন্ত। যেতে হবে হাতীর বাজারে। ভাগ্য ভালো হলে হাতীর বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে মাইল দশেক উত্তরে যেতে হবে। বাকি পথ পায়ে হেঁটে। পেরুতে হবে মাঠ, ডোবা, জলাভূমি। জুতা খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে। পা কাটবে ভাঙা শামুকে। গোটা বিশেক জোঁক ধরবে। বিশ্রী অবস্থা। কতোটা হাঁটতে হবে তারো অনুমান নেই। একেকজন একেক কথা বলবে। একটা সময় আসবে যখন লোকজন হাসিমুখে বলবে — ধুন্দুলনাড়া? ঐ তো দেখা যায়। তখন বুঝতে হবে আরো মাইল সাতেক বাকি।

বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গুলে জায়গায় আমাকে জনৈক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিলো। সাধুর নাম, কালু খাঁ। মুসলমান নাম হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ। বাবা-মা তাঁকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে। কালু খাঁ নাম তাঁর মুসলমান

পালক বাবার দেয়া। যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, বিভূতীর কোনো সীমা সংখ্যা নেই। তিনি কোনো রকম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর গা থেকে সবসময় কাঁঠালচাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয়। পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এতো তীব্র হয় যে কাছে গেলে বমি এসে যায়। নাকে রুমাল চেপে কাছে যেতে হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অতীত কোন ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয়নি। কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন আমি চমৎকৃত হবো না। ধরে নেবো এর পেছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলাকৌশল যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন। কাজেই আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে 'ধুন্দুলনাড়া' নামের অজ অজ অজ পাড়াগাঁয় যাবার প্রশ্নই আসে না। যেতে হয়েছিলো সফিকের কারণে।

সফিক আমার বাল্যবন্ধু। সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই। ভূত-প্রেত থেকে সাধু-সন্ন্যাসী সব কিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে সাপের মাথায় মণি আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এই মণি সে উগড়ে ফেলে। চারদিক আলো হয়ে যায়। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকা-মাকড় আসে। সাপ তাদের ধরে ধরে খায়। ভোজন পর্ব শেষ হলে মণিটি আবার গিলে ফেলে।

সাধু কালু খাঁর খবর সফিকই নিয়ে এলো এবং এমন ভাব করতে লাগলো যেন অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে। যে অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা।

আমি সফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দু'টি কারণে। এক, সফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। তাকে একা একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। দুই, সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে। মাঝে মাঝে এরকম ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগে না। নিজেকে পরিব্রাজক-পরিব্রাজক মনে হয়। যেন আমি হিউয়েন সাং। বাংলার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতীর বাজারে পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গেলো। অমানুষিক পরিশ্রম হলো। হাতীর বাজার থেকে যে কেরায়া নৌকা নিলাম সে নৌকাও এখন ডুবে তখন ডুবে অবস্থা। নৌকার পাটাতনের ফুটা দিয়ে বিজবিজ করে পানি উঠছে। সারাক্ষণ সেই পানি সেঁচতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যচ্যুতি হলো। কয়েকবার বললো, বিরাট বোকামি হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। এরচে' কঙ্গো নদীর উৎস বের করা সহজ ছিলো।

আমি বললাম, এখনো সময় আছে। ফিরে যাবি কি-না বল্।

আরে না ! এতোদূর এসে ফিরে যাবো মানে। ভালো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতেই হবে। জাস্ট চিন্তা করে দেখ একজন মানুষের গা থেকে ভুরভুর করে কাঁঠালচাঁপা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাউ এক্সাইটিং।

সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুলনাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। তিনবার বৃষ্টিতে ভিজেছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম। বিদেশী মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এইখানে উল্টো নিয়ম দেখলাম। আমাদের ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ নেই। 'কোত্থেকে এসেছি ! যাবো কোথায় ?' এইটুকু দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে যাচ্ছে। একি যন্ত্রণা।

AMARBOI.COM

সাধু কালু খাঁ-কে দেখেও খুব হতাশ হতে হলো। বদ্ধ উন্মাদ একজন মানুষ। শ্মশানে একটা পাকুড় গাছের নিচে ন্যাংটো অবস্থায় বসা। আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করলো। গালাগালি যে এতো নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিলো। আমাকে এবং সফিককে কালু খাঁ সবচে' ভদ্র কথা যা বললো তা হচ্ছে — বাড়িত যা। বাড়িত গিয়া খাবলাইয়া খাবলাইয়া 'গু' খা।

আমি হতভম্ব। ব্যাটা বলে কি!

সফিকের দিকে তাকালাম। সে ভাবগদগদ স্বরে বললো, লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, কি করে বুঝলি? আমাদের 'গু' খেতে বলেছে এই জন্যে?

'আরে না। সে আমাদের এড়াতে চাচ্ছে। মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয়। মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা একটা সহজ টেকনিক।'

'লোকটা যে বদ্ধ উন্মাদ তা তোর মনে হচ্ছে না?'

'তাও মনে হচ্ছে, তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে সে উন্মাদ না।'

গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সাধুর প্রতি তাঁদের ভক্তি-শ্রদ্ধাও সফিকের মতই। তাঁদের একজন বললেন, বাবার মাথা এখন একটু গরম।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, মাথা ঠাণ্ডা হবে কখন?

'ঠিক নাই। চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ।'

'চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ মানে?'

'অমাবস্যা-পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে।'

এই ব্যাপারেও মতভেদ দেখা গেলো। একজন বললো, অমাবস্যা-পূর্ণিমাতেই মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। অন্য সময় গরম। বাবার কাছে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে হয়। অপেক্ষা করতে হয়, কখন বাবার মাথা ঠাণ্ডা হবে।

আমি বললাম, সফিক, বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাচ্ছি না। আমাদের যে দ্রব্য খেতে বলছিল তার গন্ধ পাচ্ছি। তুই কি পাচ্ছিস?

সফিক জবাব দেবার আগেই আমাদের সঙ্গী মানুষদের একজন ভীত গলায় বললো, একটু দূরে যান। বাবা অখন ঢিল মারবো। আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খারাপ।

কথা শেষ হবার আগেই ঢিলবৃষ্টি শুরু হলো। দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলাম। বাবার কাণ্ডকারখানায় সফিকের অবশ্যি মোহভঙ্গ হলো না। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললো, দু'টা দিন থেকে দেখি। এতোদূর থেকে আসা। ভালো মতো পরীক্ষা না করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

'আর কি পরীক্ষা করবি?'

'মানে উনার মাথা যখন ঠাণ্ডা হবে তখন দু'একটা কথা-টথা জিজ্ঞেস করলে . . . '

আমি হাল ছেড়ে দেয়া গলায় বললাম, থাকবি কোথায়?

'স্কুল ঘরে শুয়ে থাকবো। খানিকটা কষ্ট হবে। কি আর করা। কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না।'

জানা গেলো এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই। পাশের গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে —এখান থেকে ছ'মাইলের পথ। তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে। অতিথি মোসাফির এলে মসজিদে

থাকে। মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন। তিনি অতিথিদের খোঁজখবর করেন। প্রয়োজনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আমি খুব-একটা উৎসাহ বোধ করলাম না। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম সাহেব লোক কেমন? সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বললো, ভালোয় মন্দয় মিলাইয়া মানুষ। কিছু ভালো। কিছু মন্দ। এই উত্তরও আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হলো। উপায় নেই। আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। রওনা হলাম মসজিদের দিকে। গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত। কেউ সঙ্গে এলো না। কিভাবে যেতে হবে তাই বলেই ভাবলো আমাদের জন্যে অনেক করা হয়েছে।

মসজিদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লাগলো।

অন্ধকার রাত। পথ-ঘাট কিছুই চিনি না। সঙ্গে টর্চলাইট ছিলো — বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চলাইটও কাজ করছে না। অন্ধের মতো এগুতে হচ্ছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই খানিকটা জেরা করে, জুম্মাঘরে যাইতে চান ক্যান? কার কাছে যাইবেন? আপনের পরিচয়?

শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেলো। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ। মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দু'শ বছরের কম হবে না। বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার। সেই স্তূপের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা। গা বেয়ে উঠেছে বটগাছ। সব মিলিয়ে কেমন গা ছমছমানি ব্যাপার আছে।

আমাদের সাড়া-শব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন। ছোটখাট মানুষ। খালি গা। কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো। বয়স চল্লিশের মতো হবে। দাড়িতে তাকে খানিকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো দেখাচ্ছে। আমার ধারণা ছিলো মসজিদে রাত্রি যাপন করবো শুনে তিনি বিরক্ত হবেন। হলো উল্টোটা। তাঁকে আনন্দিত মনে হলো। নিজেই বালতি করে পানি এনে দিলেন। গামছা আনলেন। দু'জোড়া খড়ম নিয়ে এলেন। সফিক বললো, 'ভাই, আমাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার। সারাদিন উপাস। টাকা-পয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।'

AMARBOI.COM

ইমাম সাহেব বললেন, ব্যবস্থা হবে জনাব। আমার বাড়িতেই গরীবী হালতে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা।

'নাম কি আপনার?'

'মুনশি এরতাজ উদ্দিন।'

'থাকেন কোথায়, আশেপাশেই?'

'মসজিদের পেছনে — ছোট্ট একটা টিনের ঘর আছে।'

'কে কে থাকেন?'

'আমার স্ত্রী, আর কেউ না।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ছেলেমেয়ে নাই জনাব। আল্লাহপাক সন্তান দিয়েছিলেন, তাদের হায়াত দেন নাই। হায়াত-মউত সবই আল্লাহপাকের হাতে। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন, আমি আসতেছি।'

ভদ্রলোক ছোট ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সফিক বললো, ইমাম সাহেবকে নিতান্ত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। মাই ডিয়ার টাইপ। মনে হচ্ছে আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন।

আমি বললাম, ভদ্রলোক জঙ্গুলে জায়গায় একা পড়ে আছেন — আমাদের দেখে সেই কারণেই খুশি। এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে আমার মনে হয় না।

'বুঝলি কি করে?'

'লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকতো। পথ দেখলাম না।'

সফিক হাসতে হাসতে বলল, মিসির আলির সঙ্গে থেকে থেকে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয়।

'কিছুটা তো বেড়েছেই। ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে গেলেন, কি নিয়ে ফিরবেন জানিস?'

'কি নিয়ে?'

'দু'হাতে দু'টা কাটা ডাব নিয়ে।'

'এই তোর অনুমান?'

আমি হাসিমুখে বললাম, মিসির আলি থাকলে এই অনুমানই করতেন। অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব গাছ। অতিথিদের ডাব দেয়া সনাতন রীতি।

'লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুনশি এরতাজ উদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন। ট্রেতে দু'কাপ চা। একবাটি তেল-মরিচ মাখা মুড়ি। এই অজ পাড়া গাঁ জায়গায় অভাবনীয় ব্যাপার তো বটেই। মফস্বলের চা-অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কড়া হয়। তবু চা হচ্ছে চা। চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রথম চায়ে চুমুক দিলাম। মনটা ভালো হয়ে গেলো। চমৎকার চা। বিস্মিত হয়ে বললাম, চা কে বানিয়েছে? আপনার স্ত্রী?

ইমাম সাহেব লাজুক মুখে বললেন, জ্বি। তার চায়ের অভ্যাস আছে। শহরের মেয়ে। আমার শ্বশুর সাহেব হচ্ছেন নেত্রকোনার বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন। নাম শুনেছেন বোধহয়।

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিতি নয়। আগে অনেকবার শুনেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, আমি চা খাই না। আমার স্ত্রীর চায়ের অভ্যাস আছে। শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয়। বিরাট খরচান্ত ব্যাপার।

'আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন?'

'জ্বি না। সামান্য জমিজমা আছে। আধি দেই। আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর মেয়ের নামে নেত্রকোনা শহরে একটা ফার্মেসী দিয়েছেন, সান রাইজ ফার্মেসী। তার আয় মাসে মাসে আসে। রিজিকের মালিক আল্লাহ্‌পাক। তাঁর ইচ্ছায় চলে যায়।'

'ভালো চলে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'জ্বি জনাব, ভালোই চলে। সংসার ছোট। ছেলেপুলে নাই।'

এশার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিলো। ইমাম সাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে

AMARBOI.COM

গেলেন। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না। ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানলাম — লোক এমনিতেই হতো না। দু'বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না। শুধু জুম্মাবারে কিছু মুসুল্লীরা আসেন।

লোকজন না হওয়ার কারণও বিচিত্র। মসজিদ সম্পর্কে গুজব রটে গেছে — এখানে জ্বীন থাকে। নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জ্বীন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। নানান ধরনের যন্ত্রণা করে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, জ্বীন কি সত্যি সত্যি আছে?

'অবশ্যই আছে। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন। একটা সুরা আছে — সুরায়ে জ্বীন।'

'সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না — জানতে চাচ্ছি, জ্বীন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্যি কি-না?'

'জ্বি জনাব সত্য। তবে লোকজন জ্বীনের ভয়ে মসজিদে আসে না এটা ঠিক না — আসলে সাপের ভয়ে আসে না।'

'সাপের ভয়ে আসে না? কি বলছেন আপনি?'

'একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের হয়ে গেলো। দাঁড়াস সাপ। অবশ্য কাউকে কামড়ায় নাই। বাস্তু সাপ কামড়ায় না। মাঝে-মধ্যে ভয় দেখায়।'

সফিক আঁৎকে উঠে বললো, মাই গড! যখন-তখন সাপ বের হলে এইখানে থাকব কিভাবে?

'ভয়ের কিছু নাই। কার্বলিক এসিড ছড়ায়ে দিব।'

'কার্বলিক এসিড আছে?'

'জ্বি। নেত্রকোনার ফার্মেসী থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয়। এই অঞ্চলে সাপখোপ একটু বেশি।'

মসজিদের সামনে উঁচু চাতালের মতো জায়গায় বসে আছি। সাপের ভয়ে খানিকটা আতংকগ্রস্ত। আকাশে মেঘ ডাকছে। বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসন্ন। ইমাম সাহেব বললেন, খাওয়া দিতে একটু দেরি হবে। আমার স্ত্রী সব একা করছে, লোকজন নাই।

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে — বিরাট আয়োজন।'

'জ্বি না। আয়োজন কিছু না, দরিদ্র মানুষ। আপনারা এসেছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি। কেউ আসে না। আমি বলতে গেলে একা থাকি। সবাই আমাকে ভয় করে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

'সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি জ্বীন পুষি। জ্বীনদের নিয়ে কাজকর্ম করাই . . .'

'বলেন কি?'

'সত্য না জনাব। তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। অসত্য বিশ্বাস করা সহজ, কারণ — শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে।'

ইমাম সাহেব বেশ মন খারাপ করে চুপ হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, সাধু কালু খাঁ সম্পর্কে কি জানেন?

ইমাম সাহেব বললেন, তেমন কিছু জানি না। তবে আপনাদের মতো দূর দূর থেকে

AMARBOI.COM

উনার কাছে লোকজন আসে এইটা দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই আসে বেশি। ময়মনসিংহের ডিসি সাহেব উনার পত্নীকে নিয়ে এসেছিলেন।

'উনার ক্ষমতা-টমতা কিছু আছে?'

'মনে হয় না। কুৎসিত গালাগালি করেন। কামেল মানুষের এই রকম গালিগালাজ করার কথা না। তাছাড়া কালু খাঁর কারণে অনেক বেদাতী কাণ্ডকারখানা হয়, এইগুলাও ঠিক না।'

'কি কাণ্ডকারখানা হয়?'

'উনি নগ্ন থাকেন — এইজন্য অনেকের ধারণা, নগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তাঁর মেজাজ ঠিক থাকে। অনেকেই নগ্ন অবস্থায় যান।'

'সে-কি?'

'উনি পাগল মানুষ। সমস্যার কারণে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁরাও এক অর্থে পাগল। পাগল মানুষের কাজকর্ম তো এই রকমই হয়। সমস্যা হলে তার পরিত্রাণের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে হয়। মানুষ তা করে না, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির খোঁজে।'

ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম। পরিস্কার চিন্তা-ভাবনা। গ্রাম্য মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তি-নির্ভর কথা আশা করা যায় না। লোকটির প্রতি আমার এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হল। তাছাড়া ভদ্রলোকের আচার-আচরণেও সহজ-সারল্য আছে যে সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না।

AMARBOI.COM

রাত ন'টার দিকে ইমাম সাহেব বললেন, চলেন যাই, খানা বোধহয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। ডাল-ভাত — এর বেশি কিছু না। নিজ গুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন।

ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট্ট টিনের দু'কামরার বাড়ি। একচিলতে উঠোন। বাড়ির চারদিকে দর্মার বেড়া। আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হলো। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো। থালা-বাসন সাজানো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো। সবজি, ছোট মাছের তরকারি, ডাল এবং টক জাতীয় একটা খাবার। ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা এতো আচমকা ঘটলো যে আমি বেশ হকচকিয়েই গেলাম। অজ পাড়াগাঁয়ে এটা অভাবনীয়। কঠিন পর্দাপ্রথাই আশা করেছিলাম। আমি খানিকটা সংকুচিত হয়েই রইলাম। ইমাম সাহেবকেও দেখলাম খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

সফিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি কেমন আছেন?

ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভালো নাই। আমার সঙ্গে একটা জীন থাকে। জীনটার নাম কফিল। কফিল আমারে খুব ত্যক্ত করে।

সফিক হতভম্ব হয়ে বললো, আপনি কি বললেন বুঝলাম না।

মেয়েটি যন্ত্রের মত বললো, আমার সঙ্গে একটা জীন থাকে। জীনটার নাম কফিল। কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে।

সফিক অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। আমি নিজেও বিস্মিত। ব্যাপার কি কিছু

বুঝতে পারছি না। ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, লতিফা, তুমি একটু ভিতরে যাও।

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, ক্যান? ভিতরে ক্যান? থাকলে কি অসুবিধা?

'উনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো। তুমি না থাকলে ভালো হয়। সব কথা মেয়েছেলেদের শোনা উচিত না।'

লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলো। খাওয়া বন্ধ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। একি সমস্যা।

লতিফা মেয়েটি রূপবতী। শুধু রূপবতী নয়, চোখে পড়ার মতো রূপবতী। হাল্কা-পাতলা শরীর। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। লম্বাটে স্নিগ্ধ মুখ। বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণীর মতো। এতো কম বয়স তার নিশ্চয় নয়। যার স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠারো-উনিশ হতে পারে না। আরো একটি লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো — মেয়েটি সাজগোজ করেছে। চুল বেঁধেছে, চোখে কাজল দিয়েছে — কপালে লাল রঙের টিপ। গ্রামের মেয়েরা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম না।

ইমাম সাহেব আবার বললেন, লতিফা ভিতরে যাও।

মেয়েটি উঠে চলে গেলো।

ইমাম সাহেব গলার স্বর নিচু করে বললেন, লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না। এর দু'টা সন্তান নষ্ট হয়েছে। তার পর থেকে এ রকম। তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তার হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কিছু মনে করবেন না — আল্লাহর দোহাই।

আমি বললাম, কিছুই মনে করিনি। তাছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেননি।

ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, জ্বীনের কারণে এরকম করে। জ্বীনটা তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মাঝে মাঝে মাস খানিকের জন্যে চলে যায়। তখন ভালো থাকে। গত এক মাস ধরে তার সাথে আছে।

'আপনি এসব বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস করবো না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই। বাতাস আমরা চোখে দেখি না কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি। কারণ বাতাসের নানান আলামত দেখি। সেই রকম জ্বীন কফিলেরও নানান আলামত দেখি।'

'কি দেখেন?'

'জ্বীন যখন সঙ্গে থাকে তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে। কথায় কথায় হাসে। কথায় কথায় কাঁদে।'

'জ্বীন তাড়াবার ব্যবস্থা করেননি?'

'করেছি। লাভ হয় নাই। কফিল খুব শক্ত জ্বীন। দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে। প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসলো তখন থেকেই কফিল আছে।'

'জ্বীন চায় কি?'

ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হলো — জ্বীন বোধহয় লতিফা মেয়েটিকেই স্ত্রী হিসেবে চায়। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসছে দেখে আমি নিজের উপরও

AMARBOI.COM

বিরক্ত হলাম। ইমাম সাহেব বললেন, এই জ্বীনটা আমার দুইটা বাচ্চা মেরে ফেলেছে। আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে। বড় মনঃকষ্টে আছি জনাব। দিনরাত আল্লাহপাকেরে ডাকি। আমি গুনাহগার মানুষ। আল্লাহপাক আমার কথা শুনেন না।

'আপনার স্ত্রীকে কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ডাক্তার কি করবে, ডাক্তারের কোন বিষয় না। জ্বীনের ওষুধ ডাক্তারের কাছে নাই।'

'তবু একবার দেখালে হতো না?'

'আমার শ্বশুর সাহেব দেখিয়েছিলেন। একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। শ্বশুর সাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গেলেন। চিকিৎসা-টিকিৎসা করালেন। লাভ হল না।'

বারান্দা থেকে গুনগুন শব্দ আসছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। খুবই মিষ্টি গলায় টেনে টেনে গান হচ্ছে — যার কথাগুলোর বেশির ভাগই অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে দু'একটা লাইন বোঝা যায় যার কোনো অর্থ নেই। যেমন ঃ 'এতে না দেহে না দেহে না এতে না।'

ইমাম সাহেব উঁচু গলায় বললেন, লতিফা চুপ কর। চুপ কর বললাম।

গান থামিয়ে লতিফা বললো, তুই চুপ কর্। তুই থাম্ শুওরের বাচ্চা।

অবিকল পুরুষের ভারী গলা। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই পুরুষকণ্ঠ থমথমে স্বরে বললো, চুপ কইরা থাকবি। একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলগা করুম। শইল থাকব একখানে মাথা আরেকখানে। শুওরের বাচ্চা আমারে চুপ করতে কয়।

আমরা হাত ধুয়ে উঠে পড়লাম। এত কাণ্ডের পর খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না।

এ জাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব কখনো ভাবিনি।

সফিক নিচু গলায় বললো, বিরাট সমস্যা হয়ে গেলো দেখি। ভয় ভয় লাগছে। কি করা যায় বল তো?

AMARBOI.COM

মসজিদের ভেতর এর আগে কখনো রাত্রি যাপন করিনি। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। মসজিদের একটা মাত্র দরজা — সেটি পেছন দিকে। ভেতরে গুমট ভাব। ইমাম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণজনিত লজ্জা হয়তো বা ঢাকার চেষ্টা করছেন। আমাদের দু'জনের জন্যে দুটা শীতল পাটি, পাটির চারপাশে কার্বলিক এসিড ছড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা দু'টা মশারি খাটানো হয়েছে।

ইমাম সাহেব বললেন, ভয়ের কিছু নাই। হারিকেন জ্বালানো থাকবে। আলোতে সাপ আসে না। দরজা বন্ধ। সাপ ঢোকারও পথ নাই।

আমি খুব যে ভরসা পাচ্ছি তা না। চৌকি এনে ঘুমোতে পারলে হতো। মসজিদের ভেতর চৌকি পেতে শোয়া — ভাবাই যায় না।

সফিকের হচ্ছে ইচ্ছাঘুম। শোয়ামাত্র নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ। যে গন্ধ সব সময় মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে গা ছমছমানো ব্যাপার।

আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, আপনি চলে যান, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনার স্ত্রী একা। তাঁর শরীরও ভলো না।

ইমাম সাহেব বললেন, আমি মসজিদেই থাকব। এবাদত- বন্দেগী করব। ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমুব।

'কেন?'

'লতিফা এখন আমাকে দেখলে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে। মেঝেতে মাথা ঠুকবে।'

'কেন?'

'ওর দোষ নাই কিছু। সঙ্গে জ্বীন আছে — কফিল। এই জ্বীনই সবকিছু করায়। বেচারীর কোন দোষ নাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না। সন্তানসম্ভবা হলেই কফিল ভয়ংকর যন্ত্রণা করে। বাচ্চাটা মেরে না ফেলা পর্যন্ত থামে না। দুইটা বাচ্চা মেরেছে — এইটাও মারবে।

'আপনার স্ত্রী কি সন্তানসম্ভবা?'

'জ্বি।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জ্বীন করছে। অন্য কিছু না?'

'জ্বি নিশ্চিত। জ্বীনের সঙ্গে আমার মাঝে-মধ্যে কথা হয়।'

'অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি।'

'অবিশ্বাসের কিছু নাই। একদিনের ঘটনা বলি তাহলে বুঝবেন। ভাদ্র মাস। খুব গরম। একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়ায়ে এশার নামাজে দাঁড় হয়েছি। মসজিদে আমি একা। আমি ছাড়া আর কেউ নাই। হঠাৎ দপ করে হারিকেনটা নিভে গেল। চমকে উঠলাম। তারপর শুনি মসজিদের পেছনের দরজার কাছে ধপধপ শব্দ। খুব ভয় লাগল। নামাজ ছেড়ে উঠতে পারি না। নামাজে মনও দিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর পিছনের দরজায় ধুপধুপ শব্দ। যেন কেউ কিছু-একটা এনে ফেলছে। সেজদায় যাবার সময় কফিলের গলা শুনলাম — টেনে টেনে বলল, তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তারপর ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউ দাউ আগুন। নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেখি দরজার কাছে গাদা করা শুকনা লাকড়ি। আগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, বাঁচাও বাঁচাও। আমার চিৎকার শুনে লতিফা পানির বালতি হাতে ছুটে আসল। পানি দিয়ে আগুন নিভায়ে আমারে মসজিদ থেকে টেনে বার করল। আমার স্ত্রীর কারণে সেই যাত্রা বেঁচে গেলাম। লতিফা সময়মত না আসলে মারা পড়তাম।'

'জ্বীন মসজিদের ভেতরে ঢুকলো না কেন?'

'খারাপ ধরনের জ্বীন। আল্লাহর ঘরে এরা ঢুকতে পারে না। আমি এই জন্যেই বেশিরভাগ সময় মসজিদে থাকি। মসজিদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি। ঘরে পারি না।'

'কফিল আপনাকে খুন করতে চায়?'

'তাও ঠিক না — একবারই চেয়েছিলো। তারপর আর চায় নাই।'

'খুন করতে চেয়েছিলো কেন?'

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আপনার যদি আপত্তি না থাকে পুরো

ঘটনাটা বলুন। আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই।

'না। আপত্তির কি আছে? আপত্তিব কিছু নাই। আমি লতিফাব অবস্থা একটু দেখে আসি।'

'যান দেখে আসুন।'

ইমাম সাহেব চলে গেলেন। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরী কখনো বিশ্বাস করিনি, এখনো করছি না তবু আতংকে আধমরা হয়ে গেছি। সফিক জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। সে ঘুমুচ্ছে মরার মত। একেই বলে পরিবেশ। ইমাম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। বিরস গলায় বললেন, ভালই আছে তবে ভীষণ চিৎকার করছে।

'তালা বন্ধ করে রেখেছেন?'

'জ্বি না। তালা বন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না। কফিল ওর সঙ্গে থাকে — কাজেই ওর গায়ের জোর থাকে অসম্ভব। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

ইমাম সাহেব মন খারাপ করে বসে রইলেন। আমি বললাম, গল্পটা শুরু করুন ভাই।

তিনি নিচু গলায় বললেন, আমার স্ত্রীর ডাকনাম বুড়ি।

কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারলেন না। মসজিদে প্রচণ্ড শব্দে ঢিল পড়তে লাগলো। ধুপধুপ শব্দ। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছুটাছুটি করছে। আমি আতংকিত গলায় বললাম, কি ব্যাপার?

ইমাম সাহেব বললেন, কিছু না। কফিল চায় না আমি কিছু বলি।

'থাক ভাই, বাদ দিন। গল্প বলার দরকার নেই।'

'অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হবে। ভয়েব কিছুই নাই।'

সত্যি সত্যি বন্ধ হলো। বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগলো। ইমাম সাহেব গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁর গল্পটাই বলছি। তাঁর ভাষাতে। তবে আঞ্চলিকতাটা সামান্য বাদ দিয়ে।

গল্পের মাঝখানেও একবার তুমুল ঢিল ছোঁড়া হলো। ইমাম সাহেব একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লেন। আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত।

২

নেত্রকোনা শহরের বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তখন আমি থাকি। উনার সংগে আমার কোনো আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই। লোকমুখে শুনেছিলাম — বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কেউ কোনো বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি যথাসাধ্য করেন। আমার তখন মহাবিপদ। একবেলা খাই তো এক বেলা উপোস দেই। সাহসে ভর করে তাঁর কাছে গেলাম চাকরির জন্যে। উনি বললেন, চাকরি যে দিবো পড়াশোনা কি জানো?

আমি বললাম, উলা পাস করেছি।

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, মাদ্রাসা পাস করা লোক, তোমারে আমি কি চাকরি দিব। আই.এ., বি.এ. পাস থাকলে একটা কথা ছিলো। চেষ্টা-চরিত্র করে দেখতাম। চেষ্টা করারও তো কিছু নাই।

আমি চুপ করে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল কিছু হবে। একটা পয়সা সংগে নাই। উপোস দিচ্ছি। রাতে নেত্রকোনা স্টেশনে ঘুমাই।

মমতাজ সাহেব বললেন, তোমাকে চাকরি দেয়া সম্ভব না। নেও, এই বিশটা টাকা রাখো। অন্য কারো কাছে যাও। মসজিদে খোঁজ-টোজ নাও — ইমামতি পাও কি-না দেখো।

আমি টাকাটা নিলাম। তারপর বললাম, ভিক্ষা নেয়া আমরা পক্ষে সম্ভব না। যদি ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন করে দেই।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, কি কাজ করতে চাও?

'যা বলবেন করবো। বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই?'

'আচ্ছা দাও।'

আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম। গাছগুলোতে পানি দিলাম। দু'এক জায়গায় মাটি কুপিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম, জনাব যাই। আপনার অনেক মেহেরবানী। আল্লাহপাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করি।

মমতাজ সাহেব বললেন, এখন যাবে কোথায়?

'ইস্টিশনে। রাত্রে নেত্রকোনা ইস্টিশনে আমি ঘুমাই।'

'এক কাজ করো। রাতটা এইখানেই থাকো। তারপর দেখি।'

আমি থেকে গেলাম।

একদিন দুইদিন তিনদিন চলে গেলো। উনি কিছু বলেন না। আমিও কিছু বলি না। বাংলাঘরের এক কোণায় থাকি। বাগান দেখাশোনা করি। চাকরির সন্ধান করি। ছোট শহর, আমার কোনো চিনা-পরিচয়ও নাই। কে দিবে চাকরি? ঘুরাঘুরি সার হয়। মোক্তার সাহেবের সংগে মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। আমি বড়ই শরমিন্দা বোধ করি। উনিও এমন ভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না। মাসখানেক এইভাবে চলে গেলো। আমি মোটামুটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে 'মা' ডাকি। ভেতরের বাড়িতে খেতে যাই। তাঁদের কোনো একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণপণে করার চেষ্টা করি। বাজার করে দেই, কল থেকে পানি তুলে দেই।

AMARBOI.COM

মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার সংগে আছে। তার দুই বাচ্চাকে আমি আমপারা পড়াই। বাজার-সদাই করে দেই। টিপকল থেকে রোজ ছয় সাত বালতি পানি তুলে দেই। মোক্তার সাহেবের কাছে যখন মক্কেলরা আসে তখন তিনি ঘন-ঘন তামাক খান। সেই তামাকও আমি সেজে দেই। চাকর-বাকরের কাজ। আমি আনন্দের সংগেই করি। মাঝে মাঝে মনটা খুবই খারাপ হয়। দরজা বন্ধ করে একমনে কোরান শরীফ পড়ি। আল্লাহপাকরে ডেকে বলি — হে আল্লাহ, আমার একটা উপায় করে দেও। কতোদিন আর মানুষের বাড়িতে অন্নদাস হয়ে থাকবো!

আল্লাহপাক মুখ তুলে তাকালেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সেধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন। চালের আড়তে হিসাবপত্র রাখা। মাসিক বেতন পাঁচশ' টাকা।

মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম। উনি খুবই খুশি হলেন। বললেন তোমাকে অনেকদিন ধরে দেখতেছি। তুমি সৎ স্বভাবের মানুষ। ঠিকমতো কাজ করবে।

তোমার আত্ম-উন্নতি হবে। আর রাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাকো। তোমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া-দাওয়াও এইখানেই করবে। তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতই দেখি।

আনন্দে মনটা ভরে গেল। চোখে পানি এসে গেলো। আমি মোক্তার সাহেবের কথামত তাঁর বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। ইচ্ছা করলে চালের আড়তে থাকতে পারতাম। মন টানলো না। তাছাড়া মোক্তার সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির লাগে।

একমাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম। পাঁচশ' টাকার বদলে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ছ'শ' টাকা দিয়ে বললেন, তোমার কাজকর্ম ভালো। এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরো বাড়িয়ে দিবো।

আমার মনে বড় আনন্দ হলো। আমি তখন একটা কাজ করলাম। পাগলামিও বলতে পারেন। বেতনের সব টাকা খরচ করে মোক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং তার তিন মেয়ের জন্য তিনটা শাড়ি কিনে ফেললাম। টাঙ্গাইলের সুতী শাড়ি। মোক্তার সাহেবের জন্য একটা খদ্দরের চাদর।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, তোমার কি মাথাটা খারাপ? এইটা তুমি কি করলা? বেতনের প্রথম টাকা — তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য জিনিস কিনবা, বাড়িতে টাকা পাঠাইবা।

আমি বললাম, মা, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই। আপনারাই আমার আত্মীয়-স্বজন।

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, কই কোনোদিন তো কিছু বলো নাই।

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই — এই জন্যে বলি নাই। আমার বাবা-মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানা থেকেই উলা পাস করেছি।'

উনি আমার কথায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। উনার মনটা ছিলো পানির মতো। সবসময় টলটল করে। উনি বললেন, কিছু মনে নিও না। আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো। তুমি আমারে 'মা' ডাকো আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। এইটা খুবই অন্যায় কথা। আমার খুব অন্যায় হইছে।

তিনি তাঁর তিন মেয়েরে ডেকে বললেন, তোমরা এরে আইজ থাইক্যা নিজের ভাই-এর মতো দেখবা। মনে করবা তোমরার এক ভাই। তার সামনে পর্দা করার দরকার নাই।

এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরী কথা বলতে ভুলে গেছি — মোক্তার সাহেবের ছোট মেয়ে লতিফার কথা। এই মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর। একটু পাগল ধরনের। নিজের মনে কথা বলে। নিজের মনে হাসে। যখন-তখন বাংলাঘরে চলে আসে। আমার সংগে দুই-একটা টুকটাক কথাও বলে। অদ্ভুত সব কথা। একদিন এসে বললো, এই যে মৌলানা সাব, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো, শয়তান পুরুষ না মেয়েছেলে?

আমি বললাম, শয়তান পুরুষ।

লতিফা বললো, আল্লা মেয়ে শয়তান তৈরি করেন নাই কেন?

আমি বললাম, তা তো জানি না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার খবর কেমনে জানবো? আমি অতি তুচ্ছ মানুষ।

AMARBOI.COM

'কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন?'

'জানি।'

'আপনে ভুল জানেন। শয়তান পুরুষও না স্ত্রীও না। শয়তান আলাদা এক জাত।'

আমি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হই। এই রকম সে প্রায়ই করে। একদিনের কথা। ছুটির দিন। দুপুরবেলা। বাংলাঘরে আমি ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। অবাক হয়ে দেখি লতিফা আমার ঘরে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লতিফা বললো, আপনেরে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো —

'হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।'

আমি ধাঁধার জবাব না দিয়ে বললাম, তুমি কখন আসছো?

লতিফা বললো, অনেকক্ষণ হইছে আসছি। আপনে ঘুমাইতেছিলেন, আপনারে জাগাই নাই। এখন বলেন — ধাঁধার উত্তর দেন,

'হেন কোনো গাছ আছে এ ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।'

আমি বললাম, এইটার উত্তর জানা নাই।

'উত্তর খুব সোজা — উত্তর হইলো — পরগাছা। আচ্ছা আরেকটা ধরি বলেন দেখি. . .।

'পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?'

মেয়েটার কাণ্ডকারখানায় আমার ভয় ভয় লাগতে লাগলো। কেন সে এই রকম করে? কেন বার বার আমার ঘরে আসে? লোকের চোখে পড়লে নানান কথা রটবে। মেয়ে যতো সুন্দর তারে নিয়া রটনাও ততো বেশি।

লতিফা আমার বিছানায় বসতে বসতে বললো, কই বলেন এটার উত্তর কি —

'পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?'

বলতে পারলেন না — এটা হলো — শশা। পাকা শশা কেউ খায় না। সবাই কাচা শশা চায়। আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এতো কম কেন? একটাও পারেন না। আপনি একটা ধাঁধা ধরেন আমি সংগে সংগে বলে দেবো।

'আমি ধাঁধা জানি না লতিফা।'

'আপনি কি জানেন? শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে জানেন, আর কিছু জানেন?'

'লতিফা তুমি এখন ঘরে যাও।'

'ঘরেইও তো আছি। এইটা ঘর না? এইটা কি বাহির?'

'যখন-তখন তুমি আমার ঘরে আসো — এটা ঠিক না।'

'ঠিক না কেন? আপনি কি বাঘ না ভালুক?'

আমি চুপ করে রইলাম। আধা-পাগল এই মেয়েকে আমি কি বলবো? এই মেয়ে একদিন নিজে বিপদে পড়বে। আমাকেও বিপদে ফেলবে। লতিফা বললো, আমি যে মাঝে-মধ্যে আপনার এখানে আসি — সেইটা আপনার ভালো লাগে না — ঠিক না?

AMARBOI.COM

'হ্যাঁ ঠিক।'

'ভালো লাগে না কেন?'

'নানান জনে নানান কথা বলতে পাবে।'

'কি কথা বলতে পারে? আপনাব সংগে আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে? চুপ করে আছেন কেন বলেন।'

'তুমি এখন যাও লতিফা।'

'আচ্ছা যাই। কিন্তু আমি আবার আসবো। রাত দুপুরে আসবো। তখন দেখবেন — কি বিপদ।'

'কেন এই রকম করতেছো লতিফা?'

লতিফা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাতে আমাব ভালো লাগে। এইজন্যে এরকম করি। আচ্ছা মৌলানা সাহেব, যাই। আসসালামু আলায়কুম। ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু হি–হি – হি।

ভাই, আপনার কাছে সত্য কথা গোপন করবো না। সত্য গোপন করা বিবাট অন্যায়। আল্লাহপাক সত্য গোপনকারীকে পছন্দ করেন না। চাকরি পাওয়ার পরেও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য। তারে দেখার জন্য মনটা ছটফট করতো। মনে মনে অপেক্ষা করতাম কোন সময় তারে এক নজর হলেও দেখব। তার পায়ের শব্দ শুনলেও বুক ধড়ফড় করতো। রাত্রে ভাল ঘুম হত না। শুধু লতিফার কথা ভাবতাম। বলতে খুব শরম লাগছে ভাই সাব তবু বলি — লতিফার চুলের একটা কাঁটা আমি সব সময় আমার সঙ্গে রাখতাম। আমার কাছে মনে হত এইটা চুলের কাঁটা না। সাতরাজার ধন। আমি আল্লাহপাকের দরবারে কান্নাকাটি করতাম। বলতাম — হে পরোয়ারদিগার, হে গাফুরুর রহিম, তুমি আমাকে একি বিপদে ফেললা। তুমি আমারে উদ্ধার করো।

আল্লাহপাক আমাকে উদ্ধার করলেন। লতিফার বিবাহের প্রস্তাব আসলো। ছেলে এমবিবিএস ডাক্তার। বাড়ি গৌরিপুর। ভালো বংশ। খান্দানি পরিবার। ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে গেলো। মেয়ে তার খুব পছন্দ হলো। পছন্দ না হওয়ার কোনো কারণ নাই। লতিফার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো। শুধু গায়ের রঙটা একটু ময়লা। কথায় বার্তায়ও ছেলে অতি ভদ্র। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেলো। বারোই শ্রাবণ। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে বিবাহ পড়ান হবে।

আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেলো। আমি জানি এই মেয়ের সংগে আমাব বিবাহেব কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি। চাকর-শ্রেণীর আশ্রিত একজন মানুষ। জমিজমা নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, সহায়-সম্বল নাই। তার জন্য আমি কোনদিন আফসোস কবি নাই। আল্লাহপাক যাকে যা দেন তাই নিয়াই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমিও ছিলাম। কিন্তু যেদিন লতিফার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলো সেদিন কি যে কষ্ট লাগলো বলে আপনাকে বুঝাতে পারবো না। সারারাত শহরের পথে পথে ঘুরলাম। জীবনে কোনোদিন নামাজ ক্বাজা করি নাই — এই প্রথম এশার নামাজ ক্বাজা করলাম। ফজরের নামাজ ক্বাজা করলাম। এতোদিন পরে বলতে লজ্জা লাগছে — আমার প্রায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিলো। ভোরবেলা মোক্তার সাহেবের বাসায় গেলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

AMARBOI.COM

এইখানে আর থাকবো না। বাজারে চালের আড়তে থাকবো। মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, এখন যাবে কেন বাবা? মেয়েব বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কতো কাজকর্ম। কাজকর্ম শেষ করে তাবপব যও।

আমি মিথ্যা কথা বলি না। প্রথম মিথ্যা বললাম। আমি বললাম, মা, সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন — উনি আমার মনিব। অন্নদাতা। উনাব কথা না রাখলে অন্যায় হবে। বিয়ের সময় আমি চলে আসবো। কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হবে না, মা।

সবার কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। লতিফার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়ালো তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না।

লতিফা বললো, চলে যাচ্ছেন? আমি বললাম — হ্যাঁ।

'কেন, আমরা কি কোনো দোষ করেছি?'

'ছিঃ ছিঃ দোষ করবে কেন?'

'আচ্ছা, যাওয়ার আগে এই ধাঁধাটা ভাঙায়ে দিয়ে যান — বলেন দেখি —

'ছুই ছাড়া শোয় না,

'লাথি ছাড়া উঠে না। এই জিনিস কি?'

'জানি না লতিফা।'

'এতো সহজ জিনিস পারলেন না? এটা হলো কুকুর। আচ্ছা যান। দোষ-ঘাট হলে — ক্ষমা করে দিয়েন।'

আমি আড়তে চলে আসলাম। রাত আটটার দিকে মোক্তার সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি শোবার ঘরে চেয়ারে বসেছিলেন। আমাকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি খুবই অবাক হলাম। একটু ভয় ভয়ও করতে লাগলো। তাকিয়ে দেখি — মোক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন। নিঃশব্দে কাঁদছেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। না জানি কি হয়েছে।

মোক্তার সাহেব বললেন, তোমাকে আমি পত্রের মতো স্নেহ করেছি। তার বদলে তুমি এই করলে? দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষার কথা শুধু শুনেছি। আজ নিজের চোখে দেখলাম।

আমি মোক্তার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, মা, আমি কিছুই বুঝতেছি না।

মোক্তার সাহেব চাপা স্বরে বললেন, বোকা সাজার দরকার নাই। বোকা সাজবা না। তুমি যা করেছো তা তুমি ভালোই জানো। তুমি পথের কুকুরেরও অধম।

আমি বললাম, আমার কি অপরাধ দয়া করে বলেন।

মোক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে কাপতে বললেন, মেথরপট্টিতে যে শুওর থাকে তুই তার চেয়েও অধম — তুই নর্দমার ময়লা। বলতে বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, লতিফা সবই আমাদের বলেছে — কিছুই লুকায় নাই। এখন এই অপমান, এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় লতিফার সংগে তোমার বিবাহ দেয়া। তুমি তাতে রাজি আছো? না মেয়ের সর্বনাশ করে পালানোই তোমার ইচ্ছে?

আমি বললাম, মা, আপনি কি বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না। লতিফা কি বলেছে আমি জানি না। তবে আপনারা যা বলবেন — আমি তাই করবো। আল্লাহপাক উপরে

আছেন। তিনি সব জানেন, আমি কোনো অন্যায় করি নাই, মা।

মোক্তার সাহেব চিৎকার করে বললেন, চুপ থাক্ শুওরের বাচ্চা। চুপ থাক্।

সেই রাতেই কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়ানো হলো। বাসররাতে লতিফা বললো, আমি একটা অন্যায় করেছি — আপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এই জন্যে বাবা-মাকে মিথ্যা করে বলেছি — আমার পেটে সন্তান আছে। বিরাট অপরাধ করেছি, আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

আমি বললাম, লতিফা আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাও।

'আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তাছাড়া আমি তেমন বড় অপরাধ তো করি নাই। সামান্য মিথ্যা বলেছি। আপনাকে বিবাহ করার জন্য অনেক বড় অপরাধ করার জন্যেও আমি তৈরি ছিলাম। আচ্ছা, এখন বলেন এই ধাঁধাটির মানে কি

'আমার একটা পাখি আছে
যা দেই সে খায়।
কিছুতেই মরে না পাখি
জলে মারা যায়।'

বুঝলেন ভাই সাহেব, আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেলো। এই আনন্দের কোনো সীমা নাই। আমার মতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাহপাক এতো আনন্দ রেখে দিয়েছেন আমি কল্পনাও করি নাই। আমি কতোবার যে বললাম, আল্লাহপাক আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি।

বিয়ের পর আমি শ্বশুর বাড়িতেই থেকে গেলাম। আমার এবং লতিফার বড় দুঃখে সময় কাটিতে লাগলো। শ্বশুর বাড়ির কেউ আমাদের দেখতে পারে না। খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার শাশুড়ী দিনরাত লতিফাকে অভিশাপ দেন, মর্ মর্ তুই মর্।

আমার শ্বশুর সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, সকাল বেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না। সকাল বেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়।

শ্বশুর বাড়ির কেউ আমার সংগে কথা বলে না। তারা এক সংগে খেতে বসে। সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে লতিফা থালায় করে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে। সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

লতিফা রোজ বলে — চলো, অন্য কোথায়ও যাই গিয়া।

আমি চুপ করে থাকি। কই যাবো বলেন? আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে? যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। লতিফা খুব কান্নাকাটি করে।

একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম। আমার শ্বশুর সাহেবের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি আমারে ডেকে নিয়ে বললেন, এই যে দাড়িওয়ালা, তুমি কি আমার টাকা নিয়েছো?

আমার চোখে পানি এসে গেলো। একি অপমানের কথা। আমি দরিদ্র। আমার যাওয়ার জায়গা নাই — সবই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমি কি চোর? ছিঃ ছিঃ।

শ্বশুর সাহেব বললেন, কথা বলো না কেন?

AMARBOI.COM

আমি বললাম, আমারে অপমান কইরেন না। যতো ছোটই হই আমি আপনার কন্যার স্বামী।

শ্বশুর সাহেব বললেন, চুপ। চোর আবার ধর্মের কথা বলে।

লতিফা সেইদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলো। সে বললো, এই বাড়ির ভাত সে মুখে দিবে না।

আমার শাশুড়ী বললেন, ঢং করিস্ না। এই বাড়ির ভাত ছাড়া তুই ভাত পাবি কই?

দুই দিন দুই রাত গেলো লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না। আমারে বলে, তুমি আমারে অন্য কোথাও নিয়া চলো। দরকার হইলে গাছতলায় নিয়া চলো। এই বাড়িব ভাত আমি মুখে দিবো না।

আমি মহাবিপদে পড়লাম।

সারারাত আল্লাহরে ডাকলাম। ফজরের নামাজের শেষে আল্লাহপাকের দরবারে হাত উঠায়ে বললাম, হে মাবুদ! হে পাক পরোয়ারদিগার—! তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাবো? আমার দুঃখের কথা কারে বলবো? কে আছে আমার? তুমি আমারে বিপদ থাইক্যা বাঁচাও।

আল্লাহপাক আমার প্রার্থনা শুনলেন।

ভোরবেলায় চালের আড়তে গিয়েছি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন, এই যে মৌলানা, আমার একটা উপকার করতে পারবে?

আমি বললাম, জ্বি জনাব বলেন।

'ময়মনসিংহ শহরে আমি নতুন বাড়ি করেছি। এখন থেকে ঐ বাড়িতে থাকবো। সপ্তাহে সপ্তাহে এইখানে আসবো। নেত্রকোনায় আমার যে বাড়ি আছে — তুমি কি সেই বাড়িতে থাকতে পারবে? নেত্রকোনার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না। শুনলাম তুমি বিবাহ করেছো — তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু'জন মিলে থাকবে।'

আমি বললাম, জনাব আমি অবশ্যই থাকবো।

'তাহলে তুমি এক কাজ করো, আজকেই চলে আসো। একতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে তুমি থাকো। দু'তলার ঘর তালাবন্ধ থাকুক।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বাড়িটা শহর থেকে দূরে। তবে ভয়ের কিছু নেই, একজন দারোয়ান আছে। চব্বিশ ঘন্টা থাকবে। দারোয়ানের নাম — বলরাম। ভালো লোক।'

'জনাব আমি আজকেই উঠবো।'

সেইদিন বিকালেই সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে এসে উঠলাম। বিরাট বাড়ি। বাড়ির নাম 'সরজুবালা হাউস।' হিন্দুবাড়ি ছিলো। সিদ্দিক সাহেবের বাবা কিনে নিয়েছিলেন।

আট ইঞ্চি ইটের দেয়ালে বাড়ির চারদিক ঘেরা। দোতলা পাকা দালান। বিরাট বড় বড় বারান্দা। দেয়ালের ভেতরে নানান জাতের গাছগাছড়া। দিনের বেলায় অন্ধকার হয়ে থাকে।

আমি লতিফাকে বললাম, বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা?

লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেললো। দুইদিন খাওয়া-দাওয়া না করায় লতিফার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। চোখ ছোট ছোট, ঠোঁট কালচে। মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে। এই অবস্থাতেই সে রান্নাবান্না করলো। অতি সামান্য আয়োজন। ভাত ডাল পেঁপে ভাজা। খেতে

AMARBOI.COM

অমৃতের মতো লাগলো ভাই সাহেব।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম। হাসবেন না ভাইসাব, তখন আমাদের বয়স ছিলো অল্প। মন ছিল অন্য রকম। হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হলো এই দুনিয়াতে আল্লাহপাক আমার মতো সুখী মানুষ তৈরি করেন নাই। আনন্দে বারবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো ভাই সাহেব।

ক্লান্ত হয়ে একসময় একটা লিচুগাছের নিচে আমরা বসলাম। লতিফা বললো, আমি যে মিথ্যা কথা বইলা আপনেরে বিবাহ করছি এই জন্যে কি আমার উপর রাগ করছেন?

আমি বললাম, না লতিফা। আমার মতো সুখী মানুষ নাই।

'যদি সুখী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পারেন কিনা দেখেন। বলেন দেখি —

'কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন্ গাছেতে ধরে?'

'পারলাম না লতিফা।'

'ভালোমতো চিন্তা কইরা বলেন। এইটা পারা দরকার। খুব দরকার —

কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন্ গাছেতে ধরে?'

'পারবো না লতিফা। আমার বুদ্ধি কম।'

'এইটা হইলো সন্তানের নাড়ি কাটা। সন্তানের জন্মের পর নাড়ি কাটলে সন্তান বাঁচে। না কাটলে বাঁচে না। আচ্ছা, এই ধাধাটা আপনেরে কেন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো?'

'তুমি বলো। আমার বিচার-বুদ্ধি খুবই কম।'

'এইটা আপনেরে বললাম — কারণ আমার সন্তান হবে।'

লতিফা লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললো। কি যে আনন্দ আমার হলো ভাই সাহেব। কি যে আনন্দ।

সেই রাতে লতিফার জ্বর আসলো।

বেশ ভালো জ্বর। আমি জ্বরের খবর রাখি না। ঘুমুচ্ছি। লতিফা আমারে ডেকে তুললো। বললো, আমার খুব ভয় লাগতেছে। একটু উঠেন তো।

আমি উঠলাম। ঘর অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হারিকেন জ্বালায়ে শুয়েছিলাম। বাতাসে নিভে গেছে। হারিকেন জ্বালালাম।

তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বললো, ছাদের বারান্দায় কে যেন হাঁটে।

আমি শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না।

লতিফা বললো, আমি স্পষ্ট শুনেছি। একবার না। অনেকবার শুনেছি। জুতা পায়ে দিয়া হাঁটে। জুতার শব্দ হয়। হাঁটার শব্দ হয়।

'বোধহয় দারোয়ান।'

'না দারোয়ান না। অন্য কেউ।'

'কি করে বুঝলা অন্য কেউ?'

'বললাম না — জুতার শব্দ। দারোয়ান কি জুতা পরে?'

AMARBOI.COM

'তুমি থাকো। আমি খোঁজ নিয়া আসি?'

'না না। এইখানে একা থাকলে আমি মরে যাবো।'

আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম। এই প্রথম বুঝলাম লতিফার খুব জ্বর। জ্বর আরো বাড়লো। একসময় জ্বর নিয়ে ঘুমায়ে পড়লো। তখন আমি নিজেই শব্দটা শুনলাম। ঝনঝন শব্দ। জুতার শব্দ না। অন্যরকম শব্দ। ঝন-ঝন-ঝন- ঝন।

একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লাম।

তিনবার আয়াতুল কুরসি পড়ে হাত তালি দিলে — সেই হাত তালির শব্দ যতোদূর যায় ততোদূর কোনো জ্বীন-ভূত আসে না। হাত তালি দেয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেলো, তবে পুরাপুরি গেলো না। আমি সারারাত জেগে কাটালাম।

ভোরবেলা সব স্বাভাবিক।

রাতে যে এতো ভয় পেয়েছিলাম মনেই রইলো না। লতিফার গায়েও জ্বর নাই। সে ঘর-দোয়ার গুছাতে শুরু করলো। একতলার সর্বদক্ষিণের দুটা ঘর আমরা নিয়েছি। বারান্দা আছে। কাছেই কলঘর। লতিফা নিজের সংসার ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্য চলে আসলো। বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছকাছি। আদি বাড়ি নেপালে। দশ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে। আর ফিরে যায়নি। এখন পুরোপুরি বাঙালী। বাঙালী একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলো। সে মেয়ে মরে গেছে। বলরামের এক ছেলে আছে। খুলনার এক ব্যাংকের দারোয়ান। ছেলে বিয়ে-শাদী করেছে। বাবার কোনো খোঁজ খবর করে না।

বলরামের সংগে অতি অল্প সময়ে লতিফার ভাব। বলরাম লতিফাকে মা ডাকা শুরু করলো। আমি নিশ্চিত হয়ে দোকানে চলে গেলাম। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে। তার মুখ শুকনা। আমি বললাম, কি হয়েছে?

'ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কি স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি। একটা লম্বা, কালো এবং খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকলো। লোকটার সারা শরীরে বড় বড় লোম। কোনো দাঁত নেই। চোখগুলো অসম্ভব ছোট ছোট, দেখাই যায় না — এরকম। হাতের থাবাগুলিও খুব ছোট। বাচ্চা ছেলেদের মতো। আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। সে বললো, এই ভয় পাস কেন? আমার নাম কফিল। আমি তো তোর সাথেই থাকি। তুই টের পাস না? তুই বিয়ে করেছিস আমি কিছু বলি নাই। এখন আবার সন্তান হবে। ভালোমতো শুনে রাখ — তোর সন্তানটারে আমি শেষ করে দিবো। এখনি শেষ করতাম। এখন শেষ করলে তোর ক্ষতি হবে। এই জন্যে কিছু করছি না। সন্তান জন্মের সাতদিনের ভিতর আমি তারে শেষ করবো। এই বলেই সে আমারে ধরতে আসলো। আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম। তারপর থেকে এইখানে বসে আছি।'

আমি বললাম, স্বপ্ন হলো স্বপ্ন। কতো খারাপ খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে। সবচে' বেশি

AMARBOI.COM

খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াতী মেয়েছেলে। তাদের মনে থাকে মৃত্যুভয়।

কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুললাম। সে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগলো। রান্না করলো। আমরা সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর বাগানে হাঁটতে বের হলাম। লতিফা বললো, এই বাড়িতে একটা দোষ আছে সেইটা কি আপনি জানেন?

'কি দোষ?'

'এই বাড়িতে একটা খারাপ কূয়া আছে। সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট মেয়ে কূয়ায় পড়ে মারা গিয়েছিলো। কূয়াটা দোষী।'

'কি যে তুমি বলো। কূয়া দোষী হবে কেন? বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে।'

'তা না, কূয়টা আসলেই দোষী।'

'কে বলেছে?'

'বলরাম বলেছে। কূয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই টিনে রাতের বেলা ঝনঝন শব্দ হয়। মনে হয় ছোট কোনো বাচ্চা টিনের উপরে লাফায়। তুমি গত রাতে কোনো ঝনঝন শব্দ শোনো নাই?'

আমি মিথ্যা করে বললাম, না।

'আমি কিন্তু শুনেছি।'

আমি বলরামের উপর খুব বিরক্ত হলাম। এইসব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? ঠিক করলাম ভোরবেলায় তাকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেবো।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম লতিফার জ্বর এসেছে। সে কেমন ঝিম মেরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলাম। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলো। লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘর অন্ধকার। লতিফা বললো, হারিকেন আপনা-আপনি নিভে গেছে। আমার বড় ভয় লাগতেছে।

আমি হারিকেন জ্বালালাম। আর তখনি ঝনঝন শব্দ পেলাম। একবার না, বেশ কয়েকবার।

লতিফা ফিসফিস করে বললো, শব্দ শুনলেন?

আমি জবাব দিলাম না। লতিফা কাঁদতে লাগলো।

যতোই দিন যেতে লাগলো লতিফার অবস্থা ততোই খারাপ হতে লাগলো। রোজ সে কফিলকে স্বপ্ন দেখে। কফিল তাকে শাসিয়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয় — বাচ্চা হওয়ার সাতদিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে নিবে। মনের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলো।

আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে রাজি হলো না। প্রয়োজনে সে এইখানেই মরবে কিন্তু বাবার বাড়িতে যাবে না। আমি তার জন্যে তাবিজ-কবচের ব্যবস্থা করলাম, বাড়ি বন্ধনের ব্যবস্থা করলাম। আমি দরিদ্র মানুষ। তবু একটা কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করলাম যেন সে সারাক্ষণ লতিফার সংগে থাকে।

কিছুতেই কিছু হলো না।

এক সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখি — লতিফা খুব সাজগোজ করেছে। লাল একটা শাড়ি পরেছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। বেণী করে চুল বেঁধেছে। বেণীতে চার-পাঁচটা

AMARBOI.COM

জবা ফুল। সে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে বলরাম এবং কাজের মেয়েটা। তারা দু'জন ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে।

আমাকে দেখেই লতিফা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বললাম, কি হয়েছে লতিফা? লতিফা হাসি থামালো এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পুরুষের গলায় বললো, মৌলানা আসছে। মৌলানারে অজুর পানি দেও। নামাজের পাটি দেও। কেবলা কোন দিকে দেখাইয়া দাও। টুপি দেও, তসবি দেও।

আমি বললাম, এই রকম করতেছো কেন লতিফা?

লতিফা আবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে বললো, ওমা, মেয়েছেলের সংগে দেখি মৌলানা কথা বলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মৌলানার লজ্জা নাই।

আমি আয়াতুল কুরসি পড়া শুরু করলাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা চিৎকার করে বললো, চুপ করো। আমার নাম কফিল। তোর মতো মৌলানা আমি দশটা হজম কইরা রাখছি। গোটা কোরান শরীফ আমার মুখস্থ। আমার সংগে পাল্লা দিবি? আয়, পাল্লা দিলে আয়। প্রথম থাইকা শুরু করি . . . হি – হি – হি। ভয় পাইছস? ভয় পাওনেরই কথা। বেশি ভয় পাওনের দরকার নাই। তোরে আমি কিছু বলবো না। তোর বাচ্চাটারে শেষ করবো। তুই মৌলানা মানুষ, তুই বাচ্চা দিয়া কি করবি? তুই থাকবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লারে ডাকবি। পুলাপান না থাকাই তোর জন্যে ভালো। হি–হি–হি –।

একটা ভয়ংকর রাত পার করলাম ভাইসাব। সকালে দেখি সব ঠিকঠাক। লতিফা ঘরের কাজকর্ম করছে। এইভাবে দিন পার করতে লাগলাম। কখনো ভালো, কখনো মন্দ।

লতিফা যখন আটমাসের পোয়াতী তখন আমি হাতে পায়ে ধরে আমার শাশুড়ীকে এই বাড়িতে নিয়া আসলাম। লতিফা খানিকটা শান্ত হলো। তবে আগের মতো সহজ স্বাভাবিক হলো না। চমকে চমকে উঠে। রাতে ঘুমাতে পারে না। ছটফট করে। মাঝে মাঝে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নে কফিল এসে উপস্থিত হয়। কফিল চাপা গলায় বলে, দেরি নাই, আর দেরী নাই। পুত্রসন্তান আসতেছে। সাতদিনের মধ্যে নিয়ে যাবো। কান্দাকাটি যা করার কইরা নেও। ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদে। আমি চোখে দেখি অন্ধকার। কি করবো কিছুই বুঝি না।

শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটা সন্তান হলো। কি সুন্দর যে ছেলেটা হলো ভাইসাহেব, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। আমি একশ' রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম। আমার মনের অস্থিরতা কমলো না।

আঁতুর ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাশুড়ী আর আমার স্ত্রীর দূর–সম্পর্কের এক খালাতো বোন। পালা করে কেউ না কেউ সারারাত জেগে থাকি।

লতিফার চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নাই। সন্তানের মা। সারাক্ষণ বাচ্চা বুকের নিচে আড়াল

AMARBOI.COM

করে রাখে। এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করে না। আমার শাশুড়ী যখন বাচ্চা কোলে নেন তখনো লতিফা বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে রাখে যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

ছয় দিনের দিন কি হলো শুনেন :

ঘোর বর্ষা। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। এরকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

লতিফা আমাকে বললো, আইজ রাইতটা আপনে জাগনা থাকবেন। আমার কেমন জানি লাগতেছে।

আমি বললাম কেমন লাগতেছে?

'জানি না। একটু পরে পরে শরীর কাঁপতেছে।'

'তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকো। আমি সারা রাইত জাগনা থাকবো।'

'আপনে একটু বলরামরেও খবর দেন। সেও যেন জাগনা থাকে।'

আমি বলরামকে খবর দিলাম। লতিফা বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়া শুইয়া আছে। আমি একমনে আল্লাহপাকেরে ডাকতেছি। জীবন দেয়ার মালিক তিনি। জীবন নেয়ার মালিকও তিনি।

রাত তখন কতো আমি জানি না ভাই সাহেব। ঘুমায়ে পড়েছিলাম। লতিফার চিৎকারে ঘুম ভাঙলো। সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে। আমার বাচ্চা কই গেল। আমার বাচ্চা কই। দুইটা হারিকেন জ্বালানো ছিলো। দুইটাই নিভানো। পুরা বাড়ি অন্ধকার। কাঁপতে কাঁপতে হারিকেন জ্বালালাম। দেখি, সত্যি বাচ্চা নাই। আমার শাশুড়ী ফিট হয়ে পড়ে গেলেন।

লতিফা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছুটে গেলো কুয়ার দিকে।

কুয়ার উপর টিন দিয়া ঢাকা ছিলো। তাকায়ে দেখি টিন সরানো। লতিফা চিৎকার করে বলছে — আমার বাচ্চারে কুয়ার ভিতর ফালাইয়া দিছে। আমার বাচ্চা কুয়ার ভিতরে। লতিফা লাফ দিয়া কুয়াতে নামতে চাইলো। আমি তাকে জড়ায়ে ধরলাম।

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। আমি বললাম, বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিলো?

'জ্বি।'

'আর দ্বিতীয় বাচ্চা। সেও কি এইভাবে মারা যায়?'

'জ্বি-না জনাব। আমার দ্বিতীয় সন্তান বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে।'

'সিদ্দিক সাহেবের ঐ বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন?'

'জ্বি। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। কফিলের যন্ত্রণা কমে না। দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে। জন্মের চারদিনের দিন . . . '

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, থাক ভাই আমি শুনতে চাই না। গল্পগুলো আমি সহ্য করতে পারছি না।

ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহপাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন। কিন্তু এই সন্তানটাকেও বাঁচাতে পারবো না। মনটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব। বড়ই খারাপ। আমি কতোবার চিৎকার করে বলেছি — কফিল, তুমি আমারে মেরে ফেলো। আমার সন্তানরে মেরো না। এই সুন্দর

AMARBOI.COM

দুনিয়া তারে দেখতে দাও।

ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হলো। ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেইদিন ভোরেই আমি সফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। সফিকের আরো কিছুদিন থেকে কালু খাঁ রহস্য ভেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল। আমি তা হতে দিলাম না। ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

৩

সাধারণত আমি আমার জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে — ইমাম সাহেবের এই গল্প তাঁকে বলা হলো না।

ঢাকায় ফেরার তিনদিনের মাথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। নানান কথাবার্তা হলো, এটা বাদ পড়ে গেলো।

দু'মাস পর মিসির আলি আমার বাসায় এলেন। রাতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি প্রায় দু'ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন — ইমাম সাহেবের গল্প বলা হলো না। তিনি চলে যাবার পর মনে হলো, ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাঁকে শোনানো হলো না।

আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে, এরপরে যদি কখনো মিসির আলি সাহেব আমাদের বাসায় আসেন সে যেন আমার কানের কাছে 'ইমাম' বলে একটা চিৎকার দেয়। আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। সে যে যথাসময়ে 'ইমাম' বলে চিৎকার দেবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলোও তাই। অনেকদিন পর মিসির আলি সাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিলো। এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। মেয়েকে কড়া ধমক দিলাম। মেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, তুমি তো বলেছিলে মিসির চাচু এলে— 'ইমাম' বলে চিৎকার করতে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলিনি। যাও, এখন যাও তো।

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা কি ?

আমি বললাম, তেমন কিছু না। আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম। একজন ইমাম সাহেবের গল্প। আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না। মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি। সে এমন চিৎকার দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বাঁ কানে কিছু শুনতে পারছি না।

মিসির আলি বললেন, গল্পটা কি বলুন শুনি।

'আজ থাক। আরেকদিন বলবো। একটু সময় লাগবে। লম্বা গল্প।'

মিসির আলি বললেন, আরেক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়ে বিদেয় হই।

চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে এসে বসলাম। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, ইমাম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনোই বলতে পারবেন না।

AMARBOI.COM

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

'আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে। যে কারণে অনেকদিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বলা হয় না। আপনার মনে থাকে না। আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হলো। এবং মনে করিয়ে দেয়ার জন্য আপনি রেগে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা — মনে করে দেবার পরেও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না। অজুহাত বের করেছেন, বলছেন লম্বা গল্প। আমি নিশ্চিত, আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না — এই গল্প আপনি আমাকে বলুন। আপনার সাব-কনসাস মাইণ্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে।'

'আমার সাব-কনসাস মাইণ্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন?'

'আমি তা বুঝতে পারছি না। গল্পটা শুনলে বুঝতে পারবো। চা আসুক। চা খেতে খেতে আপনি বলা শুরু করুন। আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে। কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে দিন।'

আমি আর কোনো অজুহাতে গেলাম না। গল্প শেষ করলাম। গল্প শেষ হওয়ামাত্র মিসির আলি বললেন, আবার বলুন।

'আবার কেন?'

'মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝোঁক থাকে বেশি। গল্পের ডিটেইলস-এ যেতে চায় না। একই গল্প দ্বিতীয়বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে। কারণ মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে। কথক তখন না বলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন। আপনিও তাই করবেন। প্রথমবার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয়বারে বুঝতে পারবো। শুরু করুন।'

আমি শুরু করলাম, বেশ সময় নিয়ে বললাম।

মিসির আলি বললেন, কবে গিয়েছিলেন ধুন্দুলনাড়া? তারিখ মনে আছে?

'আছে।'

আমি মিসির আলিকে তারিখ বললাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, আপনার তারিখ অনুযায়ী মেয়েটির বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে। আপনি বলছেন দশ মাস আগের কথা। মেয়েটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি। আর যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন ক'টা বাজে দেখুন তো।

আমি ঘড়ি দেখলাম, ন'টা বাজে।

মিসির আলি বললেন, রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। চলুন রওনা হই।

'সত্যি যেতে চান?'

'অবশ্যই যেতে চাই। আপনার অসুবিধা থাকলে কিভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি ঘুরে আসি।'

'আমার অসুবিধা আছে। তবু যাবো। এখন বলুন তো জ্বীন কফিলের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করছেন?'

AMARBOI.COM

'না।'

'আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে?'

'তা তো বটেই।'

'কে খুন করেছে?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন। আপনার সাব-কনসাস মাইণ্ড জানে। জানে বলেই সাব-কনসাস মাইণ্ড গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিলো।

'আমি কিছুই জানি না।'

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, আপনার সাব-কনসাস মাইণ্ড জানে কিন্তু সে এটি আপনার কনসাস মাইণ্ডকে জানায়নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না।

আমি বললাম, কে খুন করেছে?

'লতিফা। দু'টি বাচ্চাই সে মেরেছে। তৃতীয়টিও মারবে।'

'কি বলছেন এসব?'

'চলুন রওনা হয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করবো।'

মিসির আলি বললেন, লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই, যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কিভাবে জ্বীন কফিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলো।

পুরানো ধরনের মসজিদ, একটামাত্র দরজা। এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না। ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না। কারণ সাউণ্ড ওয়েভ চলার জন্য মাধ্যম লাগে। মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে।

আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন। ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, লতিফা খুব চিৎকার করছে। তাই না?

'জ্বি তাই।'

'মসজিদের ভেতরে বসে সেই চিৎকার আপনি শুনতে পাননি। তাই না?'

'জ্বি।'

'অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চেঁচালেন, 'বাঁচাও বাঁচাও', তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো। প্রথমত ইমাম সাহেবের চিৎকার লতিফার শোনার কথা নয়। দ্বিতীয়ত শুনে থাকলেও লতিফা কি করে বুঝলো আগুন লেগেছে? সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এলো কেন? 'আগুন, আগুন' বলে চিৎকার করলেও আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি, তারপর পানির বালতি আনি। এটাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। কারণ পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে। আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'প্রথম শিশুটি মারা গেলো। শিশুটিকে ফেলা হলো কুয়ায়। এই খবর মেয়েটি জানে।

কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে — অন্য কোথাও নয়। তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে এটা সে জানলো কিভাবে? জানলো কারণ সে নিজেই ফেলেছে। এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'আপনাকে কি আরো যুক্তি দিতে হবে? আমার কাছে আরো ছোট খাটো যুক্তি আছে।'

'আর লাগবে না। শুধু বলুন কুয়ার উপরের টিনে ঝনঝন শব্দ হতো কেন? যে শব্দ ইমাম সাহেব নিজেও শুনেছেন।'

'কুয়ার টিনটা না দেখে বলতে পারবো না। আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে, ঝনঝন শব্দ হয়। দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না, কারণ আশেপাশে অনেক ধরনের শব্দ থাকে। রাত যতোই গভীর হয় চারপাশ নীরব হতে থাকে। সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে।'

'আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম। এখন বলুন লতিফা এমন ভয়ংকর কাণ্ড কেন করছে?'

'মেয়েটা অসুস্থ। মনোবিকার ঘটেছে। ইমাম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত। তাদের পরিবারে চাকর-বাকররা যে কাজ করে সে তাই করতো। মেয়েটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরিবারের সবার কাছে ছোট হয়। অপমানিত হয়। এতো প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিলো না। তার মনোবিকার ঘটে। পোয়াতী অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালান্স এদিক-ওদিক হয়। সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মেয়েটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। কি ভয়াবহ অবস্থা।'

'মেয়েটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এটা কেন বলছেন?'

'ইমামতি পেশা মেয়েটির পছন্দ নয়। পছন্দ নয় বলেই মেয়েটি কফিলের গলায় বলেছে — ইমাম আসছে। অজুর পানি দে, জায়নামাজ দে, কেবলা কোনদিকে বলে দে। এক ধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছে।'

'মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিলো কেন? সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে কেন?'

'বড় ধরনের বিকারে এরকম হয়। সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে। নিজের সন্তান হত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছারই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে। আরো কিছু থাকতে পারে। না দেখে বলতে পারবো না।'

৪

ধুন্দুলনাড়া গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌঁছলাম। পৌঁছেই খবর পেলাম পাঁচদিন হয় ইমাম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যাটি ভালো আছে। বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে। তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন। আমি বললাম, আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

AMARBOI.COM

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, ভালো না। খুব খারাপ। কফিল তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। কফিল বলেছে, সাতদিনের মাথায় মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। খুব কষ্টে আছি ভাই সাহেব। আল্লাহপাকের কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দোয়া করবেন।

আমি বললাম, আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।

ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

'যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে। সুস্থ থাকে। উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। অনেক কিছু বুঝতে পারেন। যা আমরা বুঝতে পারি না। উনার কথা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে। এই জন্যেই উনাকে এনেছি।'

'অবশ্যই আমি উনার কথা শুনবো। অবশ্যই শুনবো।'

ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে অনেক লোকজন ছিল। তাদের সরিয়ে দেয়া হল।

মিসির আলি বললেন, আমি কিছু কথা বলব যা শুনতে ভাল লাগবে না তবু দয়া করে শুনুন।

লতিফা চাপা গলায় বললো, আমার সাথে কি কথা?

'আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা। বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে, ভাল থাকে, সে জন্যেই আমার কথাগুলি আপনাকে শুনতে হবে।'

লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, বলেন কি বলবেন।

মিসির আলি খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না। লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় লম্বা ঘোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে। ইমাম সাহেব তার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। মিসির আলির ব্যাখ্যা যতোই শুনছে ততোই তাঁর চেহারা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন?

লতিফা জবাব দিলো না। মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিলো। কি সুন্দর শান্ত মুখ। চোখের তীব্রতা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে।

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্য শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন। সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে। আমার যা বলবার বললাম, বাকিটা আপনার ব্যাপার। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই। আমরা রাতেই রওনা হবো। নৌকা ঠিক করা আছে।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, হ্যাঁ করেছে। এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটবে। আমার ধারণা মেয়েটি নিজেও খানিকটা হলেও এই সন্দেহই

AMARBOI.COM

করছিলো। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। চলুন রওনা দেয়া যাক। এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না।

আমি বললাম, ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না?

'না। আমার কাজ শেষ। বাকিটা ওরা দেখবে।'

রওনা হবার আগে আগে ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। শিশুটি তাঁর কোলে। তিনি বললেন, লতিফা মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে। সে খুব কাঁদতেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মেহেরবানী করে একটু আসেন।

আমরা আবার ঢুকলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, আপনি কি কিছু বলবেন?

লতিফা কাঁদতে কাঁদতে বললো, আল্লাহ্ আপনার ভালো করবে। আল্লাহ্ আপনার ভালো করবে।

'আপনি কোন রকম চিন্তা করবেন না। আপনার অসুখ সেরে গেছে। আর কোনদিন হবে না।'

লতিফা তার স্বামীর কানে কানে কি যেন বললো।

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, জনাব কিছু মনে করবেন না। লতিফা আপনারে একটু ছুঁইয়া দেখতে চায়।

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লতিফা দু'হাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

AMARBOI.COM

নৌকায় উঠছি।

ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন। নৌকা ছাড়ার আগমুহূর্তে নিচু গলায় বললেন, ভাই সাহেব আমি অতি দরিদ্র মানুষ, আপনাদের যে কিছু দিবো আল্লাহপাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। এই কোরান শরীফটা আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। যখন মন খুব খারাপ হয় তখন পড়ি — মন শান্ত করি। আমি খুব খুশি হবো যদি কোরান মজিদটা আপনি নেন। আপনি নেবেন কিনা তা অবশ্য জানি না।

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই নেবো। খুব আনন্দের সঙ্গে নেবো।

'ভাই সাহেব, আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি রাইখা যাইবেন?'

মিসির আলি হাসি মুখে বললেন, হ্যাঁ যাবো। আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাবণ্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয়নি। মাঝে মাঝেই মেয়েটার কথা আমার মনে হয়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাই যাই।

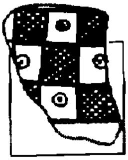

কবি

টাউন প্রেসের মালিক সিরাজুল ইসলাম রাগী রাগী মুখ করে বসে ছিলেন। তাঁর রাগের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রুফ রিডার জোবেদ আলী এখনো এসে পৌঁছায়নি। মেশিনম্যান কাজ ছাড়া বসে আছে। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভাল নয়। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি হলে সিরাজুল ইসলাম সাহেবকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আজ তাঁর খুব শখ ছিল বিন্তির ওখানে রাত কাটাবেন। তিনি মাসে একবার বিন্তির ওখানে কিছুটা সময় থাকেন। এই মেয়েটি ভাল। বাজে ঝামেলা করে না। এই বয়সে বাজে ঝামেলা তাঁর সহ্য হয় না।

রাত আটটার দিকে সত্যি সত্যি চেপে বৃষ্টি এল। তার কিছুক্ষণ পর ভিজতে ভিজতে জোবেদ আলী এসে উপস্থিত।

একটু দেরী হয়ে গেল ইসলাম সাহেব, মেয়েটার জ্বর।

সিরাজুল ইসলাম উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

ডাক্তার গাদা খানিক অষুধ দিয়েছে।

তাই নাকি?

জ্বি।

অসুখটা কি?

জোবেদ আলী দীর্ঘ সময় নিয়ে অসুখ সম্পর্কে বলতে লাগল।

সিরাজুল ইসলাম সাহেবের শোনার আগ্রহ ছিল না। তবু তিনি আগ্রহের একটা ভাব চোখে-মুখে ফুটিয়ে রাখলেন। জোবেদ আলী বলল, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় যাব স্যার।

আরে সর্বনাশ কি বলেন। কাল সকালে ডেলিভারী দিতে হবে। পার্টি দুইবার তাগাদা দিয়ে গেছে। চা খান, চা খেয়ে বসে যান।

জোবেদ আলী বসে গেল। লোকটি প্রুফ দেখার কাজে ওস্তাদ বিশেষ। ন'টার আগেই এক ফর্মার মত দেখা হয়ে গেল।

জোবেদ আলী।

জ্বি স্যার।

কি মনে হয়, বৃষ্টি থামবে?

বলা তো মুশকিল।

মুশকিল হবে কেন? বৃষ্টি-বাদলা নিয়েই তো আপনাদের কারবার — কবি মানুষ।

জোবেদ আলীর মুখে অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা দেখা গেল।

AMARBOI.COM

আপনারা আছেন সুখে। বৃষ্টির মত একটা বাজে ঝামেলা নিয়েও লিখে ফেলেন গদ্যকাব্য।

জোবেদ আলীর মুখের হাসি স্পষ্ট হল। সিরাজুল ইসলাম লোকটাকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করে। কিন্তু এই একটি লোকই তাকে কবি বলে খোঁচা দেয়। খোঁচাটিও বড় মধুর মনে হয়।

স্যার, একটু সকাল সকাল যাওয়া দরকার। মেয়েটা স্যার —

যাবেন যাবেন, কতক্ষণ আর লাগবে? শেষ করে ফেলেন। বানানগুলিও দেখবেন।

জোবেদ আলী গভীর মনোযোগে বানান দেখে। সিরাজুল ইসলাম দেখেন বৃষ্টি। মাসের বিশেষ বিশেষ ফূর্তির দিনগুলিতে বৃষ্টি-বাদলা হয় কেন এই রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন না। তাঁর কাছে জগতের অমীমাংসিত রহস্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বিন্তি মেয়েটির গায়ের রঙ কালো। কালো মেয়েগুলি সাধারণত মায়াবতী হয়। একটি কালো মায়াবতী যুবতীর জন্যে তার এক ধরনের ক্ষুধা বোধ হয়। তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ ফর্সা। দারুণ ফর্সা। শুধু গায়ের রঙের জন্যে তার সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যায়। মেয়েটির উঁচু দাঁত তখন চোখে পড়েনি। কিংবা দাঁত হয়ত সে সময় উঁচু ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাঁত আরো উঁচু হচ্ছে। এবং গায়ের রঙ হচ্ছে আরো সাদা। এখন তাকে শ্বেতী রোগীর মত লাগে।

স্যার বাকিটা কাল সকালে দেখে দিব।

আরে পাগল নাকি? সকালেই পার্টি আসবে। শেষ করে ফেলেন। কতক্ষণ আর লাগবে? চা খাবেন?

জ্বি না।

খান খান। এই চা দে তো। তারপর কবি সাহেব নতুন কবিতা কি লিখলেন?

একটা ছোট লিরিকের মত লিখলাম গত রাত্রে।

বলেন কি?

শুনবেন স্যার?

থাক থাক কাজ করেন। কাজের সময় কাব্যচর্চা ঠিক না।

জোবেদ আলী প্রুফের উপর চোখ রেখে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'দেশের মাটি'তে ছাপা হবে।

তাই নাকি?

জ্বি। সম্পাদক সাহেব খুব প্রশংসা করলেন।

ভাল ভাল। এইবার বই বের করে ফেলেন।

বলতে বলতে সিরাজুল ইসলামের মনে হল বৃষ্টি ধরে আসছে। সিরাজুল ইসলাম রক্তের মধ্যে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভব করলেন। বিন্তি মেয়েটি কথা বলে টেনে টেনে। যশোর-টশোরের দিকে বাড়ি নিশ্চয়ই। তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি। এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে বাড়তি খাতির রাখা ঠিক না। দূরে দূরে থাকতে হয়।

জোবেদ আলী কাজ শেষ করে উঠে পড়ল। এবং মুখ কালো করে মাথা চুলকাতে লাগল। এই ভঙ্গিটি সিরাজুল ইসলামের চেনা। কাজেই তিনি ভারী গলায় বললেন, পার্টির কাছ থেকে আদায়পত্র কিছু হয় নাই। বিজনেস তুলে দিতে হবে, বুঝলেন?

দশটা টাকা হবে? মেয়েটা কন্যা নিয়ে যেতে বলেছিল।

সিরাজুল ইসলাম অপ্রসন্ন মুখে একটা নোট বের করে দিলেন। মাসের মাঝামাঝি টাকা দিতে তাঁর ভাল লাগে না।

যাই স্যার।

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। তাঁর মুখ অপ্রসন্ন। কারণ বড় বড় ফোঁটায় আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জোবেদ আলী বাসায় ফিরে দেখেন মেয়ের জ্বর কমে গিয়েছে। মেয়ে অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। কলা এলে দুধ-কলা দিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু রাত বেড়ে গিয়েছিল। কলা পাওয়া যায়নি। জোবেদ আলীর বেশ খারাপ লাগল।

কাল সকালে কলা নিয়ে আসব।

আচ্ছা।

সবরি কলা না সাগর কলা?

যেটা তোমার ইচ্ছা।

ঠিক আছে।

জোবেদ আলী খেয়ে-দেয়ে তার খাতা নিয়ে বসল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই একটা সুবিধা হয়েছে, গভীর রাতে বই-খাতা নিয়ে বসলেও কেউ কিছু বলে না।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এ রকম ঝড়-বৃষ্টির রাত ঘুমিয়ে কাটানোর কোন মানে হয় না।

জোবেদ আলীর মেয়েটি ঘুমাল না। তার জ্বর আসছিল। সে কাঁথা গায়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে বাবাকে দেখতে লাগল। একবার ফিসফিস করে ডাকল, 'বাবা'। জোবেদ আলী শুনতে পেলেন না। তাঁর মনে অদ্ভুত সুন্দর একটা লাইন এসেছে — "কি সুন্দর বৃষ্টি আজ রাতে।" অন্য লাইনগুলি আর মনে আসছে না। এই একটি লাইনই ঘুরেফিরে আসছে। গভীর আবেগে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

মেয়েটির জ্বর বাড়ছে। সে আবার ডাকল — বাবা। বাইরে ঝড়-বৃষ্টির শব্দে সে ডাক চাপা পড়ে গেল। মেয়েটি জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তার কবি বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। শিশুরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে, আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না।

AMARBOI.COM

রহস্য

রহস্যজাতীয় ব্যাপারগুলিতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। তবু প্রায়ই এরকম কিছু গল্প-টল্প শুনতে হয়। গত মাসে ঝিকাতলার এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তাঁর ঘরে একটি তক্ষক আছে — সেটি রোজ রাত ১ টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকে। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম। এরকম সময়নিষ্ঠ তক্ষক আছে নাকি এ যুগে? ভদ্রলোক আমার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বললেন, কি ভাই বিশ্বাস করলেন না?

জ্বি না।

এক রাত থাকেন আমার বাসায়। নিজের চোখে দেখেন তক্ষকটা। ঘড়ি ধরে বসে থাকবেন। দেখবেন ঠিক ১ টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকবে।

আরে দূর, কি যে বলেন।

ভদ্রলোক মুখ কালো করে উঠে গেলেন। চারদিন পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। পৃথিবীটা এরকম যার সঙ্গে দেখা হবার তার সঙ্গে দেখা হয় না। ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি কি দৈনিক বাংলার সালেহ সাহেবকে চেনেন?

হ্যাঁ চিনি।

তাঁকে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের কানে শুনেছেন — বলেছেন একটা নিউজ করবেন।

ভালই তো। নিউজ হবার মতই খবর।

আপনি আসেন না ভাই, থাকেন এক রাত। নিজের কানে শুনবেন।

আমাকে শোনালে কি হবে?

আরে ভাই, আপনারা ইউনিভার্সিটির টিচার। আপনাদের কথার একটা আলাদা দাম।

তাই নাকি?

আপনারা একটা কথা বললে কেউ ফেলবে না।

এই জিনিসটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ করছেন মনে হচ্ছে।

না, হৈ-চৈ কোথায়? অনেকেই অবশ্যি শুনে গেছেন। বাংলাদেশ টিভির ক্যামেরাম্যান নজমুল হুদাকে চেনেন?

জ্বি না।

উনিও এসেছিলেন। খুব মাইডিয়ার লোক। আপনি আসুন না।

আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন যাওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মুখভর্তি করে হাসলেন। টেনে-টেনে বললেন, চলেন চা খাই।

AMARBOI.COM

না, চা খাব না।

আরে ভাই, আসেন না। প্রফেসর মানুষ, আপনাদের সঙ্গে থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার।

ভদ্রলোক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। যেতে হল চায়ের দোকানে।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? চপ?

না।

আরে ভাই খান না। এই এদিকে দু'টো চপ দে তো। এখন ভাই বলেন, কবে যাবেন?

আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। বলে দেব একদিন।

চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি রহস্যের কথা শুরু করলেন। নাইনটিন সিক্সটিতে তিনি বরিশালের পিরোজপুরে থাকতেন। তাঁর বাসার কাছে একটা বিরাট কাঁঠাল গাছ ছিল। অমাবস্যার রাতে নাকি সেই কাঁঠাল গাছ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসত। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, সেই কান্নারও কি কোন টাইম ছিল? নির্দিষ্ট সময়ে কাঁদত? আপনার তক্ষকের মত?

ভদ্রলোক আহত স্বরে বললেন, আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

বিশ্বাস করব না কেন?

আমি কান্নার শব্দ গোটাটা টেপ করে রেখেছি। একদিন শোনাব আপনাকে।

ঠিক আছে।

বরিশালের ডিসি সাহেবও শুনেছেন। চেনেন উনাকে? আসগর সাহেব। সি এস পি। খুব খান্দানী ফ্যামিলি।

না, চিনি না।

ডিসি সাহেবের এক ভাই আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বিরাট অফিসার।

তাই বুঝি? '

জ্বি। উনার বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। খুব খাতির-যত্ন করলেন। গুলশানে বাসা। তিন তলা। উনি থাকেন এক তলায়। ওপরের দু'টো তলা ভাড়া দিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে বিদায় হলেন। আমার মায়াই লাগল। ইন্ডেনটিং ফার্মে সামান্য একটা চাকরি করেন। দেখেই বোঝা যায় অভাবে পর্যুদস্ত। চোখের দৃষ্টি ভরসাহারা। বয়স এখনো হয়ত ত্রিশ হয়নি কিন্তু বুড়োটে দেখায়। বিচিত্র চরিত্র।

মাসখানেক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল না। তার প্রধান কারণ, যে সব জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা সে সব জায়গা আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করেছি। নিউ মার্কেটে আড্ডার জায়গাটিতে যাই না। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে? এই লোকটি পিচ্ছিল পদার্থ, সে গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাবে। আর ছাড়ানো যাবে না। কিন্তু তবু দেখা হল। একদিন শুনলাম সে ইউনিভার্সিটি ক্লাবে এসে খোঁজ নিচ্ছে। ক্লাবের বেয়ারা বলল, গত কিছুদিন ধরে নাকি সে নিয়মিতই আসছে। কি মুসিবত।

একদিন আর এড়ানো গেল না। ভদ্রলোক বাসায় এসে হাজির।

কি ভাই, আপনি তো আর এলেন না।

কাজের ব্যস্ততা . . .

আজ আপনাকে নিতে এসেছি।

AMARBOI.COM

সে কি?

কবি শামসুল আলম সাহেবও আসবেন।

তাই বুঝি?

জ্বি। চিনেন তো শামসুল আলম সাহেবকে? দু'টো কবিতার বই বেরিয়েছে। 'পাখির পালক' আর 'অন্ধকার জ্যোৎস্না'।

তাই বুঝি?

জ্বি। আমাকে দু'টো বই-ই দিয়েছেন। খুবই বন্ধু মানুষ। বাড়ি হচ্ছে আপনার ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা।

ও।

উনার ছোট ভাইও গল্প-টল্প লেখেন। আরিফুল আলম।

গেলাম তাঁর বাসায়। ঝিকাতলার এক গলিতে ঘুপসি মত দু'কামরার বাড়ি। আমার মেজাজ খুবই খারাপ। রাত দেড়টা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে সময়নিষ্ঠ তক্ষকের ডাক শোনার জন্যে। কত রকম যন্ত্রণা যে আছে পৃথিবীতে।

ভদ্রলোক আমাকে ঘরে বসিয়ে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। মহিলার হাতের সযত্ন স্পর্শ আছে। ভদ্রলোক বিবাহিত জানতাম না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। অল্প বয়েসী তরুণী এবং অসম্ভব রূপসী। আমি প্রায় হকচকিয়ে গেলাম।

আমার স্ত্রী লীনা। আর লীনা, উনি হুমায়ূন আহমেদ। এঁর কথা তো তোমাকে বলেছি। উনি লেখেন-টেখেন। ছাপা হয়।

লীনা হাসিমুখে বলল, জ্বি, আপনার কথা প্রায়ই বলে।

লীনা একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

লীনা চলে গেল ভেতরে। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, লীনার গল্প-উপন্যাস লেখার শখ আছে। কয়েকদিন আগে সাপ নিয়েও একটা গল্প লিখেছে। মারাত্মক গল্প ভাই। আপনাকে পড়ে শোনাতে বলবো। আমি বললে পড়বে না। আপনিও কাইন্ডলি একটু বলবেন। রিকোয়েস্ট করবেন।

আমি বললাম, গুণী মহিলা তো।

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তা ভাই, কথাটা অস্বীকার করব না। গানও জানে। নজরুল গীতি। ভাল গায়। বাড়িতে টিচার রেখে শিখেছে।

তাই নাকি?

জ্বি, শোনাবে আপনাকে। একটু প্রেসার দিতে হবে আর কি? আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলেই শোনাবে। কাইন্ডলি একটু রিকোয়েস্ট করবেন।

ঠিক আছে, করব।

চা এসে পড়ল। চায়ের সঙ্গে বড়া জাতীয় জিনিস। খেতে খেতে। আমি বললাম, কিসের বড়া এগুলি? ডালের নাকি?

AMARBOI.COM

ভদ্রলোক উচ্চস্বরে হাসলেন, নারে ভাই, ফুলের বড়া। হা–হা–হা। কত রকম অদ্ভুত রান্না যে লীনা জানে। মাঝে মাঝে এত সারপ্রাইজড্ হই। খেতে কেমন হয়েছে বলেন? চমৎকার না?

ভাল, বেশ ভাল।

আরেক দিন আসবেন, চাইনীজ স্যুপ খাওয়াবো। চিকেন কর্ন স্যুপ। চাইনিজ–রেস্তোরাঁর চেয়ে যদি ভাল না হয় তাহলে কান কেটে ফেলবেন। হা–হা–হা। থাই স্যুপও জানে।

আমি মেয়েটির লেখা একটি ছোটগল্প শুনলাম। দু'টি কবিতা শুনলাম। তিনটি নজরুল গীতি শুনলাম। ভদ্রলোক মুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। বারবার বললেন, ইশ শামসুল আলম সাহেব আসলেন না। দারুণ মিস্ করলেন, কি বলেন ভাই?

রাত এগারোটার দিকে বললাম, তাহলে আজ উঠি?

তক্ষকের ডাক শুনবেন না?

আরেক দিন শুনব।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ভুলবেন না যেন ভাই। আসতেই হবে।

ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। রাস্তায় নেমেই বললেন, আমার স্ত্রীকে কেমন দেখলেন ভাই?

খুব গুণী মহিলা।

ভদ্রলোকের চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ধরা গলায় বললেন, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। ঠিক না ভাই?

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক কাঁপা গলায় বললেন, গরীব মানুষ, স্ত্রীর জন্যে কিছুই করতে পারি না। কিন্তু এইসব নিয়ে লীনা মোটেই মাথা ঘামায় না। বড় ফ্যামিলির মেয়ে তো। ওদের চালচলনই অন্য রকম। আমরা খুব সুখী।

আমি রিকশায় উঠতে উঠতে বললাম, খুব ভাগ্যবান আপনি।

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আবেগে কেঁদে ফেলবেন।

ভাই, আরেক দিন কিন্তু আসতে হবে। তক্ষকের ডাক শুনতে হবে। আসবেন তো? প্লীজ। লোকজন এলে লীনা খুব খুশী হয়।

তক্ষকের ডাকের মত কত রহস্যময় ব্যাপারই না আছে পৃথিবীতে।

AMARBOI.COM

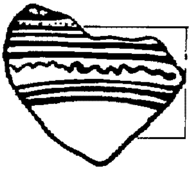

বীনার অসুখ

বীনার বয়স একুশ।

সে লালমাটিয়া কলেজে বি.এ. সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ত। বীনার মামা ইদরিশ সাহেব একদিন হঠাৎ বললেন, বীনা তোর কলেজে যাবার দরকার নেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা কর। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে। কলেজে আজকাল কি পড়াশোনা হয় তা তো জানাই আছে। যাওয়া না যাওয়া একই।

বীনা ঘাড় নেড়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, জ্বি আচ্ছা।

মামার কথার উপর কথা বলার সাহস বীনার নেই। তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মামা দেন। গত বছর গলার একটা চেন বানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে যদি ঠিকঠাক হয় সেই খরচও মামাকেই দিতে হবে। বীনার বাবা প্যারালিসিস হয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। তাঁর পক্ষে একটা টাকাও খরচ করা সম্ভব না। তিনি সবার কাছ থেকে টাকা নেন। কাউকে কিছু দেন না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, বীনা, তুই আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দে। আর শোন, কলেজে না-যাওয়া নিয়ে মন-টন খারাপ করিস না। মন খারাপের কিছু নাই।

'জ্বি, আচ্ছা মামা।'

বীনা শরবত আনতে চলে গেল। তার মনটা অসম্ভব খারাপ। কলেজ বন্ধ করে দেবার কোন কারণ সে বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করার সাহসও নেই। দিনের পর দিন ঘরে বসে থেকেই বা সে কি করবে? শরবত বানাতে বানাতে তার মনে হল — হয়ত তার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গফরগাঁয়ের ঐ ছেলে শেষ পর্যন্ত হয়ত রাজি হয়েছে। হয়ত ওরা বলেছে — মেয়েকে কলেজে পাঠাবেন না। বিয়ে ঠিকঠাক হলে ছেলেপক্ষের লোকজন অদ্ভুত অদ্ভুত শর্ত দিয়ে দেয়।

গফরগাঁয়ের ঐ ছেলেটাকে বীনার একেবারেই পছন্দ হয়নি। কেমন যেন পশু পশু চেহারা। সোফায় বসেছিল দুই হাঁটুতে দু' হাত রেখে। মুখ একটু হা হয়ে ছিল। সেই হা- করা মুখের ভেতর কালো কুচকুচে জিহ্বা। বীনার দিকে এক পলক তাকাতেই বীনার বুক ধ্বক করে উঠল। মনে হল একটা পশু জিভ বের করে বসে আছে। তার নাকে ঝাঁঝাল গন্ধও এসে লাগল। গন্ধ ঐ লোকটার গা থেকে আসছিল। টক দুধ এবং পোড়া কাঠের গন্ধ একত্রে মেশালে যে রকম গন্ধ হয় সে রকম একটা গন্ধ। গা কেমন ঝিমঝিম করে।

লোকটা তাকে কোন প্রশ্ন করল না। শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বীনার একবার মনে হল, লোকটার চোখে হয়ত পাতা নেই। সাপের যেমন চোখের পাতা থাকে না সে রকম। লোকটার সঙ্গে বয়স্ক যে দু'জন মানুষ এসেছিলেন তারা অনবরত কথা বলতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

একজন বীনাকে ডাকতে লাগলেন — আন্টি। চুল-দাড়ি পাকা বয়স্ক একজন লোক যদি আন্টি ডাকে তখন ভয়ংকর রাগ লাগে। কোন কথারই জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বীনা অবশ্যি সব প্রশ্নের জবাব দিল। কারণ, মামা তার পাশেই বসে আছেন। মামা বসেছেন সোফার ডানদিকে, সে বাঁ দিকে। প্রশ্নের জবাব না দেয়ার কোন উপায়ই নেই।

'তারপর আন্টি রবিঠাকুর কত সনে নোবেল পুরস্কার পান তা জানা আছে?'

'জ্বি না।'

'উনিশশ' তের। অবশ্যি উনি উনিশশ' তেরতে না পেয়ে উনিশশ' একত্রিশে পেলেও কিছু যেত আসত না। তবু তারিখটা জানা দরকার। এটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ। মেয়েরা শুধু রান্নাবান্না করবে তা তো না — তাদের পৃথিবীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাও তো জানতে হবে। কি বলেন আন্টি?'

'জ্বি।'

'আন্টি, আপনি খবরের কাগজ পড়েন?'

'না।'

'এইটা হচ্ছে মেয়েদের একটা কমন দোষ। কোন মেয়ে খবরের কাগজ পড়েন না। আপনি কেন খবরের কাগজ পড়েন না, না পড়ার কারণটা কি আমাদের একটু বলুন তো আন্টি?'

বীনা কিছু বলল না। মামা পাশে বসে আছেন এই ভয়েই বলল না — কারণ মামা খবরের কাগজ রাখেন না বলেই খবরের কাগজ পড়ে না। এই তথ্যটা এঁদের জানান নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মামা রাগ করবেন।

AMARBOI.COM

ইদরিশ সাহেব বললেন, মা বীনা ইনাদের চা-মিষ্টি দাও। চার-পাঁচ জাতের মিষ্টি টেবিলে সাজান। বীনা প্লেটে উঠিয়ে উঠিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটাকে যখন দিতে গেল তখন লোকটা অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করল। থাবার মত বিশাল হাত বাড়িয়ে মিষ্টির থালা নিল। বীনা লক্ষ্য করল লোকটির আঙুলের নখ কালচে ধরনের। নখের মাথা পাখির নখের মত ছুঁচাল। বীনার গায়ে সত্যি সত্যি কাঁটা দিয়ে উঠল। সে মনে মনে বলল, আল্লা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে। আল্লা এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে।

লোকটা বীনাকে পছন্দ করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। ইদরিশ সাহেব এই প্রসঙ্গে বাসার কারো সঙ্গেই কোন আলাপ করলেন না। ইদরিশ সাহেবের এই হল স্বভাব। বাসার কারোর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। নিজে যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। এই যে তিনি আজ বীনার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন — এর কারণ তিনি কাউকে বলবেন না। ইদরিশ সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে, নারী জাতির সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ না করা। নারী জাতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার ফল এটাই — সময় নষ্ট। কী দরকার সময় নষ্ট করে?

ইদরিশ সাহেবের বাসায় তিনি ছাড়া সবই মেয়ে। সব মিলিয়ে সাতজন মেয়ে। ইদরিশ সাহেবের স্ত্রী, চার কন্যা, তাঁর এক ছোট বোন এবং কাজের একটি মেয়ে। তাঁর বাসায় দুটা বিড়াল থাকে। এই বিড়াল দুটিও মেয়ে বিড়াল। সঙ্গত কারণেই ইদরিশ সাহেব বাসায় যতক্ষণ

থাকেন মনমরা হয়ে থাকেন। চারদিকে মেয়েজাতি নিয়ে বাস করতে তাঁর ভাল লাগে না। তিনি তাঁর ব্যবসা, তাঁর পরিকল্পনা কিছুই কাউকে বলেন না।

দিন পনেরো বীনার খুব ভয়ে ভয়ে কাটল। কে জানে হয়ত লোকটা তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তার চেহারা এমন কিছু খারাপ না, পছন্দ করতেও পারে। রঙ মোটামুটি ফর্সা। চোখ দুটা মায়ামায়া, লম্বা হালকা-পাতলা শরীর। সাজলে তাকে ভালই দেখায়। পছন্দ করে ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীনা বেশ কয়েকবার লজ্জার মাথা খেয়ে তার মামীকে জিজ্ঞেস করেছে, মামী, মামা কি কিছু বলেছে?

বীনার মামী হাসিনা পৃথিবীর সরলতম মহিলা। অতি সহজ কথাও তিনি বুঝেন না। একটু ঘুরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এমনভাবে তাকান যে, মনে হয় অথৈ জলে পড়েছেন। বীনার সহজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন — কিসের কথা রে?

'ঐ যে শুক্রবারে যে আসল?'

'কে আসল শুক্রবারে?'

'তিনজন লোক আসল না?'

'তিনজন লোক আবার কখন আসল?'

'বিয়ের আলাপ নিয়ে আসল না?'

'ও আচ্ছা — মনে পড়েছে। না, কিছু বলে নাই। তোর মামা কি কখনো কিছু বলে? হঠাৎ একদিন শুনবি বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গেছে। তোর মামা আগে-ভাগে কিছু বলবে? কোনদিন না।'

মাসখানেক কেটে যাবার পরেও বীনার ভয় কাটল না। মামা তাকে কোন কারণে ডাকলেই মনে হত এই বুঝি বলবেন, বীনা তোর বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললাম। শ্রাবণ মাসের বার, মঙ্গলবার। তুই তোর বাবাকে চিঠি লিখে দে।

বীনা আতঙ্কে আতঙ্কেই ভয়াবহ কিছু দুঃস্বপ্নও দেখল। এই দুঃস্বপ্নগুলির প্রতিটিতে তার বিয়ে হয় সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে। বাসরঘরে সে আর ছেলেটা থাকে আর সবাই চলে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার স্বামী আদুরে গলায় বলে — লজ্জায় দেখি মরে যাচ্ছ। এই, তাকাও না আমার দিকে। তাকাও। সে তাকায়। তাকাতেই তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষ কোথায়, একটা কুকুরের মত পশু থাবা গেড়ে বসে আছে। হা-করা মুখের ভেতর কুচকুচে কালো একটা জিহ্বা। জিহ্বা মাঝে মাঝে মুখের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পশুটার মুখ ছুঁচাল। তার গা থেকে টক দৈ আর পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। কিন্তু বীনা এই জাতীয় স্বপ্নে গন্ধ পেত। তীব্র কটুগন্ধেই এক সময় ঘুম ভেঙে যেত।

প্রায় দেড়মাস এ রকম আতংকে কাটল। তারপর আতংকে হঠাৎ করেই কেটে গেল। কারণ ইদরিশ সাহেব এক ছুটির দিনের দুপুরে ভাত খেতে খেতে বললেন, বিয়েটা ভেঙে দিলাম।

হাসিনা বললেন, কার বিয়ে ভেঙে দিলে?

AMARBOI.COM

'বীনার, ঐ যে তিনজন এসেছিল শুক্রবারে। খুব চাপাচাপি করছিল। মেয়ে না-কি তাদের খুব পছন্দ। ওদের বাড়ির অবস্থা ভাল। গফরগাঁয়ে কাপড়ের ব্যবসা আছে। গ্রামের বাড়িতে ধান-ভাঙ্গা কল দিয়েছে। বড় বড় আত্মীয়স্বজন।'

'তাহলে বিয়ে ভেঙে দিলে কেন?'

'ছেলের গায়ে বিশ্রী গন্ধ। ঘোড়ার আস্তাবলে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকম। যে ক'বার এই ছেলে আমার কাছে এসেছে এরকম গন্ধ পেয়েছি। কি দরকার?'

হাসিনা দুঃখিত মুখ করে বললেন, আহা গন্ধের জন্যে বিয়েটা বাতিল করে দিলে। ভালমত সাবান দিয়ে গোসল দিলেই তো গন্ধ চলে যায়।

ইদরিশ সাহেব কড়া গলায় বললেন, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। তুমি রোজ গিয়ে গোসল করিয়ে আসবে না-কি? মেয়েছেলে মেয়েছেলের মতো থাকবে। সব কিছুর মধ্যে কথা বলবে না।

'রাগ করছ কেন? রাগ করার মত কি বললাম?'

'চুপ। আর একটা কথাও না।'

ইদরিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারে হাসিনা কাঁদতে বসেন তবে বীনার আনন্দের সীমা থাকে না। যাক শেষ পর্যন্ত লোকটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বীনার মন ভরে যায়। মামা কথা না বললেও মানুষ খারাপ না। কে জানে এই যে তাকে কলেজে যেতে নিষেধ করেছেন এরও কোন ভাল দিক নিশ্চয়ই আছে। মামা যদি শুধু কারণটা বলত। কিন্তু মামা বলবে না। অদ্ভুত মানুষ।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে বীনা তার কলেজ বন্ধ হবার রহস্য জেনে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব বীনার বাবাকে চিঠিতে কারণটা জানিয়েছেন। খামে ভরার আগে এই চিঠি বীনা পড়ে ফেলল।

পাকজনাবেষু

দুলাভাই,

আমার সালাম জানিবেন। পর সমাচার এই যে, বীনার কলেজে যাওয়া একটি বিশেষ কারণে বন্ধ করিতে হইয়াছে। বীনা ইহাতে কিঞ্চিৎ মনে কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। এখন আপনাকে কারণ বলিতেছি।

জোবেদ আলী নামক গফরগাঁয়ের জনৈক যুবকের সহিত বীনার বিবাহের আলাপ হইয়াছিল। পাত্রপক্ষের বিশেষ করিয়া পাত্রের বীনাকে খুবই পছন্দ হইয়াছিল। একটি বিশেষ কারণে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উক্ত জোবেদ আলী প্রায়শই বীনাকে অনুসরণ করিয়া কলেজ পর্যন্ত যায়। ইহা আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কোন ঠিক নাই। একবার যদি এ্যাসিড জাতীয় কিছু দেয় তাহা হইলে সর্বনাশের কোন শেষ থাকিবে না। যাহা হউক আপনি তাহার বি.এ. পরীক্ষা নিয়া কোন চিন্তা করিবেন না। আমি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন কোন অসুবিধা হইবে না।

AMARBOI.COM

আগেকার মত কলেজগুলি পার্সেন্টেজ নিয়া ঝামেলা করে না। আপনার শরীরের হাল অবস্থা এখন কি? শরীরের যত্ন নিবেন। বীনাকে লইয়া অযথা চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না।"

চিঠি পড়ে বীনার গা কাঁপতে লাগল। কি সর্বনাশের কথা! ঐ লোক তার পেছনে পেছনে যায়। কৈ সে তো একদিনও টের পায়নি। আর তার মামার কি উচিত ছিল না ঘটনাটা তাকে জানান? সে এখন কলেজে যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু অন্য জায়গায় তো যাচ্ছে। আগে জানলে তাও যেত না। ঘরে বসে থাকত। অবশ্যই মামার উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে জানান।

বীনাকে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে বলা ঠিক হবে না। সে যদি বুদ্ধিমতী মেয়ে হত তাহলে চট করে বুঝে ফেলত তাকে ঘটনাটা জানানোর জন্যেই ইদরিশ সাহেব খামে ভরার আগে চিঠিটা দীর্ঘ সময় টেবিলে ফেলে রেখেছিলেন। এই জাতীয় ভুল তিনি কখনো করেন না।

বীনা বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। আগের ভয়ের স্বপ্নগুলি আবার দেখতে লাগল। এবারের স্বপ্নে আরো সব কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমন হল যে, ঘুমুতে পর্যন্ত ভয় লাগে।

হাসিনা বলেন, কি হয়েছে তোর বল তো?

বীনা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলে, কই কিছু হয়নি তো?

'তুই তো শুকিয়ে চটি জুতা হয়ে যাচ্ছিস। তোর তো আর বিয়েই হবে না। এরকম শুকনো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল? গায়ে গোশত না থাকলে ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করে না। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের বদ। ঝাঁটা মারি এদের মুখে।'

বীনার বন্দীজীবন কাটতে লাগল। মেয়েরা যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বীনাও খাপ খাইয়ে নিল। সারাদিন তিন কামরার ঘরেই সময় কাটে। বাইরের বারান্দায় ভুলেও যায় না। বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটা চোখে পড়ে। তার ভয় বারান্দায় দাঁড়ালে যদি লোকটাকে দেখে ফেলে। এত সাবধানতার পরও একদিন দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। হাসিনা বললেন, বৃষ্টি এসেছে, কাপড়গুলি নিয়ে আয় তো বীনা। বীনা কাপড় আনতে গিয়ে পাথরের মত জমে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার অপর পাশে জারুল গাছের নিচে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বীনার দিকে। মুখ হা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বীনাকে দেখেই সে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপাশে চলে এল। হাত ইশারা করে কি যেন বলল। বীনা চিৎকার করে ঘরে ঢুকল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তার জ্বর উঠে গেল একশ' তিন।

হাসিনা বললেন, এটা কেমন কথা। লোকটা তো বাঘও না, ভালুকও না। তাকে দেখে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?

বীনা বিড়বিড় করে বলল, আমি জানি না মামী। কেন এত ভয় লাগছে আমি জানি না। আপনি আমাকে ধরে বসে থাকেন। কেমন যেন লাগছে মামী।

ইদরিশ সাহেব সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে সব শুনলেন। কাউকে কিছুই বললেন না। সহজ ভঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া করলেন। বড় মেয়েকে অংক দেখিয়ে দিলেন। রাত সাড়ে ন'টার সময় বললেন, একটা স্যুটকেসে বীনার কাপড় গুছিয়ে দাও তো। রাত এগারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। বীনাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসি।

AMARBOI.COM

হাসিনা হতভম্ব হয়ে বললেন, আজ রাতে?

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, আজ রাতে নয় তো কি পরশু রাতে না-কি? জোবেদ হারামজাদা বড় বিরক্ত করছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখেছি।

'আজ রাতে যাওয়ার দরকার কি, কাল যাও।'

'কাল যেতে পারলে আজ যেতে অসুবিধা কি? তোমরা মেয়ে মানুষরা যা বোঝ না শুধু সেটা নিয়ে কথা বল। কাপড় গুছিয়ে দিতে বলেছি গুছিয়ে দাও।'

'বীনার জ্বর।'

'জ্বরের সঙ্গে কাপড় গোছানোর সম্পর্ক কি? কাপড় তো তুমি গোছাবে। তোমার গায়ে তো জ্বর নেই।'

হাসিনা কাপড় গুছিয়ে দিলেন। তার স্বামীকে তিনি চেনেন। কথাবার্তা বলে লাভ হবে না। বীনা একশ' দুই পয়েন্ট ফাইভ জ্বর নিয়ে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে উঠল। বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে সেই জ্বর বেড়ে হল একশ' চার পয়েন্ট ফাইভ।

ইদরিশ সাহেব ছুটি নিয়ে যাননি। বীনাকে রেখে পরদিনই তাঁকে চলে আসতে হল। বীনা সপ্তাহখানিক জ্বরে ভোগে কংকালের মত হয়ে গেল। মুখে রুচি নেই। যা খায় তাই বমি করে ফেলে দেয়। রাতে ঘুম হয় না। প্রায় রাতই জেগে জেগে কাটিয়ে দেয়। চোখের পাতা এক হলেই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে।

এই সময় তার ভয়ের অসুখ হয়। সারাক্ষণই ভয় লাগে। কোন কারণ ছাড়াই বাতাসে জানালার পাট নড়ে উঠল — বীনার হৃদপিণ্ড লাফাতে শুরু করে। সে আতংকে অস্থির হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঘাম হয়।

বীনাদের এই বসতবাড়িটা খুবই পুরানো। বীনার দাদা এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খুব সস্তায় এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি। পুরো জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সংস্কারের অভাবে দেয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। দোতলার ঘরের বেশির ভাগই ব্যবহারের উপযোগী নয়। একতলার তিনটা ঘর শুধু ব্যবহৃত হয়। দু'তলার ঘর তালাবদ্ধ থাকে।

একটা ঘরে বীনার বাবা এমদাদ সাহেব থাকেন। প্যারালাইসিসের কারণে এই ঘর থেকে বের হবার তাঁর কোন উপায় নেই। অন্য একটা ঘরে বীনা এবং বীনার দূর- সম্পর্কের মামী মরিয়ম থাকেন। ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে বাতাসী নামের কমবয়েসী একটা মেয়ে থাকে। তার চোখে অসুখ আছে। রাতে সে কিছুই দেখে না।

বাড়িতে মানুষ বলতে এই চারটি প্রাণী। সন্ধ্যার পর থেকেই বীনার ভয় ভয় করে। দোতলার বারান্দায় কিসের যেন শব্দ হয়। মনে হয় খড়ম পড়ে কেউ যেন হাঁটে। বীনা জানে ইঁদুর শব্দ করছে — তবু তার ভয় কাটে না। দুর্বল নার্ভের কারণেই হয়ত আতংকে তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে — কিসের শব্দ মামী?

মামী ঘরের কাজ করতে করতে নির্বিকার গলায় বলেন — জানি না।

'মনে হয় ইঁদুরের শব্দ তাই না মামী?'

'হইতেও পারে।'

AMARBOI.COM

'অন্য কিছু কি?'

'সইন্ধ্যা বেলায় এরার নাম নেওন নাই মা। খারাপ বাতাস হইতে পারে।'

'খারাপ বাতাস?'

'কতদিনের পুরানো বাড়ি। উপরের ঘরগুলান খালি পইড়া থাকে। কেউ বাত্তি দেয় না। ঘরে বাত্তি না দিলে খারাপ বাতাসের আনাগোনা হয়।'

'বাতি দেয় না কেন? বাতি দিলেই তো হয়। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাতি দিবেন মামী।'

'আইচ্ছা দিমুনে। অখন ঘুমাও।'

বীনা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না। রাত যতই বাড়তে থাকে দোতলার শব্দ ততই বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বীনার বাবার গোঙানি। গভীর রাতে তিনি হাঁটুর ব্যথায় গোঙানির মত শব্দ করেন। সেই শব্দও বীনার কানে অমানুষিক শব্দ বলে মনে হয়। যেন বীনার বাবা নয় অন্য কেউ শব্দ করছে। সেই অন্য কেউ মানুষগোত্রীয় নয়। এক ধরনের চাপা হাসিও শোনা যায়।

বীনাদের স্নানঘর মূল ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্নানঘর বীনার খুব প্রিয়। শ্যাওলা ধরা দেয়াল ঘেরা ছোট্ট চারকোণা একটা জায়গা। ভেতরে চৌবাচ্চা আছে। স্নানঘরের ছাদটা ছিল টিনের। গত আশ্বিন মাসের ঝড়ে টিনের ছাদ উড়ে গেছে। সেই ছাদ আর ঠিক করা হয়নি। গোসলের সময় মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। ঠিক দুপুর বেলায় সূর্যের ছায়া পড়ে চৌবাচ্চার পানিতে। মগ ডুবালেই চৌবাচ্চা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে চারদিকের সবুজ দেয়ালে। বীনার বড় ভাল লাগে। দুপুর বেলা বীনার অনেকখানি সময় এই গোসলখানায় কেটে যায়। রোজই মনে হয় গ্রামের বাড়িতে এসে ভালই হয়েছে। রাতের তীব্র আতংকের কথা তখন আর মনে থাকে না।

AMARBOI.COM

এক দুপুর বেলায় এই গোসলখানাতেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। বীনা গোসল করছে। চারদিক সুনসান নীরবতা। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে চৌবাচ্চায়। বীনার চমৎকার লাগছে। শরীরটা আগের মত দুর্বল লাগছে না। সে আপন মনে খানিকক্ষণ গুন গুন করল।

বীনা মাথায় পানি ঢালল। ঠাণ্ডা পানি। শরীর কেঁপে উঠল। আর তখনি সে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল। অদ্ভুত হলেও গন্ধ চেনা, এই গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। বীনা আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ল। নির্জন গোসলখানায় এই গন্ধ এল কোত্থেকে? পোড়া কাঠকয়লার সঙ্গে মেশা নষ্ট দুধের মিশ্র গন্ধ। বীনা মগ ছুঁড়ে ফেলে গোসলখানার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। এক মুহূর্তও না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! বীনা দরজা খুলতে পারল না। ছিটকিনি নামান হয়েছে। বীনা প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অথচ দরজা এক চুলও নড়ছে না। যেন কেউ তাকে আটকে ফেলেছে। বীনা চিৎকার করবার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তো নড়লই না, কোন শব্দ পর্যন্ত হল না। অথচ ঘরে অন্য এক রকম শব্দ হচ্ছে। যেন কি একটা পড়ছে চৌবাচ্চায়। টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ফোঁটার মত।

'কি পড়ছে?'

'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

বীনা হতভম্ব হয়ে দেখল টকটকে লালবর্ণের রক্ত পড়ছে চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চার পানি ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে। কেউ–একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে।

বীনা সেই দৃশ্য দেখতে চায় না। সে কিছুতেই উপরের দিকে তাকাবে না। সে জানে উপরের দিকে তাকালেই ভয়ংকর কিছু দেখবে। এমন ভয়ংকর কিছু যা ব্যাখ্যার অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত।

ভারী, শ্লেষ্মা–জড়িত স্বরে কেউ–একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে। ডাকল — বীনা, ও বীনা। শব্দ উপর থেকে আসছে। কেউ–একজন বসে আছে গোসলখানার দেয়ালে। যে বসে আছে তাকে বীনা চেনে। না দেখেও বীনা বলতে পারছে কে বসে আছে।

'ও বীনা, বীনা।'

বীনা তাকাল। হ্যাঁ, ঐ লোকটিই বসে আছে। তবে লোকটির মুখ পশুর মত নয়। মায়া মাখা একটি মুখ। বড় বড় চোখ দুটি বিষণ্ন ও কালো। লোকটি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটি অস্বাভাবিক — থ্যাঁতলান। চাপচাপ রক্ত সেই থ্যাঁতলান পা বেয়ে চৌবাচ্চার জলে পড়ছে। লোকটি ভারী শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে ডাকল — বীনা, ও বীনা।

বীনা জ্ঞান হারাল।

তার জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিনে জামালপুর সদর হাসপাতালে। চোখ মেলে দেখল আরো অনেকের সঙ্গে বিছানার পাশে ইদরিশ সাহেব বসে আছেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনান হয়েছে।

AMARBOI.COM

ইদরিশ সাহেব গভীর মমতার সঙ্গে বললেন, কি হয়েছে রে মা?

বীনা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, ভয় পেয়েছি মামা।

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ভয় পাবারই কথা। ঐ জংলা বাড়িতে আমি নিজেই ভয় পাই, আর তুই পাবি না? এখানে থাকার দরকার নেই। চল আমার সঙ্গে ঢাকায়। ঢাকায় গিয়ে আবার কলেজে যাওয়া–আসা শুরু কর। ঐ ছেলে আর তোকে বিরক্ত করবে না। বেচারা ট্রাক এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

বীনা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব নিজের মনেই বললেন, পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছিল। দু'টা পাই ছাতু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেয়ার আঠারো ঘণ্টা পরে মারা গেছে। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। না গেলে অভদ্রতা হয়।

ইদরিশ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছেলেটা খারাপ ছিল না। বুঝলি? খামোকাই আজেবাজে সন্দেহ করেছি। অতি ভদ্র ছেলে। তোর কথা জিজ্ঞেস করল। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল।

বীনার খুব ইচ্ছা করল বলতে — আমার কথা কি জিজ্ঞেস করল মামা? সে বলতে পারল না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, ছেলেটার এ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্চলে পৌঁছামাত্র সেখানের সব লোক এসে উপস্থিত। হাজার হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখবার মত একটা দৃশ্য! বুঝলি বীনা, আমরা মানুষের বাইরেরটাই শুধু দেখি। অন্তর দেখি না। এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। তোর যাতে ভাল বিয়ে হয় এই জন্যে আমাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে। না করতে পারলাম না। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, কি করে 'না' বলি। ঠিক না?

অয়োময়

বদরুল আলম সাহেব তারাবীর নামাজ পড়তে যাবেন — কি মনে করে যেন বাংলা ঘরে উঁকি দিলেন। ঘর অন্ধকার। অথচ তিনি সন্ধ্যাবেলায় মাগরেবের নামাজে দাঁড়াবার আগেই বলেছিলেন বাংলা ঘরে যেন বাতি দেয়া হয়। এরা কেউ কথা শোনে না। রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। ইদানীং তাঁর এই সমস্যা হয়েছে, রেগে গেলে শরীর কাঁপে।

বাংলা ঘরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। বিকট দুর্গন্ধ। মানুষের শরীর পচে গেলে এমন ভয়াবহ ব্যাপার হয় কে জানত। দুর্গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে ঘ্যাং করে মাথায় চলে যায়। মাথা ঝিমঝিম করে। তারপরই বমিবমি ভাব হয়। বদরুল আলম সাহেব রুমাল দিয়ে নাক ঢাকলেন। ঘরে ঢোকার আগেই ঢাকা উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে। তাঁর মেজাজ আরো খারাপ হল। বাংলা ঘরে ঢোকা উচিত হয়নি। কিছুক্ষণ আগে ভাত খেয়েছেন, খাবার-দাবার বমি হয়ে যেতে পারে। তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন এখন ভাত না দিতে। তারাবী পড়ে খাবেন। এটা শুনল না। কেউ আজকাল তাঁর কথা শুনছে না।

AMARBOI.COM

তিনি নাকে রুমাল চাপা দিয়েই ডাকলেন — এ্যাই, এ্যাই।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মরে গেছে না-কি? আশ্চর্য, একটা মানুষ অর্ধেকটা শরীর পচে গেছে তবু মরার নাম নেই। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, হাসপাতালে রেখে কি করবেন। বড়জোর দুই দিন, বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের মাঝখানে আরাম করে মরবে।

আর গাধাগুলি তাকে নিয়ে এসে তাঁর বাংলা ঘরে শুইয়ে দিয়েছে। কী যন্ত্রণা। এটা কি তার বাড়িঘর? গাধাগুলির সাহস দেখে তিনি স্তম্ভিত। বাংলা ঘর দশ কাজে ব্যবহার হয়। লোকজন আসে। সেখানে আধা পচা মানুষ এনে শুইয়ে দিল। বিকট গন্ধে বাংলা ঘরের ত্রিসীমানায় এখন কেউ যেতে পারে না। নাড়ীভুঁড়ি উল্টে আসে।

তিনি আরো উঁচু গলায় ডাকলেন — এ্যাই, এ্যাই।

কোন জবাব পাওয়া গেল না। তিনি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলেন। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও আসছে না। নড়াচড়ার শব্দও নেই। মারা গেছে বোধ হয়। আশ্চর্য এই বাড়ির লোকজনের কাণ্ডজ্ঞান। এখন মরে তখন মরে একটা মানুষ, তার ঘরে সন্ধ্যাবেলা বাতি দেয়নি। অথচ তিনি

নিজে জায়নামাজে দাঁড়াবার আগে বলেছেন যেন বাতি দেয়া হয়। কতক্ষণ আগে মরেছে কে জানে। অন্ধকার ঘর, কে জানে শিয়াল-কুকুরে টেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো খেয়ে ফেলেছে।

তিনি নাক থেকে রুমাল সরাতেই ভক্ করে আরও খানিকটা গন্ধ ঢুকে গেল। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না। দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। ঘর খানিকটা আলো হল।

না মরেনি। পিট পিট করে তাকাচ্ছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে দু'দিনের বেশি টিকবে না। আজ হল তের দিন। আজকাল ডাক্তারগুলির কি রকম বিদ্যা-বুদ্ধি। যে রুগীর দু'দিন বাঁচার কথা সে তের দিন বাঁচে কি করে?

বদরুল আলম সাহেব বললেন, বেঁচে আছো?

ইউনুস বলল, জ্বে আছি।

যখন এ্যাই বললাম, তখন কথা বললে না কেন?

ইউনুস জবাব দিল না। সে কথা বলেনি ভয়ে। বদরুল আলম সাহেবকে সে বড় ভয় পায়। তাছাড়া সে এই বাড়ির কামলাও না। সে কাজ করত পুব-পাড়ায়। তারা তাকে রাখতে রাজি না হওয়ায় সবাই মিলে এই বাড়িতে রেখে গেছে। বদরুল আলম সাহেবও রাখতে রাজি হননি। দু'দিনের বেশি টিকবে না শুনে কিছু বলেননি। তাছাড়া রমজান মাস।

বদরুল আলম সাহেব রাগী গলায় বললেন, ঘরে বাতি দেয় নাই?

দিছিল, নিভ্যা গেছে।

কুপীর বাতি। বাতাসে নিভে যাওয়ারই কথা। বাংলা ঘরে এখন কেউ আসে না, কাজেই হারিকেন দেয়া বিপজ্জনক। চোর এসে নিয়ে যাবে। এই লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, কিছু করতে পারবে না।

ভাত দিয়েছে?

জ্বে দিছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

ঘর থেকে বেরুবার আগে তিনি আবার কুপী জ্বেলে দিয়ে গেলেন। যতক্ষণ থাকে থাকুক।

মসজিদে সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি যাওয়ামাত্র তারাবীর নামাজ শুরু হল। নামাজ শেষ হতে তেমন সময় লাগল না কিন্তু দোয়া আর যেন শেষ হতেই চায় না। এক দোয়ায় বাংলা, উর্দু, আরবী, নানান ভাষা। এই মৌলানা সাহেবের চাকরি এখনো স্থায়ী হয়নি। রমজান মাসে তাঁর কাজকর্ম দেখে তারপর স্থায়ী করা হবে তেমন কথা হয়েছে।

ব্যাটা সে কারণেই দোয়ার মাধ্যমে কাজকর্ম দেখাচ্ছে। দোয়ার শেষ পর্যায়ে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। বড়ই বিরক্তিকর।

বদরুল আলম সাহেব ঠিক করে রাখলেন আজ মৌলানাকে দু'একটা কথা বলবেন। তিনি মসজিদ কমিটির সভাপতি। তাঁর পক্ষে এইসব বলা ভাল দেখায় না, তবু বলতে হবে। মানুষের কাজকর্ম আছে। সারারাত জেগে দোয়া পড়লে তো হবে না। মৌলানা সাহেব দোয়ার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন — ওগো পেয়ারা নবীর পেয়ারা দোস্ত, তোমার কাছে হাত না তুললে আমরা কার কাছে হাত তুলব? কারণ তুমি নিজেই তো কোরান মজিদে বলেছ —

'মারাজ্বাল বাহরাইনি ইয়ালতাক্বিইয়া-ন'

AMARBOI.COM

অর্থাৎ — তিনি বহমান রেখেছেন দু'টি বিশাল জলরাশিকে . . .

বাইনহুমা–বারযাখু

অর্থাৎ — তাদের দু'য়ের মাঝে রয়েছে কুদরতী পর্দা . . .

বদরুল আলম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না ।

আজ রাতে দোয়া মনে হচ্ছে শেষ হবে না। মৌলানাকে সাবধান করে দিতে হবে। কিছু না বলায় লাই পেয়ে যাচ্ছে।

দোয়া শেষ হল। বদরুল আলম সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, মৌলানা সাহেব আপনার সংগে একটা কথা ছিল। তাঁর গলার স্বরেই মৌলানা আতংকেগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তিনি কি বলবেন তা না শুনেই বলল, আপনের কথা মত আমি গেছিলাম। সে রাজি হয় না। এই কাজ তো জবরদস্তিতে হয় না। যদি বলেন আইজ না হয় আরেকবার যাব।

আপনে কিসের কথা বলতেছেন?

আপনে যে বলছিলেন তওবা করাইতে। তওবা করতে রাজি হয় না।

এতক্ষণে বদরুল আলম সাহেবের মনে পড়ল। মৌলানাকে গত সপ্তাহে বলেছিলেন যেন ইউনুসকে দিয়ে তওবা করানো হয়। একবার তওবা করে ফেললে তিনদিনের ভেতর ঘটনা ঘটে যায়। তাঁর ধারণা ছিল, মৌলানা তওবা করিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তওবা করায়নি।

তওবা করতে চায় না কেন?

ভয় পায়। মরতে চায় না।

তওবার সাথে বাঁচা-মরার কী সম্পর্ক? জন্ম-মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে। আপনি এখনি চলেন। তওবা করিয়ে দেন। আমি সামনে থাকলে অরাজি হবে না।

জ্বি আচ্ছা।

তাছাড়া এখন মৃত্যু হলে তা তার জন্যে শুভ। রমজান মাসে মৃত্যু সরাসরি জান্নাতের দরজা — কি বলেন আপনারা?

সবাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। একজন বলল, এর জন্য আপনি যা করছেন তা বাপ-মা'ও করত না। বাপ-মা'র অধিক করছেন আপনি।

বদরুল আলম সাহেব উদাস গলায় বললেন, আমি তো করার কেউ না। যার করার তিনিই করেন। আমরা হলাম উপলক্ষ। ঐ দিন মিয়া বাড়ির কুদ্দুস সাহেব আসছিলেন। তিনি বললেন, আপনি করছেন কি? আরে অন্য কোনখানে ফালায়ে দিয়ে আসেন। আমি বললাম, রমজান মাসে এই রকম কথা মুখে আনবেন না কুদ্দুস সাহেব।

ইউনুসকে এক ধমক দিতেই সে তওবা করতে রাজি হয়ে গেল।। মৌলানা সাহেব বললেন, এইবার আল্লাহপাক তোমাকে আজাব থেকে মুক্তি দিবেন। তাছাড়া তুমি এখন সাত দিনের শিশুর মত পবিত্র। সরাসরি জান্নাতে দাখিল হবে। বুঝতে পারলা?

জ্বে পারছি।

কারো উপরে কোন দাবি-দাওয়া রাখবে না। দাবি-দাওয়া তুইল্যা নাও।

জ্বে-আচ্ছা।

বললে তো হবে না। বল কারো উপরে কোন দাবি-দাওয়া নাই।

কারো উপরে কোন দাবি-দাওয়া নাই।

AMARBOI.COM

মৌলানা সাহেব থাকেন মসজিদে। মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে মসজিদের পাশেই একটা ঘর তুলে দেয়ার কথা। এখনো তোলা হয়নি। সবই অবশ্য নির্ভর করছে বদরুল আলম সাহেবের উপর। তিনি একবার হ্যাঁ বললেই হয়। মৌলানা সাহেব মসজিদে যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবের সংগে দেখা করে গেলেন। বদরুল আলম সাহেব বললেন, তওবা ঠিকঠাক হয়েছে?

জ্বি।

অবস্থা কি দেখলেন?

সময় ঘনিয়ে আসছে। তওবার পরে তিন দিনের বেশি টিকে না। তবে এ তাও ঠিকবে না। হয়েছে কি?

জানি না। শরীর পচে যাচ্ছে এইতো দেখি। গন্ধে থাকা মুশকিল। এদিকে সাতাশ রোজায় মেয়ে, মেয়ে-জামাই আসতেছে।

মৌলানা দৃঢ় স্বরে বলল, এ এক দুই দিনের বেশি নাই।

তওবা পড়ানোর চতুর্থ দিনেও দেখা গেল ইউনুস বেঁচে গেছে। প্রশ্ন করলে চিঁ-চিঁ করে জবাব দেয়। তবে অবস্থা যে খুব খারাপ তা বোঝা যায়। আগে শরীরের পচা দুর্গন্ধ বাংলো ঘরের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল — এখন তা ভেতর বাড়ি পর্যন্ত গেছে।

সেনিটারী ইন্সপেক্টরের পরামর্শে ঘরের চারদিকে প্রচুর ফিনাইল দিয়েছেন, তাতেও গন্ধ যাচ্ছে না। তাছাড়া বাংলো ঘরের চারপাশে এখন শিয়াল ঘুরাফিরা করে। মানুষ-পচা গন্ধের আকর্ষণ এড়াতে পারে না।

বদরুল আলম সাহেব নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দেখতে গেলেন, কি রে অবস্থা কি?

জ্বে ভাল।

ভাল হলেই ভাল।

রাইতে বড় ভয় লাগে।

ভয় লাগে কেন?

কি যেন চাইরপাশে ঘুরাফিরা করে। চউক্ষে দেখি না, খালি কথা শুনি।

মৌলানা সাহেব এসব শুনে বললেন, সময় ঘনায়ে আসছে। আজরাইল চাইরপাশে ঘুরাফিরা করে।

মৌলানার উপর বিরক্তিতে বদরুল আলম সাহেবের গা জ্বলে যায়। কি সব কথা, আজরাইল ঘুরাফিরা করে। ব্যাটা তওবাটা ঠিকমত পড়িয়েছে কি-না কে জানে।

মৌলানা সাহেব?

জ্বি।

তওবা কি ঠিকঠাক পড়ানো হয়েছে?

জ্বি — তা হইছে।

দেখেন আরেকবার পড়াবেন কি-না। কষ্ট পাচ্ছে এই জন্যে বলতেছি, অন্য কিছু না।

AMARBOI.COM

আইজ আরেকবার পড়ায়ে দিব। কোন অসুবিধা নাই। তওবা দিনের মধ্যে দুইবারও পড়ানো যায়। কোন অসুবিধা নাই। এই প্রসংগে রসুলাল্লাহ্‌র একটা হাদিস আছে। পেয়ারা নবী বলছেন . . .

আচ্ছা থাক। আরেকদিন শুনব।

মৌলানা সাহেব বললেন, অনেক সময় মনের মধ্যে কোন আফসোস থাকলে জ'ব বাইর হইতে চায় না। জিজ্ঞেস কইরা দেখা দরকার কিছু খাইতে চায় কি-না। কাউরে দেখতে চায় কি-না।

আচ্ছা এটা খোঁজ নিব।

দ্বিতীয়বার তওবার কথা শুনে ইউনুস বেশ অবাক হল। চি-চি করে বলল, একবার তো করছি। তওবার পরে কোন পাপ কাজ করি নাই।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নাফরমানী কথা বলবা না। পাপ কাজ করছ কি কর নাই তার বিচার তোমার উপরে না, আল্লাহ্‌ পাকের উপরে।

আবার তওবা পড়ানো হল। বদরুল আলম সাহেব তওবা পড়ানোর শেষে খোঁজ নিতে এলেন, কি-রে শইল কেমন?

জ্বে ভাল।

কিছু খাইতে মনে চায়?

জ্বে না।

মনে চাইলে বল।

তেঁতুলের পানি দিয়া ভাত খাইতে মনে চায়।

তাকে তেঁতুলের পানি দিয়ে ভাত খেতে দেয়া হল। ভাত খাওয়া শেষ হবার সংগে সংগেই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। বুক হাপরের মত উঠানামা করছে। চোখ মনে হয় বের হয়ে আসছে। বদরুল আলম সাহেব মৌলানাকে খবর দিয়ে রাখলেন। ভালমন্দ কিছু হলে দিনের মধ্যেই দাফন-কাফন শেষ করতে হবে।

দিনে কিছুই হল না। রাতে শ্বাসকষ্ট মনে হল খানিকটা কমে এসেছে।

মৌলানা সাহেব ঘুমুতে গেলেন। যাবার আগে বদরুল আলম সাহেবকে বলে গেলেন, আরো একটা দিন দেখতে হবে।

বদরুল আমল সাহেব শুকনো গলায় বললনে, আর একদিন পরে কি?

অমাবস্যা লাগতেছে। অমাবস্যার টান সহ্য হবে না।

বদরুল আলম সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, একদিকে বলেন আজরাইলের কথা, আরেকদিকে বলেন অমাবস্যার কথা। আজরাইল কি পূর্ণিমা-অমাবস্যা দেখে ঘুরাফিরা করে?

অমাবস্যার রাতে ইউনুসের অবস্থা খুবই খারাপ হল। বুকের ভেতর থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। মুখে ফেনা ভাঙছে। রাত যে কাটবে না, তা বোঝাই যাচ্ছে। বদরুল আলম সাহেবের স্ত্রীও শাড়ির আঁচলে মুখ চেপে এক সময় ইউনুসকে দেখে গেলেন। খাবার প্লেটে পড়ে আছে। ইউনুস ছুঁয়েও দেখেনি। তিনি বললেন, এর মুখে তোমরা পানি দাও, দেখছ না ঠোঁট চাটিতেছে। আহারে!

AMARBOI.COM

ভোরবেলা বদরুল আলম সাহেব খোঁজ নিতে গেলেন।

কী রে অবস্থা কি?

ইউনুস চিঁ চিঁ করে বলল, জ্বে ভল।

শ্বাসকষ্ট নাই?

জ্বে না।

বদরুল আলম সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ইউনুস বলল, রাইতে একটা শিয়াল ঢুকছিল। পাও হাতে কামড় দিছে। আইজ আপনে বইল্যা দিবেন হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়। আর একটা হারিকেন।

বদরুল আলম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর মেজাজ রোজার সময় এমনিতেই চড়া থাকে। আজ সেই মেজাজ আকাশে চড়ে গেল।

তিনি ইফতারির সময় মজনুকে বলে দিলেন, ইউনুসের হাতের কাছে যেন একটা লাঠি দেয়া হয়। আর একটি হারিকেন। মজনু এ বাড়ির কামলা। তার উপর দায়িত্ব ইউনুসকে খাবার-দাবার দিয়ে আসা। এই কাজটা তার খুবই না-পছন্দ, কারণ ইউনুস এখন আর নিজে নিজে খেতে পারে না। খাবার মুখে তুলে দিতে হয়। ঘেন্নায় মজনুর বমি আসার উপক্রম হয়।

মজনু বলল, ইউনুস হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

বদরুল আলম সাহেব তাকালেন। কেন বজ্জাত সেটা শুনতে চান।

মজনু বলল, মৌলানা সাব যে দুই-দুইবার তওবা করাইছিলেন, কোনবারই এই হারামজাদা তওবা করে নাই। মৌলানা সাব তারে যে কথা বলছেন, হে মনে মনে উল্টা কথা বলেছে।

তোকে বলেছে কে?

হে নিজেই বলেছে। তওবা করলে জেবন শেষ এই জন্য।

বলিস কি?

হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

মাগরেবের নামাজের পর বদরুল আলম সাহেব ইউনুসকে দেখতে গেলেন। ইউনুসের হাতের কাছে লাঠি। হারিকেন জ্বলছে।

কিরে তুই না-কি তওবা করস নাই?

ইউনুস চুপ করে রইল।

ক্যান করস নাই? আল্লাহর সাথে মশকরা? হারামজাদা, তুই তো বিরাট বদ।

ইউনুস ক্ষীণ স্বরে বলল, মরতে চাই না।

দীর্ঘ সময় বদরুল আলম সাহেব ইউনুসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার একটা পা ফুলে কোল বালিশের মত হয়ে গেছে। এই পায়েই বোধ হয় শিয়াল কামড়েছে।

ইউনুস বলল, আপনে যদি বলেন তাইলে আরেকবার ঠিকমত তওবা করি।

থাক, তার আর দরকার নাই। তোর যখন অতই বাঁচনের শখ, দেখি একটা চেষ্টা কইরা। চল, তোরে ময়মনসিং নিয়া যাই। দেখি কি অবস্থা।

ইউনুস মনে হয় কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারে না। ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়ে থাকে।

বদরুল আলম সাহেব রাতেই মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা করেন। প্রথমে যেতে হবে নেত্রকোনা, নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহ। সেখানে ডাক্তাররা জবাব দিলে নিতে হবে ঢাকা।

AMARBOI.COM

মহিষের গাড়ি রওনা হল রাত আটটায়। অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে অবাক করে দিয়ে তিনিও সংগে চললেন। অনেক দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটির ব্যাপার আছে। ছেলে- ছোকরাদের উপর ভরসা করা যায় না।

ইউনুস?

জ্বে।

ঝুলে থাক। হাল ছাড়িস না, আমি আছি।

ইউনুসের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। সে প্রাণপণে ঝুলে থাকতে চেষ্টা করে। মহিষের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যায়।

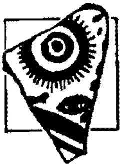

সঙ্গিনী

মিসির আলি বললেন, গল্প শুনবেন না-কি?

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত মন্দ হয়নি। দশটার মত বাজে। বাসায় ফেরা দরকার। আকাশের অবস্থাও ভাল না। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। আষাঢ় মাস। যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি বললাম, আজ থাক। আরেকদিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা করবে।

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, হাসছেন কেন?

মিসির আলি হাসতে হাসতেই বললেন, বাসায় কে চিন্তা করবে? আপনার স্ত্রী কি বাসায় আছেন? আমার তো ধারণা তিনি রাগ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন।

মিসির আলির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে চলে যাবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত। তবুও বিস্মিত হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দুপুরেই বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে স্যুটকেস গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেছে। একা একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলির কাছে এসেছি। তবে এই ঘটনার কিছুই বলিনি। আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ঝগড়ার কথা বলে বেড়ানোর কোন মানে হয় না।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, ঝগড়া হয়েছে বুঝলেন কি করে?

'অনুমানে বলছি।'

'অনুমানটাই বা কি করে করলেন?'

AMARBOI.COM

'আমি লক্ষ্য করলাম, আপনি আমার কাছে কোন কাজে আসেননি। সময় কাটাতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কোন কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কোন কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ভাবী কেমন আছেন? আপনি বললেন, ভাল। কিন্তু বলার সময় আপনার মুখ কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম — রাগারাগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার একা একা লাগছে বলেই আপনি এসেছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন। তারপর এইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় একা একা রাত কাটাতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া বৃষ্টি নামতে পারে।

'এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?'

'না — এটা হচ্ছে উইসফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি — বৃষ্টি হলে জীবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারী, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।'

'বাতাসের আবার হাল্কা-ভারী কি?'

'আছে। হাল্কা-ভারীর ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয় ভারী। সেটা আমি বুঝতে পারি মাথার চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখবেন এক রকম, আবার গরম কালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি তখন অন্যরকম।'

'আমার কাছে তো সব সময় এক রকম লাগে।'

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ রকম যেন এরচে' মজার কথা আগে শুনেননি। আমি বোকার মত বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে লাগল। খুব বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোত্থেকে জোগাড় করেছেন কে জানে। কিছুক্ষণ পরপর পাম্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?'

'জানি না।'

'বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কারণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি নেই। এয়ারকুলার বসানো একটা ঘরের মত সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না। অনন্তকাল একই থাকবে। কোন মানে হয়?'

'আপনি কি বেহেশত-দোজখ এইসব নিয়ে মাথা ঘামান?'

'না ঘামাই না।'

'সৃষ্টিকর্তা নিয়ে মাথা ঘামান?'

AMARBOI.COM

'হ্যাঁ ঘামাই। খুব চিন্তা করি, কোন কূল কিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কি বলে জানেন? বলে — সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দু'টা জিনিস পারেন না যা মানুষ পারে।'

'আমি অবাক হয়ে বললাম, উদাহরণ দিন।'

'সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। মানুষ পারে। আবার সৃষ্টিকর্তা দ্বিতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের জন্ম দেয়।'

'আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?'

'না আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে আস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথাটাই ধরুন। সামান্য স্বপ্ন অথচ ব্যাখ্যাতীত একটা ঘটনা।'

'ব্যাখ্যাতীত হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি।'

'মোটেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার উপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন — **Interpretations of dream**; তিনি শুধু বিশেষ এক ধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্যাদিক সম্পর্কে চুপ করে রইলেন। যদিও তিনি খুব ভাল করে জানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর ছাত্র প্রফেসর জাং কিছু কাজ করেছেন — মূল সমস্যায় পৌঁছতে পারেন নি। বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কিছু কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন একটা লোক স্বপ্ন দেখল — হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দু'দিন পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে প্রিকগনিশন ড্রিম (Precognition dream)। এর একটিই ব্যাখ্যা — স্বপ্নে মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। যা সম্ভব নয়। কাজেই এ জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত।'

আমি বললাম, এমনো তো হতে পারে — যে কাকতালীয় ভাবে মিলে গেছে।

'হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকেও একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর থাকতে হবে। Precognition dream-এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।'

'বুঝতে পারছি না।'

'বোঝানো একটু কঠিন। আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে গল্প বলি — শুনতে চান?'

'বলুন শুনি — ভৌতিক কিছু?'

'না — ভৌতিক না — তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক দফা চা হয়ে যাক।'

'হোক।'

'কি ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি কিন্তু বাড়ছে।'

আমি থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চা নিয়ে বিছানায় পা তুলে বসলেন। গল্প শুরু হল।

AMARBOI.COM

"ছোটবেলায় আমাদের বাসায় 'খাবনামা' নামে একটা স্বপ্ন তথ্যের বই ছিল। কোন্ স্বপ্ন দেখলে কি হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বইটার বিশেষ ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই বলতেন, ও মিসির বইটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কি বল।

'আমি বই নিয়ে বসতাম।'

'দেখ তো বাবা গরু স্বপ্ন দেখলে কি হয়।'

আমি বই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম, কি রঙের গরু মা? সাদা না কালো?

'এই তো মুসকিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।'

'সাদা রঙের গরু হলে — ধনলাভ। কালো রঙের গরু হলে — বিবাদ।'

'কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?'

'লেখা নাই তো মা।'

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোন শেষ ছিল না। আর কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দেখতেন! একবার দেখলেন — দু'টা অন্ধ চড়ুই পাখি। খাবনামায় অন্ধ চড়ুই পাখি দেখলে কি হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কি হয় লেখা আছে। মা'র কারণেই খাবনামা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একসময় পুরো বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বপ্ন-বিশারদ হিসেবে আমার নাম রটে গেল। যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিজ্ঞেস করে। এই করতে গিয়ে জানলাম কত বিচিত্র স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেই সঙ্গে মজার মজার কিছু জিনিসও লক্ষ্য করলাম। যেমন অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বপ্নগুলি হয় সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে — সেটা হচ্ছে কোন একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভাল পোশাক-আষাক। শুধু সেই পুরোপুরি নগ্ন। কেউ তা লক্ষ্য করছে না।"

মিসির আলি সাহেব কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?

'আমি বললাম, না। একটা স্বপ্নই আমি বারবার দেখি — পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। কলমটা বদলে অন্য কলম নিলাম, সেটা দিয়েও কালি বেরুচ্ছে না। এদিকে ঘণ্টা পড়ে গেছে।'

"এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা — প্রশ্ন দিয়েছে অংকের। কঠিন সব অংক। বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উঠার অংক। একটা বাঁদরের জায়গায় দু'টা বাঁদর। একটা খানিকটা উঠে অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে নিচে নামায় — খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আবার তৈলাক্ত না, কিছুটা তেল ছাড়া.."

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?

'জ্বি-না — ঠাট্টা করে বলছি — জটিল সব অংক ছিল এইটুকু মনে আছে। যাই হোক ছোটবেলা থেকেই এইসব কারণে স্বপ্নের দিকে আমি ঝুঁকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজী পড়তে গেলাম তখন স্পেশাল টপিক নিলাম 'ড্রীম'। ড্রীম ল্যাবোরেটরীতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ডঃ সুইন হার্ন। দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যাঁকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন এ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন

AMARBOI.COM

— যার নাম সুইন হার্ন এ্যানালিসিস। সুইন হার্ন এ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব দুঃস্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। সম্ভবত, সে কারণেই সেই ফাইল ঘাটার সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভম্ব। ব্যাখ্যাতীত সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দেই — নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসী মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভীমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু — লম্বা লম্বা আঙুল। হাতটার রঙ নীলচে — খুব তুলতুলে। দুঃস্বপ্নটা সে প্রায়ই দেখতে লাগল। প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙতো বিকট চিৎকারে। তাকে ড্রীম ল্যাবোরেটরীতে ভর্তি করা হল। প্রফেসর সুইন হার্ন রুগিণীর মনোবিশ্লেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হল নিউ ইংল্যাণ্ডে। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ্য করল তার নাভীমূল ফুলে উঠেছে — এক ধরনের নন ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাথায় মানুষের হাতের আঙুলের মত পাঁচটি আঙুল . . . ”

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ভাই এই গল্পটা থাক। শুনতে ভাল লাগছে না। ঘেন্না লাগছে।

‘ঘেন্না লাগার মতই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেন্না লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসিনে। ছবি দেখতে চান?’

‘জ্বি–না।’

‘পি–এইচ. ডি. প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, পি–এইচ. ডি. না করেই ফিরতে হল। প্রফেসরের সঙ্গে ঝামেলা হল। যে লোক আমাকে এত পছন্দ করতো সে-ই বিষ নজরে দেখতে লাগলো। এম. এস. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টিচিং–এর একটা ব্যবস্থা হল। ছাত্রদের এবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখ তাহলে আমাকে বলবে।

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোন স্বপ্নই তেমন ভয়ংকর না। সাপে তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে — এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দুঃস্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হল না। দুঃস্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেলো না। আমি গবেষণার কথা যখন ভুলে গেলাম তখন এলো লোকমান ফকির।

লোকমান ফকিরের বাড়ি কুমিল্লার নবীনগরে। বয়স ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ। শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের চাকরি করে। দু'কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে কাঁঠাল বাগানে। বিয়ে করেনি, তবে বিয়ের চিন্তা–ভাবনা করছে। তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। মেয়েটিকে তার পছন্দ নয়। তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ তার এই মামা তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন।

ছেলেটি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মত ভাবলেশহীন চোখ। যৌবনের নিজস্ব যে জ্যোতি যুবক–যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই। ছেলেটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠছে। সে ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বলল, স্যার আপনি আমাকে বাঁচান।

AMARBOI.COM

আমি ছেলেটিকে বসালাম। পরিচয় নিলাম। হাল্কা কিছু কাথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। তাতে খুব লাভ হল বলে মনে হল না। তার অস্থিরতা কমল না। লক্ষ্য করলাম, সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। খুব নড়াচড়া করছে। আমি বললাম, তোমার সমস্যাটা কি?

ছেলেটি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললো, স্যার আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

আমি বললাম, দুঃস্বপ্ন দেখে না এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না। সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া — এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন। সাধারণত হজমের অসুবিধা হলে লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে। তুমি শুয়ে আছ, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল — তখনো এরকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পার। শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দুঃস্বপ্নে। আগুনে পোড়ার স্বপ্ন মানুষ কখন দেখে জান? যখন পেটে গ্যাস হয় সেই গ্যাসে বুক জ্বালাপোড়া করে, তখন সে স্বপ্ন দেখে — তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে।

'স্যার আমার স্বপ্ন এ রকম না অন্য রকম।'

'ঠিক আছে, গুছিয়ে বল। শুনে দেখি কি রকম।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কথা শুরু করল। মুখস্থ বলে যাবার মত বলে যেতে লাগলো। মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেকবার রিহার্সেল দিয়েছে।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না।

AMARBOI.COM

'প্রথম স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারোটার দিকে ঘুমুতে গেছি। আমার ঘুমের কোন সমস্যা নেই। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে রাতেও তাই হল। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।'

'কি করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ?'

'জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারোটা দশ।'

'স্বপ্নটা বল।'

'আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মত জায়গা। খুব বাতাস বইছে। শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। রীতিমত শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে তাও শুনছি। বুড়ামত একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কাউকে আবছা ভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল আমি বোধ হয় অন্ধ হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম — মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি — কিন্তু মানুষজন দেখছি না অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে গেলো। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল কেউ যেন এসেছে। তার ভয়ে সবাই চুপ করে গেছে। আমার নিজেরো প্রচণ্ড ভয় লাগালো। এক ধরনের অন্ধ ভয়।

তখন শ্লেষ্মা-জড়িত মোটা গলায় কে-একজন বললো, ছেলেটি তো দেখি এসেছে। মেয়েটা কোথায়?

কেউ জবাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চা ছেলেটির কান্না শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। মনে হল কেউ যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারী গলার লোকটা আবার কথা বললো, মেয়েটা দেরি করছে কেন? কেন এত দেরি? ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।

হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো। এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলো — এসেছে, এসেছে, মেয়েটা এসেছে। আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রোগা একটা মেয়ে। অসম্ভব ফর্সা, বয়স আঠারো-উনিশ। এলোমেলো-ভাবে শাড়ি পরা। লম্বা চুল। চুলগুলি ছেড়ে দেয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে। আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কাঁপা গলায় বলল, আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে।

আমি বললাম, আপনি কে?

সে বলল, আমার নাম নারগিস। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন। একটু পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতংকে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতিমাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।

আমি বললাম, এরা কারা?

'জানি না। কিছু জানি না। আপনি থাকায় কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না কিছুই না . . .'

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারী এবং শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠ চিৎকার করে বললো, সময় শেষ। দৌড়াও, দৌড়াও, দৌড়াও . . .।

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চোখের সামনে কুয়াশা কেটে যেতে লাগলো। চারদিকে তীব্র আলো। এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায় — যাদের কথা শুনছিলাম অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না ; এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম — এরা এরা এরা . . .

'এরা কি?'

এরা মানুষ না, অন্য কিছু — লম্বাটে পশুর মত মুখ, হাত-পা মানুষের মত। সবাই নগ্ন। এরা অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগলো। আমার কানে বাজতে লাগলো — দৌড়াও দৌড়াও, . . . আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পেছনে সেই জন্তুর মত মানুষগুলিও দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের উপর দিয়ে। সেই মাঠে কোন ঘাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ধারালো ব্লেড সারি সারি সাজানো। সেই ব্লেডে আমার পা কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে — তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনি ঘুম ভেঙে গেলো। দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে।

AMARBOI.COM

'এই তোমার স্বপ্ন?'

'জ্বি।'

'দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে?'

'ঠিক একমাস পর।'

'সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল?'

'জ্বি।'

'একই স্বপ্ন? না — একটু অন্য রকম?'

'একই স্বপ্ন।'

'দ্বিতীয়বারও কি তুমি মেয়েটির হাত ধরে দৌড়ালে?'

'জ্বি।'

'প্রথমবার যেমন তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল? দ্বিতীয়বারও হল?'

'জ্বি।'

'দ্বিতীয়বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে?'

'জ্বিনা — দ্বিতীয়বারে মেয়েটি আগে এসেছিল। আমি পরে এসেছি।'

'দ্বিতীয়বারের স্বপ্ন তুমি রাত ক'টায় দেখেছো?'

'ঠিক বলতে পারব না তবে শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙ্গার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান হল।'

'দ্বিতীয়বারও স্বপ্নে মোটা গলার লোকটি কথা বলল?'

'জ্বি।'

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো। সে অসম্ভব ঘামছে। আমি বললাম, পানি খাবে? পানি এনে দেব?

'জ্বি স্যার, দিন।'

আমি পানি এনে দিলাম, সে এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম, স্বপ্ন ভাঙ্গার পর তুমি দেখলে তোমার দু'টি পা-ই ব্লেডে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে — তাই না?

লোকমান হতভম্ব হয়ে বললো, জ্বি স্যার। আপনি কি করে বুঝলেন?

'তুমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ঢুকলে সেখান থেকে অনুমান করেছি। তাছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ংকর। পা যদি না কাটতো তাহলে স্বপ্নটা ভয়ংকর হত না বরং একটা মধুর স্বপ্ন হত। কারণ স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে যে তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আঠারো উনিশ-বছরের রূপবতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।'

আমার কথার মাঝখানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতা খুলে ফেললো, মোজা খুলল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম পায়ের তলা ফালা ফালা করে কাটা। এমন কিছু সত্যি সত্যি ঘটতে পারে আমি ভাবিনি।

লোকমান ক্ষীণ গলায় বলল, এটা কি করে হয় স্যার?

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপের ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি — **Invert reaction** বলে একটা ব্যাপার আছে। ধর

AMARBOI.COM

তোমার একটা আঙুল পুড়ে গেল — সেই খবর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছবে তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। **Invert reaction**-এ কি হয় জান? আগে মস্তিষ্কে আঙুল পোড়ার অনুভূতি পায়, তারপর সেই খবর আঙুলে পৌঁছে —। তখন আঙুলটি পোড়া পোড়া হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মস্তিষ্কে। সেখান থেকে **Invert reaction** -এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এক লোক স্বপ্নে দেখতো তার হাতে কে যেন পিন ফুটাচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর তার হাতে সত্যি সত্যি পিন ফোটার দাগ দেখা যেত। তোমার ক্ষেত্রেও হয়ত তাই ঘটেছে। তবে এমন ভয়াবহ ভাবে পা কাটা **Invert reaction**-এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কি?'

'আমি বুঝতে পারিছ না।'

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, এক মাস পর পর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ পায়ের ঘা শুকাতে এক মাসে লাগে।

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে — ঘুমুতে যাবে জুতা পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয় — তোমার পায়ে থাকবে জুতা। ব্লেড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।

'সত্যি বলছেন?'

'আমার তাই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে, জুতা পরে ঘুমুলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।'

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম, এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এল দেড় মাস পর।

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো। চোখ ভাবলেশহীন। অথর্ব মানুষের মত হাঁটছে। আমি বললাম, স্বপ্ন দেখেছো?

'জ্বি-না।'

'জুতা পায়ে ঘুমুচ্ছো?'

'জ্বি স্যার। জুতা পায়ে দেয়ার জন্যেই স্বপ্ন দেখছি না।'

আমি হাসিমুখে বললাম। তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন খারাপ কেন? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছো। সমস্যাটা কি?

লোকমান নিচু গলায় বলল, মেয়েটার জন্যে মন খারাপ স্যার। বেচারী একা একা স্বপ্ন দেখছে। এত ভাল একটা মেয়ে কষ্ট করছে। আমি সঙ্গে থাকলে সে একটু ভরসা পায়। নিজের জন্যে কিছু না। মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হয়।

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে কি?

'স্যার আমি ঠিক করেছি। জুতা পরব না। যা হবার হবে। নারগিসকে একা একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। মেয়েটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে। আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।'

'সেটা কি ভাল হবে?'

AMARBOI.COM

'জ্বি স্যার, হবে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।'

'সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।'

'সে স্বপ্নের মেয়ে নয়। আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু'জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়ত ঢাকাতেই কোন-এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ব্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, গল্পটি এই পর্যন্তই।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কি?

'শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতা খুলে ঘুমানো মাত্রই সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দু'জন খানিকক্ষণ গল্প করে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। এক সময় — মানুষের মত জন্তুগুলি চেঁচিয়ে বলে — দৌড়াও, দৌড়াও। তারা দৌড়াতে শুরু করে।

'ছেলেটি আপনার কাছে আর আসেনি?'

'জ্বি-না।'

'ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?'

'না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতা পায়ে ঘুমুলে এই দুঃস্বপ্ন সে দেখবে না, তারপরেও জুতা পায়ে দেয় না। কারণ মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কি প্রচণ্ড হতে পারে প্রেমে না পড়লে তা বুঝা যায় না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্ন সঙ্গিনীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতা পায়ে ঘুমুবে না। সে আসলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দুঃস্বপ্ন হলেও এটি সেই সঙ্গে তার জীবনের মধুরতম স্বপ্ন।'

'আপনার কি ধারণা নারগিস নামের কোন মেয়ে এই পৃথিবীতে সত্যি সত্যি আছে?'

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, আমি জানি না। রহস্যময় এই পৃথিবীর খুব কম রহস্যের সন্ধানই আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমারো কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে —। আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?

AMARBOI.COM

অংক শ্লোক

পাখির ডাকে যে সত্যি সত্যি ঘুম ভাঙতে পারে এই ধারণা আমার ছিল না। শহরে পাখি তেমন নেই আর থাকলেও তারা সম্ভবত ভোরবেলায় এত ডাকাডাকি পছন্দ করে না ।

ভাটি অঞ্চলে এসে প্রথম পাখির ডাকে জেগে উঠলাম এবং বেশ হকচকিয়ে গেলাম। নানান ধরনের পাখি যখন এক সংগে ডাকাডাকি করতে থাকে তখন খুব যে মধুর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা নয়। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, ব্যাপার কি? কিসের হৈ চৈ?

আমার বন্ধু করিম ঘুমঘুম গলায় বলল, পাখি ডাকছে। এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুই চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে থাক।

করিমের সংগে গত রাতে এই অঞ্চলে এসে পৌছেছি। আমি ঘরকোণা ধরনের মানুষ। বেড়াতে পছন্দ করি যদি বেড়ানোটা খুব আরামের হয়। দু'দিন নৌকায় করে, জীবন হাতে নিয়ে হাওর পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। করিম বলতে গেলে জোর করে আমাকে নিয়ে এসেছে। তার একটাই কথা, তোর লেখালেখিতে সুবিধা হবে। দু'একটা চরিত্রও পেয়ে যেতে পারিস। কিছুই বলা যায় না।

কোথাও বেড়াতে গিয়ে চরিত্র খোঁজা আমার স্বভাব না। ঢাকা ছেড়ে বাইরে গেলেই মানুষের চেয়ে প্রকৃতি আমাকে অনেক বেশি টানে। মানুষ তো সব সময় দেখছি, প্রকৃতি দেখার সুযোগ কই। যেখানেই যাই প্রচুর বই সংগে নিয়ে যাই। আমি লক্ষ্য করেছি নতুন পরিবেশে আরামদায়ক আলস্যে বই পড়ার মত মজা আর কিছুতেই নেই। হুট করে কেউ বেড়াতে আসবে না, বিকট শব্দে টেলিফোন বেজে উঠবে না। চেনা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অন্য রকম আনন্দ আছে। একে বোধ হয় বলে শিকল ছেঁড়ার আনন্দ।

করিম আমাকে বলেছিল, তোকে দোতলা দালানের বিরাট একটা ঘর ছেড়ে দেব। সামনে বিশাল বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখবি বিশাল হাওর। ঘাটে পানসি নৌকা থাকবে, মাঝি থাকবে। যখন ইচ্ছা নৌকায় চড়ে বসবি। আমি তোকে মোটেও বিরক্ত করব না। তুই থাকবি তোর মত।

মোটামুটি লোভনীয় একটা ছবি তুলে ধরল তবে এও বলল, প্রকৃতি দেখতে প্রথম কয়েকদিন তোর ভাল লাগবে তারপর বোর হয়ে যাবি। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। দৃশ্যের কোন ভেরিয়েশন নেই। অবশ্যি কোনমতে এক সপ্তাহ কাটাতে পারলে দেখবি নেশা ধরে গেছে। তখন আর যেতে মন চাইবে না।

করিমের সব কথাই মিলে গেল। অষ্টম দিনে আমাদের ঢাকা ফেরার কথা। আমি বললাম, আরো কয়েকটা দিন থেকে যাই। করিম বলল, যতদিন ইচ্ছা থাক্। আমি এই ফাঁকে আমার মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। একটা হাওর পরেই আমার মামার বাড়ি। তোকে নিতে চাচ্ছি না। কারণ আমি মামার বাড়ি যাচ্ছি ঝগড়া করার জন্যে। তুই থাক্ এখানে।

আমি থেকে গেলাম।

দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতে লাগল পানসি নৌকায়। বিশাল নৌকা। নৌকার ভেতরই গোসলখানা এবং বাথরুম। নৌকার ছাদে শুয়ে থেকে দুলতে দুলতে আকাশ দেখা যায়। এক সময় মনে হয় আমি স্থির হয়ে আছি, আকাশ দুলছে। অপার্থিব অনুভূতি, দালান-কোঠার শহরে এই অনুভূতি কল্পনা করা সম্ভব নয়।

এক বিকেলে নৌকার ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মেলানোর পর। উঠে বসতেই ভারী গলায় কে যেন বলল, ভাই সাহেব কেমন আছেন? আপনার সংগে দেখা করার জন্যে আসছি। আমার জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি। আমি ভাটিপাড়া মডেল হাই স্কুলের অংকের শিক্ষক। আপনি অসময়ে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এটা স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। ঘুম ভাঙতেই উপদেশ শুনতে কারোরই ভাল লাগার কথা না। শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বভাব হচ্ছে যখন-তখন উপদেশ দিয়ে বেড়ানো।

AMARBOI.COM

ভদ্রলোক আগের চেয়েও ভারী গলায় বললেন, আপনার বিনা অনুমতিতে একটা কার্য করেছি। নৌকার মাঝিকে চা বানাতে বলেছি। নিজে এক পেয়ালা খেয়েছি। এখন আপনার সংগে আরেক পেয়াল খাব। যান, মুখ ধুয়ে আসুন। শহবেব বেশির ভাগ লোক মুখ না ধুয়ে চা খায়। স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর বিষয়গুলি যিনি এত ভাল জানেন তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল দেখলাম না। রোগা কাঠি। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। যক্ষ্মা রুগীর চোখের মত উজ্জ্বল চোখ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। পায়জামার উপর কালো রংগের পাঞ্জাবী।

আমি বললাম, আপনি কি কোন বিশেষ কাজে এসেছেন — না এম্নি গল্প-গুজব করতে এসেছেন ?

কাজে এসেছি। গল্প-গুজব করে নষ্ট করার সময় আমার নাই। আপনারও নিশ্চয়ই নাই। লোকমুখে শুনেছি, আপনি গল্প-উপন্যাস লেখেন। অবশ্য পড়া হয় নাই। সময়ের বড়ই অভাব ।

একবার ভাবলাম, বলি আমাদের কাজের অভাব আছে। সময়ের অভাব নেই। আমাদের সবার অঢেল সময়। বললাম না। কথাবার্তা বলে এই মানুষটিকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। শিক্ষক শ্রেণীর কেউ কথা বলার প্রশ্রয় পেলে অনবরত কথা বলবে। ফরিদপুরে একবার এমন একজনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি সন্ধ্যাবেলায় কথা শুরু করলেন। একনাগাড়ে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বললেন। কেউ কিছু বলতে গেলেই হাত তুলে বলেন, এক মিনিট। আমি আমার কথাটা শেষ করে নেই। তারপর যা বলার বলবেন।

এই জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি.ও সেই ধরনের কোন মানুষ কি-না কে জানে।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, আপনি কি সিগারেট খান মাস্টার সাহেব ?

তিনি বিরক্তমুখে বললেন, স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর জিনিস পরিহার করি। চা পরিহার করতে পারি নাই। লেখালেখি করি এই জন্যে চা-টা প্রয়োজন হয় ।

আমি অত্যন্ত শঙ্কিত বোধ করলাম।

অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামে-গঞ্জে যে সব লেখক আছেন তাঁরা শহরের শ্রোতা পেলে সহজে ছাড়েন না। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেন।

জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি. বললেন, আমি কাব্যচর্চা করি।

আমি চুপ করে রইলাম। এই সব ক্ষেত্রে উৎসাহসূচক কোন কথাই বলা উচিত না।

আপনার মনে হয়ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে অংকের শিক্ষক হয়ে কাব্যচর্চা কেন করি।

আমার মনে এই জাতীয় কোন প্রশ্নের উদয় হয়নি। অংকের শিক্ষক কাব্যচর্চা করতে পারবেন না এমন কোন কথা নেই।

সঠিক বলেছেন। তবে আমি প্রথাগত কবি নই। আমি গোটা পাটিগণিত কাব্যে রূপান্তরিত করছি।

বলেন কি ?

আপনি হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই। পাটিগণিতের একটি অংক আছে এই রকম, ক একটি কাজ পনেরো দিনে সম্পন্ন করিতে পারে। খ সেই কাজ ৩০ দিনে সম্পন্ন করে। ক ও খ মিলিত ভাবে সেই কাজটি কতদিনে সম্পন্ন করিবে ? এই অংকটি আমি কাব্যে রূপান্তরিত করেছি। আপনি কি শুনবেন ?

AMARBOI.COM

অবশ্যই শুনব।

জালালুদ্দিন বি.এ., বি.টি. গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করলেন :

করিম রহিম ছিল সহোদর ভাই
করিমের যে শক্তি রহিমের তা নাই।
করিম যে কর্ম মাত্র পনেরো দিনে করে
সেই কর্ম রহিম করে এক মাস ধরে।
এখন বালকগণ চিন্তা কর ধীরে,
দুই ভ্রাতা সেই কর্ম কতদিনে করে।।

আমার মুখে কোন কথা জোগাল না। অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাইসাব কেমন লাগল?

জ্বি ভাল।

অন্তর থেকেই বলছেন তো?

অন্তর থেকেই বলছি।

শুনে প্রীত হলাম। আরেকটা শুনুন চৌবাচ্চার অংক। আবৃত্তি করব?

জ্বি করুন।

চৌবাচ্চা ছিল এক প্রকাণ্ড বিশাল
দুই নলে পানি আসে সকাল, বিকাল।
এক নলে পূর্ণ হতে কুড়ি মিনিট লাগে
অন্য নলে পূর্ণ হয় না অর্ধঘন্টার আগে।।
চৌবাচ্চা পূর্ণের সময় করহ নির্ণন।
দুই নল খুলে দিলে লাগিবে কতক্ষণ?

আমি নিজের বিস্ময় গোপন করে বললাম, এ জাতীয় কবিতা মোট কতগুলি লিখেছেন?

তিন হাজার ছয়শত এগারোটা লেখা হয়েছে। এইসব কবিতার আমি নাম দিয়েছি অংক শ্লোক। পরিকল্পনা আছে দশ হাজার পূর্ণ করে পুস্তকাকারে ছাড়ব।

আমি নিতান্ত আনাড়ির মত বললাম, এতে লাভ কি হবে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, লাভ কি হবে তাও ব্যাখ্যা করতে হবে? ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অংকভীতি প্রবল। কবিতায় সে অংকগুলি পড়লে ভীতি দূর হবে। তা ছাড়া মেধাবী ছাত্ররা অংকগুলি মুখস্থ করে ফেলতে পারবে। পারবে না ?

হ্যাঁ পারবে।

বাঁদরের শ্লোকটা শুনুন। তৈলাক্ত বাঁশ ও বাঁদরের শ্লোক। আমার গ্রন্থে শ্লোক নাম্বার দু'হাজার তিন :

একটি বাঁদর ছিল
দুষ্ট প্রকৃতির
তৈলাক্ত বাঁশ দেখে
হয়ে গেল স্থির।।

AMARBOI.COM

বাঁশ বেয়ে উপরে সে উঠিবার চায়,
পিচ্ছিলতার কারণে পড়ে পড়ে যায়।।
এক মিনিট বেচারা উঠে যতখানি
অর্ধপথ নেমে যায় পরাভব মানি
বংশ দণ্ড কুড়ি ফিট লম্বা যদি হয়
উপরে উঠিবার সময় করহ নির্ণয়।।

আবৃত্তি শেষ করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন, উঠলাম। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

বসুন আরেকটু।

জ্বি–না, সময় অল্প — কাজ প্রচুর। দোয়া করবেন যেন কাজটা শেষ করে যেতে পারি। বেশিদিন বাঁচব না। আপনি করিমের বন্ধু। তাকে আমার কথা বলবেন। বললেই সে চিনবে। স্লামালিকুম।

ভদ্রলোক আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেলেন। নিজে ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকার মত নৌকা নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকারে শুধুমাত্র নক্ষত্রের আলো সম্বল করে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন।

আমার নৌকার মাঝি বলল, ইনার নাম পাগলা মাস্টার। একলা একলা থাকে। রাইতদিন বিড়বিড় কইরা কি যেন বলে। আন্ধাইর রাইতে একলা একলা নাও নিয়া ঘুরে।

ছেলেপুলে নাই?

একটাই মেয়ে ছিল, মইরা গেছে।

আমি লোকটির প্রতি এক ধরনের মমতা অনুভব করলাম। ভুল কাজে জীবন উৎসর্গ করে দেয়ার অনেক নজির আছে। ইনিও তেমন একজন। এদের মমতা দেখানো চলে ; এর বেশি কিছু না।

AMARBOI.COM

করিম এল তার পরদিন।

তাকে জালালুদ্দিন বি.এ. বি.টি.-র কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল, তোর কাছে এসেছিলেন না-কি? তাঁকে কি ডাকা হত জানিস? মুসলমান যাদব। অংকের জাহাজ ছিলেন। যে কোন পাটিগণিতের অংক মুখে মুখে করতে পারতেন।

এখন পারেন না?

পারেন বোধ হয়। তবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত কবিতা-টবিতা লেখেন—অংক শ্লোক। মেয়েটা মারা যাবার পর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। খুব আদরের মেয়েটি ছিল। নাইনে পড়তো। অংকে কাঁচা ছিল বলে বাবার কাছে খুব বকা খেত। মেয়েটা বাবাকে অসম্ভব ভয় করতো। মেয়েটা মরবার আগে বাবাকে বলল, এখন তোমাকে কেন জানি ভয় লাগছে না বাবা। আগে ভয় লাগতো। অংক ভয় লাগতো সেই সঙ্গে তোমাকেও লাগতো। এখন একটুও ভয় লাগছে না।

মেয়েটার মৃত্যু স্যারকে খুবুই এফেক্ট করে। মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে যায় — কি করে ছাত্রদের অংকভীতি দূর করা যায়। আস্তে আস্তে মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় যাবার আগে তোকে একদিন নিয়ে যাব স্যারের কাছে।

গেলাম একদিন উনার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে চিনতে পারলেন। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত কথাবার্তা বললেন। খুব আগ্রহ করে অংক শ্লোকের বিশাল খাতা এনে দেখালেন। গাঢ় স্বরে বললেন, গ্রন্থটির নাম রেখেছি — 'নূরুন নাহার'। আমার কন্যার নামে নাম। বেচারীর বড় অংকভীতি ছিল। গোপনে কাঁদতো। বইটা আরো পনেরো বছর আগে যদি লিখতে পারতাম

জালালুদ্দিন সাহেবের চোখ দিয়ে টপ- টপ করে পানি পড়তে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, একটু দোয়া রাখবেন। কাজটা যেন শেষ করতে পারি।

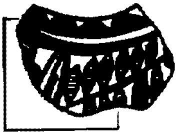

বান

মাঝরাতে বাতাসীর ভয়ার্ত গলা শোনা গেল — ও রহমান, ও রহমান।

রহমান তার আগেই জেগেছে। সে জবাব দিল না। কান পেতে শুনল। কলকল করে ঘরে পানি ঢুকছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নদীর শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে। বাতাসী হাহাকার করে উঠল, পানি আসে ও রহমান।

রহমান মরার মত পড়ে রইল যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

ও রহমান, ওরে রহমান।

রহমান ঠাণ্ডা গলায় ধমক দিল, প্যান প্যান করবা না। কূপী জ্বালো। খামাখা চিল্লাইও না।

পানি আসে যে রহমান।

আসুক।

বাতাসী কান্নার মত শব্দ করে। রহমান শক্ত ধমক লাগায়, খবরদার কানবা না। ভাল্লাগে না।

কূপী জ্বালাতে গিয়ে বাতাসীর হাত কাঁপে। বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ শব্দ হয়। কূপী জ্বালানোও মুশকিল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি বারবার নিভে যায়। কূপীর ঘোলাটে আলোয় বাতাসী দেখতে পায় রহমান চুপচাপ বসে আছে চৌকিতে। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে যেখানে ঘোলাটে পানি ক্রমে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাতাসী চেঁচিয়ে উঠল, পুতিরে ডাক দে রহমান। আবাগীর বেটি এখনো ঘুমায়।

তুমি চুপ থাকো। খামাখা চিল্লানী।

বাতাসী চুপ করে যায়। দরজা খুলতেই হাওয়ায় দপ করে কূপী নিভে যায়। ছপছপ শব্দ করে রহমান উঠোনে নেমে পড়ে। ঘুটঘুটি অন্ধকার চারদিকে। একটানা বৃষ্টি পড়ছে। নদীর পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘরগুলি জেগে উঠেছে। দূরে দূরে কূপীর আলোর ব্যস্ত নাড়াচাড়া চোখে পড়ে। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে একজন আরেকজনকে গলা ফাটিয়ে

AMARBOI.COM

ডাকছে — কলিম ভাই ও কলিম ভাই। একজন ডাকলেই সাড়া দিচ্ছে অনেকে। অনেকটা জায়গা জুড়ে হুই হুই শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে রহমান হাক পাড়ে —

কুপী ধরাও গো মা, ভেন্দার মত চাইয়া থাইক্যা না।

কুপী হাতে বাইরে আসতেই আবার ফস করে কুপী নিভে যায়।

রহমান গাল পাড়ে, আরে বেকুব বেটি বুদ্ধি-শুদ্ধি ছটাকটাও নাই।

ছপছপ শব্দ তুলে হাতড়ে হাতড়ে রহমান এগোয়। পানি এর মধ্যেই হাঁটু ছাপিয়ে উঠেছে। গোয়াল ঘর অনেকটা নীচুতে। গরু দু'টির গলার দড়ি কেটে দেয়া উচিত। কোন সাড়া-শব্দ আসছে না। কে জানে কেন। এর মধ্যেই ডুবে মরেছে নাকি?

ঘরের ভেতর পুতি জেগে উঠেছে। পুতি ঘুমায় তার দাদীর সঙ্গে। সেও জেগে উঠে চেঁচাতে শুরু করেছে, ও দাদী ও দাদী।

পুতি কি হইছেরে? ও পুতি কি হইছে?

পুতি বলল, বান ডাকছে গো দাদী।

বুড়ি কানে শুনতে পায় না। সে কিছুই বুঝল না। পুতির ছোট ভাই কাদের আলী নেংটো হয়ে ঘুমিয়েছিল। বহু ডাকাডাকি করেও পুতি তার ঘুম ভাঙাতে পারল না।

বাইরে থেকে রহমান বলল, মুরগী কয়টা বেবাক মরছে গো মা।

গরুর দড়ি কাটছস বাপধন?

হ। কাটছি।

তয় দেরী করস ক্যান?

আইতাছি।

পুতি ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। ভয়ে ভয়ে বলে, পানি কদ্দুর ভাইজান?

বুক পানি। জব্বর টান।

রহমানকে দেখতে পেয়ে বুড়ি দাদী গলা ছেড়ে কেঁদে উঠে। রহমান বিরক্ত হয়ে বলে, কি হইছে?

পুতি আমারে গাল পাড়ে রহমান।

দুত্তেরী খালি বাজে ঝামেলা।

পুতি আমারে হাত দিয়া ঠেলা দিছে।

রহমান উত্তর না দিয়ে ঘুমন্ত কাদের আলীর গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দেয়।

হারামজাদা এখনো ঘুমায়, পানিতে সব নিল।

বুড়ি ঘ্যানঘ্যান করে, পুতিরে একটা চড় দে, ও রহমান, পুতি আমারে গাইল দিছে।

কাদের আলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পানির দিকে। কাঁদতেও ভুলে যায়। রহমানের দাদী ফোকলা মুখে পান চিবোয়।

রহমান তার মায়ের দিকে পেছন ফিরে তামাক টানে। অনেকটা রাত পড়ে আছে সামনে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত যাওয়া যাবে না কোথাও। কিন্তু পানি যে হারে বাড়ছে কতক্ষণ চৌকির উপর বসে থাকা যাবে কে জানে।

ও রহমান জাগন আছ? ও রহমান।

AMARBOI.COM

রহমান হুঁকা রেখে বেরিয়ে এল। কলা গাছের ভেলায় করে হাসু চাচা এসেছেন। তাঁর ছোট ছেলেটাও সঙ্গে আছে। ভিজে চুপসে গেছে দুজনেই। হাসু চাচা ফ্যাসফ্যাস গলায় বললেন, রহমান জিনিস-পত্তর গোছগাছ কইরা রাখ। পানি আরো বাড়ব। আমি নৌকা আনতে যাই। রাইতে রাইতে বেবাক মানুষ রেল সড়কও তুলন লাগবো।

রহমান বলল, তামুক খাইবেন চাচা?

নাহ্। করিম মনে লয় বানে ভাইস্যা গেছে। হুনছস?

নাহ্। হুনি নাই।

তার বউটা খুব চিল্লাইতেছে।

এট্টু তামুক খান চাচা।

নাহ্ যাই। তরা জিনিসপত্র ঠিকঠাক কর।

বাতাসী ও পুতি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছোট ছোট পুঁটলি তৈরি করতে থাকে। রহমান চৌকির উপর চুপচাপ বসে থাকে। তার দৃষ্টি নিরাসক্ত যেন কোন কিছুর সঙ্গেই তার কোন যোগ নেই। ঘরের ভেতরের পানি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পুতির চোখে জল টলটল করে। নিচু গলায় বলে, বড় ডর লাগে ভাইজান।

ডর লাগনের কিছু নাই। কাম কর।

কোমর ছাপিয়ে পানি উঠে আসবার পরই সবাইকে নিয়ে চালে উঠে রহমান। বৃষ্টিও তখন নামে জোরেসোরে। রহমানের দাদী গলা ছেড়ে কাঁদতে বসে।

ও রহমান ভিজলাম যে রে।

বুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদে কাদের আলী।

বাতাসী আক্ষেপের সুর বের করে, ধান-চাউল সব গেল রে, ও রহমান। ও বাপধন।

রহমান ধমক লাগায়, খবরদার প্যান প্যান করবা না।

অন্ধকার রাত। অঝোরে পড়ছে বৃষ্টি। চারদিকে ফুলে-ফেঁপে উঠছে রাত্রির মতই অন্ধকার জলরাশি। দূরে দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘর থেকে চিৎকার ও কোলাহল শোনা যাচ্ছে। নদীর শোঁ-শোঁ আওয়াজের সঙ্গে সে কোলাহল মিশে অদ্ভুত শব্দ হয়।

স্রোতের প্রবল টানে রহমানের বহুদিনের পুরানো চালাঘর নড়বড় করে কাঁপে। ভয়-পাওয়া গলায় পুতি ডাকে, ভাইজান ও ভাইজান।

রহমানের দাদী ভাঙা গলায় বলে, ও দাদা বড় শীত লাগে। এবং এক সময় পুতি শুনতে পায় তার ছাব্বিশ বছরের জোয়ান দাদা ছেলেমানুষের মত কাঁদছে। তার বড় ইচ্ছা করে সে দাদার পাশে বসে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। দাদাকে তারা সবাই বড় ভয় করে।

AMARBOI.COM

শঙ্খমালা

অনেক রাতে খেতে বসেছি, মা ধরা গলায় বললেন, 'খবর শুনেছিস ছোটন?'

'কি খবর?'

'পরী এসেছে।'

আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। মা থেমে থেমে বললেন, পরীর একটি মেয়ে হয়েছে।'

মায়ের চোখে এইবার দেখা গেল জল। আমি বললাম, 'ছিঃ মা, কাদেন কেন?'

মা সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'না কাঁদি না তো; আর দুটি ভাত নিবি?'

আমি দেখলাম মার চোখ ছাপিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। মায়েরা বড় দুঃখ পুষে রাখে।

ছ'বছর আগের পরী আপাকে ভেবে আজ কি আর কাঁদতে আছে? হাত ধুতে বাইরে এসে দেখি ফুটফুটে জ্যোৎস্না নেমেছে। চারদিকে কি চমৎকার আলো। উঠোনের লেবু গাছের লম্বা কোমল ছায়া সে আলোয় ভাসছে। কতদিনের চেনা ঘর-বাড়ী কেমন অচেনা লাগছে আজ।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন আমার অন্ধ বাবা। তাঁর পাশে একটি শূন্য টুল। ঘরের সমস্ত কাজ সেরে আমার মা এসে বসবেন সেখানে। ফিসফিস করে কিছু কথা হবে। দুজনেই তাকিয়ে থাকবেন বাইরে। একজন দেখবেন উথাল-পাতাল জ্যোৎস্না, অন্যজন অন্ধকার।

AMARBOI.COM

বাবা মৃদু স্বরে ডাকলেন, ছোটন, ও ছোটন! আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর অন্ধ চোখে তাকালেন আমার দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পরী এসেছে শুনেছিস?

'শুনেছি।'

'আচ্ছা যা।'

আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। পরী আপা আজ এসেছেন। কাল খুব ভোরে তাদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়ত দেখা যাবে তিনি হাসি-হাসি মুখে শিমুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। শিমুল তুলো উড়ে এসে পড়ছে তাঁর চোখে-মুখে। আমাকে দেখে হয়তো খুশী হবেন। হয়তো বা হবেন না। পরী আপাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।

আমরা খুব দুঃখ পুষে রাখি। হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন আমাদের কত পুরানো কথা মনে পড়ে। বুকের ভেতর আচমকা ধাক্কা লাগে। চোখে জল এসে পড়ে। এমন কেন আমরা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আমার মা হাত ধুতে কলঘরে যাচ্ছেন। মাথার কাপড় ফেলে

তিনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর অনেক সময় নিয়ে অজু করলেন। এক সময় এসে বসলেন শূন্য টুলটায়। বাবা ফিসফিস করে বললেন, খাওয়া হয়েছে তোমার?

'হুঁ। তোমার বুকে তেল মালিশ করে দেব?'

'না।'

'সিগারেট খাবে? দেব ধরিয়ে?'

'না।'

তারপর দু'জনে নিঃশব্দে বসেই রইলেন, বসেই রইলেন। লেবু গাছের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে লাগলো। এত দূর থেকে বুঝতে পারছি না কিন্তু মনে হচ্ছে আমার মা কাঁদছেন। বাবা তাঁর শীর্ণ হাতে মার হাত ধরলেন। কফ-জমা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কাঁদে না, কাঁদে না।

বাবা তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে আজ আবার তিরিশ বছর আগের মত ভালবাসুক। আমার মা'র আজ বড় ভালবাসার প্রয়োজন। আমি তাঁদের ভালবাসার সুযোগ দিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। মা ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, কোথায় যাস ছোটন?

'এই একটু হাঁটবো রাস্তায়।'

'দেরী করবি না তো?'

'না।'

মা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, ছোটন তুই কি পরীদের বাসায় যাচ্ছিস?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, যেতে চায় যাক না। যাক।

রাস্তাঘাট নির্জন। শহরতলীর মানুষরা সব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। তারস্বরে ঝিঁঝি ডাকছে চারপাশে। গাছে-গাছে নিশি পাওয়া পাখীদের ছটফটানি। তবু মনে হচ্ছে চারপাশ কি চুপচাপ।

রাস্তায় চিনির মত সাদা ধুলো চিকমিক করে। আমি একা একা হাঁটি। মনে হয় কত যুগ আগে যেন অন্য কোন জন্মে এমন জ্যোৎস্না হয়েছিল। বড়দা আর আমি গিয়েছিলাম পরী আপাদের বাসায়। আমার লাজুক বড়দা শিমুল গাছের আড়াল থেকে মৃদুস্বরে ডেকেছিলেন, পরী, ও পরী।

লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন পরীর মা। হাসিমুখে বলছিলেন,

'ওমা তুই? কবে এলি রে? কলেজ ছুটি হয়ে গেল?'

'ভাল আছেন খালা? পরী ভাল আছে?'

খবর পেয়ে পরী হাওয়ার মত ছুটে এসেছিলো ঘরের বাইরে।

এক পলক তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, ইশ! কত দিন পর কলেজ ছুটি হল আপনার।

আমার মুখচোরা লাজুক দাদা ফিসফিসিয়ে বলছিলেন — পরী, তুমি ভাল আছো?

'হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল। তোমার জন্য গল্পের বই এনেছি পরী।'

এসব কোন্ জন্মের কথা ভাবছি? হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে — এসব কি সত্যি সত্যি কখনো ঘটেছিল? একজন বৃদ্ধা মা একজন অন্ধ বাবা — এরা ছাড়া কোন কালে কি কেউ ছিল আমার?

AMARBOI.COM

পরী আপার বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়ালাম। খোলা উঠোনে চেয়ার পেতে পরী আপা চুপচাপ বসে আছেন। পাশে একটি শূন্য চেয়ার। পরী আপার বর হয়তো উঠে গেছেন একটু আগে। পরীর আপা আমাকে দেখে স্বাভাবিক গলায় বললেন, ছোটন না?

'হ্যাঁ।'

'উঁহু! কতদিন পর দেখা। বোস এই চেয়ারটায়।'

'আপনি ভাল আছেন পরী আপা?'

'হ্যাঁ, আমার মেয়ে দেখবি? বোস নিয়ে আসছি।'

লাল জামা গায়ে ডল পুতুলের মত একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করে ফিরে আসলেন তিনি।

'দেখ্, অবিকল আমার মত হয়েছে। তাই না?'

'হ্যাঁ, কি নাম রেখেছেন মেয়ের?'

'নীরা। নামটা তোর পছন্দ হয়?'

'চমৎকার নাম।'

অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমি। একসময় পরী আপা বললেন, বাড়ী যা ছোটন। রাত হয়েছে।

বাবা আর মা তেমনি বসে আছেন। বাবার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর সারা মাথায় দুধের মত সাদা চুল। মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। পায়ের শব্দে চমকে উঠে বাবা বললেন, ছোটন ফিরলি?

'জ্বি।'

'পরীদের বাসায় গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা হল না। আমরা তিনজন চুপচাপ বসে রইলাম।

এক সময় বাবা বললেন, পরী কিছু বলেছে?

'না।'

মা'র শরীর কেঁপে উঠলো। একটি হাহাকারের মত তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, "আমার বড় খোকা। আমার বড় খোকা।"

এনড্রিন খেয়ে মরা আমার অভিমানী দাদা যে প্রগাঢ় ভালবাসা পরী আপার জন্যে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তার সবটুকু দিয়ে বাবা আমার মাকে কাছে টানলেন। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলেন মার কুঞ্চিত কপালে। ফিসফিস করে বললেন, কাঁদে না কাঁদে না।

ভালবাসার সেই অপূর্ব দৃশ্যে আমার চোখে জল আসলো। আকাশভরা জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললুম, পরী আপা, আজ তোমাকে ক্ষমা করেছি।

AMARBOI.COM

পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮১৭
খুলনা

নিউটনের ভুল সূত্র

রূপেশ্বর নিউ মডেল হাইস্কুলের সায়েন্স টিচার হচ্ছেন অমর বাবু।

অমর নাথ পাল, বি.এসসি. (অনার্স, গোল্ড মেডাল)।

খুব সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। স্কুলের স্যারদের আসল নামের বাইরে একটা নকল নাম থাকে। ছাত্র মহলে সেই নামেই তাঁরা পরিচিত হন। অমর বাবু স্কুলে 'ঘড়ি স্যার' নামে পরিচিত। তাঁর বুক পকেটে একটা গোল ঘড়ি আছে। ক্লাসে ঢোকার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখে নেন। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ামাত্র আবার ঘড়ি বের করে সময় দেখেন । তখন যদি তাঁর ভুরু কুঁচকে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঘণ্টা ঠিকমত পড়েনি। দু'এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়েছে।

তাঁর ক্লাসে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে। হাসা যাবে না, পেনসিল দিয়ে পাশের ছেলের পিঠে খোঁচা দেয়া চলবে না, খাতায় কাটাকুটি খেলা চলবে না। মনের ভুলেও যদি কেউ হেসে ফেলে তিনি হতভম্ব চোখে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলবেন, সায়েন্স ছেলেখেলা নয়। হাসাহাসির কোন ব্যাপার এর মধ্যে নেই। সায়েন্স পড়াবার সময় তুমি হেসেছ, তার মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করেছ। মহা অন্যায় করেছ। তার জন্যে শাস্তি হবে। আজ ক্লাস শেষ হবার পর বাড়ি যাবে না। পাটিগণিতের সাত প্রশ্নমালার ১৭, ১৮, ১৯ এই তিনটি অংক করে বাড়ি যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?

AMARBOI.COM

অপরাধী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। তার লাঞ্ছনা দেখে অন্য কেউ হয়ত ফিক করে হেসে ফেলল। অমর স্যার থমথমে গলায় বলবেন, ওকি, তুমি হাসছ কেন? হাস্যকর কিছু কি বলেছি? তুমি উঠে দাঁড়াও। অকারণে হাসার জন্য শাস্তি হিসেবে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমর বাবু পকেট থেকে ঘড়ি বের করবেন। পাঁচ মিনিট তিনি এক দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইবেন। ছাত্ররা মূর্তি মত বসে থাকবে।

অমর বাবুর বয়স পঞ্চাশ। স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে — এই নিয়ে তাঁর সংসার। দুটি ছেলেই বড় হয়েছে — রূপেশ্বর বাজারে একজনের কাপড়ের ব্যবসা, অন্যজনের ফার্মেসী আছে। ভাল টাকা রোজগার করে। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অন্য মেয়েটির বিয়ের কথা হচ্ছে। এদের কারোর সঙ্গেই তাঁর বনে না। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনেক দিন হল বাড়িতেও থাকেন না। স্কুলের দোতলায় একটা খালি ঘরে বাস করেন। সেখানে বিছানা বালিশ আছে। একটা স্টোভ আছে। গভীর রাতে স্টোভে চা বানিয়ে খান।

রূপেশ্বর স্কুলের হেড স্যার তাঁকে বলেছিলেন, আপনার ঘর-সংসার থাকতে আপনি স্কুলে থাকেন, এটা কেমন কথা?

অমর বাবু গম্ভীর গলায় বললেন, রাত জেগে পড়াশোনা করি, একা থাকতেই ভাল লাগে। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমার বনে না। তবে স্কুলে রাত্রি যাপন করে যদি আপনাদের অসুবিধার কারণ ঘটিয়ে থাকি তাহলে আমাকে সরাসরি বলুন, আমি ভিন্ন ব্যবস্থা দেখি।

হেড স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে না — এই কথা হচ্ছে না। আপনার যেখানে ভাল লাগবে আপনি সেখানে থাকবেন।

তিনি অমর বাবুকে ঘটালেন না। কারণ অমর বাবু অসম্ভব ভাল শিক্ষক। অংকের ডুবো জাহাজ। ডুবো জাহাজ বলার অর্থ তাঁকে দেখে মনে হয় না তিনি অংক জানেন। ভাবুক ভাবুক ভাব আছে। ক্লাসে কোন অংক তাকে করতে দিলে এমন ভাব করেন যেন অংকটা মাথাতেই ঢুকছে না। তারপর পকেট থেকে গোল ঘড়ি বের করে ঘড়ির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, চোখ বন্ধ করে মুখে মুখে অংকটা করে দেন। স্কুলের অনেক ছাত্রের ধারণা এই ঘড়িতে রহস্য আছে। ঘড়ি অংক করে দেয়। ব্যাপার তা নয়। তাঁর ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটায় গণ্ডগোল আছে। কখনো দ্রুত যায় কখনো আস্তে তবে গড়ে সমান থাকে। এইটাই তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন।

অমর বাবুকে ভাল মানুষ বলা যেতে পারে তবে তিনি অমিশুক, কথাবার্তা প্রায় বলেন না বললেই হয়। কারোর সাতে-পাঁচেও থাকেন না। টিচার্স কমন রুমে জানালার পাশের চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকেন। ঘন্টা পড়লে ক্লাসে রওনা হন। স্কুলের আরবী শিক্ষক মৌলানা ইদরিস আলি তাঁকে নিয়ে মাঝে মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেন। বিশেষ লাভ হয় না। তিনি ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করেন না। কেউ ঠাট্টা করলে কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকেন।

আজ বৃহস্পতিবার, হাফ স্কুল। আগামী কাল ছুটি। ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যেই একটা ছুটি ছুটি ভাব চলে এসেছে। থার্ড পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। তিনি জানালার কাছের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তারপর অমর বাবু, আপনার সায়েন্সের কি খবর?

অমর বাবু কিছু বললেন না তবে চোখ তুলে তাকালেন। মনে মনে রসিকতার জন্য প্রস্তুত হলেন। বিজ্ঞান নিয়ে এই লোকটি কঠিন রসিকতা করে যা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না।

ইদরিস সাহেব পানের কৌটা থেকে পান বের করতে করতে বললেন, অনেকদিন থেকে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। রোজই ভাবি আপনাকে জিজ্ঞেস করব।

'জিজ্ঞেস করলেই পারেন।'

'ভরসা হয় না। আপনি তো আবার প্রশ্ন করলে রেগে যান।'

'বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা করলে রাগি। এম্নিতে রাগি না — আপনার প্রশ্নটা কি?'

ইদরিস সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, পৃথিবী যে ঘুরছে এই নিয়ে প্রশ্ন। পৃথিবী তো ঘুরছে, তাই না?

AMARBOI.COM

'জ্বি। পৃথিবীর দু'রকম গতি — নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, আবার সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।'

'বাঁই বাঁই করে ঘুরছে?'

'জ্বি?'

'তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মাথা কেন ঘুরে না? মাথা ঘোরা উচিত ছিল না? এম্নিতে তো মাঠে দু'টা চক্কর দিলে মাথা ঘুরতে থাকে। ওকি, এরকম করে তাকাচ্ছেন কেন? রাগ করছেন না-কি?'

'বিজ্ঞান নিয়ে রসিকতা আমি পছন্দ করি না।'

'রসিকতা কি করলাম?'

অমর বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘন্টা পড়বার আগেই ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই তাঁর নিয়ম। পৃথিবী কোন কারণে হঠাৎ উল্টে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

আজ পড়ার বিষয়বস্তু হল আলো। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ। বড় চমৎকার বিষয়। আলো হচ্ছে একই সঙ্গে তরঙ্গ ও বস্তু। কি অসাধারণ ব্যাপার! ক্লাস টেনের ছেলেগুলি অবশ্যি এসব বুঝবে না। তবে বড় হয়ে যখন পড়বে তখন চমৎকৃত হবে।

অমর বাবু ক্লাসে ঢুকেই বললেন, আলোর গতিবেগ কত — কে বলতে পার? সাতজন ছেলে হাত তুলল। তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল সবাই হাত তুলবে। ছেলেগুলি কি সায়েন্সে মজা পাচ্ছে না? তা কি করে হয়? পৃথিবীতে মজার বিষয় তো একটাই। সায়েন্স।

'তুমি বল, আলোর গতিবেগ কত?'

'প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।'

'ভেরী গুড। এখন তুমি বল, আলোর গতি কি এর চেয়ে বেশি হতে পারে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'কেন পারে না?'

'এটাই স্যার নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম।'

'ভেরী গুড। ভেরী ভেরী গুড। প্রকৃতির কিছু নিয়ম আছে যে নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হবে না। হতে পারে না। যেমন মাধ্যাকর্ষণ। একটা আম যদি গাছ থেকে পড়ে তাহলে তা মাটিতেই পড়বে, আকাশে উড়ে যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

'জ্বি-স্যার।'

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জনক কে?'

'নিউটন।'

'নামটা তুমি এই ভাবে বললে যেন নিউটন হলেন একজন রাম-শ্যাম, যদু-মধু, রহিম-করিম। নাম উচ্চারণে কোন শ্রদ্ধা নাই — বল মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।'

ছাত্রটি কাঁচুমাচু মুখে বলল, মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন।

AMARBOI.COM

'একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীর নাম অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলার জন্যে তোমার শাস্তি হবে। ক্লাস শেষ হলে বাড়ি যাবে না, পাটিগণিতের বার নম্বর প্রশ্নমালার একুশ আর বাইশ এই দু'টি অংক করে তারপর যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?'

ছেলেটির মুখ আরো শুকিয়ে গেল।

অমর বাবুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ছেলেগুলি তাঁর মন খারাপ করিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞান অবহেলা করছে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ছে। খুবই দুঃখের কথা।

সন্ধ্যার পর তিনি স্কুল লাইব্রেরীতে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করলেন। বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনকথা। মনের অশান্ত ভাব একটু কমল। তিনি স্কুলের দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর ছোট ছেলে রতন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বাবাকে স্কুলের ছাত্রদের চেয়েও বেশি ভয় করে।

'রতন কিছু বলবি?'

'মা বলছিলেন, অনেকদিন আপনি বাড়িতে যান না।'

'তাতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।'

'মা'র শরীরটা ভাল না। জ্বর।'

'ডাক্তার ডেকে নিয়ে যা। আমাকে বলছিস কেন? আমি কি ডাক্তার?'

রতন মাথা নিচু করে চলে গেল। অমর বাবুর মনে হল আরেকটু ভাল ব্যবহার করলেই হত। এতটা কঠিন হবার প্রয়োজন ছিল না। কঠিন না হয়েই বা কি করবেন — গাধা ছেলে — মেট্রিকটা তিনবারেও পাস করতে পারেনি। জগতের আনন্দময় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কিছুই জানল না — আলো কি সেই সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আলো কি জিজ্ঞেস করলে নির্ঘাৎ বলবে — এক ধরনের তরকারি, ভর্তা করেও খাওয়া যায়। ছিঃ ছিঃ।

ঘড়ি ধরে ঠিক ন'টায় তিনি রাতের খাবার শেষ করলেন। খাওয়া শেষ করতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসতে লাগল। মেঘ ডাকতে লাগল। অমর বাবু দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলেন। তাঁর ঘুমুতে যাবার সময় বাঁধা আছে রাত দশটা কুড়ি। এখনো অনেক বাকি আছে। এই সময়টা তিনি চুপচাপ বসে নানা বিষয় ভাবেন। ভাবতে ভাল লাগে। আগে পড়াশোনা করতেন। এখন চোখের কারণে হারিকেনের আলোয় বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না। মাথায় যন্ত্রণা হয়। ঢাকায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখান দরকার।

তিনি বিছানায় পা তুলে উঠে বসলেন। শীত শীত লাগছিল, গায়ে একটা চাদর জড়াবেন কি-না যখন ভাবছেন তখন হঠাৎ শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি খানিকটা নড়ে উঠলেন। আর তখন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার হল — তিনি লক্ষ্য করলেন বিছানা ছেড়ে তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। প্রায় হাত তিনেক উঠে গেলেন এবং সেখানেই স্থির হয়ে গেলেন। চোখের ভুল? অবশ্যই চোখের ভুল। মহাবিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র অনুযায়ী এটা হতে পারে না। হতে পারে না। হতে পারে না। নিতান্তই অসম্ভব। সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা যেমন অসম্ভব, এটাও তেমনি অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

কিন্তু হয়েছে। তিনি খাট থেকে তিন হাত উপরে স্থির হয়ে আছেন। ঘরের সবকিছু আগের মত আছে, শুধু তিনি শূন্যে ভাসছেন। অমর বাবু চোখ বন্ধ করে মনে মনে বললেন,

AMARBOI.COM

হে ঈশ্বর, দয়া কর। দয়া কর। শরীরে কেমন যেন অনুভূতি হল। হয়ত এবার নিচে নেমেছেন। তিনি চোখ খুললেন, না আগের জায়গাতেই আছেন। এটা কি করে হয়?

প্রচণ্ড শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধপ করে নিচে পড়লেন। খানিকটা ব্যথাও পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিলেন। কি ঘটেছে তা নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। ঘুমুতে চান। নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুম ভেঙে যাবার পর হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

রাতে তাঁর ভাল ঘুম হল। শেষ রাতের দিকে তিনি একবার জেগে উঠে বাথরুমে যান। আজ তাও গেলেন না, এক ঘুমে রাত পার করে দিলেন। যখন ঘুম ভাঙল —তখন চারদিকে দিনের কড়া আলো, রোদ উঠে গেছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম সূর্য উঠার পর ঘুম ভাঙল। রাতে কি ঘটেছিল তা মনে করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দুঃস্বপ্ন, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন। বদহজম হয়েছিল। বদহজমের কারণে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরকম হয়। মানুষ খুব ক্লান্ত থাকলে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেছেন। দীর্ঘ স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল হয় খুব কম। হয়ত এক সেকেণ্ডের একটা স্বপ্ন দেখেছেন। এই হবে — — এছাড়া আর কি? স্বপ্ন, অবশ্যই স্বপ্ন। অমর বাবুর মন একটু হালকা হল।

পরের দিনের কথা। প্রথম পিরিয়ডে অমর বাবুর ক্লাস নেই। টিচার্স কমন রুমে চুপচাপ বসে আছেন। ইদরিস সাহেব যথারীতি তাঁর পাশে এসে বসলেন। পানের কৌটা বের করতে করতে বললেন, অমর বাবুর শরীর খারাপ না-কি?

'জ্বি-না।'

'দেখে কেমন কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে অসুস্থ। গায়ে কি জ্বর আছে?'

'জ্বি-না।'

'রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?'

'হুঁ, তবে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'কি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন?'

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, দেখলাম শূন্যে ভাসছি।

'আরে ভাই এটা কি দুঃস্বপ্ন? শূন্যে ভাসা, আকাশে উড়ে যাওয়া — এইসব স্বপ্ন তো আমি রোজই দেখি। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি অনেক উচু থেকে ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেছি . . খুব টেনশানের স্বপ্ন।'

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, ঠিক স্বপ্ন না, মনে হয় জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি।

'কি বললেন? জাগ্রত অবস্থায়? জেগে জেগে দেখলেন আপনি শূন্যে ভাসছেন?'

'জ্বি।'

'জাগ্রত অবস্থায় দেখলেন শূন্যে ভাসছেন?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। ইদরিস সাহেব বললেন, রাত-দিন সায়েন্স সায়েন্স করে আপনার মাথা ইয়ে হয়ে গেছে। বিশ্রাম দরকার। আপনি এক কাজ করুন — ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান। আজ ক্লাস নেয়ার দরকার নেই। আমি হেড স্যারকে বলে আসি?

'না না, আমার শরীর ঠিকই আছে।'

AMARBOI.COM

অমর বাবু যথারীতি ক্লাসে গেলেন। তাঁর পড়াবার কথা আলোর ধর্ম। তিনি শুরু করলেন মাধ্যাকর্ষণ।

"দু'টি বস্তু আছে। একটির ভর m_1 অন্যটির ভর m_2. তাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে r তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ হবে

$$\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। স্যার আইজাক নিউটনের বিখ্যাত সূত্র। এর কোন নড়চড় হবে না। হতে পারে না। বাবারা বুঝতে পারছ?"

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আজ পড়াবার কথা আলোর ধর্ম, প্রতিফলন, প্রতিসরণ ; স্যার মাধ্যাকর্ষণ পড়াচ্ছেন কেন?

"বাবারা কি বলছি বুঝতে পারছ?"

ছাত্ররা জবাব দিল না।

"যদি কেউ বুঝতে না পার হাত তোল।"

কেউ হাত তুলল না। এক সময় ঘণ্টা পড়ে গেল। কোনদিনও যা হয় না তাই হল। অমর বাবু ঘণ্টা পড়ার পরেও চুপচাপ বসে রইলেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন না বা উঠেও গেলেন না। চোখ বন্ধ করে মূর্তির মত বসে রইলেন। ছাত্রদের বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অমর বাবু স্কুল লাইব্রেরীতে বসে আছেন। হাতে একটা বই। নাম — "মৌমাছিদের বিচিত্র জীবন।" পড়তে বড় ভাল লাগছে। কত ক্ষুদ্র প্রাণী অথচ কি অসম্ভব বুদ্ধি, কি অসম্ভব জ্ঞান। মৌচাকের ভেতরের তাপমাত্রা তারা একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির করে রাখে। বাড়তেও দেয় না, কমতেও দেয় না। এই কাজটা তারা করে অতি দ্রুত পাখা কাঁপিয়ে। তাপমাত্রা এক হাজার ভাগের এক ভাগও বেশ-কম হয় না। মানুষের পক্ষেও যা বেশ কঠিন।

AMARBOI.COM

তিনি রাত আটটার দিকে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। শরীরটা ভাল লাগছে না। একটু জ্বর জ্বর লাগছে। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার দিয়ে গেছে। তিনি কিছু খাবেন না বলে ঠিক করলেন। না খাওয়াই ভাল হবে। অনেক সময় পেটের গণ্ডগোল থেকে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়। তাতে আজবাজে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা ঘটতে পারে। না খেলে তা হবে না। লেবুর সরবত বানিয়ে এক গ্লাস সরবত খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন।

কাল শীত শীত লাগছিল, আজ আবার গরম লাগছে। জানালা খোলা, সামান্য বাতাস আসছে। সেই বাতাস মশারির ভেতর ঢুকছে না। তিনি মশারি খুলে ফেললেন। মশা কামড়াবে। কামড়াক। গরমের চেয়ে মশার কামড় খাওয়া ভাল।

মশারি খুলে ফেলে বিছানায় শোয়া মাত্র আবার গত রাতের মত হল। তিনি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মাথা ঘরের ছাদ স্পর্শ করল।

তিনি হাত দিয়ে সেই ছাদে ধাক্কা দেয়া মাত্র খানিকটা নিচে নেমে আবার উপরে উঠতে লাগলেন। একি অদ্ভুত কাণ্ড? আবারো কি স্বপ্ন? না, স্বপ্ন না। আজকেরটা স্বপ্ন না।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার উপর কাজ করছে না। পৃথিবীর ভর যদি হয় m_1, তিনি যদি হন m_2 এবং তাঁর ভর m_2 যদি হয় শূন্য তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বল হবে শূন্য। তাঁর ভর কি এখন শূন্য? তিনি পাশ ফিরলেন, শরীরটা চমৎকারভাবে ঘুরে গেল। সাঁতার কাটার মত করলেন। তেমন লাভ হল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন। এটাই স্বাভাবিক, বাতাস অতি হালকা। হালকা বাতাসে সাঁতার কাটা যাবে না।

ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা কি? একটা মানুষের ভর হঠাৎ শূন্য হয়ে যেতে পারে না। নিচে নামার উপায় কি? মনে মনে আমি যদি চিন্তা করি নিচে নামব তাহলে কি নিচে নামতে পারব? তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন — নেমে যাচ্ছি, দ্রুত নেমে যাচ্ছি। লাভ হল না। যেখানে ছিলেন সেখানেই রইলেন।

আচ্ছা তিনি যদি থুথু ফেলেন তাহলে থুথুটার কি হবে? মাটিতে পড়ে যাবে না শূন্যে ঝুলতে থাকবে? তিনি থুথু ফেললেন। খুব স্বাভাবিকভাবে থুথু মাটিতে পড়ল। গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে ছেড়ে দিলে সেটিও কি শূন্যে ভাসতে থাকবে? না-কি নিচে পড়ে যাবে? অতি সহজেই এই পরীক্ষা করা যায়। তিনি গায়ের পাঞ্জাবী খুলে ফেললেন। ছেড়ে দিতেই দ্রুত তা নিচে নেমে গেল। তার মানে এই অদ্ভুত ব্যাপাটির সঙ্গে শুধুমাত্র তিনিই জড়িত। তাঁর গায়ের পোশাকের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। তিনি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছেন মাধ্যাকর্ষণ বল যদি হয় F তাহলে

$$F=\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

AMARBOI.COM

m_1 পৃথিবীর ভর। m_2 তাঁর নিজের ভর। r হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব । m_2 যদি '0' হয়, F হবে শূন্য। কিংবা r যদি হয় অসীম তাহলেও F হবে '0'. কোন বিচিত্র কারণে কি তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব অসীম হয়ে যাচ্ছে? ভাবতে ভাবতে অমর বাবুর ঘুম পেয়ে গেল। এক সময় মাটি থেকে ছ'ফুট উঁচুতে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুম। তাঁর নাকও ডাকতে লাগল। ঘুমের মধ্যেই তিনি পাশ ফিরে শুলেন। কোন রকম অসুবিধা হল না।

ঘুম ভাঙলো ভোরবেলা।

অনেক বেলা হয়েছে। ঘরে রোদ ঢুকেছে। তিনি পড়ে আছেন মেঝেতে। কখন মাটিতে নেমে এসেছেন তিনি জানেন না। গায়ে কোন ব্যথা বোধ নেই কাজেই ধপ করে পড়েন নি — আস্তে আস্তে নেমে এসেছেন।

অমর বাবু স্বাভাবিক মানুষের মত হাত-মুখ ধুলেন। মুড়ি গুড় দিয়ে সকালের নাশতা সারলেন। পুকুর থেকে গোসল শেষ করে যথাসময়ে স্কুলে গেলেন। আজ প্রথম পিরিয়ডেই তাঁর ক্লাস। তিনি ক্লাস না নিয়ে নিজের চেয়ারে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। মনে হল ঘুমুচ্ছেন। আসলে ঘুমুচ্ছিলেন না, ভাবার চেষ্টা করছিলেন — তার জীবনে এসব কি ঘটছে?

ব্যাপারটা শুধু রাতেই ঘটছে। দিনে ঘটছে না। আচ্ছা তিনি যদি তাঁর নিজের ঘরে না ঘুমিয়ে অন্য কোথাও থাকেন তাহলেও কি এই ব্যাপার ঘটবে? রাতে খোলা মাঠে যদি ঘুমিয়ে

থাকনে তাহলে কি ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে চলে যাবেন? মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি বা সূর্যের কাছাকাছি? কিংবা আরো দূরে — এণ্ড্রোমিড়া নক্ষত্রপুঞ্জে . . . সুদূর কোন ছায়াপথে . . . ?

'স্যার!'

অমর বাবু চমকে তাকালেন। দপ্তরী কালিপদ দাঁড়িয়ে আছে।

'হেড স্যার আপনারে বুলায়।'

হেড স্যার তাঁকে কেন ডেকে পাঠালেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। ইদরিস সাহেব কি হেড স্যারকে কিছু বলেছেন? বলতেও পারেন। পেট পাতলা মানুষ — বলাটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা ব্যাপারটা কি তিনি নিজে গুছিয়ে হেড স্যারকে বলবেন? বলা যেতে পারে। মানুষটা ভাল। শুরুতেই অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন না।

হেড স্যার বললেন, কেমন আছেন অমর বাবু?

'জ্বি ভাল।'

'দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে না। বসুন। চা খাবেন?'

'চা তো স্যার আমি খাই না।'

'এক-আধবার খেলে কিছু হয় না। খান। কালিপদকে চা দিতে বলেছি।'

কালিপদ চা দিয়ে থার্ড পিরিয়ডের ঘন্টা দিতে গেল। হেড স্যার বললেন, শুনলাম গতকাল ক্লাস নেননি। আজও ফার্স্ট পিরিয়ড মিস গেছে।

'ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে স্যার।'

'ও আচ্ছা। আপনার তো সব ঘড়ি-ধরা। ঘুম ভাঙতে দেরি হল কেন?'

অমর বাবু চুপ করে রইলেন।

'পারিবারিক কোন সমস্যা যাচ্ছে না-কি?'

'জ্বি-না।'

'আপনার মেয়ে গতকাল আমার কাছে এসেছিল। খুব কান্নাকাটি করল। আপনি বাড়িতে থাকেন না। এই নিয়ে বেচারীর মনে খুব দুঃখ। দুঃখ হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'আমি একা থাকতেই পছন্দ করি।'

'নিজের পছন্দকে সব সময় খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। অন্যদের কথাও ভাবতে হয়। আমরা সামাজিক জীব . . .'

'স্যার উঠি?'

'বসুন খানিকক্ষণ। গল্প করি — অমর বাবু আমি বলি কি যদি অসুবিধা না থাকে তা হলে, আপনার সমস্যাটা আমাকে বলুন। ইদরিস সাহেব স্বপ্নের কথা কি সব বলছিলেন —'

অমর বাবু ইতস্তত করে বললেন, বিজ্ঞানের সূত্র মিলছে না স্যার। হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন সূত্র মিলছে না?

'স্যার আইজাক নিউটনের সূত্র — মাধ্যাকর্ষণ সূত্র।'

'আপনার ধারণা সূত্রটা ভুল?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় বললেন, আচ্ছা আপনি বরং বাড়িতে চলে যান। আপনাকে দশ দিনের ছুটি দিয়ে

AMARBOI.COM

দিলাম। বিশ্রাম করুন। বিশ্রাম দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাঝে মাঝে মানুষের মাথা এলোমেলো হয়ে যায়।

'স্যার, আমার মাথা ঠিকই আছে।'

'অবশ্যই ঠিক আছে। কথার কথা বললাম। যান, বাসায় চলে যান . . . বাড়ির সবাই অস্থির হয়ে আছে।'

অমর বাবু বাড়ি গেলেন না। কমন রুমে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। হাতে একটা ফুল স্ক্যাপ কাগজ। সেই কাগজে নিউটনের সূত্র নতুনভাবে লিখলেন —

$$F = k.\frac{m1m2}{r^2}$$

এখানে k -এর মান ১ তবে মাঝে মাঝে k ' এর মান হচ্ছে শূন্য। যেমন তাঁর ক্ষেত্রে হচ্ছে। এক সময় কলম দিয়ে নির্মমভাবে সব কেটেও ফেললেন। নিউটন যে সূত্র দিয়ে গেছেন — তাঁর মত সামান্য মানুষ সেই সূত্র পাল্টাতে পারেন না।

অমর বাবু টিফিন পিরিয়ডে অনেক সময় নিয়ে ইংরেজীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির বাংলা অনুবাদ অনেকটা এই রকম—

জনাব,

আমি রূপেশ্বর হাইস্কুলের বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। সম্প্রতি আমার জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটিতেছে যাহার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি খুঁজিয়া না পাইয়া আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আমি শূন্যে ভাসিতে পারি। আপনার নিকট খুব অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা সত্য। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি — আপনাকে যাহা বলিলাম সবই সত্য। কোন রকম চেষ্টা ছাড়াই আমি শূন্যে উঠিতে পারি এবং ভাসমান অবস্থায় দীর্ঘ সময় কাটাইতে পারি। জনাব, বিষয়টি কি, বুঝিবার ব্যাপারে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে এই অধম আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আপনি বলিলেই ঢাকায় আসিয়া আমি আপনাকে শূন্যে ভাসার ব্যাপারটি চাক্ষুষ দেখাইব। জনাব, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন — বিষয়টি বুঝিতে আমাকে সাহায্য করুন।

বিনীত
অমর দাস পাল
B.Sc. (Hon's)

দশ দিনের পুরোটাই তিনি নিজের ঘরে কাটালেন — বাড়িতে গেলেন না। তাঁকে নিতে তাঁর ছোট মেয়ে অতসী এসেছিল। তাকে ধমকে বিদেয় করলেন। এই মেয়েটা পড়াশোনায় ভাল ছিল — তাকে এত করে বললেন সায়েন্স পড়তে, সে ভর্তি হল আর্টস-এ। কোন মানে

AMARBOI.COM

হয়? তাকে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র কি জিজ্ঞেস করলে সে হা করে তাকিয়ে থাকবে। কি দুঃখের কথা।

অতসীকে ধমকে ঘর থেকে বের করে দিলেও সে গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তিনি বাইরে এসে বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছিস কেন?

সে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, তোমার শরীর খারাপ বাবা। তুমি বাড়িতে চল।

'শরীর খারাপ তোকে কে বলল?'

'সবাই বলাবলি করছে। তুমি না-কি কি সব স্বপ্ন-টপ্ন দেখ।'

'কোন স্বপ্ন দেখি না। আমি ভাল আছি। নির্জনে একটা পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা শেষ হোক — তোদের সঙ্গে এসে কয়েকদিন থাকব।'

'কিসের পরীক্ষা?'

'কিসের পরীক্ষা বললে তো তুই বুঝবি না। হা করে তাকিয়ে থাকবি। এত করে বললাম সায়েন্স পড়তে।'

'অংক পারি না যে।'

'অংক না পারার কি আছে? যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ — অংক তো এর বাইরে না। কাঁদিস না। বাসায় যা। আমি ভাল আছি।'

তিনি যে ভাল আছেন তা কিন্তু না।

রোজ রাতে একই ব্যাপার ঘটছে। খেয়ে-দেয়ে ঘুমুতে যান — মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে দেখেন শূন্যে ভাসছেন। তখন আতংকে অস্থির হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। তিনি ইচ্ছে করলেই নিচে নামতে পারেন না।

নিচে কিভাবে নামেন তাও জানেন না। রাতটা তাঁর অঘুমেই কাটে। তিনি ঘুমুতে যান দিনে। এমন যদি হত তিনি দিনরাত সারাক্ষণই শূন্যে ভাসছেন তাহলেও একটা কথা ছিল। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে, কোন-এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় তাঁর ভর শূন্য হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সে রকম না। এমন কেউ এখানে নেই যে তিনি সাহায্যের জন্যে তাঁর কাছে যাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার চেয়ারম্যান সাহেবও কিছু লিখছেন না। হয়ত ভেবেছেন পাগলের চিঠি। কে আর কষ্ট করে পাগলের চিঠির জবাব দেয়?

ন' দিনের মাথায় অমর বাবু চিঠির জবাব পেলেন। অতি ভদ্র চিঠি। চেয়ারম্যান সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডে লিখেছেন —

> জনাব,
>
> আপনার চিঠি কৌতূহল নিয়ে পড়লাম। আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক। কাজেই বুঝতে পারছেন আপনি যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। আপনি যদি আমার অফিসে এসে শূন্যে ভাসতে থাকেন তাহলেও আমি বিশ্বাস করব না। ভাবব এর পেছনে ম্যাজিকের কোন কৌশল কাজ করছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যাদুকররা শূন্যে ভাসার খেলা সব সময়ই দেখায়।
>
> যাই হোক, আপনার চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে আপনার সমস্যাটি মানসিক। আপনি মনে মনে ভাবছেন — শূন্যে ভাসছেন। আসলে ভাসছেন না। সবচে' ভাল হয় যদি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা

AMARBOI.COM

করেন। একমাত্র তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। আমি আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছি না বলে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি।

বিনীত
এস.আলি
M.Sc.,Ph.D., F.R.S.

অমর বাবু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দিলেন না। কারণ তিনি জানেন বিষয়টা সত্যি। তিনি দু'একটা ছোটখাট পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। যেমন স্কুল থেকে লাল রঙের চক নিয়ে এসেছিলেন। শূন্যে উঠে যাবার পর সেই লাল রঙের চক দিয়ে ছাদে বড় বড় করে লিখলেন,

হে পরম পিতা ঈশ্বর, তুমি আমাকে দয়া কর।
তোমার অপার রহস্যের খানিকটা আমাকে দেখতে দাও।
আমি অন্ধ, তুমি আমাকে পথ দেখাও। জ্ঞানের আলো আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত কর। পথ দেখাও পরম পিতা।

আরো অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, চক ফুরিয়ে যাওয়ায় লেখা হল না। এই লেখাটা ছাদে আছে। তিনি তাকালেই দেখতে পান। এমন যদি হত লেখাটা তিনি একা দেখতে পাচ্ছেন তাহলেও বোঝা যেত সমস্যাটা মনে। কিন্তু তা তো না। অন্যরাও লেখা পড়তে পারছে। গতকাল বিকেলে হেড মাস্টার সাহেব তাঁকে দেখতে এসে হঠাৎ করেই বিস্মিত গলায় বললেন, ছাদে এই সব কি লেখা?

অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, প্রার্থনা সংগীত।

'প্রার্থনা সংগীত ছাদে লিখলেন কেন?'

'শুয়ে শুয়ে যাতে পড়তে পারি এই জন্যে।'

'লিখলেন কিভাবে? মই দিয়ে উঠেছিলেন না-কি?'

অমর বাবু জবাব দিলেন না। হেড মাস্টার সাহেব জবাবের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, আপনার ছুটি তো শেষ হয়ে গেল, আপনি কি ছুটি আরো বাড়াতে চান?

'জ্বি-না।'

'আপনি বরং আরো কিছুদিন ছুটি নিন। শরীরটা এখনো সেরেছে বলে মনে হয় না। আপনাকে খুব দুর্বল লাগছে।'

'আমার শরীর যা আছে তাই থাকবে স্যার। আর ভাল হবে না।'

'এইসব কি ধরনের কথা? কোন ডাক্তারকে কি দেখিয়েছেন?'

'জ্বি-না।'

'ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তার না দেখালে কিভাবে হবে? বিধু বাবুকে দেখান। বিধু বাবু এল.এম.এফ. হলেও ভাল ডাক্তার। যে কোন বড় ডাক্তারের কান কেটে নিতে পারে। বিধু বাবুকে দেখানোর কথা মনে থাকবে?'

'জ্বি স্যার, থাকবে।'

AMARBOI.COM

'না আপনার মনে থাকবে না। আমি বরং নিয়ে আসব। আমার ছোট মেয়েটার জ্বর। বিধু বাবুকে বাসায় আসতে বলেছি। এলে, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'জ্বি — আচ্ছা।'

'এখন তাহলে উঠি অমর বাবু?'

'একটু বসুন স্যার।'

হেড মাস্টার সাহেব উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন। তিনি খানিকটা বিস্মিত, কারণ অমর বাবু এক দৃষ্টিতে ছাদের লেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। অমর বাবু নিচু গলায় বললেন, আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি স্যার — যদি কিছু মনে না করেন।

'বলুন কি বলবেন। মনে করাকরির কি আছে?'

অমর বাবু প্রায় ফিসফিস করে বললেন, আমি শূন্যে ভাসতে পারি।

'বুঝতে পারলাম না কি বলছেন।'

'আমি আপনা-আপনি শূন্যে উঠে যেতে পারি।'

'ও আচ্ছা।'

হেড মাস্টার সাহেব "ও আচ্ছা" এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন শূন্যে ভেসে থাকবার ব্যাপারটা রোজই ঘটছে। তবে তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব চিন্তিত বোধ করছেন।

'ছাদের লেখাগুলি শূন্যে ভাসতে ভাসতে লেখা।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনার কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

হেড মাস্টার সাহেব জবাব দিলেন না। অমর বাবু বললেন, আমি স্যার এই জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। ছেলেবেলায় হয়তো বলেছি, জ্ঞান হবার পর থেকে বলিনি।

'আমি বিধু বাবুকে পাঠিয়ে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, উনাকে শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা বলার দরকার নেই। জানাজানি হবে — ইয়ে মানে — লোকজন হাসাহাসি করতে পারে।

'আমি আপনাকেই খোলাখুলি বলেছি। আর কাউকে বলিনি।'

'ভাল করেছেন। খুব ভাল করেছেন।'

বিধু বাবু এসে খানিকক্ষণ গল্পটল্প করে যাবার সময় ঘুমের অষুধ দিয়ে গেলেন। বললেন, দুঃস্বপ্ন না দেখার একটাই পথ। গভীর নিদ্রা। নিদ্রা পাতলা হলেই মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। আমি ফেনোবারবিটন ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। শোবার আগে দু'টা করে খাবেন।

অমরবাবু দুটো ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। তবে ঘুমুতে যাবার আগে এক কাণ্ড করলেন — কালিপদকে বললেন, লম্বা একগাছি দড়ি নিয়ে তাঁকে খুব ভাল করে চৌকির সঙ্গে বেঁধে রাখতে।

কালিপদ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল ।

AMARBOI.COM

অমর বাবু বিরক্ত মুখে বললেন, আমার মাথা খারাপ হয়নি, মাথা ঠিক আছে। তোমাকে যা করতে বলেছি কর। ব্যাপারটা কি পরে বুঝিয়ে বলব। লম্বা দেখে একগাছি দড়ি আন। শক্ত করে আমাকে চৌকির সঙ্গে বাধ।

কালিপদ তাই করল। তবে করল খুব অনিচ্ছার সঙ্গে।

অমর বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের ট্যাবলেটের কারণে তাঁর গাঢ় নিদ্রা হল। ঘুম ভাঙল বেলা উঠার পর। তিনি দেখলেন — এখনো চৌকির সঙ্গে বাঁধা আছেন তবে চৌকি আগের জায়গায় নেই, ঘরের মাঝামাঝি চলে এসেছে। তার একটিই মানে — চৌকি নিয়েই তিনি শূন্যে ভেসেছেন। নামার সময় চৌকি আগের জায়গায় নামেনি। স্থান পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি সেদিনই বিছানাপত্র নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। অতসী তাঁকে দেখে কেঁদে ফেলল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, নাকে কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?

অতসী কাঁদতে কাঁদতেই বলল, তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন বাবা? কি ভয়ংকর রোগা হয়ে গেছো।

'ভাল ঘুম হচ্ছে না, এই জন্যে শরীর খারাপ হয়েছে, এতে নাকে কাঁদার কি হল?'

'সবাই বলাবলি করছে তোমার না-কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কালিপদ নাকি রোজ রাতে দড়ি দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখে।'

'কি যন্ত্রণা! একবারই বাঁধতে বলেছিলাম — এর মধ্যে এই গল্প ছড়িয়ে গেছে?'

'তোমার কি হয়েছে বাবা বল?'

'কিছু হয়নি।'

অমর বাবু ছ'দিন বড়িতে থাকলেন। এই ছ'দিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করলেন। শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা তিনি একা একা থাকার সময়ই ঘটে। অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ঘুমুলে ঘটে না। যে ক'রাত তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ঘুমিয়েছেন সে ক'রাত তিনি শূন্যে ভাসেননি। দু'রাত ছিলেন একা একা, দু'রাতেই শূন্যে উঠে গেছেন।

পূজার ছুটির পর স্কুল নিয়মিত শুরু হল। তিনি স্কুলে গেলেন না। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করলেন। আবার বাড়ি ছেড়ে বাস করতে শুরু করলেন স্কুলের ঘরে। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকতে তাঁর ভাল লাগে না।

শূন্যে ভাসার ব্যাপারটা রোজ ঘটতে লাগল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘটতে লাগল। এখন বিছানায় শোয়ামাত্র শূন্যে উঠে যান। সারারাত সেখানেই কাটে। শেষ রাতের দিকে নিচে নেমে আসেন। ব্যাপারটা ঘটে শুধু রাতে, দিনে ঘটে না। কখনো না। এবং অন্য কোন ব্যক্তির সামনেও ঘটে না।

হেড স্যার এবং ইদরিস স্যার পর পর দু'রাত অমর বাবুর ঘরে জেগে বসে ছিলেন। দেখার জন্যে ব্যাপারটা কি। তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা এক করেননি। লাভ হয়নি, কিছুই দেখেননি। হেড স্যার বললেন, ব্যাপারটা পুরোপুরি মানসিক।

অমর বাবু দুঃখিত গলায় বললেন, আপনার কি ধারণা আমি পাগল হয়ে গেছি?

'না, তা না। পাগল হবেন কেন? তবু আমার ধারণা ব্যাপারটা আপনার মনে ঘটছে। একবার ঢাকায় চলুন না, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলি।'

'না'

AMARBOI.COM

'ক্ষতি তো কিছু নেই। চলুন না।'

'আমি যেতে চাচ্ছি না স্যার. কারণ আমি জানি ব্যাপারটা সত্যি। সত্যি না হলে ছাদে এই লেখাগুলি আমি কিভাবে লিখলাম? দেখছেন তো ঘরে কোন মই নেই।'

হেড স্যার চুপ করে রইলেন। অমর বাবু বললেন, আপনারা ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি আবার শূন্যে উঠে ছাদে একটা লেখা লিখব।

হেড স্যার বললেন, তার দরকার নেই কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি আমাদের সামনে ব্যাপারটা পারছেন না কেন?

'আমি জানি না। জানলে বলতাম। জানার চেষ্টা করছি, দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবছি।'

'এত ভাবাভাবির দরকার নেই, আপনি আমার সঙ্গে ঢাকা চলুন। দু'দিনের ব্যাপার। যাব, ডাক্তার দেখাব, চলে আসব। আমার একটা অনুরোধ রাখুন। প্লীজ। আপনার হয়ত লাভ হবে না কিন্তু ক্ষতি তো কিছু হবে না।'

অমর বাবু ঢাকায় গেলেন।

একজন অতি বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে নানান প্রশ্ন করলেন। পরপর কয়েকদিন তাঁর কাছে যেতে হল। শেষ দিনে বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক বললেন,

'আপনার যা হয়েছে তা একটা রোগ। এর উৎপত্তি হচ্ছে অবসেসনে। বিজ্ঞানের প্রতি আপনার তীব্র অনুরাগ। সেই অনুরাগ রূপান্তরিত হয়েছে অবসেসনে। কেউ যখন বিজ্ঞানকে অবহেলা করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে তখন আপনি তীব্র আঘাত পান। এই আঘাত আপনি পেয়েছেন আপনার অতি নিকটজনের কাছ থেকে। যেমন ধরুন আপনার কন্যা। সে বিজ্ঞান পড়েনি। আর্টস পড়ছে। এই তীব্র আঘাত আপনার মন গ্রহণ করতে পারেনি। আপনার অবচেতন মন ভাবতে শুরু করেছে — বিজ্ঞানের সূত্র অভ্রান্ত নয়। ভুল সূত্রও আছে। মাধ্যাকর্ষণ সূত্রও ভুল। এক সময় অবচেতন মনের ধারণা সঞ্চারিত হয়েছে চেতন মনে। বুঝতে পারছেন?'

AMARBOI.COM

'জ্বি না, বুঝতে পারছি না।'

'মোদ্দা কথা হল, আপনার রোগটা মনে।'

'না — আমি নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষক। আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করেছি। আমি যে শূন্যে উঠতে পারি এটা ভুল না। পরীক্ষিত সত্য।'

'মোটেও পরীক্ষিত সত্য নয়। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি দেখেনি যে আপনি শূন্যে ভাসছেন। দেখলেও কথা ছিল, কেউ কি দেখেছে?'

'জ্বি-না।'

'আমি ট্রাংকুলাইজার জাতীয় কিছু অষুধ দিচ্ছি। নিয়মিত খাবেন, ব্যায়াম করবেন। মন প্রফুল্ল রাখবেন। বিজ্ঞান নিয়ে কোন পড়াশোনা করবেন না।'

অমর বাবু দুঃখিত গলায় বললেন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি কিন্তু আমি যা বলছি সত্য বলছি —।'

'ব্যাপারটা হয়ত আপনার কাছে সত্যি। কিন্তু সবার কাছে নয়। আপনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলেও এই সিদ্ধান্তে আসবেন।'

অমর বাবু ভগ্নহৃদয়ে রূপেশ্বরে ফিরে এলেন। স্কুলে যোগ দিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই মাথা খারাপের সব লক্ষণ তাঁর মধ্যে একে একে দেখা দিতে লাগল। বিড়বিড় করে কথা বলেন, একা একা হাঁটেন। হাঁটার সময় দৃষ্টি থাকে আকাশের দিকে। নিতান্ত অপরিচিত কাউকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যান, শান্ত গলায় বলেন, কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নিউটনের গতিসূত্র জানেন?

পাগলের অনেক রকম চিকিৎসা করানো হল। কোন লাভ হল না। বরং লক্ষণগুলি আরো প্রকট হওয়া শুরু করল। গভীর রাতে ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে উঁচু গলায় ডাকেন — জব্বার, ও জব্বার, উঠে আয় তো বাবা। খুব দরকার।

জব্বার উঠে এলে তিনি করুণ গলায় বলেন, নিউটনের সূত্র মনে আছে? ভাল করে পড়। এস.এস.সি তে আসবে। সাথে অংক থাকবে — "ভূমি থেকে দশ ফুট উচ্চতায় ১ গ্রাম ভর বিশিষ্ট একটি আপেল ছাড়িয়া দিলে তার গতিবেগ পাঁচ ফুট উচ্চতায় কত হইবে? অংকটা চট করে কর। মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ কত মনে আছে তো?"

আমাদের সমাজ পাগলদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর আচরণ করে। অমর বাবুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। বছর খানিক না ঘুরতেই দেখা গেল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে বলছে — "নিউটনের সূত্রটা কি যেন?" অমর বাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এদের তাড়া করছেন। তারা মজা পেয়ে খুব হাসছে। কারণ তারা জানে পাগলরা শিশুদের তাড়া করে ঠিকই — কখনো আক্রমণ করে না।

পৌষের শুরু। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। এই শীতেও খালি গায়ে শুধুমাত্র একটা ধুতি কোমরে পেঁচিয়ে অমর বাবু রাস্তায় রাস্তায় হাঁটেন। নিউটনের সূত্র মনে আছে কি-না এই প্রশ্ন তিনি এখন আর কোন মানুষকে করেন না। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গদের করেন। তারা প্রশ্নের উত্তর সঙ্গত কারণেই দেয় না। তিনি তখন ক্ষেপে যান।

AMARBOI.COM

রাত দশটার মত বাজে। কনকনে শীত।

অমর বাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা কাঁঠাল গাছের নিচে। কাঁঠাল গাছের ডালে কয়েকটা বাদুর ঝুলছে। তিনি বাদুরগুলিকে নিউটনের সূত্র সম্পর্ক বলছেন। তখনই দেখা গেল — হারিকেন হাতে হেড স্যার আসছেন। কাঁঠাল গাছের কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অমর বাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখিত গলায় বললেন, কে অমর?

'জ্বি স্যার।'

'কি করছেন?'

'বাদুরগুলির সঙ্গে কথা বলছিলাম স্যার।'

'ও আচ্ছা।'

'এদের সঙ্গে কথা বললে মনটা হালকা হয়। ওদের নিউটনের সূত্রগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'এই শীতে বাইরে ঘুরছেন। বাসায় গিয়ে ঘুমান।'

'ঘুম আসে না স্যার।'

হেড মাস্টার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, ইয়ে অমর বাবু, এখনো কি আপনি শূন্যে ভাসেন?

'জ্বি–না। ঢাকা থেকে আসার পর আর ভাসিনি। যদি আবার কখনো ভাসতে পারি — আপনাকে বলব। আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। ভাসতে ভাসতে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।'

'দূরে কোথায়?'

'মহাশূন্যে — অসীম দূরত্বে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব ছাড়িয়ে . . . '

'ও আচ্ছা।'

'যাবার আগে আমি আপনাকে খবর দিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

শীত কেটে গিয়ে বর্ষা এসে গেল। অমর বাবু লোকালয় প্রায় ত্যাগ করলেন। বেশির ভাগ সময় বনে–জঙ্গলে থাকেন। রূপেশ্বরের পাশের গ্রাম হলদিয়ায় ঘন বন আছে। এখন ঐ বনেই তাঁর আস্তানা। তাঁর মেয়ে অতসী প্রায়ই তাঁকে খুঁজতে আসে। পায় না। মেয়েটা বনে বনে ঘুরে এবং কাঁদে। তিনি চার–পাচদিন পর পর একবার বের হয়ে আসেন। তাঁকে দেখে আগের অমর বাবু বলে চেনার কোন উপায় নেই। যেন মানুষ না — প্রেত বিশেষ। মাথাভর্তি বিরাট চুল, বড় বড় দাড়ি। হাতের নখগুলি বড় হতে হতে পাখির ঠোটের মত বেঁকে গেছে। স্বভাব–চরিত্র হয়েছে ভয়ংকর। মানুষ দেখলে কামড়াতে আসেন। ইট–পাথর ছুঁড়েন। একবার স্থানীয় পোস্ট মাস্টারকে গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলতে বসেছিলেন। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। অতসীর বিয়ে হয়ে গেছে, সেও এখন আর বাবার খোঁজে আসে না।

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। কার্তিক মাস। অল্প অল্প শীত পড়ছে। এগারোটার মত বাজে। হেড স্যার খাওয়া–দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন, হঠাৎ শুনলেন উঠান থেকে অমর বাবু ডাকছেন — স্যার, স্যার — স্যার জেগে আছেন?

'কে?'

'স্যার আমি অমর। একটু বাইরে আসবেন?'

হেড স্যার অবাক হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, খবর্দার, তুমি বেরুতে পারবে না। পাগল মানুষ — কি না কি করে বসে। ঘুমাও।

অমর বাবু আবার কাতর গলায় বললেন, একটু বাইরে আসুন স্যার — খুব দরকার। খুব বেশি দরকার।

হেড স্যার ভয়ে ভয়ে বাইরে এলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর বাড়ির সামনের আমগাছের সমান উচ্চতায় অমর বাবু ভাসছেন। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় দৃশ্য। একটা মানুষ অবলীলায় শূন্যে ভাসছে। তার জন্যে পাখিদের মত তাঁকে ডানা ঝাপ্টাতে হচ্ছে না।

'স্যার দেখুন আমি ভাসছি।'

হেড স্যার জবাব দিতে পারছেন না। প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হচ্ছিল চোখের ভুল। এখন তা মনে হচ্ছে না। ফকফকা চাঁদের আলো। দিনের আলোর মত সব দেখা যাচ্ছে। তিনি

AMARBOI.COM

পরিষ্কার দেখছেন — অমর বাবু শূন্যে ভাসছেন। এই তো ভাসতে ভাসতে খানিকটা এগিয়ে এলেন। সাঁতার কাটার মত অবস্থায় মানুষটা শুয়ে আছে। কি আশ্চর্য!

'স্যাব দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আজ হঠাৎ করে শূন্যে উঠে গেলাম। বন থেকে বের হয়ে রূপেশ্বরের দিকে আসছি হঠাৎ শরীরটা হালকা হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দশ–বারো ফুট উঠে গেলাম। প্রথমেই ভাবলাম আপনাকে দেখিয়ে আসি। ভাসতে ভাসতে আসলাম।'

'আর কেউ দেখেনি?'

' না। কয়েকটা কুকুর দেখেছে। ওরা ভয় পেয়ে খুব চিৎকার করছিল। এরকম দেখে তো অভ্যাস নেই। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে স্যার?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'আমি ঠিক করেছি — ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাব।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল সারাক্ষণ ব্যথা করত। এখন ব্যথাও নেই। আগে কাউকে চিনতে পারতাম না। এখন পারছি।'

'শুনে ভাল লাগছে অমর বাবু।'

'অন্য একটা কারণেও মনে খুব শান্তি পাচ্ছি। কারণটা বলি — মহাশূন্যে ভাসার রহস্যটাও ধরতে পেরেছি।'

হেড মাস্টার সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, রহস্যটা কি?

'রহস্যটা খুব সাধারণ। এতদিন কেন ধরতে পারিনি কে জানে। তবে স্যার আপনাকে রহস্যটা বলব না। বললে আপনি শিখে যাবেন। তখন দেখা যাবে সবাই শূন্যে ভাসছে। এটা ঠিক না। প্রকৃতি তা চায় না। স্যার যাই?'

অমর বাবু উপরে উঠতে লাগলেন। অনেক অনেক উঁচুতে। এক সময় তাঁকে কালো বিন্দুর মত দেখাতে লাগল।

হেড স্যারের স্ত্রী হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে ভীত গলায় বললেন, কি ব্যাপার? পাগলটা কোথায়?

'চলে গেছে।'

'তুমি বাইরে কেন? ভেতরে এসে ঘুমাও।'

তিনি ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

অমর বাবুকে এর পর আর কেউ এই অঞ্চলে দেখেনি। হেড স্যার সেই রাত্রির কথা কাউকেই বলেননি। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই পাগল ভাববে। আর একবার পাগল ভাবতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত পাগল হতেই হয় — এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

AMARBOI.COM

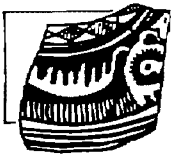

মন্ত্রীর হেলিকপ্টার

মন্ত্রী হবার পর তিনি (আব্দুল কাদের জোয়ারদার) এই প্রথমবার গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বেড়াতে যাওয়া নয় — সরকারী সফর। গ্রামের উন্নয়ন দেখবেন, স্কুলের মাঠে একটা বক্তৃতা দেবেন, মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অনেক প্রোগ্রাম।

নিজ গ্রামে যাবার ব্যাপারটিতে বড় রকমের জাঁকজমক করার তাঁর খুব ইচ্ছা। কিন্তু এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে কি–না বোঝা যাচ্ছে না। হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী (সোলায়মান) এখনো চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু জোয়ারদার সাহেব খুব–একটা ভরসা করতে পারছেন না। সোলায়মান ছেলেটি ভ্যাবদা ধরনের। আগের সিএসপি–দের সেই ধারালো ভাবের কিছুই তার মধ্যে নেই। আজেবাজে সব ছেলেপুলে এখন সিভিল সার্ভিসে চলে আসছে। চেহারা দেখলে মনে হয় প্রাইভেট টিউশ্যানি করে জীবন চালায়।

একটা হেলিকপ্টারের খুবই দরকার। প্রথমবার যাচ্ছেন। সেই যাওয়াটার মধ্যে কিছু নাটকীয়তা থাকবে না? বিকট শব্দ হবে হেলিকপ্টারের — অঞ্চল ভেঙে লোকজন আসবে, তবেই না ব্যাপারটা জমবে।

তিনি গম্ভীর ভঙ্গিতে হেলিকপ্টার থেকে নামবেন। পুলিশের একটা দল তাঁকে গার্ড অব অনার দেবে। এইসব জিনিস গণ্ডগ্রামের লোকজন আগে দেখেনি। মুগ্ধ হয়ে দেখবে। পুলিশ ক'জন আসবে কে জানে? সোনাদিয়ায় পুলিশ স্টেশন নেই। তবু জনাদশেক নিশ্চয়ই থাকবে। আজকালকার পুলিশগুলিও ল্যাদল্যাদা। বিনা ইস্ত্রীর পোশাকেই নিশ্চয়ই চলে আসবে। অথচ গার্ড অব অনারের অনুষ্ঠানটিতে দরকার কিছু স্মার্ট পুলিশ। দেশ থেকে স্মার্টনেস উঠেই গিয়েছে।

জোয়ারদার সাহেব বিরক্ত মুখে বেল টিপে পি.এস.কে আসতে বললেন। পি.এস.কে দেখে তাঁর বিরক্তি আরো বেড়ে গেল। সে আজ এসেছে পায়জামা–পাঞ্জাবী পরে। এটা কি কবি সম্মেলন?

স্যার ডেকেছেন?

আজ দেখি নতুন জামাইয়ের ড্রেস পরে চলে এসেছেন।

পি.এস. দাঁত বের করে হাসল। যেন খুব মজার কথা কিছু শুনল।

সোলায়মান সাহেব!

জ্বি স্যার!

পায়জামা–পাঞ্জাবী ড্রেসটা অফিসের কাজের জন্যে ঠিক সুইটেবল নয়। বিদেশে পায়জামা–পাঞ্জাবী লোকজন পরে ঘুমুতে যাবার সময়। তারা এটাকে বলে স্লিপিং স্যুট।

এটা তো বিদেশ না।

AMARBOI.COM

জোয়ারদার সাহেব বহু কষ্টে নিজেকে সামলালেন। এই ছোকরার মুখে মুখে কথা বলার একটা বদঅভ্যাস আছে। আগেও লক্ষ্য করেছেন। ম্যানার্স এক বস্তু এ জানেই না। যেন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে না — কথা বলছে ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে। হোয়াট ইজ দিস?

সোলায়মান সাহেব!

জ্বি স্যার।

যাবার ব্যবস্থা কি করেছেন?

সব ফাইন্যাল করা হয়েছে স্যার।

কি ফাইন্যাল করলেন দয়া করে বলুন, আমি শুনি। অবশ্যি আপনার যদি তকলিফ না হয়।

কথাগুলি আঘাত করার জন্যেই বলা। কিন্তু পি.এস. সেটা ধরতে পারল না। হাসিমুখে বলতে লাগল —

এখান থেকে ময়মনসিংহ যাব ট্রেনে করে। সেলুনের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে যাব গাড়িতে করে। গাড়ির ব্যবস্থা ময়মনসিংহের ডি. সি. করবেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই কথা হয়েছে।

হেলিকপ্টারের কি হল?

ব্যবস্থা করা যায়নি। আর্মি হেলিকপ্টার সবই এনগেজড।

এনগেজড মানে? দেশে কি এখন যুদ্ধ চলছে নাকি?

পি.এস.. চুপ করে রইল। জোয়ারদার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, আপনি একজন ইনএফিসিয়েন্ট অফিসার — এটা বোধহয় আপনি নিজেও জানেন না।

গাড়িতে যেতে খুব কষ্ট হবে না স্যার। রাস্তা ভালো।

রাস্তা ভালো হলে গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলুন। পুরোপুরি দেশীয় একটা ব্যাপার হবে। মন্ত্রী গোরুর গাড়িতে করে এসেছেন। নিউজ হবে।

পি.এস চুপ করে রইল। তাকে দেখে মনে হলো না সে খুব চিন্তিত। সামান্য একটা কাজ করতে পারেনি অথচ তার জন্যে কোনো অনুশোচনা পর্যন্ত নেই।

আপনি প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিন। হেলিকপ্টার পাওয়া গেলে যাবো নয়, তো যাবো না। ট্রেনে-মোটরে গেলে সমস্তটা দিন নষ্ট হবে। নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। বুঝতে পারছেন?

জ্বি স্যার।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান।

জোয়ারদার সাহেব বিমর্ষ মুখে সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ টানলেন। একটা ফাইলে চোখ বুলাতে চেষ্টা করলেন। কিছুতেই মন বসল না।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন ক্ষিধে হয়নি। মন্ত্রী হবার পর তাঁর এই রোগ হয়েছে — ক্ষিধে হয় না। যা খান তাই বদহজম হয়ে যায়। দু'দিন আগে একটা চপ খেয়েছিলেন। এখনো ঢেকুরের সঙ্গে সেই চপের গন্ধ আসছে। কুৎসিত ব্যাপার ;- অথচ তিনি যে পরিশ্রম করেন না তাও না। সারাদিন বলতে গেলে ছোটাছুটির মধ্যেই কাটে।

স্যার আসবো?

AMARBOI.COM

জোয়ারদার সাহেব চোখ ছোট করে তাকালেন। পি.এস. ব্যাটা উঁকি দিচ্ছে। একে দেখলেই এখন কেমন গা জ্বালা করছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তবু তিনি সহজ-ভাবেই বললেন, কি ব্যাপার?

হেলিকপ্টার জোগাড় হয়েছে স্যার। সিভিল এভিয়েশনের।

ভেরী গুড।

প্রোগ্রাম তাহলে স্যাব ঠিক বইলো। বিকাল চারটায় রওনা হবো। ফিরবো ছ'টায়।

ঠিক আছে।

আব কোনো ম্যাসেজ কি স্যার দিতে চান?

দাঁড়ান, চিন্তা করে দেখি। আপনার খাবার খাওয়া হয়েছে?

জ্বি-না, এখন গিয়ে খাবো।

আমার সঙ্গে বসে পড়ুন। খাবার যথেষ্টই আছে। খেতে খেতে ডিসকাস করা যাবে। না-কি কোনো অসুবিধা আছে?

জ্বি-না স্যার, অসুবিধা আবার কি?

পি.এস. ছেলেটিকে এখন আব সে রকম খাবাপ লাগছে না। লম্বা এবং ফর্সা চেহারার কারণেই হয়তো পায়জামা-পাঞ্জাবীতে সুন্দর মানিয়েছে। তার মেয়েগুলিব জন্যে এ রকম ছেলে পাওয়া গেলে ভালো হতো। কিন্তু মন্ত্রী হবার আগেই সবক'টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এলেবেলে ধরনেব বিয়ে। কাউকে বলার মতো কিছু না। ইশ্, আর ক'টা দিন যদি অপেক্ষা করা যেতো।

AMARBOI.COM

সোলায়মান সাহেব!

জ্বি স্যার।

আপনি হয়তো ভাবছেন আমি হেলিকপ্টার দিয়ে গ্রামের লোকদের ভড়কে দিতে চাই। একটা কায়দা করতে চাই।

আমি এ রকম কিছুই ভাবছি না স্যার।

ভাবলেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ আসলেই আমি একটু কায়দা করতে চাচ্ছি। গ্রামের লোকজন এসব জিনিস খুব পছন্দ করে। এই হেলিকপ্টারের গল্পই তারা একমাস ধরে করবে। করবে না?

অবশ্যই করবে।

ভড়ংয়ের দরকার আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভড়ং করেছেন আর আমরা তো . . .

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভড়ং করেছেন নাকি?

নিশ্চয়ই করেছেন। আলখাল্লা গায়ে দিয়ে বেড়াতেন না? আলখাল্লাটাই তাঁর ভড়ং। বুঝতে পারছেন?

পারছি স্যার।

আমি আরেকটা কাজ করতে চাই। ফেরার পথে একজন রুগীকে ঢাকায় নিয়ে আসতে চাই চিকিৎসার জন্য।

কেন স্যার?

এতে ডাবল পারপাস সার্ভ হবে। নাম্বার ওয়ান — গ্রামের মানুষদের প্রতি আমার মমতা প্রকাশ পাবে। নাম্বার টু — একজন দরিদ্র ব্যক্তি হেলিকপ্টারে ঘুরবে। এই গল্প সে বাকি জীবন সবার সঙ্গে করবে।

তাতে স্যার, আপনার কি লাভ?

সব সময় লাভ-লোকসানটাকে বড় করে দেখেন কেন? হৃদয়টাকে প্রসারিত করুন। তার দরকার আছে।

জ্বি স্যার আছে।

আপনি 'ওয়ারল্যাসে' রুগী খুঁজে রাখতে বলে দিন।

কি ধরনের রুগীর কথা বলব স্যার?

তার মানে?

যে কোনো রুগী হলেই তো হবে না। বেশ জমকালো ধরনের রুগী দরকার। আপনি নিশ্চয়ই একজন আমাশার রুগী ঢাকায় আনতে চান না।

আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

জ্বি না স্যার।

করবেন না। রসিকতা জিনিসটা আমার পছন্দ নয়। এখন যান, ব্যবস্থা করুন।

লাঞ্চের জন্যে ধন্যবাদ স্যার।

AMARBOI.COM

ব্যবস্থা ভাল হল।

জোয়ারদার সাহেব যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে ভাল। লোকে লোকারণ্য। সবাই নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার দেখতে আসেনি। কেউ কেউ বক্তৃতা শুনতেও এসেছে। তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। ঘনঘন তালি পড়ল। পায়ে হেঁটে পরিচিত-অপরিচিত অনেক বাড়িতে গেলেন। স্কুলের স্যারদের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। এই দুর্লভ সম্মানে স্যার অভিভূত হলেন। একজন কেঁদে ফেললেন। গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর কিছু লোক ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে এসেছিলেন। তারা সারাক্ষণই বাজাতে লাগল — হলুদ বাটা, মেন্দি বাটা, বাটা ফুলের মউ। তারা এই একটি সুরই জানে।

জোয়ারদার সাহেব বড়ই খুশী হলেন। ফিরতি পথে হেলিকপ্টারে ওঠার সময় দেখলেন একজন রুগীকেও তোলা হয়েছে। রুগীর মা সঙ্গে থাকার জন্যে কান্নাকাটি শুরু করেছিল। কিন্তু জায়গার টানাটানি। জোয়ারদার সাহেব ধরা গলা বললেন — কোনো চিন্তা করবেন না, মা। দায়িত্ব আমার। মনে করুন আমিও আপনার এক ছেলে।

এই বলে তিনি আশেপাশে তাকালেন। তাঁর ধারণা ছিল একটা হাততালি পাবেন। তা পেলেন না। সম্ভবত হাততালি দিতে দিতে লোকজন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

হেলিকপ্টার ছেড়ে দিল। মিনিট দশেক যাবার পর পি.এস. মুখ কালো করে বলল, একটা ঝামেলা হয়ে গেছে স্যার। জোয়ারদার সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন — কি ঝামেলা?

রুগী তো স্যার খাবি খাচ্ছে।

খাবি খাচ্ছে মানে?

বড় বড় করে শ্বাস টানছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঢাকা পৌঁছবার আগেই কিছু-একটা হয়ে যাবে। ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে স্যার ।

ঘাটের মরা তুলে দিয়েছে তো আপনারা ছিলেন কোথায়? দেখতে পারলেন না?

পি.এস. চুপ করে গেলেন ।

ঢাকায় এই ডেডবডি নিয়ে আমি করবোটা কি? ঝামেলাটা বুঝতে পারছেন? না, পারছেন না?

পারছি স্যার।

বিরাট একটা কেলেংকারি হয়ে যাবে ।

কেলেংকারির কি আছে স্যার? আপনি চেষ্টা করেছিলেন সেটাই বড় কথা ।

এই ডেডবডির ঝামেলার কথা ভাবেন। এটা আবার গ্রামে ফেরত পাঠাতে হবে না?

রুগী ঘড়ঘড় শব্দ করছে। হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ ছাপিয়েও সেই শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ করে সেই শব্দ থেমে গেল। জোয়ারদার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, মরে গেল নাকি?

জ্বি-না। এখনো শ্বাস টানছে, তবে প্রায় হয়ে এল।

জোয়ারদার সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, হা করে বসে আছেন কেন? কি করবেন বলুন।

আমরা বরং আবার গ্রামেই ফিরে যাই। ঝামেলা নামিয়ে দিয়ে আসি। বললেই হবে অবস্থা খুব খারাপ দেখে মা-বাবার কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। মৃত্যু মায়ের কোলে হওয়া ভাল ।

যা ভালো বুঝেন করেন। আপনাদের ওপর নির্ভর করাটাই বোকামি।

হেলিকপ্টার আবার নামল স্কুলের মাঠে। রুগী মারা গেল তারো কিছুক্ষণ পর। নামাজে জানাজার শেষে মন্ত্রী সাহেব অসাধারণ একটি বক্তৃতা দিলেন। অনেকেই কেঁদে ফেলল।

ফেরার পথে তিনি পি.এস.কে বললেন, "প্রোগ্রামটা শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছে, কি বলেন? সব ভালো যার শেষ ভালো।"

ভয়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কিভাবে পরিচয় হল আগে বলে নেই।

কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়া গাঁ ধরনের এক শহরে গিয়েছি (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে)। এই অঞ্চলে আমি আগে কখনো আসিনি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছ-গাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল

AMARBOI.COM

কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই। পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খা-খা করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতির-যত্ন ছিল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হত। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হল কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন। ছাত্ররা তো আর আগের মত নেই। মদটদ খায়। একবার একটা বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোর রুম ছিল। একটামাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মত ছোট। ঘর ভর্তি মাকড়সার ঝুল। দু'টি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করবার জন্যে। সে কি করল কে জানে। ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দু'টির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রঙ কালো। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল — রাত দশটার পর কারেন্ট আসে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কি?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেসট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এঁর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মুখ ভর্তি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মত চাপ দাড়ি। মাথায় টুপী। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটেখাট একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মত হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

স্যার কেমন আছেন?

ভালই আছি।

আপনার খুব তকলিফ হল স্যার।

না, তকলিফ আর কি?

আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু ওঁর এক ছেলের মাথার দোষ হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।

আমি বললাম, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।

AMARBOI.COM

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, এখানে ডিসস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলা আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিন্যুর সিও তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।

বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বই-পত্র নিয়ে এসেছি। সময় কাটানো কোন সমস্যা না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, — রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দ-টব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রপ!

তাই নাকি?

জ্বি স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা। প্রায় দু'শ গজ দূরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয়।

তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোন ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।

না এলেই ভাল।

যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।

বসুন বসুন। যে ভাবে আপনার আরাম হয় সে ভাবেই বসুন।

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও সত্যি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে — হঠাৎ তাঁর মনে হল নাভীর উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ্য করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর নাভীর উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আসল সাপ, শঙ্খচূড়।

এক সময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, সাপের গল্প আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোন গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা। — চৈত্র মাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমরা গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, সাপ যে জায়গায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কি অদ্ভুত কথা। আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন?

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, জ্বি না স্যার।

লোকটি নির্বোধ। নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরী হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে এক সময় বলেই ফেললাম, সারাদিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতি-টাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কি বলছেন স্যার? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন? ভাত তো এখনো আসেনি। দেরি হবে। আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশত রান্না হচ্ছে।

AMARBOI.COM

তাই নাকি?

জ্বি। আপনি গরু খান তো?

জ্বি খাই।

এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার। তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।

ও আচ্ছা।

পঁচিশ টাকা করে ভাগ।

তাই বুঝি?

প্রিন্সিপ্যাল স্যারের স্ত্রীর রান্না খুব ভাল।

তাই নাকি?

জ্বি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে ছেলেটা পাগল তার বৌ।

ও আচ্ছা।

বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বটি নিয়ে তার মা'কে কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এই জন্যেই রান্নার দেরি হচ্ছে।

কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হত। ওদের দুঃসময়ে . . .

কি যে বলেন স্যার। আপনি আমাদের মেহমান না? তাছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়াব মত হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। হঠাৎ সাব-ডিভিশন হয়ে গেল। ভাল একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল। দু'টি প্লেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, প্রিন্সিপ্যাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা একা খাবেন, তা কি হয়?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেক কিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারী হয়ত চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেঁধেছে। আজ রাতে সে হয়ত কিছু খাবেও না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব।

জ্বি স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলেব বৌকে বলবেন, আমি এত ভাল রান্না খুব কমখেয়েছি। দ্রৌপদী এরচে' ভাল রাঁধতো বলে আমার মনে হয় না।

জ্বি স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের স্ত্রীর রান্নাব কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ লোক বলে মনে হল। তিনি একটা টর্চ লাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা পাঠিয়েছেন। পান-সুপারি-জর্দাও আছে একটা কৌটায়।

খাওয়া-দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে লোকটি

AMARBOI.COM

ক্রমাগতই সাপের কথা বলেছে তার দেখলাম তেমন ভয়-টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হাল্কা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে স্যুটকেস খুললাম। বই বের করব। ঠিক তখনই একটা কাণ্ড হল। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনই কারণ ঘটেনি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ও-পাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুণি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ংকর কিছু করবে। নিজের অজ্ঞান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম — কে কে? আর তখনি শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈ-থৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনো গা ঘামে ভেজা। হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হাল্কা বাতাস দিচ্ছে। বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙ্গী পরা খালি গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, আদাব স্যার।

আদাব। তুমি কে?

আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।

তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?

জ্বি স্যার। লাইব্রেরী ঘরের সামনে বসে ছিলাম।

কাউকে যেতে দেখেছ?

আজ্ঞে না। কেন স্যার? কি হইছে?

না, এম্নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। স্টিফান কিংয়ের লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়-ভয় লাগে, আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? রহস্যটা কি?

আমি খুব-একটা সাহসী মানুষ এরকম দাবী করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মত মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে রাতে আমার ভাল ঘুম হল না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবোরেটরীর অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র 'ব্যালেন্স', তাও ঠিকমত কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় ক্যামিকেলস ও নেই। সে নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দু'জন টিচার। ওরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের

AMARBOI.COM

অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাস-ট্লাসও তেমন হয়নি। একটু দেখেশুনে নিবেন স্যার। পাস মার্কটা দিয়ে দিবেন।

আমি হেসে বললাম, কি করে দেব বলুন। দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি।

কি করে করবে বলেন, স্ট্রাইক-ফেস্ট্রাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কিভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একুশজন ছাত্র-ছাত্রীর কেউ তাকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট এ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাবমত কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ্য রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সব সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, ক্যামিকেলস নেই, স্যারদের কোন আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কি?

দুপুরবেলা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হল বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, দেন সব কটিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।

কোন প্রিন্সিপ্যালকে এরকম কথা বলতে শুনিনি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, রাতে অসুবিধা হয়নি তো?

জ্বি না, হয়নি।

সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোন কিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।

না করব না।

সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবেন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।

তাই নাকি?

আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বোধহয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি এমন অবস্থা ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা হা।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হল রাত ন'টায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয়নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালই দিয়েছেন।

AMARBOI.COM

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়া-দাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আজ আর সাপের গল্প শুরু হল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাত-বিরাতে বেরুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।

খুব খেয়াল রাখব।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মত হল। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুণি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখনই ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক।

জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। দরজা খুলে বাইরে এলাম। চারদিকে ফকফকা জ্যোৎস্না। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম — কালিপদ, কালিপদ। কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় সে ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলো-আঁধারী। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝিঁঝি ডাকছে। কিন্তু সেই ঝিঁঝির ডাকও ম্যাজিকের মত হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। শুনতে ভাল লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসন-কোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

এই কালিপদ।

আদাব স্যার।

একটু শুনে যাও তো।

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

রাতদুপুরে বাসন ধুতে যাচ্ছ নাকি?

হ স্যার।

আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন?

আজ্ঞে চিনি।

কত দূর?

দুই মাইলের উপরে হইব।

কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারব স্যার, বলেন।

তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে?

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন?

হ্যাঁ এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আস, তারপর যাব।

AMARBOI.COM

আমি উনারে ডাইক্যা নিয়া আসি?

না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোন অসুবিধা আছে?

আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ ভয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আধিভৌতিক কোন ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডাল ভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর? সে তার উত্তরে ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ না-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রাম-ট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার উপর লক্ষ্য করলাম লোকটা একটু ভীতু টাইপের। কোন শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি, কি হল কালিপদ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সব সময় ভীতু ধরনের হয়।

এক সময় আমরা ছোটখাট একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে। এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মত। পায়ের পাতাও হয়ত ভিজবে না।

কালিপদ নদীর নাম কি?

বিরুই নদী।

বিরুই চালের কথা শুনেছি। এই নামে যে নদীও আছে কে জানত।

নদী পার হতে হবে?

আজ্ঞে না।

এসে পড়েছি নাকি?

হ।

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি বলব কিছুই ঠিক করিনি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোন লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক-করে-রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এ রকম হয়েছে। যৌবনে জরী নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশ ভাল পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কি সব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হল না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেল। জরী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ-ভালবাসার একটি কথাও দু'জনের কেউ বললাম না।

স্যার এই বাড়ি।

AMARBOI.COM

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড় পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠান। উঠোনে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধ হয়। ভেতব থেকে সিরাজউদ্দিন চেঁচাল, কে কে? কালিপদ বলল, দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ। দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হল। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বের হয়ে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার আপনি?

দেখতে এলাম আপনাকে।

কেন?

কোন কারণ নেই। ঘুম আসছিল না। ভাবলাম, দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়। আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

জ্বি।

খুব লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।

আসেন, ভিতরে এসে বসেন।

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনো কাটেনি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোন ঝামেলা হয়েছে স্যার?

না না, ঝামেলা কি হবে? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি।

স্যার একটু চা করি?

অসুবিধা না হলে করুন।

না, না। কোন অসুবিধা নাই। কোন অসুবিধা নাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছোটাছুটি শুরু করলেন। উঠোনে চুলা জ্বালানো হল। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়ত চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে।

সিরাজউদ্দিন সাহেব।

জ্বি স্যার।

লোকজন দেখছি না যে। আপনি একাই থাকেন নাকি?

বিয়ে-শাদী তো করি নাই।

করেননি কেন?

ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।

এখন তো বোধ হয় অবস্থা সে রকম না।

জ্বি, এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।

তাই নাকি?

অতি অল্প। ধানী জমি।

একা একা থাকেন, ভয় লাগে না?

ভয় লাগবে কেন?

AMARBOI.COM

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কিভাবে সেটা করা যায়? আমি ইতস্তত করে বললাম, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

জ্বি না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্টি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কি কি নাকি দেখে। আমি কোনদিন দেখি নাই। রাত-বিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি।

চা তৈরী হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুর রসের চা। চমৎকার পায়েস পায়েস গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, তবে জ্বীন বলে একটা জিনিস আছে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন?

করব না কেন? কোরান শরীফে পরিষ্কার লেখা — জ্বীন এবং ইনসান। হাশরের দিনে মানুষের যেমন বিচার হবে জ্বীনেরও হবে।

আপনি জ্বীন দেখেছেন কখনো?

জ্বি না। সাধারণ লোকে দেখে না।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোন রকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনাও মুশকিল। তবু একবার বললাম, আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভাল। তাহলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চ লাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।

বিদায় নিতে নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরুই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই রকম হল। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ংকর অশুভ একটা-কিছু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ্য করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, "কি হইল স্যার? কি হইল?"

কিছু হয়নি। মাথাটা কেমন যেন করল।

মাথা ধুইবেন স্যার? নদীর পানি দিয়া . . . ।

মাথা ধুতে হবে না। চল রওনা দেই।

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

AMARBOI.COM

কালিপদ !

জ্বে আজ্ঞে।

একটু আগে তোমার কি কোন ভয়-টয় লেগেছে?

জ্বে না।

ও আচ্ছা ! চল আস্তে আস্তে হাঁটি।

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি-না কে জানে। ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে লোক মাঝরাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায় সে আর যাই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমত শুনছি না। বি.এস সি. পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমূলাতে দু'টি ক্লোরিন এটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নাম্বার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, হ্যাঁ। কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।

রাতে ঘুম কেমন হয়েছে?

ঘুম ভাল হয়েছে।

যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তাহলে এক ডোজ অষুধ দিতে পারি।

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন?

জ্বি। ছোটখাট একটা ডিসপেনসারী আছে। রুগী-টুগী ভালই হয়।

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশী নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোন পেশা আছে। কোন্ পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

কি স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে?

জ্বি না, ভূত-প্রেত এবং হোমিওপ্যাথি এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন না কেন? এটা তো হাইলি সাইন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস-করা ডাক্তার ছিলেন।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি অষুধে যে আসলে কোন অষুধই থাকে না সেটা মোলার কনসানট্রেশন এবং এ্যাভাগেড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সব সময় তাই করি। আজ ইচ্ছা করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে, চলছে থাকুক। আমি বললাম, আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন। আমি ঘরে চলে যাব।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা?

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরো খারাপ হল। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

AMARBOI.COM

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম তাই না? কিছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ ছ' বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলা উচিত কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মত গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয়?

জ্বি শুনেছি।

ভাল খবর কেউ কখনো শুনে না। কিন্তু এই সব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাঁধাবে।

ডাক্তারী চিকিৎসা করাচ্ছেন না?

তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সব রকম চিকিৎসাই চলছে। কোনটাই লাগছে না।

অসুখটা শুরু হল কিভাবে?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। শুধু চা নয়। মিষ্টি, সিঙ্গাড়া, কচুরি।

নিন চা নিন। ক্ষিধে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথা ধরাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, কি করে অসুখটা শুরু হল সত্যি জানতে চান?

বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।

না না, শুনুন। গত বছর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেকদিন থেকেই আসতে বলছিলাম। ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি, ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দু'বছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশী।

রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্প-টল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্গছে। কোনমতে বলল, তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-তামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন,

AMARBOI.COM

কয়েকদিন পর আবার এরকম হল। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাবার পর আবার আমার ছেলে ঐ রকম করতে লাগল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল?

হ্যাঁ ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।

তারপর কি হল, বলুন।

আর বলার কিছু নেই। রোজই ওরকম হতে লাগল।

কখন হত?

রাত দশটা সাড়ে দশটা।

আমি কোন কথা না বলে পরপর দু'টা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসেন এখানে?

আসে। আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে যায় না।

আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি?

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভাল করতাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কি যে অসহায় লাগছে। ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।

ঢাকাতেই তো ছিল। কোন রকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরঞ্চ ভাল আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।

তাই নাকি?

জ্বি। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বটি নিয়ে তার মা'কে কাটতে গিয়েছিল।

সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা-টথা বলে?

না, কথা-টথা কিছু না। চুপচাপ থাকে। ও এলে খুশী হয় এইটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঙানির মত একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হা হয়ে আছে। একটু আগেই যাকে অসহায় লাগছিল এখন সে রকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।

কি বললেন?

আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনদিন পারব বলেও মনে হয় না।

আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

AMARBOI.COM

আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা শেষ করবেন।

অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।

তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামের নির্জনতা কোন-না-কোন ভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলেন সুয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।

চিনতে পেরেছি।

ঐবার স্যার কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে গেলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কি দুর্দশা ছাত্রদের। গরীবের ছেলেপুলে।

আমি কঠিন স্বরে বললাম, আপনারা সবাই ভাল তো?

জ্বি ভাল।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, উনি ভাল আছেন?

উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।

ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?

জ্বি। বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ — বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল। নানান জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।

তাই বুঝি?

জ্বি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।

এখন কি নতুন প্রিন্সিপ্যাল এসেছেন?

জ্বি। ভাল লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্প-গুজব করি।

ভাল কথা।

তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন? নতুন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের মত অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দু'টি মমতায় আর্দ্র।

AMARBOI.COM

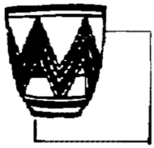

অচিন বৃক্ষ

ইদরিশ বলল, ভাইজান ভাল কইর‍্যা দেহেন। এর নাম অচিন বৃক্ষ।

বলেই থু করে আমার পায়ের কাছে একদলা থুথু ফেলল। লোকটির কুৎসিত অভ্যাস, প্রতিটি বাক্য দু'বার করে বলে। দ্বিতীয়বার বলার আগে একদলা থুথু ফেলে।

ভাইজান ভাল কইরা দেহেন, এর নাম অচিন বৃক্ষ।

অচিন পাখির কথা গানের মধ্যে প্রায়ই থাকে, আমি অচিন বৃক্ষের কথা এই প্রথম শুনলাম এবং দেখলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরা সবাই বৃক্ষ শব্দটা উচ্চারণ করছে শুদ্ধভাবে। তৎসম শব্দের উচ্চারণে কোন গণ্ডগোল হচ্ছে না। অচিন বৃক্ষ না বলে অচিন গাছও বলতে পারত, তা বলছে না। সম্ভবত গাছ বললে এর মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষিত হয় না।

ইদরিশ বলল, ভাল কইরা দেহেন ভাইজান, ত্রিভুবনে এই বৃক্ষ নাই।

তাই না-কি?

জ্বে। ত্রিভুবনে নাই।

ত্রিভুবনে এই গাছ নাই শুনেও আমি তেমন চমৎকৃত হলাম না। গ্রামের মানুষদেব কাছে ত্রিভুবন জায়গাটা খুব বিশাল নয়। এদের ত্রিভুবন হচ্ছে আশেপাশের আট-দশটা গ্রাম। হয়ত আশেপাশে এরকম গাছ নেই।

কেমন দেখতাছেন ভাইজান?

ভাল।

এই রকম গাছ আগে কোনদিন দেখছেন?

না।

ইদরিশ বড়ই খুশি হল। থু করে বড় একদলা থুথু ফেলে খুশির প্রকাশ ঘটাল।

বড়ই আচানক, কি বলেন ভাইজান?

আচানক তো বটেই।

ইদরিশ এবার হেসে ফেলল। পান খাওয়া লাল দাঁত প্রায় সব ক'টা বের হয়ে এল। আমি মনে মনে বললাম, কী যন্ত্রণা! এই অচিন বৃক্ষ দেখার জন্যে আমাকে মাইলের উপরে হাঁটতে হয়েছে। বর্ষা কবলিত গ্রামে দু'মাইল হাঁটা যে কি জিনিস, যারা কোনদিন হাটেননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। জুতা খুলে খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে। হুক ওয়ার্মের জীবাণু যে শরীরে ঢুকে গেছে সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত।

গাছটা দেখতাছেন কেমন কন দেহি ভাইজান?

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এরা শুধু গাছ দেখিয়ে খুশি নয়, প্রশংসাসূচক কিছুও শুনতে চায়। আমি কোন বৃক্ষ-প্রেমিক নই। সব গাছ আমার কাছে এক রকম মনে হয়।

AMARBOI.COM

আশেপাশের মানুষদেরই আমি চিনি না, গাছ চিনব কি করে? মানুষজন তাও কথা বলে, নিজেদের পরিচিত কবার চেষ্টা করে। গাছেরা তেমন কিছুই করে না।

অচিন বৃক্ষ কেমন দেখলেন ভাইজান?

আমি ভাল করে দেখলাম। মাঝারি সাইজের কাঁঠাল গাছের মত উঁচু, পাতাগুলি তেঁতুল গাছের পাতার মত ছোট ছোট, গাছের কাণ্ড পাইন গাছের কাণ্ডের মত মসৃণ। গাছ প্রসঙ্গে কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই বললাম, ফুল হয়?

ইদরিশ কথা বলার আগেই, পাশে দাঁড়ানো রোগা লোকটা বলল, হে না — ফুল ফুটনের 'টাইম' হয় নাই। 'টাইম' হইলেই ফুটবে। এই গাছে ফুল আসতে মেলা 'টাইম' লাগে।

বয়স কত এই গাছের?

তা ধরেন দুই হাজারের কম না। বেশিও হইতে পারে।

বলেই লোকটা সমর্থনের আশায় চারদিকে তাকাল। উপস্থিত জনতা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল। যেন এই বিষয়ে কারো মনেই সন্দেহের লেশমাত্র নেই। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। গ্রামের লোকজন কথাবার্তা বলার সময় তাল ঠিক রাখতে পারে না। হুট করে বলে দিল দু'হাজার বছর। আর তাতেই সবাই কেমন মাথা নাড়ছে। আমি ইদরিশের দিকে তাকিয়ে বললাম, ইদরিশ মিয়া, গাছ তো দেখা হল, চল যাওয়া যাক।

আমার কথায় মনে হল সবাই খুব অবাক হচ্ছে।

ইদরিশ হতভম্ব গলায় বলল, এখন যাইবেন কি? গাছ তো দেখাই হইল না। তার উপরে, মাস্টার সাবরে খবর দেওয়া হইছে। আসতাছে।

আমার চারপাশে সতেরো আঠারোজন মানুষ আর একপাল উলঙ্গ শিশু। অচিন বৃক্ষের লাগোয়া বাড়ি থেকে বৌ-ঝিরা উঁকি দিচ্ছে। একজন এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে এল। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কালো রঙের বিশাল একটা চেয়ারও একজন মাথায় করে আনছে। এই গ্রামের এটাই হয়ত একমাত্র চেয়ার। অচিন বৃক্ষ যাঁরা দেখতে আসেন তাদের সবাইকে এই চেয়ারে বসতে হয়।

অচিন বৃক্ষের নিচে চেয়ার পাতা হল। আমি বসলাম। কে-একজন হাতপাখা দিয়ে আমাকে প্রবল বেগে হাওয়া করতে লাগল। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব চলে এলেন। বয়স অল্প, তবে অল্প বয়সেই গালটাল ভেঙে একাকার। দেখেই মনে হয় জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ। বেঁচে থাকতে হয় বলেই বেঁচে আছেন। ছাত্র পড়াচ্ছেন। হেডমাস্টার সাহেবের নাম মুহম্মদ কুদ্দুস। তাঁর সম্ভবত হাঁপানি আছে। বড় বড় করে শ্বাস নিচ্ছেন। নিজেকে সামলে কথা বলতে অনেক সময় লাগল।

স্যারের কি শইল ভাল?

জ্বি ভাল।

আসতে একটু দেরি হইল। মনে কিছু নিবেন না স্যার।

না মনে কিছু নিচ্ছি না।

বিশিষ্ট লোকজন শহর থাইক্যা অচিন বৃক্ষ দেখতে আসে, বড় ভাল লাগে। বিশিষ্ট লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

আপনি ভুল করছেন ভাই। আমি বিশিষ্ট কেউ নই।

এই তোমরা স্যারকে হাত-পা ধোয়ার পানি দেও নাই, বিষয় কি?

হাত-পা ধুয়ে কি হবে? আবার তো কাদা ভাঙতেই হবে।

হেডমাস্টার সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, খাওয়া-দাওয়া করবেন না? আমার বাড়িতে পাক-শাক হইতেছে। চাইরটা ডাল-ভাত, বিশেষ কিছু না। গেরাম দেশে কিছু জোগাড়যন্ত্রও করা যায় না। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। গত বৎসর ময়মনসিংহের এ ডি সি সাহেব আসছিলেন। এডিসি রেভিন্যু। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অচিন বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এক হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন।

তাই না-কি?

জ্বি। অবশ্যি টাকা এখনো পাওয়া যায় নাই। এরা কাজের মানুষ। নানান কাজের চাপে ভুলে গেছেন আর কি। আমাদের মত তো না যে কাজকর্ম কিছু নাই। এদের শতেক কাজ। তবু ভাবতেছি একটা পত্র দিব। আপনে কি বলেন?

দিন। চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিন।

আবার বিরক্ত হন কি-না কে জানে। এরা কাজের মানুষ, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করাও ঠিক না। এই চায়ের কি হইল?

চা হচ্ছে না-কি?

জ্বি, বানাতে বলে এসেছি। চায়ের ব্যবস্থা আমার বাড়িতে আছে। মাঝে-মধ্যে হয়। বিশিষ্ট মেহমানরা আসেন। এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসার সাহেব এসেছিলেন, বিরাট জ্ঞানী লোক। এদের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, কি বলেন স্যার?

তা তো বটেই।

চা চলে এল।

চা খেতে খেতে এই গ্রামের অচিন বৃক্ষ কী করে এল সেই গল্প হেডমাস্টার সাহেবের কাছে শুনলাম। এক ডাইনী না-কি এই গাছের উপর 'সোয়ার' হয়ে আকাশপথে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পানির পিপাসা হয়। এইখানে সে নামে। পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারিত করে। পানি ছিল বড়ই মিঠা। ডাইনী তখন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রামের লোকদের বলে, তোমাদের মিঠা পানি খেয়েছি, তার প্রতিদানে এই গাছ দিয়ে গেলাম। গাছটা যত্ন করে রাখবে। অনেক অনেক দিন পরে গাছে ফুল ধরবে। তখন তোমাদের দুঃখ থাকবে না। এই গাছের ফুল সর্বরোগের মহৌষধ। একদিন উপাস থেকে খালি পেটে এই ফুল খেলেই হবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনি এই গল্প বিশ্বাস করেন?

হেডমাস্টার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না করার তো কিছু নাই।

যে যুগে মানুষ চাঁদে হাঁটাহাঁটি করছে সেই যুগে আপনি বিশ্বাস করছেন গাছে চড়ে ডাইনী এসেছিল?

জগতে অনেক আচানক ব্যাপার হয় জনাব। যেমন ধরেন ব্যাঙের মাথায় মণি। যে মণি সাত রাজার ধন। অন্ধকার রাতে ব্যাঙ এই মণি শরীর থেকে বের করে। তখন চারদিক আলো হয়ে যায়। আলো দেখে পোকারা আসে। ব্যাঙ সেই পোকা ধরে ধরে খায়।

আপনি ব্যাঙের মণি দেখেছেন?

জ্বি জনাব। নিজের চোখে দেখা। আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

আমি চুপ করে গেলাম। যিনি ব্যাঙের মণি নিজে দেখেছেন বলে দাবি করেন তাঁর সঙ্গে কুসংস্কার নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তাছাড়া দেখা গেল ব্যাঙের মণি তিনি একাই দেখেননি — 'আমার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের অনেকেও দেখেছে।'

দুপুরে হেডমাস্টার সাহেবের বাসায় খেতে গেলাম। আমি এবং ইদরিশ। হেডমাস্টার সাহেবের হতদরিদ্র অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। প্রাইমারী স্কুলের একজন হেডমাস্টার সাহেবের যদি এই দশা হয় তখন অন্যদের না-জানি কি অবস্থা। অথচ এর মধ্যেই পোলাও রান্না হয়েছে। মুরগির কোরমা করা হয়েছে। দরিদ্র মানুষটির অনেকগুলি টাকা বের হয়ে গেছে এই বাবদে।

আপনি এসেছেন বড় ভাল লাগতেছে। অজ পাড়াগাঁয়ে থাকি। দু' একটা জ্ঞানের কথা নিয়ে যে আলাপ করব সেই সুবিধা নাই। চারদিকে মূর্খের দল। অচিন বৃক্ষ থাকায় আপনাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন। বড় ভাল লাগে। কিছু জ্ঞানের কথা শুনতে পারি।

বেচারা জ্ঞানের কথা শুনতে চায়। কোন জ্ঞানের কথাই আমার মনে এল না। আমি বললাম, রান্না তো চমৎকার হয়েছে। কে রেঁধেছে, আপনার স্ত্রী?

জ্বি না জনাব। আমার কনিষ্ঠ ভগ্নি। আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী।

সে-কি?

হার্টের বাল্বের সমস্যা। ঢাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা বলেছেন, লাখ দুই টাকা খরচ করলে একটা-কিছু করা যাবে। কোথায় পাব এত টাকা বলেন দেখি।

আমি চুপ করে গেলাম।

হেডমাস্টার সাহেব সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আপনি যখন আসছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিব। সে শহরের মেয়ে। মেট্রিক পাস।

তাই না-কি?

জ্বি। মেট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন ছিল। টোটেল মার্ক ছয়শ' এগারো। জেনারেল অংকে পেয়েছে ছিয়াত্তর। আর চারটা নম্বর হলে লেটার হত।

হেডমাস্টার সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ওর আবার লেখালেখির শখ আছে।

বলেন কি?

শরীরটা যখন ভাল ছিল তখন কবিতা লিখত। তা এই মূর্খের জায়গায় কবিতার মত জিনিস কে বুঝবে বলেন? আপনি আসছেন দু'একটা পড়ে দেখবেন।

জ্বি নিশ্চয়ই পড়ব।

মহসিন সাহেব বলে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একটি কবিতার কপি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন অনেক পত্রিকার সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে, ছাপিয়ে দিবেন।

ছাপা হয়েছে?

হয়েছে নিশ্চয়ই। কবিতাটা ভাল ছিল, নদীর উপরে লেখা। পত্রিকা টত্রিকা তো এখানে কিছু আসে না। জানার উপায় নাই। একটা পত্রিকা পড়তে হলে যেতে হয় মশাখালির

AMARBOI.COM

বাজার। চিন্তা করেন অবস্থা। শেখ সাহেবের মৃত্যুর খবর পেয়েছি দু'দিন পরে, বুঝলেন অবস্থা।

অবস্থা তো খারাপ বলেই মনে হচ্ছে।

তাও অচিন বৃক্ষ থাকায় দুনিয়ার সাথে একটা যোগাযোগ আছে। আসেন ভাইসাব, আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলেন। সে শহরের মেয়ে। ময়মনসিংহ শহরে পড়াশোনা করেছে।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অপরিচিতি অসুস্থ একজন মহিলার সঙ্গে আমি কী কথা বলব? ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে অচিন বৃক্ষ দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের সবাইকে এই মহিলার সঙ্গেও দেখা করতে হয়।

মহিলার সঙ্গে দেখা হল।

মহিলা না বলে মেয়ে বলাই উচিত। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না। বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। মানুষ নয় যেন মিশরের মমি। বিশিষ্ট অতিথিকে দেখে তার মধ্যে কোন প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। তবে বিড় বিড় করে কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন। পরক্ষণেই হাসি মুখে বললেন, আপনাকে সালাম দিচ্ছে।

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। কিছু-একটা বলতে হয় অথচ বলার মত কিছু পাচ্ছি না। মেয়েটি আবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল, হেডমাস্টার সাহেব বললেন — রেনু বলছে আপনার খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হল। ওর কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। আমি পারি।

আমি বললাম, চিকিৎসা হচ্ছে তো? না-কি এমনি রেখে দিয়েছেন?

হেডমাস্টার সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়েটি বিড়বিড় করে আবারো কী যেন বলল। হেডমাস্টার সাহেব বুঝিয়ে দিলেন — ও জিজ্ঞেস করছে অচিন বৃক্ষ দেখে খুশি হয়েছেন কি-না।

আমি বললাম, হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।

মেয়েটি বলল, ফুল ফুটলে আরেকবার আসবেন। ঠিকানা দিয়ে যান। ফুল ফুটলে আপনাকে চিঠি লিখবে।

মেয়েটি এই কথাগুলি বেশ স্পষ্ট করে বলল, আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। আমি বললাম, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি যাই।

হেডমাস্টার সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আমি রাজী হলাম না। এই ভদ্রলোকের এখন উচিত তার স্ত্রীর কাছে থাকা। যত বেশি সময় সে তার স্ত্রীর পাশে থাকবে ততই মঙ্গল। এই মেয়েটির দিনের আলো যে নিভে এসেছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

আমি এবং ইদরিশ ফিরে যাচ্ছি।

আসার সময় যতটা কষ্ট হয়েছিল ফেরার সময় ততটা না। আকাশে মেঘ করায় রোদের হাত থেকে রক্ষা হয়েছে। তার উপর ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ইদরিশের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগুচ্ছি।

AMARBOI.COM

আমি বললাম, হেডমাস্টার সাহেব তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করাচ্ছে না?

করাইতাছে। বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব গেছে পরিবারের পিছনে। অখন বাড়ি-ভিটা পর্যন্ত বন্দক।

তাই না-কি?

জ্বি। এই মানুষটা পরিবারের জন্যে পাগল। সারা রাইত ঘুমায় না। স্ত্রীর ধারে বইস্যা থাকে। আর দিনের মধ্যে দশটা চক্কর দেয় অচিন বৃক্ষের কাছে।

কেন?

ফুল ফুটেছে কি-না দেখে। অচিন বৃক্ষের ফুল হইল অখন শেষ ভরসা।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

খেয়াঘাটের সামনে এসে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। দেখা গেল হেডমাস্টার সাহেব ছুটতে ছুটতে আসছেন। ছুটে-আসাজনিত পরিশ্রমে খুবই কাহিল হয়ে পড়া একজন মানুষ যার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ছুটে আসার কারণ হচ্ছে স্ত্রীর কবিতার খাতা আমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন। মনে পড়ায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

আমরা একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ার নিচে বসলাম। হেডমাস্টার সাহেবকে খুশি করার জন্যেই দু'নম্বরী খাতার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়ে বললাম, খুব ভাল হয়েছে।

হেডমাস্টার সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, এখন আর কিছু লিখতে পারে না। শরীরটা বেশি খারাপ।

আমি বললাম, শরীর ভাল হলে আবার লিখবেন।

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, আমিও রেনুকে সেইটাই বলি, অচিন বৃক্ষের ফুল ফুটারও বেশি বাকি নাই। ফুল ফুটার আগে পচা শ্যাওলার গন্ধ ছাড়ার কথা। গাছ সেই গন্ধ ছাড়া শুরু করেছে। আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি পাই।

আমি গভীর মমতায় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, প্রথম কবিতাটা আরেকবার পড়েন স্যার। প্রথম কবিতাটার একটা ইতিহাস আছে।

কী ইতিহাস?

হেডমাস্টার সাহেব লাজুক গলায় বললেন, রেনুকে আমি তখন প্রাইভেট পড়াই। একদিন বাড়ির কাজ দিয়েছি। বাড়ির কাজের খাতা আমার হাতে দিয়ে দৌড় দিয়া পালাইল। আর তো আসে না। খাতা খুইল্যা দেখি কবিতা। আমারে নিয়া লেখা। কী সর্বনাশ বলেন দেখি। যদি এই খাতা অন্যের হাতে পড়ত, কি অবস্থা হইত বলেন?

অন্যের হাতে পড়বে কেন? বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে দিবে আপনার হাতেই।

তা ঠিক। রেনুর বুদ্ধির কোন মা-বাপ নাই। কি বুদ্ধি, কি বুদ্ধি! তার বাপ-মা বিয়ে ঠিক করল — ছেলে পূবালী ব্যাংকের অফিসার। চেহারাসুরত ভাল। ভাল বংশ। পান চিনি হয়ে গেল। রেনু চুপ করে রইল। তারপর একদিন তার মা'রে গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে বলল, মা তুমি আমারে বিষ জোগাড় কইরা দেও। আমি বিষ খাব। রেনুর মা বললেন, কেন? রেনু বলল, আমি একজনরে বিবাহ করব কথা দিছি, এখন অন্যের সঙ্গে বিবাহ হইতেছে। বিষ

AMARBOI.COM

ছাড়া আমার উপায় নাই। কতবড় মিথ্যা কথা, কিন্তু বলল ঠাণ্ডা গলায়। ঐ বিয়ে ভেঙে গেল। রেনুর মা-বাবা তাড়াহুড়া করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজের ঘরের কথা আপনাকে বলে ফেললাম, আপনি স্যার মনে কিছু নিবেন না।

না — আমি কিছু মনে করিনি।

সবাইরেই বলি। বলতে ভাল লাগে।

হেডমাস্টারের চোখ চকচক করতে লাগল। আমি বললাম, আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তিনি জড়ানো গলায় বললেন, একটু দোয়া করবেন স্যার। ফুলটা যেন তাড়াতাড়ি ফুটে।

পড়ন্ত বেলায় খেয়া নৌকায় উঠলাম। হেডমাস্টার সাহেব মূর্তির মত ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই এক ধরনের প্রতীক্ষার ভঙ্গি আছে। সেই প্রতীক্ষা অচিন বৃক্ষের অচিন ফুলের জন্যে। যে প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে হতদরিদ্র গ্রামের অন্যসব মানুষরাও। এবং কী আশ্চর্য, আমার মত কঠিন নাস্তিকের মধ্যেও সেই প্রতীক্ষার ছায়া। নদী পার হতে হতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে — আহা ফুটুক। অচিন বৃক্ষে একটি ফুল হলেও ফুটুক। কত রহস্যময় ঘটনাই তো এ পৃথিবীতে ঘটে। তার সঙ্গে যুক্ত হোক আরো একটি।

হেডমাস্টার সাহেবও পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তার হাতে হাতীর ছবি আঁকা দু'নম্বরী একটা কবিতার খাতা। দূর থেকে কেন জানি তাঁকে অচিন বৃক্ষের মত লাগছে। হাতগুলি যেন অচিন বৃক্ষের শাখা। বাতাস পেয়ে দুলছে।

AMARBOI.COM

নিশিকাব্য

পরী মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে এসে দেখে চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। চিকমিক করছে চারদিক। সে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। এরকম জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হয়ে যায়।

বেশ রাত হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে অনেক আগে। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। শুধু আজিজ, সাপ খেলানো সুরে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। পরীর এখন আর কিছুই করার নেই। সে একাকী উঠোনো দাঁড়িয়ে রইল।

কি করছ ভাবী?

পরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হারিকেন হাতে রুনু এসে দাঁড়িয়েছে। সে হালকা গলায় বলল, ঘুমুবে না ভাবী?

ঘুমুব। দাঁড়া একটু। কি চমৎকার জ্যোৎস্না দেখলি?

হুঁ।

আয় রুনু, তোকে একটা জিনিস দেখাই।

কি জিনিস?

ঐ দেখ জামগাছটার কেমন ছায়া পড়েছে। অবিকল মানুষের মত না? হাত-পা সবই আছে।

ওমা, তাই তো। রুনু তরল গলায় হেসে উঠল।

পরী বলল, কুয়োতলায় একটু বসবি না কি রে রুনু? চল বসি গিয়ে।

তোমার মেয়ে জেগে উঠে যদি?

বেশিক্ষণ বসব না, আয়।

কুয়োতলাটা বাড়ি থেকে একটু দূরে। তার দু'পাশে দু'টি প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ। জায়গাটা বড় নিরিবিলি। রুনু বলল, কেমন অন্ধকার দেখেছ ভাবী? ভয় ভয় লাগে।

দূর, ভয় কিসের। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ।

দু'জনেই কুয়োর বাঁধানো পাশটায় চুপচাপ বসে রইল। ঝিরঝির বাতাস বইছে। বেশ লাগছে বসে থাকতে। পরী কি মনে করে যেন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসছ কেন ভাবী?

এম্নি। রাস্তায় একটু হাঁটবি নাকি?

কোথায়?

চল না, হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ের দিকে যাই। বেশ লাগছে না জ্যোৎস্নাটা?

রুনু সে কথার জবাব না দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, দেখ ভাবী, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ঐখানটায়?

শিরীষ গাছের নিচে যেখানে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে, সেখানে সাদা মত কি-একটি যেন নড়ে উঠল।

কে ওখানে? কথা বলে না যে, কে?

কেউ সাড়া দিল না। রুনু পরীর কাছে সরে এল। ফিসফিস করে বলল, ভাবী, ছোট ভাইজানকে ডাক দাও।

তুই দাঁড়া না, আমি দেখছি। ভয় কিসের এত?

সাহস দেখাতে হবে না ভাবী, তুমি ছোট ভাইজানকে ডাক।

শিরীষ গাছের নিচের ঘন অন্ধকার থেকে একটা লোক হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনেই রুনু বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বড় ভাইজান এসেছে। বড় ভাইজান এসেছে।

পর মুহূর্তেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়িতে খবর দিতে।

আনিস স্যুটকেস কুয়োতলায় নামিয়ে পরীর পাশে এসে দাঁড়াল। পরী কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তার কেন জানি চোখে পানি এসে পড়ল।

টুকুন ভাল আছে, পরী?

হুঁ।

আর তুমি?

ভাল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?

তোমাদের আসতে দেখে দাঁড়ালাম। কি মনে করেছিলে — ভূত? পরী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ নিচু হয়ে কদমবুসি করল। আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল।

কি যে কর তুমি পরী, লজ্জা লাগে।

ততক্ষণে হারিকেন হাতে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। পরী বলল, তুমি আগে যাও। স্যুটকেস থাক, রশীদ নিয়ে যাবে।

আনিস হাসিমুখে হাঁটতে লাগল।

AMARBOI.COM

বাড়ির উঠোনো আনিস এসে দাঁড়াতেই আনিসের মা কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অভ্যাসই এরকম। যে কোন খুশির ব্যাপারে মরাকান্না কাঁদতে বসেন। কেউ ধমক দিয়ে না থামালে সে কান্না থামে না। আনিসের বাবা চেঁচিয়ে বললেন, একটা জলচৌকি এনে দে না কেউ, বসুক। সবগুলি হয়েছে গাধা। রুনু হা করে দেখছিস কি পাখা এনে হাওয়া কর।

আনিসের ছোটভাই আজিজ বলল, খবর দিয়ে আসে নাই কেন দাদা? খবর দিলেই ইস্টিশনে থাকতাম।

আনিস কিছু বলল না। জুতোর ফিতা খুলতে লাগল। আনিসের মা'র কান্না তখনো থামেনি। এবার আজিজ ধমক দিল।

আহ মা, তোমার ঘ্যানঘ্যানানি থামাও।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কান্না থেমে গেল। সহজ ও স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, তোর শরীরটা এত খারাপ হল কি করে রে আনিস? পেটের ঐ অসুখটা সারেনি? চিকিৎসা করাচ্ছিস তো বাবা?

সবাই লক্ষ্য করল আনিসের শরীর সত্যি খারাপ হয়েছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল ভেতরে বসে গেছে। আনিসের বাবা বললেন, স্বাস্থ্য খারাপ হবে না, মেসের খাওয়া। পাঁচ বছর মেসে থাকলাম, জানি তো সব। বুঝলে আনিসের মা, মেসে খাওয়ার ধারাই ঐ।

পরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আনিসের জন্য নতুন করে রান্না চড়াতে হবে। তবু তার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। পরীর শ্বাশুড়ি এক সময় ঝাঝিয়ে উঠলেন, ওকি বৌমা, সংয়ের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন? রান্না চড়াও গিয়ে। তার আগে আনিসকে চা দাও এক কাপ।

পরী অপ্রস্তুত হয়ে রান্নাঘরে চলে এল। রুনু এল তার পিছু পিছু ।

রুনু হেসে বলল, আমি চা বানিয়ে আনছি, তুমি ভাইজানের কাছে থাক ভাবী। পরী লজ্জা পেয়ে হাসল।

তুই তো ভারী ফাজিল হয়েছিস রুনু।

হয়েছি তো হয়েছি। তোমাকে একটা কথা বলি ভাবী।

কি কথা?

রুনু ইতস্তত করতে লাগল। পরী অবাক হয়ে বলল, বল না কি বলবি।

বাবা আমার যেখানে বিয়ে ঠিক করেছেন সেটা আমার পছন্দ না ভাবী। ভাইজানকে বুঝিয়ে বলবে তুমি। দোহাই তোমার।

পরী আশ্চর্য হয়ে বলল, পছন্দ হয়নি কেন রুনু? ছেলেটা তো বেশ ভালোই। কত জায়গাজমি আছে। তার উপর স্কুলে মাস্টারি করে।

করুক। আমার একটুও ভাল লাগেনি। কেমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিল দেখতে এসে। না না ভাবী, তোমার পায়ে পড়ি।

আচ্ছা আচ্ছা, পায়ে পড়তে হবে না। আমি বলব।

রুনু খুশি হয়ে বলল, তুমি বড় ভাল মেয়ে ভাবী।

তাই নাকি?

হুঁ। ভাইজান হঠাৎ আসায় তোমার খুব খুশি লাগছে তাই না?

AMARBOI.COM

পরী জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

বল না ভাবী খুব খুশি লাগছে?

লাগছে।

রুনু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। থেমে থেমে বলল, ভাইজানের চাকরিটা বড় বাজে। বৎসরে দশটা দিন ছুটি নেই। গত ঈদে পর্যন্ত আসল না।

পরী কিছু বলল না। চায়ের কাপে চিনি ঢালতে লাগল।

রুনু বলল, এবার তুমি বাসা করে ভাইজানের সঙ্গে থাক ভাবী। মেসের খাওয়া খেয়ে তার শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখেছ?

পরী মৃদুস্বরে বলল, দুই জায়গায় খরচ চালানো কি সহজ কথা? অল্প ক'টা টাকা পায়। চা হয়ে গেছে, নিয়ে যা রে রুনু।

রুনু চা নিয়ে এসে দেখে তার বিয়ে নিয়েই আলাপ হচ্ছে। বাবা বলছেন, ছেলে হল তোমার বি.এ. ফেল। তবে এবার প্রাইভেট দিচ্ছে। বংশটংশ খুবই ভাল। ছেলের এক মামা ময়মনসিংহে ওকালতী করেন। তাঁকে এক ডাকে সবাই চিনে।

আনিসের মা বলছেন, ছেলে দেখতে-শুনতে খারাপ না — রঙটা একটু মাজা। পুরুষ মানুষের ফর্সা রঙ কি আর ভাল? ভাল না।

আনিস বলল, রুনুর পছন্দ হয়েছে তো? তার পছন্দ হলে আর আপত্তি কি?

পাশের বাড়ি থেকে আনিসের ছোট চাচা এসেছেন খবর পেয়ে। তিনি বললেন, রুনুর আবার পছন্দ-অপছন্দ কি? আমাদের পছন্দ নিয়ে কথা।

আনিস রুনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। লজ্জা পেয়ে রুনু চলে এল রান্নাঘরে।

আনিসের বাবা বললেন, কাল বিকালে না হয় ছেলেটাকে খবর দিয়ে আনি। তুই দেখ।

কাল বিকাল পর্যন্ত তো থাকবো না বাবা। আজ শেষ রাতেই যাব।

সে কি?

ছুটি নিয়ে আসিনি তো। কোম্পানি একটা কাজে পাঠিয়েছিল ময়মনসিংহ। অনেকদিন আপনাদের দেখি নাই। কাজটাও হয়ে গেল সকাল সকাল। তাই আসলাম।

একটা দিন থাকতে পারিস না?

উঁহুঁ। কাল অফিস ধরতেই হবে। প্রাইভেট কোম্পানি, বড় ঝামেলার চাকরি।

আনিস একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ। চার মাস পর এসেছে আনিস। আবার কবে আসবে কে জানে। আনিসের মা কাঁপা গলায় বললেন, তোর বড় সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দে না।

আনিস হেসে উঠল। গায়ের শার্ট খুলতে খুলতে বলল, বড়কর্তা যদি কোনমতে টের পায় আমি বাড়িতে এসে বসে আছি তাহলেই চাকরি নট হয়ে যাবে। গোসল করব মা, গা কুটকুট করছে।

কুয়োয় করবি? পানি তুলে দেবে?

উঁহুঁ, পুকুরে করব। পুকুরে মাছ আছে রে আজিজ?

আছে ভাইজান। বড় বড় মৃগেল মাছ আছে।

AMARBOI.COM

আনিসের পিছু পিছু পুকুর পাড়ে সবাই এসে পড়ল। আনিসের বাবা আর মা পাড়ে বসে রইলেন। আজিজ "ভীষণ গরম লাগছে" এই বলে আনিসের সঙ্গে গোসল করতে নেমে গেল। ঝুনু ঘাটের উপর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে অপেক্ষা করছে। আনিসের সবচেয়ে ছোট বোন ঝুনু, ঘুমিয়ে পড়েছিল। আনিস ভোর রাত্রে চলে যাবে শুনে তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। সেও এসে চুপচাপ রুনুর পাশে বসেছে। শুধু পরী আসেনি। দু'টি চুলোয় রান্না চাপিয়ে সে আগুনের আঁচে বসে আছে একাকী।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে অনেক রাত হল। আনিসকে ঘিরে গোল হয়ে সবাই বসে গল্প করতে লাগল। উঠোনে শীতল পাটিতে বসেছে গল্পের আসর। এর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রুনু ঘুমুচ্ছে। চমৎকার চাঁদনি সেই সঙ্গে মিষ্টি হাওয়া। কারুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। পরীর কাজ শেষ হয়নি। সে বাসন-কোসন নিয়ে ধুতে গেছে ঘাটে। এক সময় রুনু বলল, ভাইজান এখন ঘুমোতে যাক মা। রাত শেষ হতে দেরি নেই বেশি। আনিসের বাবা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ যা রে তুই ঘুমুতে যা। রুনু তুই বৌ-মাকে পাঠিয়ে দে। বাসন সকালে ধুলেই হবে।

ঘরের ভিতর হারিকেন জ্বলছিল। আনিস সলতা বাড়িয়ে দিল। টুকুন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আনিস চুমু খেল তার কপালে। পরীর দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বর নাকি টুকুনের?

হুঁ।

কবে থেকে?

কাল থেকে। সর্দি জ্বর। ও কিছু না। ঘাম দিচ্ছে, এক্ষুণি সেরে যাবে। আনিস পরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। পরীর লজ্জা করতে লাগল। পরী বলল, হাসছো কেন?

এম্নি। পরী তোমার জন্যে শাড়ি এনেছি একটা। দেখ তো পছন্দ হয় কি-না।

পরী খুশি খুশি গলায় বলল, অনেকগুলি পয়সা খরচ করলে তো।

শাড়িটা পর, দেখি কেমন তোমাকে মানায়।

রুনুর জন্যে একটা শাড়ি আনলে না কেন? বেচারীর একটাও ভাল শাড়ি নেই।

পয়সায় কুলোলে আনতাম। আরেকবার আসার সময় আনব।

পরী ইতস্তত করে বলল, আমার একা একা শাড়ি নিতে লজ্জা লাগবে। এইটি রুনুর জন্যে থাক। আরেকবার নিয়ে এসো আমার জন্যে।

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ থাক তবে, আজ রাতের জন্য পর না দেখি?

শাড়ীর ভাঁজ ভেঙে যাবে যে। রুনু মনে করবে আমার জন্যে এনেছিলে পরে তাকে দিয়েছ।

আচ্ছা, তাহলে থাক।

পরী লজ্জিত স্বরে বলল, বিয়ের শাড়িটা পরবো ? যদি বল তাহলে পরি।

পরী লজ্জায় লাল হয়ে ট্রাঙ্কের তালা খুলতে লাগল। আনিস বলল, টুকুন দেখতে তোমার মত হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ, আব্বা তাকে ছোট পরী ডাকে। আচ্ছা টুকুনের একটা ভাল নাম রাখ না কেন?

জরী রাখব তার নাম।

জরী আবার কেমন নাম?

AMARBOI.COM

তোমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখলাম। পরীর মেয়ে জরী।

পরী হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, অন্য দিকে তাকিয়ে থাক, শাড়ি বদলাব।

কি হয় অন্য দিকে না তাকালে?

আহ শুধু অসভ্যতা।

আনিস মাথা নীচু করে টুকুনকে আদর করতে লাগল। পরী হালকা গলায় বলল, দেখ তো কেমন লাগছে?

একেবারে লাল পরী।

ইশ, শুধু ঠাট্টা।

রান্নাঘর থেকে দুপধুপ শব্দ উঠছে।

আনিস বলল, এত রাতে ধান কুটছে কেন?

ধান কুটছে না চাল ভাঙছে। তোমার জন্যে পিঠা তৈরি হবে।

নিশ্চয়ই রুনুর কাণ্ড।

আনিস পরীর হাত ধরে তাকে কাছে টানল। পরীর চোখে আবার পানি এসে পড়ল। গাঢ়স্বরে বলল, আবার কবে আসবে?

জুলাই মাসে।

কতদিন থাকবে তখন?

অ-নে-ক দিন।

তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন? পেটের ঐ ব্যথাটা এখনো হয়?

হয় মাঝে মাঝে?

টুকুন কেঁদে জেগে উঠল। পরী বলল, জ্বর আরো বেড়েছে। ও টুকুন সোনা, কে এসেছে দেখ। দেখ তোমার আব্বু এসেছে।

আনিস বলল, আমার কোলে একটু দাও তো পরী। আরে আরে মেয়ের একটা দাত উঠেছে দেখছি। কি কাণ্ড। ও টুকুন, ও জরী, একটু হাস তো মা। ও সোনামণি, দেখি তোমার দাঁতটা?

টুকুন তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো। তাই দেখে আনিস ও পরী দু'জনেই হাসতে লাগল।

আমার জরী সোনা কথা শিখছে নাকি, পরী?

হুঁ। মা বলতে পারে। আর পাখি দেখলে বলে, ফা ফা।

আনিস হো হো করে হেসে উঠল — যেন ভীষণ একটা হাসির কথা। হাসি থামলে বলল, আমার জরী তোমার চেয়েও সুন্দর হবে। তাই না পরী?

আমি আবার সুন্দর নাকি?

না, তুমি ভীষণ বিশ্রী।

আনিস আবার হেসে উঠল। তার একটু পরেই বাইরে কাক ডাকতে লাগল। আনিসের বাবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ও আনিস, ও আনিস।

জ্বি আব্বা।

এখন রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারবি না বাবা।

AMARBOI.COM

আনিস টুকুনকে শুইয়ে দিল বিছানায়। পরী কোন কথা বলল না। আনিস বাইরে বেরিয়ে দেখল চাঁদ হেলে পড়েছে। জ্যোৎস্না ফিকে হয়ে এসেছে। বিদায়ের আয়োজন শুরু হল। ঘুমন্ত ঝুনুকে আবার ঘুম থেকে টেনে তোলা হল। সে হঠাৎ বলে ফেলল, ভাবী আজ বিয়ের শাড়ী পরেছে কেন?

কেউ তার কথার কোন জবাব দিল না। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী আকাশের চাঁদ। পরীকে অহেতুক লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্যেই হয়তো একখণ্ড বিশাল মেঘের আড়ালে তার সকল জ্যোৎস্না লুকিয়ে ফেলল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল আনিস। শেষ রাতের ট্রেনটা যেন কিছুতেই মিস না হয়।

কৃষ্ণপক্ষ

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে জারুল গাছের নিচে।

জায়গাটা বেশ সুবিধাজনক, গাছ-গাছড়ায় ঝুপড়ির মত হয়ে আছে — দূর থেকে তাকে দেখার উপায় নেই। টর্চের আলো ফেললেও বোঝা যাবে না। কিছু কিছু বে-আক্কেল লোক টর্চের আলো রাস্তায় ফেলার বদলে আশেপাশের ঝোপঝাড়েও ফেলে। তবে আশার কথা হল, টর্চওয়ালা লোক এই অঞ্চলে নেই বললেই হয়। যে দু'একজন আছে তারা ব্যাটারি বাঁচাবার জন্যে খুট করে খানিকটা আলো ফেলেই টর্চ নিভিয়ে ফেলে।

ভাদ্র মাস।

তালপাকা গরম পড়েছে। হানিফের গায়ে মার্কিন কাপড়ের মোটা পাঞ্জাবী। গা অসম্ভব ঘামছে। অবশ্যি এই রকম অবস্থায় সব সময় তাঁর গা ঘামে। মাঘ মাস হলেও ঘামতো। বড় ধরনের কোন কাজের আগে আগে তার এমন হয়। মানুষ মারা সহজ কোন কাজ না। বড় কাজ।

হানিফ দাঁড়িয়ে আছে নওয়াবগঞ্জের মুনশি রইসুদ্দিন নামের একজন লোককে খুন করার জন্যে। মুনশি রইসুদ্দিনকে সে চেনে না। লোকটা ভাল কি মন্দ তাও জানে না। তবে মন্দ হবারই সম্ভাবনা। ভাল নির্বিরোধী কোন মানুষকে কেউ খুন করতে চায় না।

অবশ্যি লোকটি ভাল হলেও কিছু যায় আসে না। কাজটা করে দিলে হানিফ পাঁচ হাজার টাকা পাবে — এটাই আসল কথা। পাঁচ হাজারের মধ্যে এক হাজার তাকে দেয়া হয়েছে। বাকি চার হাজার কাজ শেষ হলে পাওয়া যাবে। আজ কাজ শেষ হলে আজ রাতেই। এইসব ব্যাপারে টাকা-পয়সা নিয়ে কেউ ঝামেলা করে না। মাঝে মাঝে বেশিও পাওয়া যায়।

AMARBOI.COM

তিন বছর আগে এই রকম একটা কাজের জন্যে দুই হাজার টাকা বেশি পাওয়া গেল। ছ'হাজারের চুক্তি হয়েছিল। পুরো টাকাটা পাওয়ার পর হানিফ বলল, বকশিশ দেবেন না? মোবারক শাহ্ নামের আধবুড়ো মানুষটা অতি দ্রুত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, অবশ্যই দিব। তৎক্ষণাৎ দু'হাজার টাকা দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, আপনে খুশি তো?

এই একটা মজার ব্যাপার — কাজ শেষ হবার পর তাকে আপনি আপনি করে বলা হয়। এর আগে তুমি। হানিফের ধারণা ভয়ের চোটে আপনি বলে।

হানিফ মোবারক শাহ নামের বুড়ো লোকটাকে বলেছিলো, আমি বসতেছি। কাজ ঠিকমত সমাধান হয়েছে কি-না খোঁজ নিয়ে আসেন, তারপর যাব।

মোবারক শাহ্ চমকে উঠে বলেছিল, তার দরকার হবে না। আপনের কথা ষোল আনা বিশ্বাস করতেছি। আপনার বসতে হবে না, আপনি যান।

একটু বসি। এক কাপ চা খাই।

মোবারক শাহ ফ্যাকাশে মুখে বলেছে, চায়ের আয়োজন বাড়িতে নাই। আপনে দোকানে গিয়া চা খান। ভাংতি টাকা দিতাছি। এই বলে পাঁচ টাকার ময়লা একটা নোট বের করে দিল। হানিফ নোটটা পকেটে রাখতে রাখতে মনে মনে হেসেছে। লোকটার ভয় দেখতে মজা লাগছে, হারামজাদা, মানুষ মারবার সময় খেয়াল ছিল না?

আপনে তা হইলে এখন যান। বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না।

হানিফ উদাস গলায় বলল, কোন অসুবিধা নাই।

আপনে হইলেন বিদেশী লোক, আপনেরে সন্দেহ করবো।

আরে না, কী সন্দেহ করবো? এত বড় গঞ্জ, বিদেশী লোক তো থাকবই। এক গ্লাস পানি দিতে বলেন।

পানি দিতেছি। পানি খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান।

পানি খাওয়ার পরও হানিফ যায় না। জর্দা দিয়ে পান খেতে চায়। পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরায়। উদাস ভঙ্গিতে টানতে থাকে।

আসলে কাজ শেষ হবার পরপরই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে তার ইচ্ছা করে না। বড়ই ক্লান্ত লাগে। ঘুম পায়। তাছাড়া এইসব ঘটনার পর কি সব কথাবার্তা রটে সেইগুলিও শুনতে ইচ্ছা করে। থানা থেকে পুলিশ সাহেব এসে চারদিকে মিথ্যা আতংক জাগিয়ে তোলে। একে ধমকায়, তাকে ধমকায় — এইগুলি দেখতে ভাল লাগে। পুলিশ সাহেব মুখে দুঃখ এবং রাগ রাগ ভাব ফুটাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। পুলিশ সাহেবের মুখ দেখেই মনে হয় তিনি গভীর আনন্দ বোধ করছেন। খুন-খারাবি মানেই তাঁদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সা। কাজেই এইসব ঘটনায় তাঁরা আনন্দিতই হবেন। এটাই স্বাভাবিক। খুব কম করে হলেও দশ-বারো জনকে ধরে হাজতে পুরে দিবেন। এদের ছাড়াতে টাকা লাগবে। খুনীর শত্রুদের টাকা দিতে হবে। যে খুন হয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনদেরও টাকা খরচ করতে হবে। টাকারই খেলা।

পায়ের কাছে মড়মড় শব্দ হল। হানিফ চমকে খানিকটা সরে গেল। সাপ-খোপ হতে পারে। ভাদ্র মাস হল সাপের মাস। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত ছেড়ে বের হয়। হানিফের সঙ্গে একটা টর্চ আছে। আলো ফেলে দেখবে না-কি ব্যাপারটা কি? না, সেটা ঠিক হবে না।

আশেপাশে কেউ নেই। টর্চ জ্বালালেও কোন ক্ষতি হবে না, তবু সাবধান থাকা ভাল। পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কতক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে তা নিজে ধরতে পারছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সময় কাটছেই না, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

হানিফ বসল।

হাতের আঙুলে আগুন আড়াল করে সিগারেট ধরাল। পকেটে দশটা সিগারেট নিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন সিগারেট আছে তিনটা। সাতটা এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেছে। এর থেকে মনে হচ্ছে রাত কম হয়নি। হানিফ রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল। অন্য সময়ে এতটা ঘামে না। আজ বড় বেশি ঘামছে। মুখের ভেতরটাও নোনতা লাগছে। মানুষের মুখের ভেতরেও কি ঘাম হয়? মনে হয়, হয়। না হলে মুখের ভেতর নোনতা লাগত না।

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কৃষ্ণপক্ষের রাত, অন্ধকার হবেই। আকাশে মেঘ থাকায় নক্ষত্রের আলোও নেই। খুন করার জন্যে সময়টা ভাল না। এই রকম অন্ধকার রাতে ভুল-ভ্রান্তি হয়। ভুল লোক মারা পড়ে। চাঁদনি রাতে হলে ভুল-ভ্রান্তি হয় না। কে আসছে দূর থেকে দেখা যায়। সবচে' ভাল হয় দিনের বেলা। তবে এই জাতীয় কাজ-কর্ম দিনের আলোয় হয় না বললেই হয়।

কৃষ্ণপক্ষে কাজ করতে হবে বলেই হানিফ গতকাল সন্ধ্যায় দুই ব্যাটারীর এই টর্চ লাইটটা কিনেছে। কাজ করার আগে মুখে আলো ফেলে দেখে নিতে হবে লোক ঠিক আছে কি-না। একবার আলো ফেললেই চিনতে পারবে। আলো না-ফেলে হাঁটা দেখেও চিনতে পারবে — লোকটা হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ডান পায়ে কোন দোষ-টোষ মনে হয় আছে।

লোকটাকে সে যাতে চট করে চিনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গতকাল তার সঙ্গে আলাপও করেছে। লোকটা প্রতিদিন ভোর আটটার ট্রেনে মোহনগঞ্জ থেকে যায় বারহাট্টা, ফিরে রাত দশটার ট্রেনে। দলিল লেখক। দলিল লেখকরা সাধারণত হতদরিদ্র হয়, — এ সেই শ্রেণীর না। এর পয়সা-কড়ি ভাল আছে। বাড়িতে টিনের বড় বড় দুটো ঘর। বাংলাঘরের পশ্চিমদিকে টিউবওয়েল। লম্বা বাঁশের আগায় এন্টেনা দেখে বোঝা যায় টেলিভিশন আছে। নিশ্চয়ই ব্যাটারীতে চালায়। এই অঞ্চলে এখনো ইলেকটিসিটি আসেনি। ব্যাটারীতে টিভি চালানো খরচান্ত ব্যাপার। তবে লোকটা কঞ্জুষ ধরনের। গতকাল সকালে কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকায় তার স্বভাবচরিত্র পরিষ্কার বোঝা গেছে। হানিফ ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। মোহনগঞ্জ রেলস্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাবে, এতে চেহারাটা মনে গাথা হয়ে যাবে। অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধা হবে না।

লোকটা মাটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ডিসটিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠে এল। হানিফ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভাইজানের সঙ্গে ম্যাচবাক্স আছে? একটা সিগারেট ধরাব। রইসুদ্দিন সরু চোখে তাকাল। নিতান্ত অনিচ্ছায় দেয়াশলাই-এর বাক্স বের করল। হানিফ তার সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। হাসি মুখে বলল, নেন ভাইজান, আপনেও একটা ধরান। লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষের কাছ থেকে সিগারেট নিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা দেখাল না। কঞ্জুষ প্রকৃতির লোকজনের এই হচ্ছে লক্ষণ। যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে নেয়া।

AMARBOI.COM

হানিফ বলল, ইস্টিশানের দিকে যান না-কি ভাইজান?

হুঁ।

আমি একজন চাউলের পাইকার। চাউল কিনতে আসছিলাম, দরে বনল না। এই দিকে চাউলের দর বেশি।

হুঁ।

লোকটা সব কথার জবাব এক অক্ষরে দিচ্ছে। কঞ্জুষ ধরনের মানুষদের এটাও এক ধরনের আচরণ। মুখের কথাও তাদের কাছে টাকা-পয়সার মতন। সহজে খরচ করতে চায় না। লোকটা বাজারে ঢোকার মুখে এক খিলি পান কিনল। হানিফ সঙ্গে আছে। একবার জিজ্ঞেস করল না পান খাবে কি-না।

অথচ কিছুক্ষণ আগেই তার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বিনা দ্বিধায় খেয়েছে। আশ্চর্য লোক।

হানিফ দুপুরের দিকে রইসুদ্দিনের বাড়িতে গিয়েও উপস্থিত হল। এটা তার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। কাজকর্ম করার আগে ঐ বাড়িতে একবার যাবেই। রইসুদ্দিনের বাড়িঘর তার পছন্দ হল। হিন্দু বাড়ির মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ি। ফুটফুটে একটা সবুজ জামা-পরা মেয়ে বাংলাঘরের উঠোন ঝাট দিচ্ছে। হানিফ মধুর গলায় বলল, ও মা তুমি এই বাড়ির?

হ।

আমার জন্য গেলাসে কইরা পানি আন তো, তিয়াশ লাগছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কেমন হেলতে-দুলতে যাচ্ছে। দেখতে ভাল লাগছে। পাঁচ-ছয় বছর বয়স হবে, কিন্তু পরিষ্কার কাজকর্ম। কি সুন্দর করে উঠোন ঝাট দিচ্ছে। মেয়েটি ফিরে এল খালি হাতে। চিকন সুরে বলল, চাপকল থাইক্যা পানি খাইতে কইছে।

আচ্ছা আচ্ছা। তুমি চাপ কলে চাপ দেও আমি পানি খাই।

মেয়েটি খুব উৎসাহের সঙ্গে কলে চাপ দিয়ে পানি বের করল। মনে হল সে পানি বের করার কাজটায় খুব মজা পায়।

তোমার নাম কি গো?

ময়না।

বড় ভাল নাম — ময়না। রইসুদ্দিন সাব তোমার কে হয়?

বাজান হয়।

আচ্ছা আচ্ছা ভাল।

হানিফের একটু মন খারাপ হল। ঘটনা ঘটে গেলে এই মেয়ে নিশ্চয়ই ডাক ছেড়ে কাঁদবে। কাঁদলেও কিছু করার নেই। ঘটনা সে না ঘটালে অন্য কেউ ঘটাবে। ব্যাপার একই। মাঝখান থেকে এতগুলি টাকা হাতছাড়া হবে। টাকার খুবই দরকার। হাত এখন একেবারে খালি। তার বৌ খানিকটা সৌখিন ধরনের মেয়ে, অভাব সহ্য করতে পারে না। একবেলা উপাস দিলেই চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে। ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে ধরে পিটায়। সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে — সর, সর।

AMARBOI.COM

টাকাটা পাওয়া গেলে মাস ছয়েকের জন্য নিশ্চিন্ত। শ্যামগঞ্জ বাজারের মেয়ে মানুষটার কাছেও তাহলে ইজ্জত নিয়ে যাওয়া যাবে। মেয়ে মানুষটা বড় তুচ্ছ করছে। গত মাসে একবার গিয়েছিল, দরজা ধরে কঠিন গলায় বলল, আইজ্ঞ জান গিয়া, ঘরে লোক আছে।

হানিফ আবার সিগারেট ধরাল। আর একটা মাত্র বাকি আছে। শেষ সিগারেটটা ধরানো যাবে না। কাজের শেষে একটা সিগারেট ধরাতেই হয়। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সিগারেটের আগুন খুব সাবধানে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে আড়াল করে রাখতে হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটায় আগুন নিভে গেলে সিগারেট আর ধরানো যাবে না। রাতের ট্রেইন আসতে আজ এত দেরি করছে কেন কে জানে। লোকাল ট্রেইনগুলির আসা-যাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। খুব বেশি দেরি করলে রইসুদ্দিন নামের রোগা কঞ্জুষ লোকটা হয়ত আসবেই না। বারহাট্টায় আত্মীয় বাড়িতে থেকে যাবে। আরো একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এইসব কাজে অপেক্ষার যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা। একবার এই রকম একটা কাজে এগারো দিন অপেক্ষা করা লাগলো। লোকটাকে কিছুতেই একা পাওয়া যায় না। সঙ্গে সব সময় একজন না একজন থাকে। অতি সাবধানী লোক। এত সাবধান হয়েও অবশ্যি শেষ রক্ষা হয়নি। কপালে মরণ লেখা থাকলে সাবধান হয়েও লাভ হয় না। লখিন্দর লোহার ঘর বানিয়েও বাঁচতে পারেনি।

এই লোক অবশ্যি সাবধানী না। একা একাই ঘোরাফিরা করে। তার এত বড় একজন শত্রু আছে তা বোধ হয় জানেও না। না জানাই ভাল। জানিলে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। তাছাড়া মরাটা ভয়াবহ কিছু না। একদিন না একদিন সবাইকেই মরতে হবে। রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরার চেয়ে এইভাবে মরে যাওয়া ভাল। কষ্ট অনেক কম। মৃত্যুর পর শহীদের দরজা পাওয়ারও একটা সম্ভাবনা থাকে। অপঘাতে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যায় — মৌলানা সাহেব একবার ওয়াজে বলেছিলেন। অপঘাতে মৃত্যু আর পেটের অসুখে মৃত্যু। এই দুয়ের জন্যে আছে শহীদের দরজা। মৌলানা সাহেবদের সব কথা কেন জানি বিশ্বাস হতে চায় না। পেটের অসুখে মৃত্যু হলে শহীদের দরজা পাওয়া যাবে কি জন্যে? কারণটা কি? সত্যি হলে অবশ্যি ভালই হয়। তাহলে বড় মেয়েটা শহীদের দরজা পায়। মেয়েটা মারা গেল পেটের ব্যথায়। কোন চিকিৎসা করাতে পারেনি। কি চিকিৎসা করাবে, হাতে নাই একটা পয়সা। মেয়েটা ছটফট করেছে আর বলেছে — বাজান, আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যাও।

হানিফ নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছিলেন — পেট কাটা লাগবে। তিন হাজার টাকা খরচ হবে কমসে কম। আছে টাকা? না থাকলে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে দে।

হানিফ তাও পারেনি। মেয়েটা কোলের উপর ছটফট করতে করতে মরল। বড় মেয়েটার মৃত্যুর পর মানুষ মারার প্রথম কাজটা হানিফ করে। যে মানুষটাকে প্রথম মারে তার নাম ছিল দবীর। মরার সময় সেও অবিকল তার মেয়ের মত ছটফট করতে করতে হানিফকে বলল, আফনে আমারে ডাক্তারের কাছে লইয়া যান।

কি আশ্চর্য কথা। যে তার পেটে ছোরা বসিয়েছে তাকেই অনুরোধ করছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। মৃত্যুর সময় মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে। কেন করে কে

AMARBOI.COM

জানে? একবার এক লোকের পেটে ছোরা বসাবার পর দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়তে পড়তে খুবই অবাক-হওয়া গলায় জিজ্ঞেস করেছিল — ভাইজান আপনের নাম কি?

মৃত্যুর সময় মানুষের মাথায় বোধ হয় কিছু-একটা হয়। সব গোলমাল হয়ে যায়। তার বড় মেয়েরও তাই হয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল — বাজান, আপনে হাসতাছেন ক্যান। কি হইছে?

হানিফ তখন হাসছিল না। চিৎকার করে কাঁদছিল। সেই কান্না মৃত্যুর সময় মেয়েটার কাছে হাসি হয়ে ধরা পড়ল।

পিপড়া কামড়াচ্ছে।

রাতে পিপড়া কামড়ায় না, কিন্তু এখন কামড়াচ্ছে কেন কে জানে? হানিফ ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রইসুদ্দিন আসছে। পা টেনে টেনে আসছে।

হানিফ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। শেষ সিগারেটটা রয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ধরানো যাবে। তবে দিয়াশলাই ভিজে গেছে। ভেজা দিয়াশলাই দিয়ে এ সিগারেট ধরানো সমস্যা হতে পারে, এই নিয়েই সে খানিকটা চিন্তিত এবং বিষণ্ন।

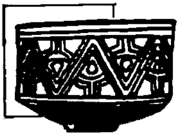

AMARBOI.COM

ছায়াসঙ্গী

প্রতি বছর শীতের ছুটির সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব — হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনও গ্রাম দেখেনি — তারা খুশি হবে। পুকুরে ঝাপাঝাপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফোটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফোটে তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজ পাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওড় পরে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মত।

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভাল লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড় জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের মত একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দু'তিনজন এক সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা তাদের যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল — কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা — পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে-বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মত লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানা জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে — 'দেশের অবস্থাডা কি কন দেহি ছোড মিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কি? কি দেশ ছিল আর কি হইল!'

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্প-গুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক আমি লেখালেখির প্রবল আগ্রহ বোধ করলাম। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম, সারাদিন লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দু'জন করে 'গাতক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে —

"ও মনা
এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।
না না না — আমি প্রাণে বাঁচতাম না।"

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা — একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে রোগামত দশ-এগার বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম — কি রে?

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম — চলে গেলি নাকি?

ও আড়াল থেকে বলল — না।

'নাম কি রে তোর?'

'মন্তাজ মিয়া।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

AMARBOI.COM

'না।'

আর কোন কথাবার্তা হল না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু ডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মন্তাজ মিয়া বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম — কি ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, থাকিস কোথায়?

উত্তরে পোকা খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কি করবে বুঝতে পারছে না! কাগজটার গন্ধ শুঁকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন — মন্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।

'কেন?'

'বিরাট চোর। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুইদিন পরপর মার খায়। তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কি?'

'কিছু করে না?'

'চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়ত তোমার কলম-টলম নিয়ে নিয়েছে।'

'না কিছু নেয়নি।'

'ভাল করে খুঁজে-টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।'

'কি ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালিখি শুরু করেছি। হৈচৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি মন্তাজ মিয়াকে তিনচারজন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফুঁপাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, দেখেন তো এই কমলটা আপনের কি-না। মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।

দেখলাম কলমটা আমারই। চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোন মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হল। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কি?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত মারধর করেছেন কেন? মারাধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?'

AMARBOI.COM

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হল সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলেনি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু'একটা কথাবার্তা বলি। আজ একটা কথাও বলা হল না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচীর কাছে। চুরির ঘটনারও দু'দিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন্ ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ, কোন্‌টা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলেনি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই —

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ — 'আমার পুত কই গেল রে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়। পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘরের পাশে বাদ আসর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সব কিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হল দুপুর রাতের পর। যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হল। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা করছ কি? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দিয়ে দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সব সময় বলে — "ও মরে নাই।" কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈ-চৈ শুরু করল যে সবাই বাধ্য হল মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে — আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না। মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন — বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?

AMARBOI.COM

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি জানি।

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন — প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে...

কবর খোঁড়া হল।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মত পেঁচিয়ে পরা। অন্য দু'টি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোন কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন — কি রে মন্তাজ?

মন্তাজ মৃদু স্বরে বলল, পানির পিয়াস লাগছে।

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এরকম কখনো শুনিনি।

ছোট চাচাকে বললাম, মন্তাজ তারপর কিছু বলেনি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কি কি দেখল না দেখল এইসব?

ছোট চাচা বললেন — না। কিছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

'জিজ্ঞেস করেননি কিছু?'

'কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল — একটা শব্দ করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।'

আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে — লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না?

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত। আল্লাহ্‌তায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?'

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেননি সে কি করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে?'

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহ্‌র কুদরত। উনার কেরামতি।'

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক, গ্রামের মানুষদের আল্লাহ্‌তায়ালার 'কুদরত এবং কেরামতির' উপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মত গলায় বলে 'আল্লাহ্‌র কুদরত'।

আমি ছোট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না? ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওয়ার দরকার নাই। এম্নেই আসব।'

'এম্নিতেই আসবে কেন?'

AMARBOI.COM

ছোট চাচা বললেন — তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গ্রামের যত মেয়েব বিয়া হইছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম। আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোন বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামেব সব মেয়েবা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি এসেছে?

'আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না?'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, আমাদের উপলক্ষে যে সব মেয়েরা নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামী শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোন উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়ম মত এক সময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দু'টা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হল। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। একরকম একটা উপহার বোধ হয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, কেমন আছ রহিমা?

রহিমা ফিসফিস করে বলল, ভাল আছি ভাইজান।

'শাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'পছন্দ হইব না। কি কন ভাইজান? অত দামী জিনিস কি আমরা কোনদিন চউক্ষে দেখছি।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কি করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে?'

রহিমা অনেকটা চুপ করে থেকে বলল, কি কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে।

'কি জন্যে মনে হল?'

'জানি না ভাইজান ! মনে হইল।'

'এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোন ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার?'

'জ্বি-না।'

'মন্তাজ তোমাকে কিছু বলেনি? জ্ঞান ফিরলে সে কি দেখল বা তার কি মনে হল?'

'জ্বি-না।'

'জিজ্ঞেস করনি?'

করছি। হারামজাদা কথা কয় না।'

AMARBOI.COM

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সব সময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কি ভাবল? কি সে দেখল? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল?

মন্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয় — জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সব সময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুর বেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়া গাঁর ঝিম ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুমঘুম আসছে। জানালার বাইরে খুট্ করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি মন্তাজ। আমি বললাম — কি খবর মন্তাজ?

'ভাল।'

'বোন আছে না চলে গেছে?'

'গেছে গা।'

'আয় ভেতরে আয়।'

মন্তাজ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্প-গুজব হয়। মনে হয় আমাকে সে খানিকটা পছন্দ করে। এইসব ছেলেরা ভালবাসার খুব কাঙ্গাল হয়। অল্প কিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর — এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম — তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?

'আইচ্ছা।'

'ঠিকমত জবাব দিবি তো?'

'হু।'

'আচ্ছা মন্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?'

'আছে।'

'যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?'

'না।'

'না কেন?'

মন্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, কি দেখলি — চারদিকে অন্ধকার?

'হু।'

'কেমন অন্ধকার?'

মন্তাজ এবারো জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

AMARBOI.COM

আমি বললাম — কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না?

মন্তাজ নিচু স্বরে বলল, 'আরেকজন আমার সাথে আছিল, সেই জন্যে ভয় লাগে নাই।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরেকজন ছিল মানে? আরেকজন কে ছিল?'

'চিনি না। আন্ধাইরে কিছু দেখা যায় না।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'জানি না।'

'সে কি করল?'

'আমারে আদর করল। আর কইল কোন ভয় নাই।'

'কিভাবে আদর করল?'

'মনে নাই।'

'কি কি কথা সে বলল?'

'মজার মজার কথা — খালি হাসি আসে।'

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, কি রকম মজার কথা? দু'একটা বল তো শুনি?

'মনে নাই।'

'কিছুই মনে নাই। সে কে — এটা কি বলেছে?'

'জ্বি-না।'

'ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো — কোনকিছু কি মনে পড়ে?'

'উনার গায়ে শ্যাওলার মত গন্ধ ছিল।'

'আর কিছু?'

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, ভাল করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই?

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা মনে আসছে।

'সেটা কি?'

'বলতাম না। কথাডা গোপন।'

'বলবি না কেন?'

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম — বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে। মন্তাজ উঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনদিন আমার কাছে আসেনি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি তবু আসেনি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে আসবে না।

AMARBOI.COM

জলিল সাহেবের পিটিশন

তিনি হাসি মুখে বললেন, আমি দু'জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। সেভেন্টি ওয়ানে আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোকের চেহারা বিশেষত্বহীন। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। সে তুলনায় বেশ শক্ত-সমর্থ। বসেছেন মেরুদণ্ড সোজা করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চশমা-টশমা নেই। তার মানে চোখে ভালই দেখতে পান। আমি বললাম, আমার কাছে কি ব্যাপার? ভদ্রলোক যেভাবে বসে ছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। সহজ সুরে বললেন, একজনের ডেড-বডি পেয়েছিলাম। মালিবাগে কবর দিয়েছি। আমার ছোট মেয়ের বাড়ি আছে মালিবাগে।

তাই নাকি?

জ্বি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া।

আমার কাছে কেন এসেছেন?

গল্পগুজব করতে আসলাম। নতুন এসেছেন এ পাড়ায়। খোঁজখবর করা দরকার। আপনি আমার প্রতিবেশি।

AMARBOI.COM

ভদ্রলোক হাসিমুখে বসে রইলেন। আমার সন্দেহ হল, তিনি হয়তো সত্যি সত্যি হাসছেন না। তাঁর মুখের কাটাটাই হাসি হাসি। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, আমি আপনার পাশের গলিতেই থাকি।

তাই বুঝি?

জ্বি? ১৩/২, বাসার সামনে একটা নারিকেল গাছ আছে দেখছেন তো?

আমি দেখিনি। তবু মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোকের চরিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সম্ভবত অবসর জীবন যাপন করছেন। কিছু করবার নেই। সময় কাটানোটাই বোধহয় তার এখন একমাত্র সমস্যা। যার জন্যে ছুটির দিনে প্রতিবেশি খুঁজতে হয়।

আমার নাম আবদুল জলিল।

আমি নিজের নাম বলতে গেলাম, ভদ্রলোক বলতে দিলেন না। উঁচু গলায় বললেন, চিনি আপনাকে চিনি।

চা খাবেন? চায়ের কথা বলি?

জ্বি-না। আমি চা খাই না। চা সিগারেট কিছুই খাই না। নেশার মধ্যে পান খাই।

পান তো দিতে পারব না, এখানে কেউ পান খায় না।

পান আমার সঙ্গেই থাকে।

ভদ্রলোক কাঁধের ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে পানের কৌটা বার করলেন। বেশ বাহারী কৌটা। টিফিন কেরিয়ারের মত তিন-চারটা আলাদা বাটি আছে। আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করলাম। ভদ্রলোক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। সারা সকালটা হয়তো এখানে কাটাবেন। নিজের ছেলে দু'টির কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন। দুঃখ-কষ্টের গল্প অন্যকে শোনাতে সবাই খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে এসে বললেন, প্রফেসার সাহেব, আপনি একটা পান খাবেন?

জ্বি-না।

পান কিন্তু শরীরের জন্য ভাল। পিত্ত ঠাণ্ডা রাখে। যারা পান খায় তাদের পিত্তে দোষ হয় না।

তাই নাকি?

জ্বি। পানের রস আর মধু হল গিয়ে পিত্তের খুব বড় ওষুধ।

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। আজ ইউনিভার্সিটি নেই। থাকলে সুবিধা হতো। বলা যেত — 'কিছু মনে করবেন না। এগারোটার সময় একটা ক্লাস আছে। আপনি অন্য আরেক দিন সময় হাতে নিয়ে আসুন।' ছুটির দিনে এরকম কিছু বলা যায় না।

ভদ্রলোক তাঁর পানের কৌটা খুলে নানান রকম মশলা বের করলেন। প্রতিটি মশলা শুঁকে শুঁকে দেখলেন। পান বানালেন অত্যন্ত যত্নে। যিনি পান বানানোর মত তুচ্ছ ব্যাপারে এতটা সময় নষ্ট করেন তিনি যে আজ দুপুরের আগে নড়বেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক পান মুখে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, যাই, আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।

বিস্ময় সামলে আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, বসুন, এত তাড়া কিসের?

তিনি বসলেন না। আমি তাঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ফেরার পথে দেখি, বাড়িওয়ালা বারান্দায় ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রফেসার সাহেবকে ধরেছে বুঝি? সিগনেচার করেছেন?

কি সিগনেচার?

জলিল সাহেবের পিটিশনে সিগনেচার করেননি?

পিটিশনটা কিসের?

আমাকে বলতে হবে না। নিজেই টের পাবেন। হাড় ভাজা-ভাজা করে দিবে। কোন প্রশ্রয় দিবেন না।

অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। নতুন পাড়ায় আসার অনেক বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। নতুন নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সে পরিচয় অনেক সময়ই সুখকর হয় না। তবে জলিল সাহেব প্রসঙ্গে ভয়টা বোধহয় অমূলক। এরপর তাঁর সঙ্গে দু'বার দেখা হল। বেশ সহজ স্বাভাবিক মানুষ। একবার দেখা গ্রীন ফার্মেসীর সামনে। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, প্রফেসার সাহেব না? ভাল আছেন?

জ্বি ভাল। আপনি ভাল আছেন? কই আর তো এলেন না।

সময় পাই না। খুব ব্যস্ত। পিটিশনটার ব্যাপারে।

AMARBOI.COM

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ক্লাসের দোহাই দিয়ে রিকশায় উঠে পড়লাম। দ্বিতীয়বার দেখা হল নিউ মার্কেটের একটা নিউজ স্ট্যাণ্ডের সামনে। দেখি, তিনি উবু হয়ে বসে একটির পর একটি পত্রিকা দ্রুত পড়ে শেষ করছেন। হকার ছেলেটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে।

কি জলিল সাহেব, কি পড়ছেন এত মন দিয়ে?

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। মনে হল ঠিক চিনতে পারলেন না। তাঁর চোখে চশমা।

চশমা নিয়েছেন নাকি?

জ্বি। সন্ধ্যা হলে মাথা ধরে। প্লাস পাওয়ার। ভাল আছেন প্রফেসার সাহেব?

জ্বি ভাল।

যাব একদিন আপনার বাসায়। পিটিশনটা দেখাব আপনাকে। চৌদ্দ হাজার তিনশ' সিগনেচার জোগাড় হয়েছে।

কিসের পিটিশন?

পড়লেই বুঝবেন। আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না।

আমার ধারণা ছিল সরকারের কাছে কোন সাহায্য-টাহায্য চেয়ে পিটিশন করা হয়েছে। সেখানে চৌদ্দ হাজার সিগনেচারের ব্যাপারটা বোঝা গেল না। আমি নিজে থেকেও কোন আগ্রহ দেখালাম না। জগতে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কম নয়। সিগনেচার সংগ্রহ করা যদি তাঁর নেশা হয়, তা নিয়ে আমার উদ্বিগ হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে হল। জলিল সাহেব এক সন্ধ্যায় তাঁর চৌদ্দ হাজার তিনশ' সিগনেচারের ফাইল-পত্র নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, ভাল করে পড়েন প্রফেসার সাহেব।

আমি পড়লাম। পিটিশনের বিষয়বস্তু হচ্ছে — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদী মারা গিয়েছিল। সেই অপরাধে অপরাধীদের প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে অপরাধীরা কি করে পার পেয়ে গেল? কেন এ নিয়ে আজ কেউ কোন কথা বলছে না? জলিল সাহেব তাঁর দীর্ঘ পিটিশনে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যেন এদের বিচার করা হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে, সেই জন্যেই যে আমি এটা করছি তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্যে আমি কোন বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্যে যাদের ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন?

পারছি।

জানি পারবেন। আপনি জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অনেকেই পারে না। বুঝলেন ভাই অনেকে মানবতার দোহাই দেয়। বলে, বাদ দেন। ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা এত সস্তা? এ্যাঁ, বলেন সস্তা?

আমি কিছু বললাম না। জলিল সাহেব পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে বসলেন। শান্ত স্বরে বলেন, আপনি কি মনে করছেন আমি ছেড়ে দেব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দেব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি

AMARBOI.COM

মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল আর কেউ কোন শব্দ করল না? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি?

আমি সিগনেচার ফাইল উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব গোছানো কাজ-কর্ম। সিগনেচারের পাশে বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত আত্মীয়-স্বজনের নাম-ধাম।

অনেকেই মনে করে আমার মাথার ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মত একটা ছেলে বলল, কেন পুরানা কাঁসুন্দি ঘাটছেন? বাদ দেন ভাই। আমি তার দাদার বয়সী লোক আমাকে বলে ভাই।

আপনি কি বললেন?

আমি বললাম, তুমি চাও না এদের বিচার হোক?

ছেলেটি কিছু বলে না। সরাসরি না বলারও সাহস নাই। অথচ এই সব ছেলেরা কত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। করে নাই?

জ্বি করেছে।

আপনার বাড়িওয়ালার কথাই ধরেন। তাঁর এক শালাকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। অথচ এই লোক সিগনেচার করেনি। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেল। কোন বিচার হল না। মনে হলেই বুকের মধ্যে চিনচিন্ ব্যথা হয়।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি পান মুখে পুরে বললেন, সরকারী লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমি কি বলতে চাই সেটাই ভাল করে শুনতে চায় না। একজন আমাকে বলল, আপনি একটা পরিত্যক্ত বাড়ির জন্যে দরখাস্ত করেন। আপনার দু'টি ছেলে মারা গেছে। বাড়ি পাওয়ার হক আছে আপনার।

আপনি কি বললেন?

আমি আবার বলব কি? বাড়ির জন্যে আমি পিটিশন করছি নাকি? বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কি? আমার দুই ছেলের জীবন কি এত সস্তা? একটা বাড়ি দিয়ে দাম দিতে চায়? কতবড় স্পর্ধা চিন্তা করেন। আমি চাই একটা বিচার হবে। বিচার চাই। আর কিছুই না। সভ্য সমাজের নিয়মমত বিচার হবে। বুঝলেন?

জ্বি বুঝলাম।

আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের বুঝাতে কষ্ট হয় না। অন্যেরা বুঝতে চায় না। একেকটা সিগনেচারের জন্য তিনবার করে যেতে হয়। তাতে অসুবিধা নাই। আমি ছাড়বার লোক না।

আমার সিগনেচার নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। একটা কৌতূহল জেগে রইল। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি, কি ভাই কতদূর করলেন?

চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেসার সাহেব। দোয়া রাখবেন।

লোকজন দস্তখত দিচ্ছে তো?

সবাই দেয় না। ভয় পায়।

কিসের ভয়?

AMARBOI.COM

ভয়ের কি কোন মা-বাপ আছে? ভয় পাওয়া যাদের স্বভাব তারা ভয় পাবেই। বুঝলেন না? আমি আছি লেগে। আদালতে হাজির করে ছাড়ব। কি বলেন প্রফেসার সাব?

তা তো ঠিকই।

ডিস্ট্রিক্টে ভাগ করে ফেলছি। এখন সব ডিস্ট্রিক্টে যাব। কষ্ট হবে। উপায় তো নাই। আপনি কি বলেন?

ভালই তো।

তাছাড়া শুধু দস্তখত জোগাড় করলেও হবে না। কেইস চালানোর মত এভিডেন্স থাকতে হবে। বিনা কারণে নিরপরাধ লোকজন ধরে ধরে মেরেছে — এটা প্রমাণ করতে হবে না? ওরা ঘাগু ঘাগু সব 'ল'ইয়ার' দেবে। দেবে না?

তা তো দেবেই।

আপনার জানামত ভাল ল'ইয়ার আছে?

আমি খোঁজ করব।

তা তো করবেনই। আপনি তো অন্ধ না। অন্যায়টা বুঝতে পারছেন। বেশির ভাগ লোকই পারে না। মূর্খের দেশ।

অনেকদিন আর জলিল সাহেবের দেখা পাই না। হয়তো সত্যি সত্যি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। বগলে ভারী ভারী ফাইল। দস্তখতের সংখ্যা হয়ত বাড়ছে। বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার। পনেরো থেকে বিশ। এমনকি সত্যি হতে পারে যে চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ দস্তখত জোগাড় করে ফেলবেন তিনি। পঞ্চাশ লাখ লোকের দাবী অত্যন্ত জোরালো দাবী।

বর্ষার শুরুতে খবর পেলাম জলিল সাহেব অসুখে পড়েছেন। হাঁপানি, সেই সঙ্গে রিউমেটিক ফিভার। বাড়িওয়ালা বললেন, পাগল মানুষ। শরীরের যত্ন তো কোনদিন করে নাই। এ যাত্রা টিকবে না।

বলেন কি?

হ্যাঁ। গ্রীন ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেব বললেন। আমি নিজেও গিয়েছিলাম দেখতে।

অবস্থা কি বেশি খারাপ?

বর্ষাটা টিকে কিনা সন্দেহ।

বলেন কি?

খুবই খারাপ অবস্থা।

বর্ষাটা অবশ্যি টিকে গেলেন। ফাইলপত্র বগলে নিয়ে আবার ঘুরতে বেরুলেন। আমার সঙ্গে দেখা হল এক দুপুরে। আমি চিনতেই পারি না এমন অবস্থা। তিনি এগিয়ে এলেন, প্রফেসার সাহেব না?

আরে কি ব্যাপার ভাই? একি অবস্থা আপনার!

বাঁচব না বেশি দিন।

না বাঁচলে চলবে? এত বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন।

ঐটার জন্যেই টিকে আছি।

সিগনেচার কতদূর জোগাড় হয়েছে?

AMARBOI.COM

পনেরো হাজার। মাসে তিন চারশ'র বেশি পারি না। বয়স হয়েছে তো। তবে ছাড়বার লোক না আমি.

না, ছাড়বেন কেন?

কাঠগড়ায় দাঁড়া করাবো শালাদের। ইহুদীরা পেরেছে, আমরা পারব না কেন? কি বলেন?

তা তো ঠিকই।

ত্রিশ লাখ লোক মেরেছে বুঝলেন — একটা দু'টা না। বাংলাদেশের মানুষ সস্তা না। মজা টের পাইয়ে দেব।

আজিমপুরের ঐ পাড়ায় আমি প্রায় দু'বছর কাটালাম। এই দু'বছরে জলিল সাহেবের সঙ্গে ভালই ঘনিষ্ঠতা হল। মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর বাসায়। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ি। দোতলাটি ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। স্ত্রী নেই। বড় ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে থাকে। ফুটফুটে দু'টি মেয়ে আছে সেই বউটির। যমজ মেয়ে বোধ করি। খুব হাসি-খুশি। ভালই লাগে ও-বাড়ীতে গেলে। বউটি বেশ যত্ন করে।

পিটিশন সম্পর্কে বাচ্চা দু'টির ধারণাও দেখলাম খুব স্পষ্ট। একটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, দাদার খাতা লেখা শেষ হলে যারা আমার বাবাকে মেরেছে তাদের বিচার হবে।

এইটুকু মেয়ে এত সব বোঝার কথা নয়। জলিল সাহেব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন।

ঐ পাড়া ছেড়ে চলে আসার পরও মাঝে-মধ্যে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে গেল। এবং এক সময় দীর্ঘ দিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গেলাম।

যাবার আগে দেখা করতে গিয়েছি। শুনলাম তিনি ফরিদপুরে গিয়েছেন সিগনেচার জোগাড় করতে। কবে ফিরে আসবেন কেউ বলতে পারে না। তাঁর ছেলের বউ অনেক দুঃখ করল। দুঃখ করার সঙ্গত কারণ আছে। একমাত্র পুরুষ যদি ঘর-সংসার ছেড়ে দেয় তাহলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

বাইরে থাকলে দেশের জন্যে অন্যরকম একটা মমতা হয়। সেই কারণেই বোধহয় জলিল সাহেবের কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হতো, ঠিকই তো ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করছেন ঠিকই করছেন। এটা মধ্যযুগ না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য করা যায় না।

উইক এন্ড-গুলিতে বাঙালীরা এসে জড়ো হতো আমার বাসায়। কিছু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছেলে, মুরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির অংকের প্রফেসার আফসার উদ্দিন সাহেব। সবাই একমত — জলিল সাহেবের প্রজেক্টে সব রকম সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। বিদেশী পত্রিকায় জনমতের জন্যে লেখালেখি করা হবে। আমেরিকার ফার্গো শহরে আমরা এক সন্ধ্যাবেলায় 'আবদুল জলিল সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে ফেললাম। আমি তার আহ্বায়ক। আফসার উদ্দিন সাহেব সভাপতি। বিদেশে বসে দেশের কথা ভাবতে বড় ভাল লাগে। সব সময় ইচ্ছে করে একটা-কিছু করি।

AMARBOI.COM

দেশে ফিরলাম ছ'বছর পর।

ঢাকা শহর অনেকখানি বদলে গেলেও জলিল সাহেবের বাড়ির চেহারা বদলায়নি। সেই ভাঙা পলেস্তরা উঠা বাড়ি। সেই নারিকেল গাছ। কড়া নাড়তেই চৌদ্দ-পনেরো বছরের ভারী মিষ্টি একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

তুমি কি জলিল সাহেবের নাতনী?

জ্বি।

তিনি বাড়ি আছেন?

না। দাদু তো মারা গেছেন দু'বছর আগে।

ও। আমি তোমার দাদার একজন বন্ধু।

আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

আমি বসলাম কিছুক্ষণ। মেয়েটির মা'র সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। ভদ্রমহিলা বাসায় ছিলেন না। কখন ফিরবেন তারো ঠিক নেই। উঠে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদু যে মানুষের সিগনেচার জোগাড় করতেন সেই সব আছে?

জ্বি আছে। কেন?

তোমার দাদু যে কাজটা শুরু করেছিলেন সেটা শেষ করা উচিত। তাই না?

মেয়েটি খুবই অবাক হল। আমি হাসিমুখে বললাম, আমি আবার আসবো, কেমন?

জ্বি আচ্ছা।

মেয়েটি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে নরম গলায় বলল, দাদু বলেছিলেন একদিন কেউ না কেউ এই ফাইল নিতে আসবে।

আর যাওয়া হল না।

উৎসাহ মরে গেল। দেশের এখন নানান রকম সমস্যা। যেখানে-সেখানে বোমা ফাটে। মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। এর মধ্যে পুরানো একটি সমস্যা টেনে আনতে ইচ্ছা করে না।

আমি জলিল সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। মীরপুরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্যে নানান ধরনের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল সাহেবের বত্রিশ হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় বেরুনোর আমার সময় কোথায়?

জলিল সাহেবের নাতনীটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর পিটিশনের ফাইলটি ধুলো ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখে। এই বয়েসী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।

AMARBOI.COM

শবযাত্রা

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মত হল। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালীবাগের পীর সাহেবের মুরীদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরন খারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছুই নেই। অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অংক করে প্রমাণ করে দিলেন যে ঈশ্বর = $0^{২}$ ও এবং আত্মা = $0 \div$ ।

যাই হোক, মানুষদের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ড রকম ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মত লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্মোকার। মাথার কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন — ভাই, কিছু মনে করবেন না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।

AMARBOI.COM

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে। সেদিন ঐ বিয়ে বাড়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে — কাজী পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এই জাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ বেং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে। ভদ্রলোক ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন মহামূর্খ।

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কি আমাকে মহামূর্খ বললেন?

'জ্বি।'

'কেন বললেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুরুই করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে -- বলছেন ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে। তা পড়ে নি। ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির একটি স্বীকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্ম বিগ বেং সিংগুলারিটিতে। আপনি বললেন ভিন্ন কথা। কোন কিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কি সব উল্টা-পাল্টা কথা বলছেন।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন —

'আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছি না . . একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।'

'বিজ্ঞান ঠাকুরমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বলবেন।'

ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, দেখা গেল চরিত্র তারচেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয় — সাইকোলজী। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমত শিক্ষক রেখে অংক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। আমি লক্ষ্য করেছি এরা সচরাচর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেই রকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, আপনি দেখি মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসেন। বিষয়টা কি বলেন তো?

'বিষয় কিছু না।'

'বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।'

আমি হাসি মুখে বললাম —

'ক্লাসিক্যাল ম্যাকানিক্স, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কি তা জানেন না . . .।'

'আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে চাচ্ছি না —আপনি স্পষ্ট করে বলুন কি জন্যে আমার কাছে আসেন — মদ্য পানের লোভে?'

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, হ্যাঁ।

'ভাল কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘুরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই — বিনা পয়সায় মদ্যপান। তৃষ্ণার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী মদ্যপান করতে চায় তবে তা নিজের বাসায় নয় অন্যের বাসায় — যাতে স্ত্রী জানতে না পারে। নিজের পয়সায় না অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয় — অদ্ভুত মধ্যবিত্ত।'

আমি বললাম, আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব বিরক্ত।

'অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ। আনকন্ট্রোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কি দেব? স্কচ ক্লাব আছে, জীন আছে, ভদকা আছে, কয়েক পদের হুইস্কি,

AMARBOI.COM

আছে। আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিংক পছন্দ হয় তাহলে তাও বানিয়ে দেব। **You name it, I will make it** — হা হা হা।'

'কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম — বিনা পয়সায় মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই আমি আসি।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে কি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হয়?

'হ্যাঁ।'

'আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি — কোন স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে করেননি। প্রথমজন অনেক কষ্টে দু'বছরের মত টিকে ছিল, বাকি দু'জন এক বছরও টিকেনি। হা হা হা।'

'না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশিই হয়েছেন।'

'হ্যাঁ, হয়েছি। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে। শুধু শুধু নানান বায়নাক্কা — মদ খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না — আরে কি মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বল কেন? আমি কি তোমার কোন ব্যাপারে মাথা গলাই? আমি কি বলি — নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাই হিল পরতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যাণ্ডেল পরবে। বলি কখনো? না বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মত থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মত। ওরা তা দেবে না।'

'এই যে এখন একা একা বাস করছেন আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী?'

'হ্যাঁ সুখী, মাঝে মাঝে একটু দুঃখ দুঃখ ভাব চলে আসে। তখন মদ্যপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আর এলকোহল একসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না — কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

'বলব, আরেকদিন বলব। এখন বলেন কি খাবেন? আজকের আবহাওয়াটা 'ব্লাডি মেরীর' জন্যে খুব আইডিয়াল। দেব একটা ব্লাডি মেরী বানিয়ে? জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভাল। প্রচুর টমেটোর রস দেয়া হয়।'

AMARBOI.COM

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভালই খাতির হল। মাসে দু'একবার তাঁর কাছে যাই। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এন্টি ম্যাটার, লাইফ আফটার ডেথ। ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মত। যা বলবেন — বলবেন। কোথাও সংশয়ের কিছু রাখবেন না। আমার মত আরো অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ জল-যাত্রায়।

একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম — শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন এসে পৌঁছার কথা। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত ন'টা মানে নিশুতি রাত। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটা লোক নেই। একা একাই রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি আমার আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখিনি। এখন এই সাইকেলে করে

কে যাচ্ছে? আমি বললাম — কে কে কে? কেউ জবাব দিল না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায় . . .

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাঁজখাই গলায় বললেন — স্টপ। আপনি বলতে চাচ্ছেন — আপনার এক মৃতবন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল?

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।'

'হতে পারে।'

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম যে, আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হল — সাইকেল। একটা সাইকেল মরে 'সাইকেল-ভূত' হবে না। যদি না হয় তাহলে আপনার ভূতবন্ধু, সাইকেল পেলো কোথায়?

যিনি গল্প করছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভূত হতে পারে। তাই বলে কাপড় মরে তো 'কাপড়-ভূত' হবে না। আমরা যদি ভূত দেখি তাদের নেংটা দেখা উচিত। ওরা কাপড় পায় কোথায়? সব সময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কি?

•

মজার ব্যাপার হচ্ছে — এই ঘোর নাস্তিক, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজন বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক ঝড় বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন।

'এই যে ভাই লেখক, ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন? একটা কণ্ডিশনে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ করে শুনে যাবেন। কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করলে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। আমার মাধ্যমে কোন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না। তা হতে দেয়া যায় না। আপনি যদি ধরে নেন এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প — মজার গল্প -- তা হলেই আপনাকে বলতে পারি।'

'এই গল্পটি আমি কোথাও ব্যবহার করতে পারি?'

'পারেন। কারণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সবাই ধরেই নেয় এগুলি বানানো ব্যাপার।'

'তাহলে বলুন শুনি।'

ভদ্রলোক পর পর চার পেগ মদ্যপান করলেন। তাঁর মদ্যপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত। অষুধের মেজারিং গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি নেন। এক ফোঁটাও পানি মেশান না। ঢক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না। কুলকুচা মত শব্দ হয়। তারপর এক সময় ঘোঁৎ করে

AMARBOI.COM

গিলে ফেলে বলেন — কেন যে মানুষ এই সব ছাইপাশ খায় — বলেই আবার খানিকটা নেন। যাই হোক, ভদ্রলোকের জবানীতে মূল গল্পে যাচ্ছি —

'তখন আমার বয়স চব্বিশ। এম.এ. পাস করেছি। ধারণা ছিল খুব ভাল রেজাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসেবে এন্ট্রি পেয়ে যাব। তা হয়নি। এম.এ-র রেজাল্ট খুবই খারাপ হল। কেন হল তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা ভাল দিয়েছি। একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি — জনৈক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল না। দু'একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন। আবার কেউ কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য করতে পারেন না।

যা বলছিলাম, রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগারাগি করলেন। হিন্দী ভাষায় বললেন — নিকালো। আভি নিকালো।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, চলে যাচ্ছি। হিন্দী বলার দরকার নেই।

এই বলেই স্যুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাজেই খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই। বিশাল একটা খাতা। এক ডজন বলপয়েন্ট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম। যে উপন্যাস মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টারেস্টিং গল্প।

যাই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব-একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি, সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা — সারাক্ষণ হৈচৈ।

কিছু কিছু কামরায় রাত দুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে । মেয়েছেলে নিয়ে আসে।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলীতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম। এক জজ সাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়ে ছিলেন। তাঁর শখ হয়তো এখনও আছে। ছেলেমেয়েদের শখ মিশে গেছে। এ বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম-মালি-কাম-দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার। লোকটিকে দেখে মনে হয় বদলোক। আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, মনে হচ্ছে, নিজ দায়িত্বেই দিয়েছেন। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে হল না। ওটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পৌঁছালে পৌঁছবে না পৌঁছালে নেই। আমার এক মাস থাকার কথা। সেটা থাকতে পারলেই হল। নিরিবিলি বাড়ি। আমার খুবই পছন্দ হল। লেখালেখির জন্য চমৎকার।

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। রিপালসিভ ধরনের চেহারা। তবে গলার স্বরটি অতি মধুর। আমি একাই এ বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল, স্যার কি সত্যি সত্যি একা থাকবেন ?

'হ্যাঁ।'

'বিষয়টা কি ?'

'বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।'

'আর খাওয়া-দাওয়া ? হোটেল এখানে পাবেন কোথায় ? সেই যদি শহরে যান, পাঁচ মাইলের ধাক্কা।'

AMARBOI.COM

'রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না? টাকা-পয়সা দেব।'

'আপনি বললে আমি রাঁধব। খেতে পারবেন কি-না সেটা হল কথা।'

'পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কোন খুঁতখুঁতানি নেই।'

'আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার। মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবারে মাছ-টাছ পাওয়া যায়। হাটবারের দেরি আছে। আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে। আপনার নিশ্চয়ই চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস।'

'চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।'

দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভাল খাওয়াল। রাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, এত ভাল রান্না শিখলে কোথায়? ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বলল,

'আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি। খুব ভাল রাঁধতে পারত।'

'পারত বলছ কেন? এখন কি পারে না?'

ইয়াকুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার। এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বরে বলল, এখন পারে কি পারে না জানি না স্যার। আমার সঙ্গে থাকে না।

'কোথায় থাকে?'

'জানি না কোথায় থাকে। ওর চরিত্র খারাপ ছিল। এর-তার সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্রী অবস্থা। বলার মত না। অনেক দেন-দরবার করেছি। কিছু লাভ হয় নাই। তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গেছে। বুঝে দেখেন কত বড় হারামী।'

'কতদিন আগের কথা?'

'বছর দুই।'

'কোন খবর পাওয়া যায়নি?'

'মোড়লগঞ্জ বাজারে না-কি দেখা গিয়েছিল — আমার কোন আগ্রহ ছিল না। খোঁজ নেই নাই।'

এদের জীবনের এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী শুনতে সাধারণত ভালই লাগে। আমার লাগল না। আমাদের সবার জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে। সেই সব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হল কথা বলবেই।

'জীবনে বড় ভুল কি করেছিলাম জানেন স্যার? সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম।'

'বউ খুব সুন্দর ছিল?'

'আগুনের মত ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তাই হল। আমার জীবন হল অতিষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জের বাজারে গেছি। ফিরে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম। কেউ দরজা খোলে না। শেষে ধুপ করে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বউরে বললাম — এ কে? বউ বলল, আমি কি জানি কে?' ইয়াকুব একের পর এক বউয়ের কীর্তিকাহিনী বলতে লাগল। আমি এক সময় বিরক্ত হয়ে বললাম —

AMARBOI.COM

'ঠিক আছে বাদ দাও এসব কথা।'

'বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিসী বসল। সালিসীতে ঠিক হল বাউরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। মন মানল না। তার উপর জমজ মেয়ে আছে। এর ফল হইল এই . . .'

'স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জান না?'

'জ্বি-না।'

'মেয়েরা তোমার সঙ্গেই থাকে?'

'জ্বি।'

'কি নাম মেয়েদের?'

'জমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুহীন একজনের নাম, তুষার আরেকজনের নাম। নাম রেখেছিল মেয়ের মা।'

'ভাল, খুব ভাল।'

'কোন কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এইখানেই থাকে। ডাক দিলেই আসবে।'

'না, আমার কিছু লাগবে না।'

'বিরক্ত করলেও বলবেন। থাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধার হয় নাই। মায়ের খাসিলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ, এই পায়ে আলতা, এই ঠোঁটে লিপস্টিক।'

'স্কুলে পড়ে না?'

'আরে দূর — পড়াশোনা। এরা যায় আর আসে।'

মেয়ে দু'টিকে আমার অবশ্যি খুবই পছন্দ হল। দু'জনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সব সময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই এক গ্লাস পানি দাও তো। ওম্নি ছুটে যাবে। দু'জনই দু'হাতে দু'টা পানিভর্তি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে, চাচা আমারটা নেন। চাচা, আমারটা নেন। আধগ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধ্য হয়ে দু' গ্লাস খাই। যাতে মেয়ে দুটোর কোনটাই কষ্ট না পায়।

স্নেহ নিম্নগামী। যতদিন যেতে লাগল বাচ্চা দু'টিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছোটখাট কিছু উপহার কিনে দিলাম। দু'জনের জন্যে দু'টা রঙ পেনসিলের সেট, ছোট ছোট আয়না। যাই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভাল লাগে দেখতে। ঐ বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল। বারো দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নেই।

আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ। বাড়ির ওপরে জঙ্গলা ধরনের জায়গা। এক সময় নিবিড় বাঁশবন ছিল। এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উকিল বাড়ির বিশাল বাগান। সেই বাগানে আম, জাম, লিচু থেকে শুরু করে আতাফলের গাছ পর্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাট দাড়িওয়ালা মালি সেই বাগান পাহারা দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায় — স্যারের শইলডা কি ভাল? ঘুমের কোন ডিসটার্ব হয় না তো?

আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি, ঘুমের ডিসটার্ব হবে কেন?

'শহরের মানুষ হঠাৎ গেরামে আইস্যা পড়লেন। এই জন্যে জিগাই।'

'আমার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কোন কিছুতেই কোন অসুবিধা হচ্ছে না।'

'অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয়-ডর পাইলে ডাক দিবেন। আমার নাম বদরুল। আমি রাইতে ঘুমাই না। জাগান থাকি।'

'ঠিক আছে বদরুল। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব।'

এগারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম। দিনটা সোমবার। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হল। এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, স্যার একটা বিরাট সমস্যা। তুহীনের গলা ফুলে কি যেন হয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছ নেয়া দরকার।

আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা। শুধু গলা না — সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। কি কষ্টে যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সেই জানে। মেয়েটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলেনি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, এক মুহূর্ত দেরী করা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুণি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

'স্যার, আপনার খাওয়া-দাওয়া . . . '

'আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। চাল ফুটিয়ে নিতে পারব। একটা ডিমও ভেজে নেব। তুমি দেরি করবে না।'

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকাও দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই মেয়েকে একটা গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। কেন যেন মনে হল মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল। দু'দিকে জানালা আছে। আসবাবপত্র বলতে পুরানো একটা খাট, খাটের পাশে টেবিল। লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখির জন্যে শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতির ব্যবস্থা।

কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকে ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানায় বসে লিখছি — হঠাৎ মনে হল কেউ-একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি কে কে বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল।

আমি দুর্বলচিত্তের মানুষ নই। তবে যে কোন সাহসী মানুষও কোন কারণে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্য রকম বোধ করে। আমার অন্য রকম লাগতে লাগল। সেই অন্য রকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে - না পানির পিপাসা না — অন্য কিছু। অনেক চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারলাম না। লেখার জন্যে মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকালেই সরে যাচ্ছে। দু'বার আমি বললাম — কে কে? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চেঁচানোর কোন মানে হয় না।

AMARBOI.COM

এই সময় লক্ষ্য করলাম হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তেল কমে এসেছে। এক্ষুণি হয়ত দপ্ করে নিভে যাবে। এতে ভয় পাবার তেমন কোন কারণ নেই। আরো একটি হারিকেন পাশের ঘরে আছে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলার রান্না ঘরে। তাছাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিভুনিভু হারিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিকেনে তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কিনা তাও দেখব।

দেখলাম রাতে খাবার জন্যে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ইয়াকুব ভাত রেঁধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়।

চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হল সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দু'টি মায়া মায়া। কিন্তু এই অন্ধকারে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তাহলে আমি এসব কি দেখছি?

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমত ঝড়ো হাওয়া বইছে। আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। জানালা বন্ধ করে দিলাম। শোঁ-শোঁ শব্দ তবু কমল না।

ঠিক তখন বজ্রপাত হল। প্রচণ্ড বজ্রপাত। সাউণ্ড ওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হঠাৎ চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম মেয়েলী গলায় কেউ একজন বলছে — আপনে বাইরে আসেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম — কে? সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল—ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।

অল্প বয়স্ক মেয়ে মানুষের গলা। পরিষ্কার গলা।

আমি আবার বললাম — কে, তুমি কে?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। মনে হল কেউ যেন ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হল কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি।

ধুপ ধুপ শব্দ আসছে। শব্দ কোত্থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে? আমি বারান্দায় রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন বিদ্যুৎ চমকালো। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল দিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। যে মাটি কোপাচ্ছে সে হল আমাদের — ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন। ও তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুৎ চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি কবর খুঁড়ছে? পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কি?

AMARBOI.COM

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তখনই শুধু দেখছি। বুঝতে পারছি এটা বাস্তব কোন দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনাজানা জগতের নয়। অন্য জগতে, অন্য সময়ে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত। অতি দ্রুত কবর খুঁড়ছে। কার কবর? সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশে রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা তার স্ত্রীর মৃতদেহ? কি আশ্চর্য! হাত পাঁচেক দূরে বাচ্চা দুটা বসে আছে। এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে রূপবতী স্ত্রী পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে? এই মেয়েটিকে সেই কি হত্যা করেছিল? হত্যাকাণ্ডটি কোন-এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল? কোন-এক অস্বাভাবিক উপায়ে সেই মুহূর্তটি কি আবার ফিরে এসেছে? আমি দেখছি। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন-একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোন অতি প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থান দেইনি। আজ আমি এটা কি দেখছি?

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম — তারপর? তারপর কি হল?

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হল। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।

'আপনি এই দৃশ্যটি দেখলেন, তারপর কি করলেন?'

'আপনি হলে কি করতেন?'

'আমি হলে কি করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কি করেছেন সেটা বলুন।'

'দাঁড়ান, আরো খানিকটা এলকোহল গলায় ঢেলে নেই। তা না হলে বলতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অনেকখানি কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন — আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে — আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোন ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। এক জাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর গ্লুকোজ ভাঙতে শুরু করে। মানুষ শারীরিক শক্তি পায়। ভয় কেটে যায়।

'আমার কোন ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম ঐ জায়গায়। কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে গেলাম।'

'তারপর কি দেখলেন?'

'কি আর দেখব? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভেবেছেন গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেডবডি নিয়ে বসে আছে?'

'না তা ভাবিনি।'

'নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন — এরা কোন রকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না। এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে

AMARBOI.COM

ভিজলাম, কাদায় মাখামাখি হলাম। আমার জেদ চেপে গেল। পাশের বাগানের মালিকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম। কিছুই পাওয়া গেল না।'

পরদিন থানায় খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারো খোঁড়াখুঁড়ি করা হল। কিছুই পাওয়া গেল না। সবার ধারণা হল আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে আমাকে এসে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক হবেন — এই ঘটনার পর মাসখানিক আমি ঘুমুতে পারতাম না।

'গল্পটা কি এখানেই শেষ না আরো কিছু বলবেন?'

'না আর কিছু বলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোন ভৌতিক গল্প না। ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত ইয়াকুব বৌটাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল। ভৌতিক গল্প না বলেই — ঐটা সত্যি হয়নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বর্ষার সময় প্রায়ই ঐখানে একা একা রাত্রিযাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ আমি দেখেছিলাম। নিজের উপর কনট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারিনি। কোন-একদিন বাকিটা হয়ত দেখব। ইচ্ছা করলে আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি কি যাবেন?

'না — আমার ভূত দেখার কোন ইচ্ছা নেই — আপনার ঐ মালি, ইয়াকুব না-কি যেন নাম বললেন, ও কি এখনো ঐ বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সে আপনার ঘটনা শুনে কি বলে?'

'এটাও একটা মজার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপ করে থাকে। ভাল কথা, এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিংকস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল, তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সব সময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব ...।

AMARBOI.COM

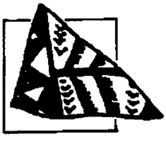

আনন্দ-বেদনার কাব্য

বইটির নাম — রিক্তশ্রী পৃথিবী।

প্রচ্ছদে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁদছে। তার মুখের পাশে একটি গ্লোব। একটি বিকটদর্শন নর-কংকাল গ্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কংকালটির ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিক্তশ্রী ফুটিয়ে তোলার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই।

এ ধরনের প্রচ্ছদচিত্রের বইগুলোর পাতা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেই পাতা উল্টালাম। এবং এক সময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন,

'দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে রিক্তশ্রী পৃথিবীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নূরন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদচিত্রটি অংকন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায় আমার বেনু মা দেখিতে পাইলো না।'

বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে।

সেখানে লেখা প্রচ্ছদশিল্পী ঃ মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার খানম। দশম শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি ঘিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম। লম্বা বেণীর দশম শ্রেণীর কালোমতো রোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে রাত জেগে প্রচ্ছদ আঁকছে। আঁকা হবার পর বাবাকে দেখাল সেটি। পৃথিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি-হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারী লজ্জায় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে বলল, দূর ছাই, মোটেও ভালো হয়নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয়নি মানে? আঁকুক দেখি কেউ এ-রকম একটা ছবি।

বই অবশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এ রকম বই? দু'একজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলেরে ভাই? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপেন।

প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্ত্রীর কানের দুলজোড়া বিক্রি করতে হল। সে বছর ঈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁজে পেতে সস্তার একটি প্রেস বের করলেন যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব, গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভক্ত। গ্রন্থকার লিখেছেন,

'টাউন প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুস সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মানুষটির সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। জনাব আবদুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নাই।'

ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাবেলায় প্রুফ দেখতে যখন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখে বলতেন, এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেণ্ড প্রুফ রেডি। কই রে কবি সাহেবের জন্য চা আন। চা খেতে খেতে বললেন, প্রুফে চোখ বুলাতে বুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।

AMARBOI.COM

কোন্ কবিতাটির কথা বলছেন?

ঐ যে কি যেন বলে, ইয়ের ওপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।

ও 'নব-বর্ষার' কথা বলছেন?

হ্যাঁ, ঐটাই। চমৎকার। খুবই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক।

কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আবদুস সালাম সাহেবকে দিতে পারেননি। সালাম সাহেব বললেন, যখন পারেন দিবেন। কবি মনুষ আপনি। আপনার কাছে টাকা মার যাবে নাকি — হা হা হা। ক'জন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে?

ভূমিকা পড়েই জানতে পারলাম নেত্রকোনা শহরে একজন প্রবীণ উকিল বাবু নালিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ । কবি লিখেছেন,

'বাবু নলিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নলিনী রঞ্জন একজন স্বভাব-কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মঞ্জুর্ষা'তে আমার একটি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগন্থ অনতিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় তখনই আমি স্থির করি . . . ।'

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'তে মোট একশ' তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি — 'দিবাবসান' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা,

'আমার বড় শ্যালক জনাব আমীর সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সন্নিকটে খরস্রোতা একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্ধ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।'

অন্য একটি কবিতার (বাসর শয্যা) ফুটনোটটি এ রকম —

'এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাত্রে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমরা নব-পরিণীতা বালিকা-বধূ মেঘগর্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।'

বাসর রাত্রিতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নুতন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কি সেই রাত্রেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে? না শুনিয়ে কি পারেন? ঝড় জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই রাত কি যে অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ'পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারে, সে পরবর্তী সময়ে কি পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছে তার স্ত্রীর মনে। ঘরে হয়তো টাকা-পয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর। তার জন্যে সাগু কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে জল। লিখছেন, 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের দীর্ঘ কোনো রচনা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয়?

AMARBOI.COM

দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাদের তাড়া করে ফিরে। কেন করে? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বেশিরভাগই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েকজন ভালোমানুষ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কারোর কাছে তাঁদের আবেগের কথা পৌঁছাতে পারেন না। কৃপণ ঈশ্বর এঁদেরকে আবেগে উদ্বেলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মত ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দুঃখী মানুষ।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার এমন কষ্ট হল। কবি কতো বিচিত্র বিষয় নিয়ে কতো আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কি আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হল? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেননি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি মনশ্চক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট, 'হে মহা সিন্ধু'।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু রিক্তশ্রী পৃথিবীর প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিক্রীত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সেরদরে বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী মাঝে মাঝে গোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কি আছে? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্ত্রী মুগ্ধ চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, আমার স্বামী তাহলে সত্যি সত্যি একটি বই লিখে ফেলেছেন? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উঁচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে?

স্যার, প্রচ্ছদটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি? বাহ্ চমৎকার।

রিক্তশ্রী পৃথিবীর শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম — 'মাগো'। কবিতাটি নূরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা । ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ 'উপশম' দেবার জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে। একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ কেউ কবি হতে পারেন। অল্প কিছু পংক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের 'রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি।

AMARBOI.COM

অপেক্ষা

বশির মোল্লার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি কোন কিছুতেই রাগ করেন না।

রেগে যাবার মত কোন ঘটনা যখন ঘটে, তিনি সারা চোখে–মুখে উদাস এক ধরনের ভাব ফুটিয়ে মৃদু গলায় বলেন, আচ্ছা আচ্ছা।

না রাগার মহৎ গুণের জন্যে তিনি পরপর তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন। বাড়িতে পাকা দালান তুলেছেন। দশ বছর আগে জমির পরিমাণ যা ছিল আজ তাই বেড়ে তিনগুণ হয়েছে। সম্প্রতি একটি পাওয়ার টিলার কিনেছেন। অনেক দূর দূর থেকে মানুষজন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির বারান্দায় পলিথিনের কাগজে ঢেকে রাখা যন্ত্রটি দেখতে আসে। বশির মোল্লা যন্ত্রটি এখনো মাঠে নামাননি। এই সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর 'না রাগা' স্বভাবের জন্যে, মোলায়েম কথাবার্তার জন্যে। অন্তত বশির মোল্লার নিজের তাই ধারণা।

শ্রাবণ মাসের সকাল।

দু'দিন আগে প্যাচপ্যাচ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয়নি। আকাশ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে দুপুরের আগে বৃষ্টি কমবে না।

বশির মোল্লা বাংলা ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছেন। নানান কারণে তার মন বিক্ষিপ্ত। আশেপাশে ডাকাতি হচ্ছে। তাঁর বাড়িতেও হতে পারে। এখন পর্যন্ত কেন হয়নি সেটাই রহস্য। অবশ্যি একটি দোনলা বন্দুক তাঁর আছে। বন্দুকের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্যে পাখি শিকারের নাম করে পরশু সকালেই তিনটা গুলি করলেন। কাজটা ঠিক হল কিনা তাও বুঝতে পারছেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। বন্দুকের লোভে ডাকাত আসতে পারে। ডাকাতের দুশ্চিন্তা ছাড়াও অন্য আরেকটি দুশ্চিন্তা তাঁকে কাবু করে ফেলেছে — তিনি ঝোঁকের মাথায় গত বছর আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছেন। মেয়েটির বয়স অল্প। কিছুতেই পোষ মানছে না। তাঁর নিজের বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সে সতের বছরের তরুণীর মন ভুলাবার জন্যে যে সব ঢং করতে হয় তা করা বেশ কষ্ট। তবু তিনি করার চেষ্টা করছেন । লাভ হচ্ছে না। মেয়েটি পোষ মানছে না।

আজ সকালে তাঁর মনের অবস্থা শ্রাবণ মাসের আকাশের মতই ঘোলাটে। অবশ্যি তাঁর মুখ দেখে কেউ তা বুঝতে পারবে না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বৃষ্টি-ভেজা সকালের অবসর বেশ উপভোগ করছেন। ভেতরের বাড়িতে চায়ের কথা বলা হয়েছে। চা এখনো আসেনি। এই বাড়িতে শহরের বাড়িঘরের মত দু'বেলা চা হয়। খবরের কাগজ আসে। দু'দিন দেরি হয়, তবে নিয়মিত আসে।

AMARBOI.COM

বশির মোল্লার কোলে খবরের কাগজ পড়ে আছে। তবে তিনি কাগজ পড়ছেন না। কাগজ পড়তে তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। ছবিগুলি দেখেন। ছবির নিচের লেখাগুলিও সব সময় পড়তে ভাল লাগে না। বশির মোল্লা অলস চোখে খবরের কাগজের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে এরশাদ সাহেবকে একজন বৃদ্ধের কাঁধে হাত রেখে কি যেন বলতে দেখা যাচ্ছে। গুচ্ছ গ্রাম-ট্রাম হবে। একেক প্রেসিডেন্ট এসে একেকটা কায়দা করেন। জিয়া সাহেব খাল কাটিয়ে গেছেন। ইনি বানাচ্ছেন গুচ্ছ গ্রাম। পরের জন এসে কি করবে কে জানে।

'পেসিডেন সাব।'

বশির মোল্লা, খবরের কাগজ থেকে চোখ তুললেন। এদিকের সবাই তাঁকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদের সুবাদে প্রেসিডেন্ট সাব ডাকে। তাঁর ভালই লাগে। আজ লাগল না, কারণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেরামত। কেরামত তাঁর বাড়ির কামলা। দশ বছর বয়স থেকেই আছে। এখন বয়স হয়েছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। বোকা ধরনের মানুষ। এরা কামলা হিসাবে অসাধারণ হয়। যা করতে বলা হয় মুখ বুজে করে। বশির মোল্লা কেরামতকে দেখে বিরক্ত হলেন। কারণ কেরামতের এখন ক্ষেতে থাকার কথা। তাঁর সামনে ঘুরঘুর করার কথা না।

কিছু বলবি না-কি রে কেরামত?

একটা কথা ছেল।

বলে ফেল্।

কেরামত মাথা নিচু করে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বয়স তো হইল। এখন যদি একটা বিবাহ দিয়া দেন। ঘর-সংসার করি। ঘর-সংসার করতে মন চায়।

বশির মোল্লা বিস্মিত স্বরে বললেন, বিয়ে করতে চাস?

কেরামত গলার স্বর আরো নিচে নামিয়ে বলল, বয়স হইতাছে। ঘর-সংসার করতে ইচ্ছা হয়। নবিজীও বয়সকালে বিবাহের কথা বলেছেন, হাদিস-কোরানে আছে।

পছন্দের কেউ আছে না-কি?

না। আপনে দেখাশোনা কইরা . . .

আচ্ছা ঠিক আছে, হবে। আমিই ব্যবস্থা করব। ঘর তুলে দিব। জমিও দিয়ে দিব। বেতন তো কিছু নেস না — সব জমা আছে। ব্যবস্থা করে দিব।

জ্বে আচ্ছা।

এখন যা, কাজে যা। কাজ ফালায়া আসা ঠিক না।

জ্বে আচ্ছা।

বিয়ের কথা বারবার আমারে বলারও দরকার নাই। আমার মনে থাকব। সুবিধামত ব্যবস্থা করব। বিয়া-সাদী তাড়াহুড়ার ব্যাপার না।

জ্বে আচ্ছা।

AMARBOI.COM

রাতে পাহারার ব্যাপারটা ঠিক আছে তো? খুব সাবধান। দল বাইন্ধা লাঠি-শরকি হাতে পাহারা দিবি।

জ্বে আচ্ছা।

পরের তিন বছর বশির মোল্লার উপর দিয়ে নানান বিপদ-আপদ গেল। জমি সংক্রান্ত এক মামলায় জড়িয়ে থানা-পুলিশে অনেক টাকা গচ্ছা গেল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেও মরমর হল। দীর্ঘদিন তাঁকে ঢাকায় রেখে চিকিৎসা করতে হল। তাঁর বাড়িতে একবার ডাকাতিও হল। তারচে' বড় কথা — তাঁর অতি মোলায়েম স্বভাব সত্ত্বেও তিনি পরপর দুটি ইলেকশনে হেরে গেলেন। স্কুল কমিটির নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচন। এই রকম অবস্থায় মেজাজ ঠিক থাকে না। কাজেই কেরামত আবার যখন বিয়ের প্রস্তাব তুলল তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তুই এমন বিয়ে-পাগলা হলি কেন বল্ তো? এই অবস্থায় বিয়ের কথা তুললি কিভাবে?

কেরমাত বলল, তিন বছর পার হইছে পেসিডেন্ট সাব।

আমার অবস্থা তুই দেখবি না? তুই কি বাইরের লোক? তুই ঘরের লোক না? একটু সামলে উঠি, তারপর ব্যবস্থা করব।

জ্বে আচ্ছা।

তোর তো ঘর-দোয়ারও লাগব। বউ এনে তুলবি কোথায়? একটু সামলে উঠি, তারপর তোকে জমিজমা লিখে দিব। তখন বিয়ে হবে, তাড়াহুড়ার কোন ব্যাপার না।

জ্বে আচ্ছা।

নিজের মনে কাম করে যা। তোর বিয়ের চিন্তা তোর করা লাগবে না। আমি আছি কি জন্যে? একটু সামলে উঠি।

AMARBOI.COM

বশির মোল্লা পাঁচ বছরের মাথাতেই সামলে উঠলেন। বেশ ভালভাবেই সামলে উঠলেন। স্কুল কমিটির সভাপতি হলেন। উপজেলা ইলেকশনে জিতলেন। রোয়াইল বাজারে বাড়ি বানালেন। গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে এলেন। তবে গ্রামের বাড়িতে এখন তিনি বেশি থাকেন না। রোয়াইল বাজারেই থাকেন। তাঁর মনের শান্তি ফিরে এসেছে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আরো একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে পুরোপুরি পোষ মেনে গেছে। পৌষ মাসের এক সন্ধ্যায় বশির মোল্লা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দিন তিনেক থাকবেন। আজকাল একনাগাড়ে বেশিদিন গ্রামের বাড়িতে থাকা হয় না। শহরের নানান কাজকর্ম থাকে। কাজকর্ম ফেলে গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকা সম্ভব না। তাছাড়া বেশ কিছু শত্রু তৈরি হয়েছে। এরা কখন কি করে বসে, শহরে সেই সুযোগ কম।

বাড়িতে পা দেয়া মাত্র কেরামতের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই তো দেখি বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস রে কেরামত।

কেরামত মাথা নিচু করে ফেলল। যেন বুড়ো হয়ে যাওয়া একটা অপরাধ। বশির মোল্লা বললেন, না এবার তোর বিয়েটা দিয়ে দিতে হয় — দেখি এই শ্রাবণেই ব্যবস্থা করব। বিয়ে-শাদীর জন্য শ্রাবণ মাস ভাল।

কেরামত ক্ষীণ স্বরে বলল, জ্বে আচ্ছা।

তুই একটা ঘর তুলে ফেল। পুষ্কুনির উত্তর পাড়ে যে জায়গাটা আছে ঐখানে। বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ যা লাগে নে। ঘরটা আগে হউক।

জ্বে আচ্ছা।

বিয়ে একটু বেশি বয়সে হওয়াই ভাল, বুঝলি কেরামত? এতে মিল-মহব্বত ভাল হয়। তুই ঘর তুলে ফেল। উপরে ছন দিয়ে দিস। ছনের টাকা নিয়ে যাস। তোর তো টাকা পাওনাই আছে।

বশির মোল্লা তিনদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন। থাকতে হল সাতদিন। স্কুল কমিটির কিছু সমস্যা ছিল। সমস্যা মেটাতে হল। ফুড ফর ওয়ার্ক প্রগ্রামে একশ' মণ গম এসেছিল। সেখান থেকে সত্তুর মণ গমের হিসাব পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটাও ঠিকঠাক করতে হল। কয়েকটা গ্রাম্য সালিশী করতে হল। দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে গেল। শহরে ফেরার দিন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে কেরামতের তৈরি ঘর দেখলেন। সে এই সাতদিনে সুন্দর ঘর তুলে ফেলেছে। ঘরের চারপাশে কাঠাল, আম এবং পেয়ারা গাছের চারা লাগিয়েছে।

বশির মোল্লা বললেন, গাছপালা লাগিয়ে তুই তো দেখি হুলুস্থুল করে ফেলেছিস।

কেরামত নিচু গলায় বলল, ফল-ফলান্তির গাছ, পুলাপান বড় হইয়া খাইব।

ভাল করেছিস। ভাল। কয়েকটা নারকেল গাছও লাগিয়ে দে।

জ্বে আচ্ছা।

দেখি এই শ্রাবণেই বিয়ে লাগিয়ে দিব।

জ্বে আচ্ছা।

সেই শ্রাবণে কিছু হল না। তার পরের শ্রাবণেও না। বশির মোল্লা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিডনির অসুখ। চিকিৎসা করাতে সপরিবারে ঢাকা গেলেন।

কেরামতকে বলে গেলেন, সেরে উঠেই বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলবেন। মেয়ে কয়েকটা দেখে রেখেছেন। এদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্র ভাল দেখে কাউকে ঠিক করা হবে।

বিয়ে-শাদী হুট করে হয় না। লাখ কথার আগে বিয়ে হওয়া ঠিক না। চিরজীবনের ব্যাপার।

কেরামত নিচু গলায় বলল, কন্যা স্বাস্থ্যবতী হইলে ভাল হয়। ঘরে কাজকর্ম আছে।

অবশ্যই। অবশ্যই। গ্রামের বউ রোগাপটকা হইলে চলে না। আছে, স্বাস্থ্যবতী মেয়েও সন্ধানে আছে। তুই এই বিষয়ে চিন্তা করিস না। আমি আছি কি জন্যে?

কেরামত চিন্তা করে না। নিজের হাতে লাগানো ফলের গাছগুলিকে যত্ন করে। একটা গাছও যেন না মরে। বিয়ের পর ছেলে-পুলে হবে, ফল-ফলান্তির গাছ দরকার। বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম। ছেলে-পুলেকে ফল-ফলান্তি কিনে খাওয়ানো সম্ভব না।

কেরামত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে। সে জানে না তার বয়স পাঁচপঞ্চাশ পার হয়েছে। এখন তার মাথার চুল সবই সাদা। বাঁ চোখে ভাল দেখতেও পায় না। গায়ে সেই আগের জোরও নেই। কাজকর্ম তেমন করতে পারে না। তবু পুরানো অভ্যাসে সারাদিন ক্ষেতে পড়ে

AMARBOI.COM

থাকে। সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়িতে এসে অনাগত স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের কথা ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

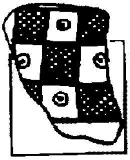

শীত

মাঝ রাতে মতি মিয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

বুকে একটা চাপ ব্যথা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসের কষ্টটা শুরু হল বোধহয়। সে কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কি অসম্ভব ঠাণ্ডা! বুড়োমারা শীত পড়েছে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে বরফ-শীতল হাওয়া আসছে। হাতে-পায়ে কোন সাড় নেই। ঠাণ্ডায় জমে গেছে নাকি?

মতি মিয়া বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কিছুতেই ফুসফুস ভরানো যায় না। কেউ একটু হাওয়া করলে আরাম হত। ডাকবে নাকি ফরিদের মাকে? মতি মিয়া উঠে বসবার চেষ্টা করল। আশ্চর্যের ব্যাপার — ব্যথাটা কমে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মতি মিয়ার মনে হল কেউ যেন তাঁর কাঁথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অশরীরী কেউ। সে হাত রাখল মতি মিয়ার পেটে। অসম্ভব শীতল হাত। সেই হাতে বড় বড় আঙুল। একবার হাত রেখেই সে হাত সরিয়ে নিল। মতি মিয়া ভয় পেয়ে ডাকল, বৌমা ও ফরিদের মা।

ফুলজান, ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমায়। শ্বশুরের বেশিরভাগ কথারই সে কোন জবাব দেয় না। আজ দিল। বিরক্ত স্বরে বলল, কি হইছে?

কুপীটা ধরাও গো মা। বড় ভয় লাগতাছে।

ঘুমান দেহি।

কে জানি আমার পেটের মইধ্যে হাত দিল।

স্বপ্ন দেখছেন। কার ঠেকা পরছে আপনের পেটে হাত দিব।

ফরিদরে এট্টু দিয়া যাও আমার সাথে। দিয়া যাও গো মা। ও ময়না।

খামাখা চিল্লাইয়েন না, ঘুমান।

ও ফরিদের মা, ও বেটি।

ফুলজান সাড়া দিল না। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। জমাট অন্ধকার চারদিকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবিন্দু আলোও আসছে না। বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ। তার ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। বুড়োকালে মানুষের ভয় বেড়ে যায়। অকারণেই গা ছমছম করে। বুড়োকাল বড় অদ্ভুত কাল।

AMARBOI.COM

রান্নাঘরে খচমচ শব্দ হচ্ছে। ফুলজান কি জেগে আছে? নাকি ইঁদুর? ইঁদুরের বড় উৎপাত হয়েছে। ফুলজান বিড়বিড় করে কথা বলছে। কে জানে হয়তো বা কূপী জ্বালাবে। দেখতে আসবে তাকে। যতটা খারাপ মনে হয় মেয়েটা তত খারাপ না। মায়া-মহব্বত আছে। মতি মিয়া কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কি ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। এই শীতটা বোধহয় কাটানো যাবে না। ভালমন্দ কিছু এবারই হবে।

বৌমা ঘুমাইলা নাহি, ও ফরিদের মা।

কিতা?

দুই কেঁথায় শীত মানে না।

না মানলে আমি কি করুম কন?

বুড়াকালে শীতটা বেশি লাগে। ফরিদরে দিয়া যাও আমার কাছে। ও ফরিদের মা।

ফুলজান জবাব দেয় না।

ও ফরিদের মা, ও ময়না।

লাভ হয় না কোন। মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুতে চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। বুড়ো-কালের এই এক যন্ত্রণা, একবার ঘুম ছুটে গেলে আর ঘুম আসে না। শীতের রাত জেগে পার করা বড় কষ্ট। ফুলজানের দু'টো বাচ্চা থাকলে ভাল হত। একটাকে রাখতেন নিজের কাছে। পুলাপানের গায়ে জবর ওম। লেপের চেয়ে বেশি ওম। মেছের আলি বেঁচে থাকলেও হত। একটা জোয়ান ছেলে আশেপাশে থাকলেই ঘরবাড়ি গরম থাকে। মতি মিয়ার বুক হু-হু করতে লাগল। বুড়োকালে আশেপাশে একটা জোয়ান ছেলে দরকার। মেছের আলির কথা তার বেশিক্ষণ মনে রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্ষিধে লেগে গেল। অথচ ক্ষিধে লাগার কোনই কারণ নেই। শীতের শুরুতেই ভাতের কষ্ট দূর হয়েছে। ফুলজান রোজ দারোগা বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসছে। একজনের ভাত কিন্তু তিনজনেরই ভরপেট হচ্ছে।

আজ খাওয়া হয়েছে টেংরা মাছের তরকারি ও ডাল দিয়ে। এইসব ছোটখাট জিনিস তার মনে থাকে না। কিন্তু আজকেরটা মনে আছে। কারণ টেংরা মাছের কাটা বিঁধে গিয়েছিল। বড় কষ্ট হয়েছে। শরীরের কষ্টটা এখন বেড়ে গেছে, অল্পতেই কষ্ট হয়।

রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। ব্যাপারটা কি? ঘুম ভাঙল নাকি ফরিদের? মাঝে মাঝে ফরিদ চুপি চুপি চলে আসে তার কাছে। বুকের কাছে গুটিশুটি মেরে ঘুমায়। বড় আরাম লাগে। মতি মিয়া উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে। এবং এক সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করে রান্নাঘরে কূপী জ্বালানো হয়েছে। বিজবিজ শব্দ শোনা যায়। ফরিদের মা নিজের মনেই কথা বলছে নাকি?

বৌমা কি হইছে?

কিছু অয় নাই।

বাত্তি জ্বালাইলা বিষয়ডা কি?

ফরিদ বিছানা ভিজাইছে।

কও কি, শীতের মইধ্যে কামডা কি করল?

একটা চড়ের শব্দ শোনা যায়। ফরিদ অবশ্যি কাঁদে না। মতি মিয়া উল্লসিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে, এরে দিয়া যাও আমার কাছে। মাইর ধুইর করার কাম নাই। পুলাপান মানুষ।

AMARBOI.COM

ফুলজানের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এখানে আনবে না নিশ্চয়ই।

ও বৌমা। ও ফরিদের মা।

কি?

ভিজা কেঁথার মইধ্যে রাখন ঠিক না। বুকে কফ জমলে মুশকিলে পড়বা। দিয়া যাও আমার কাছে।

ফুলজানের দিক থেকে কোন সাড়া নেই। ফরিদ খুনখুন করে কাঁদতে শুরু করেছে। মতি মিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর তখনি ফুলজান ফরিদকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক হাতে ধরে থাকা কূপীর সবটা আলো পড়েছে তার মুখে। মুখ থমথম করছে তার। বোধহয় কেঁদেছে খানিকক্ষণ আগে। ফুলজান মাঝে মাঝে রাত জেগে কাঁদে। মতি মিয়া সরে নাতির জন্যে জায়গা করে দিল। ফরিদ চোখ বন্ধ করে আছে। ঘুমের ভান। এমন বজ্জাত হয়েছে। ফুলজান দাঁড়িয়ে আছে কূপী হাতে। কিছু বলবে বোধ হয়।

কিছু বলবা নাকি মা?

না।

শীতটা পড়ছে মারাত্মক। রশীদ সাবের কাছে একবার যাইবা নাকি? কম্বল যদি দেয় একটা।

ফুলজান কিছু বলল না। কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল। ফরিদের মা যাবে না। যে কোন কারণেই হোক রশীদ সাহেবের কাছে সে যেতে চায় না। রিলিফের গম এল একবার। সবাই গেল, ফুলজান গেল না। পা টেনে টেনে যেতে হল মতি মিয়াকেই।

ও ফরিদের মা।

কি কইবেন কন?

যাইবা নাকি কাইল একবার রশীদ সাবের কাছে?

কম্বলের আমার দরকার নাই। শীত লাগে না আমার।

তোমার না লাগলে কি, আমার তো লাগে।

আপনের লাগলে আপনে যান।

মতি মিয়া উঠে বসার চেষ্টা করে। ফরিদ শুয়ে আছে তার গা ঘেঁষে। সে অন্য রকম একটা উত্তেজনা অনুভব করে।

বুঝলা ফরিদের মা, আমার হক আছে। আমার ছেলে মরে নাই যুদ্ধে? কও তুমি, যুদ্ধে মরে নাই?

হেতো কতই মরছে।

সবের হক আছে। বুঝলা? কম্বল আমার হকের জিনিস।

ফুলজান হাই তুলে কূপী হাতে রান্নাঘরে ঢুকল। বাতি নিভে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রাত কতটা বাকি কে জানে? মতি মিয়ার প্রস্রাবের চাপ হয়েছে। শীতের মধ্যে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রস্রাবের চাপ এমন এক জিনিস যা ক্ষিধের মত হু-হু করে বাড়তে থাকে।

ফরিদ ঘুমাইছস?

হু।

AMARBOI.COM

ঘুমাইলে কথা কস ক্যামনেরে ছাগল?

ফরিদ খুকখুক করে হাসে। মতি মিয়াও হাসে। বড় ভাল লাগে তার। বড় মায়া লাগে।

কাইল কম্বল আনতে যামু বুঝলি ফরিদ?

আইচ্ছা।

তুইও যাইবি আমার সাথে। হকের কম্বল। ঠিক না?

হু।

ফরিদ ঘুমাইছস?

ঘুমাইছি।

পেসাব করন দরকার।

মতি মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে উঠা সম্ভব না। কিন্তু ইতিমধ্যে তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। মাবুদে এলাহী, বুড়ো হওয়ার বড় কষ্ট।

ফরিদ ঘুমাইছস?

ফরিদ জবাব দেয় না। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। মতি মিয়া ঘুমন্ত ফরিদের সঙ্গেই কথাবার্তা চালাতে থাকে। কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকলে মনটা অন্য দিকে থাকে। তলপেটের চাপের কথাটা মনে থাকে না।

বুঝলি ফরিদ, কাইল যামু রশীদ সাবের কাছে। তোর বাপের নাম কইলে না দিয়া উপায় নাই। বুঝছস? তুইও যাবি আমার সাথে। চুপ কইরা বইসা থাকবি। ফাইজলামি বাদরামি করলে চড় খাইবি। বুঝছস?

মতি মিয়া অনবরত কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বড় ভাল লাগে তার।

সকালটা শুরু হয়েছে খুব চমৎকারভাবে। চনমনে রোদ উঠেছে। কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে মাঘ মাসের সকাল। মতি মিয়া আয়েশ করে রোদে বসে আছে। বড় আরাম লাগছে।

ফুলজান ফরিদকে টিনের থালায় মুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে ঘরে পান্তা নেই। যেদিন পান্তা থাকে না সেদিন দুপুরে ফরিদের মা গরম ভাতের ব্যবস্থা করে। আজও করবে। দুই-এক গাল মুড়ি খেলে হত। ফরিদ থালা নিয়ে ঘুরছে দূরে দূরে। মুড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাছে ভিড়বে না। মতি মিয়া ডাকল, ওই ফরিদ, ওই। এদিকে আয় দাদা। ফরিদ না শোনার ভান করল। মহা বজ্জাত হয়েছে ছোকরা।

ফুলজান দারোগা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দুপুর বেলা মনে করে এলে হয়। আসবে ঠিকই। মায়া-মহব্বত আছে মেয়েটার। ভাল মেয়ে।

দারোগা বাড়ি যাও নাকি গো মা?

হু।

আইচ্ছা ঠিক আছে। যাও। রইদটা একটু তেজী হউক, আমিও যাইতাছি রশীদ সাবের কাছে।

ফুলজান কোন জবাব দিল না। মতি মিয়া ইতস্তত করে বলেই ফেলল, চিড়া-মুড়ি কিছু আছে? শইলডা যেন কেমন কেমন লাগে।

AMARBOI.COM

চিড়া-মুড়ি কিছু নাই।

ঠিক আছে। অসুবিধা নাই। তুমি যাও।

রোদটা এত আরামের যে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না। তবু মতি মিয়া উঠল। রশীদ সাহেবের কাছে যাওয়া দরকার। মতি মিয়ার মন বলছে আজ গেলে কিছু-একটা হবে। না হয়েই পারে না।

আয়রে ফরিদ।

ফরিদ তার থালার মুড়ির শেষ দানাটি মুখে ফেলে দাদার হাত ধরল। চিকন গলায় বলল, কোলে নাও। কাউকে কোলে নেবার বয়স কি আছে মতি মিয়াব? তবু সে ফরিদকে কোলে নিল। কিছু দূর নিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। পুলাপান মানুষ, একটা শখ হয়েছে।

রশীদ সাহেব সোহাগীর সি.ও. রেভিন্যু।

লোকটি ছোটখাট। তাঁকে দেখেই মনে হয় সবার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন। ভুরু না কুঁচকে তিনি কারো দিকে তাকাতে পারেন না। কম্বলের প্রসঙ্গে তাঁর কোন ভাবান্তর হল না। তিনি অফিসের উঠোনে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি সরালেন না। মতি মিয়া দ্বিতীয়বার বলল, শীতে বড় কষ্ট পাইতাছি।

রশীদ সাহেব সে কথারও কোন জবাব দিলেন না। শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন। মতি মিয়া ভেবে পেল না কথাগুলি কিভাবে বললে শীতের কষ্টটা পরিষ্কার বুঝা যাবে। রশীদ সাহেব কম্বলের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, নিরাসক্ত গলায় বললেন, এই ছেলে কে?

জ্বি, আমার নাতি। মেছের আলির ছেলে।

কার ছেলে?

মেছের আলির। মেছের আলিরে চিনিলেন না? যুদ্ধ করল যে মেছের আলি।

রশীদ সাহেব বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তিনি চিনেছেন। মতি মিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। এই লোকটা বিরক্ত হচ্ছে কেন? তার ছেলের কথায় বিরক্ত হওয়ার কি আছে?

গত বছর রিলিফের গম এল। মতি মিয়া গম আনতে গিয়ে বলল, চিনছেন তো আমারে? আমি মেছের আলির বাপ। যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেল যে মেছের আলি। চ্যাংড়া মত একটি অপরিচিত ছেলে গম দিচ্ছিল। সে চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, মেছের আলির জন্যেও গম দেয়া লাগবে? সেও রুটি খাবে? লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হেসে উঠল। যেন এ রকম মজার কথা তারা বহুদিন শুনে নাই।

রশীদ সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন। কিংবা কে জানে হয়ত রেগেও যাচ্ছেন। অফিসার মানুষ। রেগে গেলে প্রথম দিকে বোঝা যায় না। তাঁরা রাগ চেপে রাখেন। চেঁচামেচি হৈচৈ শুরু করে ছোট লোকেরা। মতি মিয়ার মত মানুষরা।

মতি মিয়া গলা পরিষ্কার করে বলল, জবর যুদ্ধ করেছিল মেছের আলি। নীলগঞ্জে একটা সড়কের তারা নাম দিছে, 'শহীদ মেছের আলি সড়ক।' নীলগঞ্জ হইল গিয়া আপনার এইখান থাইক্যা . . .

চিনি, নীলগঞ্জ কোথায় চিনি।

রশীদ সাহেবের ভুরু কুঁচকানো। মতি মিয়া চুপ করে গেল। বেলা অনেক হয়েছে। পেটের খিদে জানান দিচ্ছে। মুখ ভর্তি করে থুথু জমা হচ্ছে। রশীদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, দাঁড়ান আপনি, একটা কম্বলের ব্যবস্থা করছি। চা খাবেন?

মতি মিয়ার চোখে পানি এসে গেল। বলে কি এই লোক? মতি মিয়া চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, গত বৎসর বড় কষ্ট করেছি জনাব। দানা পানি নাই। শেষে ফরিদের মা কইল, বুধবারের বাজারে একটা থালা লইয়া বসেন। বসলাম গিয়া। নিজ গেরামের বাজারে ভিক্ষা করা শরমের কথা। বড় শরমের মধ্যে ছিলাম জনাব।

মতি মিয়া ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। ফরিদ তাকিয়ে আছে। সে বড়ই অবাক হয়েছে।

রশীদ সাহেব শুধু যে কম্বল দিয়েছেন তাই না, পঞ্চাশটি টাকাও দিয়েছেন। সেই টাকার খানিকটা ভাঙ্গিয়ে মতি মিয়া চা ও চিনি কিনে ফেলল। ফরিদকে বলল, বুড়াকালে চা টা খুব দরকার। বুকে কফ জমে না। ভাল ঘুম হয়। বুঝলিরে বেকুব। বুড়াকালে চা হইল গিয়া অষুধ।

তারা দু'জন সাড়া দুপুর বাজারে ঘুরল। মতি মিয়া পরিচিত সবাইকেই নতুন কম্বল দেখাল। তার গাল ভর্তি হাসি, মেছের আলির কারণে পাইলাম, বুঝলা না? মেছেরের নাম কইতেই মন্ত্রের মত কাম হইল। বিলাতী জিনিস, হাত দিয়া দেখ। জবর ওম। চাইর পাঁচ শ' টেকা দাম হইব, কি কও?

মতি মিয়ার মনে ক্ষীণ আশংকা ছিল ফরিদের মা কম্বলটা হয়ত নিজের জন্যে দাবি করবে। মেছের আলির কম্বলে ওদের দাবিই তো বেশি। কিন্তু তা সে করল না। চকচকে নতুন কম্বলের প্রতি তার কোন রকম আগ্রহ দেখা গেল না। সে যথারীতি ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমুতে গেল।

দীর্ঘদিন পর আরাম করে ঘুমুতে গেল মতি মিয়া। এত আরাম যে চট করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে না। জেগে গল্প করতে ইচ্ছা করে।

ফরিদের মা, ঘুমাইলা নাকি?

না।

জবর ওম কম্বলটার মইধ্যে। বিলাতী জিনিস তো। বিলাতী জিনিসের ওম অন্য রকম। ভাল ঘুম হইব।

ঘুমান ভাল কইরা।

ফরিদের মা।

কন কি।

মেছেরের কথা কইতেই রশীদ সাব খুব ইজ্জত করল। চা খাওয়াইল। শরীফ আদমী। খুব শরীফ আদমী।

ফুলজান জবাব দিল না। মতি মিয়া বলল, ফরিদরে দিয়া যাও, আমার সাথে বাপের কম্বলের নীচে ঘুমাউক। ফুলজান সে কথারও জবাব দিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?

গভীর তৃপ্তিতে ঘুমুবার আয়োজন করল মতি মিয়া। ছেলের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যাচ্ছে। বড় শান্তি লাগছে। ঘুমের মধ্যেই সে শুনল, ফুলজান কাঁদছে। সে প্রায়ই

AMARBOI.COM

কাঁদে। তার কান্না শুনতে মতি মিয়ার কোন কালেই ভাল লাগে না। কিন্তু আজ ভাল লাগছে। কেমন যেন গানের সুরের মত সুর।

আরাম করে ঘুমায় মতি মিয়া। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়ছে। উত্তর দিক থেকে বইছে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া।

ওইজা বোর্ড

প্রায় আট বছর পর নাসরিনের বড় ভাই আলাউদ্দিন দেশে ফিরল। সঙ্গে বিদেশী বউ। বউয়ের নাম ক্লারা। বউয়ের চুল সোনালী, চোখ ঘন নীল, মুখটাও মায়া মায়া। তবু মেয়েটাকে কারোরই পছন্দ হল না।

যে পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে নাসরিন বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল, ভাইকে দেখে সে ঠিক ততখানি নিরাশ হল। আট বছর আগে নাসরিনের বয়স ছিল নয়। এখন সতেরো। ন'বছর বয়েসী চোখ এবং সতেরো বছর বয়েসী চোখ এক রকম নয়। ন' বছর বয়েসী চোখ সব কিছুই কৌতূহল এবং মমতা দিয়ে দেখে। সতেরো বছরের চোখ বিচার করতে চেষ্টা করে। তার বিচারে ভাইকে এবং ভাইয়ের বৌ-কে — দুজনকেই খারাপ লাগছে।

নাসরিন দেখল তার ভাই আগের মত চুপচাপ, শান্ত ধরনের ছেলে নয়। খুব হৈ- চৈ করা শিখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে সবার সামনে বেশ আহ্লাদ করছে। ঠোঁট গোল করে 'হানি' ডাকছে। অথচ 'হানি' শব্দটা বলার সময় ঠোঁট গোল হয় না।

AMARBOI.COM

আলাউদ্দিন এতদিন পর দেশে আসছে। আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে উপহার-টুপহার আনা উচিত ছিল, তেমন কিছুই আনেনি। ভূষভূষা এ্যাশ কালারের একটা সোয়েটার এনেছে মা'র জন্যে। সেই সোয়েটার নিয়ে কত রকম আধিখ্যেতা — পিওর ওল মা। পিওর ওল আজকাল আমেরিকাতেও এক্সপেনসিভ। মা তোমার কি কালার পছন্দ হয়েছে?

নাসরিনের একবার বলার ইচ্ছা হল, এ্যাশ কালারে পছন্দের কি আছে ভাইয়া?

অবশ্যি কিছু বলল না। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর আসছে। ভাইয়ার কি উচিত ছিল না মা'র জন্যে একটা ভাল কিছু আনা?

বাবার জন্যে এনেছে ক্যালকুলেটর। যে বাবা রিটায়ার করেছে, চোখে দেখতে পায় না, সে ক্যালকুলেটর দিয়ে কি করবে?

নাসরিনের বড় বোন শারমিন তার দুই জমজ মেয়েকে নিয়ে স্যুটকেস খোলার সময় বসে ছিল। এই দু'মেয়েকে আলাউদ্দিন দেখেনি। চিঠি লিখে জানিয়েছে এই দু'মেয়ের জন্যে একই রকম দু'টা জিনিস আনবে, যা দেখে দু'জনই মুগ্ধ হবে। দু'জনের জন্যে দু'টা গায়ে মাখা সাবান বেরুল। এই সাবান ঢাকার নিউ মার্কেটে ভর্তি — আমেরিকা থেকে বয়ে আনতে হয় না।

আলাউদ্দিন বলল, বেশি কিছু আনতে পারিনি, বুঝলি? লাস্ট মোমেন্টে ক্লারা ডিসাইড করল আমার সঙ্গে আসবে। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেল কিছু টাকা সঙ্গেও রাখতে হয়েছে। ঢাকায় হোটেলের বিল কেমন কে জানে?

নাসরিন বলল, হোটেলের বিল মানে? তুমি কি হোটেলে উঠবে?

'বাধ্য হয়ে উঠতে হবে। এই গাদাগাদি ভীড়ে ক্লারার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চট করে তো সব অভ্যাস হয় না। আস্তে আস্তে হয়। তোরা আবার এটাকে কোন ইস্যু বানিয়ে বসবি না। তোদের কাজই তো হচ্ছে সামান্য ব্যাপারকে কোনমতে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইস্যুতে নিয়ে যাওয়া।'

নাসরিনের চোখে পানি এসে গেল। তার আপন বড় ভাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। নাসরিনের চোখের পানি অবশ্যি কেউ দেখতে পেল না। 'একটু আসছি ভাইয়া' বলেই সে চট করে উঠে গেল। বাথরুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ মুছে উপস্থিত হল। আলাউদ্দিন তখন স্যুটকেস খুলে আরো কি সব উপহার বের করছে। অতি তুচ্ছ সব জিনিস — গাড়ির পেছনে লাগানোর স্টিকার, যেখানে লেখা —"Hug Your Kid" তাদের গাড়ি কোথায় যে তারা গাড়ির পেছনে স্টিকার লাগাবে? কেউ অবশ্যি কিছু বলল না। সবাই এমন ভাব করতে লাগল যে গাড়ির স্টিকারটার খুব প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলল, নাসরিন তোর জন্যে তো কিছু আনা হয়নি।

নাসরিন বলল, ভাইয়া আমার কিছু লাগবে না।

'তোকে বরং এখান থেকেই শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে দেব।'

'আচ্ছা।'

আলাউদ্দিন স্যুটকেস ঘাঁটতে লাগল। তার ঘাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে আশা করছে কিছু-একটা পেয়ে যাবে, যা নাসরিনকে দিতে পারলে শাড়ির ঝামেলায় যেতে হবে না। নাসরিনের লজ্জার সীমা রইল না।

'এই যে জিনিস পাওয়া গেছে।'

হাসিতে আলাউদ্দিনের মুখ ভরে গেল। সবাই ঝুঁকে পড়ল স্যুটকেসের উপর। লিপিস্টিকের মত একটা বস্তু বেরুল। আলাউদ্দিন বলল, নাসরিন নে। এর নাম লিপ গ্লস। ঠোটে দিলে ঠোঁট চকচক করে, ঠোঁট ফাটে না।

নাসরিন শুকনো গলায় বলল, থ্যাংকস ভাইয়া।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, গিফট হচ্ছে গিফট। গিফটের মধ্যে সস্তা দামী কোন ব্যাপার না। বাঙালীদের স্বভাব হচ্ছে, কোন উপহার পেলেই হিসাব-নিকাশে বসে যাবে। দাম কত কি!

নাসরিন বলল, আমি কোন হিসাব-নিকাশ করছি না ভাইয়া। লিপ গ্লসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

'দ্যাটস গুড। মাই গড, নাসরিন তোর ভাগ্য ভাল আরেকটা জিনিস পাওয়া গেছে — ওইজা বোর্ড। এতক্ষণ চোখেই পড়েনি।'

'ওইজা বোর্ড আবার কি?'

AMARBOI.COM

আলাউদ্দিন লুডু বোর্ডের মত একটা বোর্ড মেলে ধরল। চারদিকে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখা। মাঝখানে দু'টা ঘর — একটায় লেখা 'ইয়েস', একটায় 'নো'।

'এটা কি কোন খেলা ভাইয়া?'

'খেলাই বলতে পারিস। ভূত নামানোর খেলা। প্ল্যানচেটের নাম শুনিসনি? এটা দিয়ে প্ল্যানচেটের মত করা যায়।'

'কিভাবে?'

'লাল বোতামটা দেখছিস না? দু'জন বা তিনজন মিলে খুব হালকাভাবে তর্জনি দিয়ে এটাকে টাচ করে রাখবি, কোন রকম প্রেসার দেয়া যাবে না। বোতামটাকে রাখবি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে। ঘরের আলো কমিয়ে দিবি, আর মনে মনে বলবি — '**If any good soul passes by -- please come**', তখন আত্মাটা বোতামে চলে আসবে। বোতাম নড়তে থাকবে। তখন কোন প্রশ্ন করলে আত্মা জবাব দেবে।'

'কিভাবে জবাব দিবে?'

'বোতামটা অক্ষরগুলির উপর যাবে। কোন্ কোন্ অক্ষরের উপর যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ভূতটার নাম যদি হয় রহিম, তাহলে প্রথমে যাবে 'আর'-এর উপর, তারপর 'এ'-র উপর, তারপর 'এইচ' — বুঝতে পারছিস?'

'বোতামটা আপনা-আপনি যাবে?'

'না, আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখতে হবে।'

'ভাইয়া, ভূত কি সত্যি সত্যি আসে?'

'আরে দূর দূর। ভূত আছে না-কি যে আসবে। আমেরিকানদের এটা হচ্ছে পয়সা বানানোর একটা ফন্দি। এত সহজে আত্মা চলে এলে তো কাজই হত।'

আলাউদ্দিন আমেরিকানদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে মজার মজার গল্প করতে লাগল। আলাউদ্দিনের মা — রাহেলার মনে ক্ষীণ আশা — গল্প যেভাবে জমেছে তাতে মনে হয় না ছেলে বৌকে নিয়ে হোটেল যাবে। যদি সত্যি সত্যি যায় তাহলে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এম্নিতেই বিদেশী বৌয়ের কথায় অনেকেই হাসাহাসি করছে। জামশেদ সাহেবের স্ত্রী গত সপ্তাহে এসে সরু গলায় বললেন, বাঙালী ছেলেরা যে বিদেশে গিয়েই বিদেশিনি বিয়ে করে ফেলে ঐ সব বিদেশিনিগুলি নীচু জাতের। ঝি-জমাদারনী এই সব। ভদ্রলোকের মেয়েরা বাঙালী বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদের গরজটা কি?

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, আপনাকে কে বলেছে?

'বলবে আবার কে? এ তো সবাই জানে। বাঙালী ছেলেগুলির সাদা চামড়া দেখে আর হুঁশ থাকে না। ওরা তো প্রথম প্রথম জানে না যে, ঐ দেশেরে ঝিয়ের চামড়াও সাদা, আবার মেথরানীর চামড়াও সাদা।'

রাহেলা এই সব কথার কোন জবাব দিতে পারেন নি। শুধু শুনে গেছেন। এখন যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে চলে যায় তাহলে কি হবে? সবাই তো গায়ে থুথু দিবে।

অবশ্যি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ছেলে এবং ছেলের বউয়ের জন্যে একটা ঘর ভালমত সাজাতে। নাসরিনের ঘরটাই সাজাতে হয়েছে। দেয়ালে চুনকাম করা হয়েছে। টিউব লাইট লাগান হয়েছে। একটা ফ্যান ঘরে আছে। সেই ফ্যানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হয় বলে নতুন

AMARBOI.COM

একটা সিলিং ফ্যান কেনা হয়েছে। তারপরেও যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে উঠে তিনি কি আর করবেন? তাঁর আর কি করার আছে?

রাতের খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বলল, আমরা তাহলে উঠি মা।

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, কোথায় যাবি?

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, কোথায় যাবি বলছ কেন মা? আগেভাগে তো বলেই রেখেছি একটা ভাল হোটেলে উঠতে হবে। ক্লারা গতরাতে এক ফোঁটা ঘুমায় নি। বেচারি গরমে সিদ্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই এক ফোঁটা।

'ফ্যান তো আছে।'

'বাতাস গরম হয়ে গেলে ফ্যানে লাভ কি? তোমরা গরম দেশের মানুষ, ওর কষ্টটা কি বুঝবে? আমি নিজেই সহ্য করতে পারছিলাম না, আর ও . . .'

'বউকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে লোকে নানান কথা বলবে।'

আলাউদ্দিন এই কথায় রাগে জ্বলতে লাগল। হড়বড় করে এমন সব কথা বলতে লাগল যার তেমন কোন অর্থ নেই।

তার বাবা মনসুর সাহেব যিনি কখনোই কিছু বলেন না তিনি পর্যন্ত বলে ফেললেন, তুই খামাখা চিৎকার করছিস কেন?

'আমি খামাখা চিৎকার করছি? আমি খামাখা চিৎকার করছি? আমি শুধু বলছি লোকজনের কথা নিয়ে তোমরা নাচানাচি কর কেন? তোমরা যদি না খেয়ে মর লোকজন এসে তোমাদের খাওয়াবে? প্রতি মাসে দেড়শ' ডলারের যে মানি অর্ডারটা পাও সেটা কি লোকজন দেয়? বল, দেয় লোকজন?'

মনসুর সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, যা, যেখানে যেতে চাস।

আলাউদ্দিন তিক্ত গলায় বলল, তোমরা যে ভাবছ ছেলে ঘর ছেড়ে হোটেলে চলে যাচ্ছে, কাজেই ছেলে পর হয়ে গেল — এটা ঠিক না।

'আমরা কিছু ভাবছি না। তুই আর ভ্যাজভ্যাজ করিস না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস।'

'মাথা ধরিয়ে দিয়েছি? আমি মাথা ধরিয়ে দিয়েছি?'

আট বছর পর ফিরে-আসা পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ির সদস্যদের খণ্ড প্রলয়ের মত হয়ে গেল। নাসরিন মনে মনে বলল, বেশ হয়েছে। খুব মজা হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি।

ক্লারা ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। একবার শুধু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তোমরা এত চেঁচিয়ে কথা বল কেন?' বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে বসার ঘরে টিকটিকি দেখতে গেল। বাংলাদেশের এই ছোট্ট প্রাণী তার হৃদয় হরণ করেছে। সে টিকটিকির একুশটা ছবি এ পর্যন্ত তুলেছে। ম্যাকরো ল্যান্স আনা হয়নি বলে খুব আফসোসও করছে। ম্যাকরো ল্যান্সটা থাকলে ক্লোজ-আপ নেয়া যেত।

খুব সঙ্গত কারণেই গভীর রাত পর্যন্ত এ পরিবারের কোন সদস্য ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় বসে রাহেলা ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। এক সময় মনসুর সাহেব বললেন, আর কেঁদো না, চোখে ঘা হয়ে যাবে। তোমার ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বিদেশী পেত্নী বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। হারামজাদা।

AMARBOI.COM

নাসরিন আজ ওর ঘরে ঘুমুতে পারছে।

ঘরে ঢুকে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত আগ্রহ করে তারা সবাই মিলে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে, তবু ভাইয়ার পছন্দ হল না। এই ঘরটা কি হোটেলের চেয়ে কম সুন্দর হয়েছে? মাথার পাশে টেবিল ল্যাম্প। পায়ের দিকের দেয়ালে সূর্যাস্তের ছবি। খাটের পাশে মেরুণ রঙের বেড সাইড কার্পেট। জানালা খুলে ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিলে খুব-একটা গরম কি লাগে? কই তার তো লাগছে না। তার তো উল্টো কেমন শীত শীত লাগছে।

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। এত বড় খাটে একা ঘুমুতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ভাইয়া থাকবে না জানলে বড় আপাকে জোর করে রেখে দিত। নাসরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আজ রাতটা তাদের জন্যে খুব খারাপ রাত। আজ রাতে তাদের কারোরই ঘুম হবে না। একা একা জেগে থাকা খুব কষ্টের।

ভূত নামালে কেমন হয়? ওইজা বোর্ড খুলে সে যদি বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসে থাকে তাহলে কি কিছু হবে? যদি কোন আত্মা চলে আসে ভালই হয়। আত্মার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মুশকিল হচ্ছে — এই আত্মাগুলি আবার কথা বলে না। বোতাম ঠেলে ঠেলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

নাসরিন দরজা বন্ধ করে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। তর্জনি দিয়ে বোতামটা ছুঁয়ে নরম গলায় বলল, আমার আশেপাশে যদি কোন বিদেহী আত্মা থাকেন তাহলে তাঁদের মধ্য থেকে একজন কি দয়া করে আসবেন? যদি আসেন তাহলে আমার মনটা একটু ভাল হবে। কারণ আজ আমার মনটা খুব খারাপ। কেন খারাপ তা তো আপনারা খুব ভাল করেই জানেন। পুরো ঘটনার সময় নিশ্চয়ই আপনারা আশেপাশে ছিলেন। ছিলেন না? এই পর্যন্ত বলেই নাসরিন চমকে উঠল। ডান হাতটা একটু যেন কাঁপছে।

বোতামটা কি নড়তে শুরু করেছে? অসম্ভব। হতেই পারে না। একি! বোতামটা এগিয়ে গেল কিভাবে? নাসরিন নিজেই হয়ত নিজের অজান্তে বোতাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে। খানিকটা ভয় এবং খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে নাসরিন অপেক্ষা করছে। হচ্ছেটা কি?

বোতাম 'ইয়েস' লেখা ঘরে কিছুক্ষণ থেমে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। নাসরিন শব্দ করেই বলল, বাহ্ বেশ মজা তো! পরবর্তী কিছুক্ষণ 'ইয়েস' এবং 'নো'তে বোতাম ঘুরতে লাগল। নাসরিনের শুরুর ভয় খানিকটা কমে গেল। যদিও তখনো বুক ধ্বকধ্বক করছে।

ওইজা বোর্ডে 'ইয়েস' এবং 'নো' ছাড়া আরো দু'টি ঘর আছে। সেগুলি হচ্ছে — 'আমি উত্তর দেব না', 'আমি জানি না'। বোতামটা এই সব ঘরেও মাঝে মাঝে এল। প্রশ্ন এবং উত্তর এইভাবে সাজান যায়।

'আপনি কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?'

'না।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমি উত্তর দেব না।'

AMARBOI.COM

'আজ আমাদের সবার খুব মন খারাপ সেটা কি আপনি জানেন?'

'না।'

'কি জন্যে আমাদেব মন খাবাপ সেটা কি বলব?'

'না।'

'শুধু না-না করছেন কেন? একটু শুনলে কি হয়? বলি?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে বলুন আপনার নাম কি?'

বোতামটা ঘুরতে ঘুরতে এক্স ঘরে গিয়ে থামল। নাসরিন বলল, এক্স দিয়ে বুঝি কারো নাম হয়? ঠিক করে নাম বলুন।

'আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না মানে? আপনার কি নাম নেই?'

'না।'

'ভূতদের নাম থাকে না?'

'আমি জানি না।'

'সে-কি! আমার তো ধারণা প্রেতাত্মারা সব জানে। আর আমি আপনাকে যা-ই জিজ্ঞেস করছি — আপনি বলছেন আমি জানি না। আচ্ছা বলুন তো, উনিশকে তের দিয়ে গুণ দিলে কত হয়?'

'আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। তবে আপনি যদি বলতেন তাহলে গুণ করে বের করতাম। আপনি কি গুণ অংক জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আত্মাদের কি অংক করতে হয়?'

বোতাম এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। উত্তর দিল না। নাসরিন বলল, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

'হ্যাঁ।'

'প্লীজ, আমার উপর রাগ করবেন না। কেউ আমার সাথে রাগ করলে আমার খুব মন খরাপ থাকে। এমনিতেই আজ আমার খুব মন খারাপ। আপনি কি জানেন আমার যে মন খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন মন খাবাপ সেই ঘটনাটা বলি? বলব?'

'হ্যাঁ।'

নাসরিন আজ সারাদিনের ঘটনা বলতে শুরু করল। বলতে বলতে দু'বার কেঁদে ফেলল। তার কাছে একবারও মনে হল না সে হাস্যকর একটা কাণ্ড করছে। এইসব গল্প বোতামটাকে বলার কোন মানে আছে?

AMARBOI.COM

নাসরিন ঘুমুতে গেল রাত তিনটায়। খুব চমৎকার ঘুম হল। ঘুমিয়ে এত তৃপ্তি অনেকদিন সে পায়নি। তবে ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণই মনে হল — একজন বুড়ো মানুষ তার গায়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন। বুড়ো মানুষটাব শরীরে চুরুটের কড়া গন্ধ।

২.

ভোর সাতটায় আলাউদ্দিন এসে উপস্থিত।

সে ভোর হতেই বাসায় চলে আসবে রাহেলা তা ভাবেন নি। আগের রাতের সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। হাসি মুখে বললেন, বৌমাকে আনলি না?

'ও ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙলে চলে আসবে। নোট লিখে এসেছি।'

'আসতে পারবে একা একা?'

'আসতে পারবে না মানে? কি যে তুমি বল মা। ওকি আমাদের দেশের মেয়ে যে স্বামী ছাড়া এক পা ফেলতে পারে না?'

'তা তো ঠিকই।'

রাহেলা নাশতার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিনকে এখন অনেক সহজ ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। রান্নাঘরে মা'র পাশে বসে অনেক গল্প করতে লাগল। নাসরিন এবং মনসুর সাহেবও গল্পে যোগ দিলেন।

'তুই তো ঐ দেশেই থেকে যাবি?'

'হ্যাঁ। এই দেশে আছে কি বল? এই দেশে থাকলে তো মরতে হবে না খেয়ে।'

'অনেকেই তো আছে।'

'কি রকম আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাও ঠিক।'

নাসরিনও সহজভাবে ভাইয়ের সঙ্গে অনেক গল্প করল। এখন ভাইয়াকে খুব আপন লাগছে। কথা বলতে ভাল লাগছে।

'ভাইয়া, কাল ওইজা বোর্ড দিয়ে ভূত এনেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনা-আপনি বোতাম এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়।' .

'তুই নিশ্চয়ই ঠেলেছিস।'

'অনেস্ট ভাইয়া। মোটেই ঠেলি নি।'

'তুই না ঠেললেও তোর সাব-কনশাস মাইণ্ড ঠেলেছে। আমি নিউজ উইক পত্রিকায় দেখেছিলাম — পুরো ব্যাপারটাই আসলে সাব-কনশাস মাইণ্ডের।'

এমন সহজ-স্বাভাবিকভাবে যে মানুষটা গল্প করল সেই আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল। সাধারণ ঝগড়া না — কুৎসিত ঝগড়া। ব্যাপারটা এরকম ঃ

ক্লারা খাবার পানি চেয়েছে।

নাসরিন গ্লাসে করে পানি দিয়েছে। এক চুমুকে সেই পানি খেয়ে ক্লারা বলল, থ্যাংকস। খুব বালো পানি।

ক্লারা এখন কিছু কিছু বাংলা বলার চেষ্টা করে।

AMARBOI.COM

আলাউদ্দিন বলল, ফোটান পানি দিয়েছিস তো? বয়েলড ওয়াটার?

'না ভাইয়া। টেপের পানি।'

'কেন? তোদেরকে কি আগে বলিনি সব সময় বয়েলড পানি দিবি। পানি ফুটিয়ে পরে বোতলে ভরে রাখবি। সামান্য কথাটা মনে থাকে না? বয়স যত বাড়ছে তোর বুদ্ধি দেখি তত কমছে।'

নাসরিনের মুখ কালো হয়ে গেল।

মনসুর সাহেব মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, একবার মাত্র খেয়েছে কিছু হবে না। আমরা তো সব সময় খাচ্ছি।

'তোমাদের খাওয়া আর ক্লারার খাওয়া এক হল? মাইক্রো অরগেনিজম খেয়ে খেয়ে তোমরা ইমমিউন হয়ে আছ। ও তো হয়নি।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন চিৎকার করে আর কি হবে?'

'চিৎকার করছি না-কি? তোমাদের সঙ্গে দেখি সামান্য আর্গুমেন্টও করা যায় না।'

নাসরিন অনেক চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে পারল না। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দ্রুত বের হয়ে গেল। রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, দিলি তো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে। যা অভিমানী মেয়ে। রাতে তো খাবেই না।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, এত অল্পতেই যদি চোখে পানি এসে যায় তাহলে তো মুশকিল। একটা ভুল করলে আর ভুল ধরিয়ে দেয়া যাবে না?

'ও ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ কি বলছ? সতেরো-আঠারো বছরে কেউ ছেলেমানুষ থাকে? তোমাদের জন্যে বড় হতে পারে না। তোমরা ছেলেমানুষ বানিয়ে রেখে দাও।'

আলাউদ্দিন রাতে খেল না। বউকে নিয়ে না-কি নিরিবিলি কোথাও ডিনার করবে।

নাসরিন সেই রাতে ঘুমুতে গেল না খেয়ে। অনেকক্ষণ জেগে রইল, ঘুম এল না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে। অনেক রাতে সে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। আজ আর দেরি হল না। বোতামে হাত রাখামাত্র বোতাম নড়তে লাগল। আজ সে উত্তরগুলিও শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দিচ্ছে না। অক্ষরের উপর ঘুরে ঘুরে — ছোট ছোট শব্দ তৈরি করছে। মজার মজার শব্দ। নাসরিন এই শব্দগুলিতে গুরুত্ব দিচ্ছে না, আবার গুরুত্ব দিচ্ছে। একবার ভাবছে — এগুলি অবচেতন মনের ইচ্ছা। আরেকবার ভাবছে — হতেও তো পারে। হয়ত সত্যি কেউ এসেছে। পৃথিবীতে রহস্যময় ব্যাপারটা তো হয়। ক'টা রহস্যের সমাধান আমরা জানি? কি যেন বলেছেন শেক্‌স্‌পীয়ার — **There are many things . . .**

'আপনি কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কাল যিনি এসেছিলেন আজও কি তিনিই এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম?'

'X'

'কি অদ্ভুত নাম। আচ্ছা আপনি কি জানেন আজ আমার মন কালকের চেয়েও খারাপ?'

AMARBOI.COM

'জানি।'

'কি করা যায় বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'আপনি কি জানেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে?'

'জানি।'

'ভাইয়া বলছিল এই যে আপনি নানান কথা বলছেন এগুলি আসলে আমার মনের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিফলন।'

'হতে পারে।'

'ভাইয়াকে আমার দারুণ পছন্দ।'

'আমি জানি।'

'ঐ পচা মেয়েটা সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনী। ও আশেপাশে থাকলেই ভাইয়া অন্য রকম হয়ে যায়। তখন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'জানি।'

'কি করা যায় বলুন তো?'

'মেয়েটাকে মেরে ফেল।'

'ছিঃ! কি যে বলেন! মানুষকে মেরে ফেলা যায় না-কি?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'কিভাবে?'

'অনেকভাবে।'

'আপনার কথাবার্তার কোন ঠিক নেই। আপনি কি করে ভাবলেন আমি একটা মানুষ মারতে পারি।'

'সবাই পারে।'

'আপনি পারেন?'

'না।'

'আপনি পারেন না কেন?'

'আমি জানি না।'

'মানুষ মারা যে মহাপাপ এটা কি আপনি জানেন?'

'আমি জানি না।'

'আপনি আসলে কিছুই জানেন না।'

'হতে পারে।'

'তাছাড়া আপনি আরেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন — ধরুন, আমি ঐ পচা মেয়েটাকে মেরে ফেললাম, তখন পুলিশ কি আমাকে ছেড়ে দেবে? আমাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে না?'

'তা দিতে পারে।'

AMARBOI.COM

'আর ভাইয়ার অবস্থাটা তখন চিন্তা করে দেখুন। কি রকম রাগ সে করবে। টাকা-পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন না খেয়ে মারা যাব। বাবার এক পয়সা রোজগার নেই, আমাদের ব্যাংকে টাকা-পয়সা নেই। ভাইয়া প্রতিমাসে যে টাকা পাঠায় ঐটা দিয়ে আমরা চলি। ভাইয়া প্রতিমাসে কত পাঠায় বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'একশ' ডলার। একশ' ডলারে বাংলাদেশী টাকায় কত হয় তা জানেন?'

'না।'

'বেশি না, সাড়ে তিন হাজার। মা এবার কি ঠিক করে রেখেছেন জানেন? মা ঠিক করে রেখেছেন — ভাইয়াকে বলবে আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাতে। একশ' ডলারে হচ্ছে না। জিনিসপত্রের যা দাম। আপনাদের তো আর কোন কিছু কিনতে হয় না। আপনারা আছেন সুখে, তাই-না?'

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভাইয়া টাকার পরিমাণ বাড়াবে?'

'আমি জানি না।'

'না বাড়ালে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাড়াবে না। বিয়ে করেছে, খরচ বেড়েছে। তাই না?'

'হতে পারে।'

'টাকা না বাড়ালে কি হবে বলুন তো? আমার আরেক ভাই আছেন — জসিম ভাইয়া। চিটাগাং-এ থাকেন। তাঁর টাকা-পয়সা ভালই আছে। কিন্তু সে আমাদের একটা পয়সা দেয় না। আমরা যদি না খেয়ে মরেও যাই ফিরে তাকায় না। কি করা যায় বলুন তো?'

'ক্লারাকে মেরে ফেলা যাক।'

'বারবার আপনি এক কথা বলেন কেন? আপনার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছি।'

'ওকে মেরে ফেলাই একমাত্র বুদ্ধি।'

'যান। আপনার সাথে আর কথাই বলব না।'

নাসরিন ওইজা বোর্ড বন্ধ করে ঘুমুতে গেল। আজ আর গতরাতের মত চট করে ঘুম এল না। একটু যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ওইজা বোর্ড টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। তার কাছেই একটা চেয়ার। নাসরিনের কেন জানি মনে হচ্ছে চেয়ারে ঐ মিঃ এক্স বসে আছেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ, যার গায়ে চুরুটের গন্ধ। ঐ বুড়ো মানুষটার একটা চোখ ছানি-পড়া। গায়ে চামড়ার কোট। সেই কোটেও এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ।

নাসরিন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে কেউ-একজন আছে। নাসরিন ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি কি আছেন? চেয়ার নড়ে উঠল। সত্যি নড়ল? না মনের ভুল। নাসরিন ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনি দয়া করে বসে থাকবেন না। চলে যান। যখন আপনাকে দরকার হবে আমি ডাকব?

আবার চেয়ার নড়ল। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

নাসরিনের বড় ভয় লাগছে। জুন মাসের এই প্রচণ্ড গরমের রাতেও একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে সে শুয়ে রইল। ঘুম এল একেবারে শেষ রাতে। তাও গাঢ় ঘুম না। আজেবাজে

AMARBOI.COM

সব স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন তো খুবই ভয়ংকর। তার শাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সে অনেক চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে। পারছে না। যতই চেষ্টা করছে, আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ছে। একজন বুড়োমত লোক চুরুট হাতে পুরো ব্যাপারটা দেখছে কিন্তু কিছুই করছে না ।

টাকার পরিমাণ বাড়ানোর দাবী রাহেলা অনেক ভণিতার পর করলেন। বলতে তার খুবই লজ্জা লাগল কিন্তু কোন উপায় নেই।

আলাউদ্দিন তখন চা খাচ্ছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, টাকা বাড়াতে বলছ?

'হ্যাঁ।'

'একশ' ডলারে তোমাদের হচ্ছে না?'

'না।'

'তোমরা কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? আমেরিকায় কি আমি টাকার চাষ করছি? ট্রাকটার দিয়ে জমি চষে টাকার চারাগাছ বুনে দিচ্ছি?'

রাহেলা ক্ষীণ স্বরে বললেন, সংসার অচল।

'সংসার তো আমারটা আরো বেশি অচল। বিয়ে করেছি — নতুন সংসার। এ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস নেই এ্যাপার্টমেন্টে। ক্লারা অফিস করে, তার একটা আলাদা গাড়ি দরকার। তোমাদের টাকা তো বাড়াতে পারবই না বরং কিছু কমিয়ে দেব বলে ভাবছি।'

'আমাদের চলবে কিভাবে?'

'জসিম ভাইকে বল। তারও তো কিছু দায়িত্ব আছে। সে তো গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরছে।'

রাহেলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আলাউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বলল, এরকম ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে না মা। নিঃশ্বাস ফেললে সমস্যার সমাধান হয় না।

AMARBOI.COM

৩

নাসরিন ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছে। রাত প্রায় দুটো। আজ অন্য দিনের মত গরম নয়। সন্ধ্যাবেলায় তুমুল বর্ষা হয়েছে। আকাশ মেঘলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে জানালা বন্ধ।

'আপনি কি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের কি বিপদ হয়েছে শুনেছেন?'

'না।'

'ভাইয়া টাকা-পয়সা বেশি তো পাঠাবেই না বরং আরো কমিয়ে দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কি করব আমরা বলুন তো?'

'মেয়েটাকে মেরে ফেল।'

'এইটা ছাড়া বুঝি আপনার মাথায় আর বুদ্ধি নেই?'

' না। এটা সবচে' ভাল বুদ্ধি।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না।'

'শুনে দুঃখিত হলাম।'

'আচ্ছা, ঐ দিন আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন? আপনি কি ঐ চেয়ারটায় বসে ছিলেন? আমার মনে হয় আপনি এখনো চেয়ারটায় বসে আছেন।'

'ক্লারাকে আগুনে পুড়ে মারলে কেমন হয়?'

'আপনি আজেবাজে কথা বলবেন না তো। আচ্ছা, বলুন তো ঐদিন কি আপনি চেয়ারে বসে ছিলেন?'

'তুমি একটু সাহায্য করলেই হয়।'

'কি সাহায্য?'

'যখন আগুন জ্বলে উঠবে তখন এই ঘরের দরজা তুমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে।'

'আপনার কথাবার্তার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আগুন লাগার পর মেয়েটা যাতে বেরুতে না পারে।'

'কি বলছেন আপনি?'

'আগুন লাগার পর সে ছুটে বের হতে চাইবে। তখন তাকে শুধু আটকান। অল্প কিছুক্ষণ আটকে রাখা।

'চুপ করুন তো।'

'ভাল বুদ্ধি দিচ্ছি।'

'আপনার বুদ্ধি চাই না।'

'তুমি আমার বন্ধু।'

'না, আমি আপনার বন্ধু নই।'

আজ রাতে নাসরিন এক পলকের জন্যেও চোখ এক করতে পারল না। মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ওইজা বোর্ডটা ভোর হতেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। কি সর্বনাশের কথা! বোতামটা এমন অদ্ভুত কথা বলছে কেন?

AMARBOI.COM

৪.

আগামীকাল রাত দু'টার ফ্লাইটে আলাউদ্দিন চলে যাবে। শেষ রাতটা এ বাড়িতে থাকবার জন্যে এসেছে। দীর্ঘদিন হোটেলে থাকায় তাকে বেশ লজ্জিতও মনে হচ্ছে। আজ রাতটা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। আবহাওয়া অসহনীয় নয়। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

আলাউদ্দিন বসার ঘরে সবার সঙ্গে গল্প করছে। গল্প বেশ জমে উঠেছে। প্রথমদিকে আমেরিকায় সে কি সব বিপদে পড়েছিল তার গল্প। প্রতিটি গল্পই আগে অনেকবার করে শোনা, তবু সবাই খুব আগ্রহ করে শুনছে।

ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেলে ঝড়-বৃষ্টির সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে, এখনো আসেনি। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। ঝড়-বৃষ্টি এখনো হচ্ছে। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, বৃষ্টির ঝমঝমানি। দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা, চমৎকার পরিবেশ।

একটিমাত্র হারিকেন, সেটা বসার ঘরে। হারিকেন ঘিরে সবাই বসে আছে।

ক্লারা ওদের গল্পে কোন মজা পাচ্ছিল না। ঘনঘন হাই তুলছিল। মাঝরাতে সে ঘুমুতে গেল। নাসরিন তার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

দুর্ঘটনা ঘটল তারো মিনিট দশেক পর। গল্প তখন খুব জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে ভূতের গল্প। রাহেলা ছোটবেলায় নিশির ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন — সেই গল্প হচ্ছে। গা ছমছমানো পরিবেশ। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ গলায় নাসরিন বলল, ঘর এত আলো হয়ে গেছে কেন ভাইয়া? তার কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল গোঙানি ও চিৎকার। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে এবং ক্লারা চেঁচাচ্ছে — **Oh God ! Oh God !**

সবাই ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

দুর্ঘটনা তো বটেই। দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। বাতাসে মোমবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকে ক্লারার নাইট গাউনে। সিনথেটিক কাপড় — মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল। খুবই সহজ ব্যাখ্যা। শুধু একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ক্লারার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ-একজন বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ক্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারেনি। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলেছে — ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সঙ্গে তার চিৎকারও কেউ শুনেনি। ব্যাকুল হয়ে শেষ মুহূর্তে সে ঈশ্বরকে ডাকছিল। ঈশ্বর মানুষের কাতর আহ্বানে সাধারণত বিচলিত হন না।

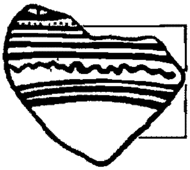

শ্যামল ছায়া

AMARBOI.COM

খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সে নিঃশ্বাস নিতে পারল না, দম আটকে এল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে রহিমার এ রকম হয়। আজ একটু বাড়াবাড়ি হল, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। রহিমা ভয় পেয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, মজিদ মিয়া, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ শেষপ্রান্তে থাকে। এত দূরে গলার আওয়াজ পৌঁছানোর কথা নয়। তবু রহিমার মনে হল মজিদ বিছানা ছেড়ে উঠেছে, দরজা খুলছে শব্দ করে! এই আবার যেন কাশল। রহিমা চিকন সুরে দ্বিতীয়বার ডাকল, ও মজিদ মিয়া — ও মজিদ।

কিন্তু কেউ এল না। মজিদ তাহলে শুনতে পায়নি। চোখে পানি এসে গেল রহিমার। হাঁপাতে হাঁপাতে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর এক সময় হঠাৎ করে ব্যথাটা মরে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। একটু আগেই যে মরে যাবার মত অনুভূতি হয়েছে তাও পর্যন্ত মনে রইল না।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এল রহিমা। বালিশের নীচ থেকে দেয়াশলাই নিয়ে হারিকেন ধরাল। খুব আস্তে অনেকটা সময় নিয়ে দরজার খিল খুলল। রাতের বেলা ঝনঝন্ করে দরজা খুললে মজিদ বিরক্ত হয়। বাইরে বেশ শীত, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কার্তিক মাসের শুরুতেই

শীত নেমে গেছে এবার। বাঁ হাতে হারিকেন উঁচু করে ধরে পা টিপে টিপে মজিদের ঘরের পাশে এসে দাঁড়াল রহিমা। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে মজিদ এখনো জেগে। বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ঘরের মেঝেতে আধ-খাওয়া সিগারেটের আস্তরণ। কটু গন্ধ আসছে সিগারেটের। রহিমা কোন সাড়াশব্দ করল না। চুপচাপ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল।

রহিমা ভেবে পায় না এত রাত জেগে কি পড়ে ছেলেটা। পরীক্ষার পড়া তো কবেই শেষ হয়েছে। রহিমা অনেকক্ষণ হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার যখন ঝিমুনি এসে গেল তখন মৃদু গলায় ডাকলো, ও মজিদ মিয়া।

মজিদ বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, ঠিক করে ডাকো মা। কি সব সময় মিয়া মিয়া কর।

রহিমা একটু অপ্রস্তুত হল। (মজিদকে মজিদ মিয়া ডাকলে সে রাগ করে কিন্তু রহিমার একটুও মনে থাকে না)। রহিমা বলল, শুয়ে পড় মজিদ।

তুমি ঘুমাও গিয়ে। ঘ্যানঘ্যান করো না।

রহিমা মৃদু গলায় বলল, জানালা বন্ধ করে দেই? ঠাণ্ডা বাতাস।

মজিদ সে কথার জবাব দিল না। বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। রহিমা তবুও দাঁড়িয়ে রইল। তার ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল না। কে জানে আবার হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে, দম বন্ধ হয়ে যাবার কষ্টটা নতুন করে শুরু হবে। মজিদ রাগী গলায় বলল, যাও না মা, দাঁড়িয়ে থেকো না।

রহিমা জানালার পাশ থেকে সরে এল। মজিদকে তার ভয় করে। অথচ জন্মের সময় সে এই এতটুকুন ছিল। রাত-দিন ট্যা ট্যা করে কাঁদত। মজিদের বাবা বলত, এই ছেলে বাঁচবে না গো, এরে বেশী মায়া করলে কষ্ট পাবে।

ছিঃ ছিঃ কি অলক্ষুণি কথা। বাপ হয়ে কেউ এরকম বলে? লোকটার ধারাই এমন, কথার কোন মা-বাপ নাই।

রহিমা এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমুতে তার ভাল লাগে না। তাই ঘুম তাড়াতে নানা কথা ভাবে। রাত জেগে ভাববার মত ঘটনা তার বেশী নেই। ঘুরেফিরে প্রতি রাতে একই কথা সে ভাবে। যেন সে একা একা একটি সাজানো ঘরে বসে আছে। হৈ-চৈ হচ্ছে খুব। মনটা বেশী ভাল নেই। ভয় ভয় করছে এবং একটু কান্না পাচ্ছে তার। এমন সময় বড় ভাবী মজিদের বাবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন, "নাও তোমার জিনিস। এখন দু'জনে মিলে ভাব-সাব কর।" এই বলে বাইরে থেকে খুট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নতুন শাড়ী পরে জড়সড় হয়ে বসে আছে রহিমা। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। কি বলবে তা-ও ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় কি কাণ্ডটাই না হল। কথাবার্তা নেই হড়হড় করে লোকটা বমি করে বিছানা ভাসিয়ে ফেলল। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে রহিমা তাকে এসে ধরল। ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে উঠে। আহা নতুন বউয়ের সামনে কি লজ্জাটাই না পেয়েছিল লোকটা। কতদিনকার কথা অথচ মনে হয় এই তো সেদিন।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে রহিমা উঠে বসল। পানের বাটা থেকে পান বের করল। সুপুরি কাটল কুচি কুচি করে। পান মুখে দিয়ে আগের মত চুপি চুপি মজিদের জানালায় উঁকি দিল। না এখনো ঘুমায়নি। রহিমা মজিদের কোন ব্যাপারই বুঝতে পারে না। লেখাপড়া না-জানা মূর্খ

AMARBOI.COM

বাপ-মা'র ছেলে যদি বৃত্তিটৃত্তি পেয়ে পাস করতে করতে এম.এ. পাস করে ফেলে তাহলে সে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

এক সময় মজিদের চোখ গিয়ে পড়ে জানালায়। "একি মা, এখনো ঘুরঘুর করছ? ঘুমাও না কেন?"

যাই বাবা যাই।

রহিমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। বারান্দায় এসে বসে রইল একা একা। আধখানা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় আবছা ভাবে সব কিছু নজরে পড়ে। রাতের বেলা একলা লাগে তার। বুকের মধ্যে হু-হু করে। দিনের বেলাটা এতোটা খারাপ লাগে না। ঘরের কত কাজকর্ম আছে। কাজের লোক নেই। তাকেই সব করতে হয়। সময়টা বেশ কেটে যায়। বাসার কাছেই মাইকের দোকান আছে একটা। তারা সারাদিনই কোন গানের সিকিখানা, কোন গানের আধাআধি বাজায়। বেশ লাগে।

মজিদের বাবারও গান ভাল লাগতো। এক একবার গান শুনে চেঁচিয়ে বলেছে, "ফাস ক্লাস, ফাস ক্লাস।" মজিদের বাপ লোকটা আমোদ-আহ্লাদের বড় কাঙ্গাল ছিল। বদনসিব লোক। আমোদ-আহ্লাদ তার ভাগ্যে নাই। কোনদিন হয়ত জামা-টামা পরে খুশী হয়ে গেছে সিনেমা দেখতে। ফিরে এসেছে মুখ কালো করে। হয় টিকিট পায়নি, নয় তো পকেট মার গেছে। কোন বিয়ের দাওয়াত-টাওয়াত পেলে হাসিমুখে গিয়েছে কিন্তু খেতে পায়নি কিছু। তার খাওয়ার আগেই খাবার শেষ হয়ে গেছে। নিজের ছেলেটা যখন লেখাপড়া শেষ করেছে, চাকরি-বাকরি করে বাপকে আরাম দেবে তখনি কথা নেই বার্তা নেই বিছানায় শুয়েই শেষ। রহিমা রান্নাঘর থেকে বলেছে পর্যন্ত, অসময়ে ঘুমাও কেন? চা খাবে, চা দিব?

রহিমা সেই মন্দভাগ্য লোকটার কথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেলল। এমন খারাপ ভাগ্যের লোক আছে দুনিয়ায়? মরণের সময়ও যার পাশে কেউ রইল না। মজিদের তখন কোন খোঁজ নেই। কোথায় নাকি গিয়েছে মিটিং করতে। তার বাপকে কাফন পরিয়ে খাটিয়ায় তুলে সবাই যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে হাঁক দিয়েছে তখন মজিদ নেমেছে রিকশা থেকে। বোকার মত জিজ্ঞেস করেছে, কি হয়েছে?

আহা লোকটা সারাজীবন কি কষ্টটা না করল। কি কষ্ট! কি কষ্ট! মেকানিকের আর কয় পয়সা বেতন? বাড়ীর জমিজমা যা ছিল বেচে বেচে পড়ার খরচ চলল মজিদের। এত কষ্টের পয়সায় পড়ে আজ মজিদের এই হাল। সন্ধ্যা নামতেই বন্ধুরা আসে। মিটিং বসে ঘরে। ট্রেড ইউনিয়ন, মৎস্য সমবায় সমিতি, হেনো তেনো। ছিঃ।

মজিদের মাথায় কিসের পোকা ঢুকেছিল কে জানে। মজিদের বাপকে রহিমা কত বলেছে, ছেলেকে এসব করতে মানা কর গো, কোনদিন পুলিশে ধরবে তাকে।

মজিদের বাপ শুধু বলেছে, বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি বলব?

রহিমার শীত করছিল, সে ঘরের ভেতর চলে গেল। অন্ধকার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা লাগল কিসের সঙ্গে। পিতলের বদনা ঝনঝন করে গড়িয়ে গেল কতদূর। মজিদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, কে কে?

আমি।

আর কোন সাড়া-শব্দ হল না। রহিমা যখন ভাবছে আবার শুয়ে পড়বে কি-না, তখনি শুনল মজিদ বেশ শব্দ করে হাসছে। কি কাণ্ড। রহিমা ডাকল, ও মজিদ মিয়া।

কি?

হাস কেন?

এম্নি হাসি। ঘুমাও তো, ফ্যাসফ্যাস করো না।

না, মজিদকে রহিমা সত্যি বুঝতে পারে না। শুধু মজিদ নয়, মজিদের বন্ধুদেরও অচেনা লাগে। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় তারা আসে। চোখের দৃষ্টি তাদের কেমন কেমন। কথা বলে থেমে থেমে, নীচু গলায় হাসে। ঘন্টার পর ঘণ্টা চলে তাদের আলাপ। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পাশের রইসুদ্দীনের চায়ের স্টল থেকে দফায় দফায় চা আসে। কিসের এত গল্প তাদের? রহিমা দরজার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে চেষ্টা করে,

না ইলেকশন হবে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

কিন্তু না হলে আমাদের করণীয় কি?

শেখ সাহেব কি ভাবছেন তা জানা দরকার।

শেখ সাহেব আপোস করবেন। সাফ কথা।

সাদেক বেশী বাড়াবাড়ি করছে। একটু কেয়ারফুল না হলে . . .

রহিমার কাছে সমস্তই দুর্বোধ্য মনে হয়। তবু রোজ দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে সে শোনে। আর যদি কোনদিন শিখা নামের মেয়েটি আসে, তবে তো কথাই নেই। রহিমা জোঁকের মত দরজার সঙ্গে সেঁটে থাকে। শিখা আসে লম্বা একটি নকশীদার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে। একটুও সাজগোজ করে না, তবু কি সুন্দর লাগে তাকে। সে হাসতে হাসতে দরজায় ধাক্কা দেয়। ভেতর থেকে মজিদ গম্ভীর হয়ে বলে, কে কে? (যদিও হাসির শব্দ শুনেই মজিদ বুঝতে পেরেছে কে, তবু তার এই ঢংটা করা চাই-ই।)

আমি, আমি শিখা।

অগ্নিশিখা নাকি?

না, আমি প্রদীপশিখা।

বলতে বলতে মেয়েটা হাসিতে ভেঙে পড়ে। দরজা খুলে মজিদ বেরিয়ে আসে। মজিদের চোখ-মুখ তখন অন্য রকম মনে হয়। দেখে-শুনে রহিমার ভাল লাগে না। কে জানে শিখাকে হয়ত পছন্দ করে ফেলেছে। হয়ত এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে রেখেছে অথচ মজিদের বাপ সুতাখালীর ঐ শ্যামলা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের বিয়ে দিবে বলে কি খুশী (টাঙ্গাইলের লালপাড় একটি শাড়ীও সে দিয়েছে হাসিনা নামের ঐ ভালমানুষ মেয়েটিকে। রহিমা মেয়েটিকে দেখেনি, শুনেছে খুব নরম মেয়ে আর ভীষণ লক্ষ্মী)। আহা মজিদের বাপ বেচারা বিয়েটা দিতে পারল না! আহা!

রহিমা কতবার দেখেছে শিখা এলেই মজিদ কেমন অস্থির হয়ে উঠে। শুধু শুধু হো হো করে হাসে। চায়ের সঙ্গে খাবার আনতে নিজেই উঠে যায়। কথাবার্তার মাঝখানে ফস করে বলে, আজ আর ইলেকশন-ফিলেকশন ভাল লাগছে না। আজ অন্য আলাপ করব। ঘরে যারা থাকে তারা উসখুস করলেও আপত্তি করে না। তখন শোনা যায় হাসির হল্লা। মেয়েমানুষ এত চেঁচিয়ে কি করে হাসে রহিমা বুঝতে পারে না। শুধু হাসি নয় গানটানও হয়। শিখা

মেয়েটি মাঝে মাঝে গান গায় (তার জন্য সবাইকে খুব সাধ্য-সাধনা করতে হয়। খুব অহংকারী মেয়ে)। রহিমা বুঝতে পারে না এত রাত পর্যন্ত মেয়েমানুষ কি করে আড্ডা দেয়। মজিদের বাপ এইসব দেখেও কোনদিন কথা বলেনি। শুধু বলেছে, বুঝদার বিদ্বান ছেলে, আমি কি করব?

মজিদের বাপ লোকটাও কি কম বুঝদার ছিল? চুপ করে থাকলে কি হবে দুনিয়ার হাল অবস্থা ঠিক বুঝত। রহিমার কতবার মনে হয়েছে পড়াশুনা করতে পেলে এই লোকটাও বন্ধুদের সাথে সন্ধ্যাবেলা ইংরেজিতে গল্প করত। নসিবে দেয়নি। ইমানদার লোক বদনসিব হয়। রহিমা আবার বিছানা ছেড়ে উঠল। বাতি জ্বালাল। একা একা অন্ধকার ঘরে ভাল লাগে না। যুদ্ধের পর তেলের যা দাম হয়েছে। কে আর সারারাত বাতি জালিয়ে রাখবে? ঐ ঘরে মজিদ আবার ঘুমের মধ্যে খুক খুক করে কাশছে। নতুন হিম পড়েছে। রহিমা কতবার বলেছে জানালা বন্ধ করে ঘুমুতে। কিন্তু মজিদ কিছুতেই শুনবে না। বন্ধ ঘরে তার নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। মজিদের বাপেরও এরকম বদঅভ্যাস ছিল। মাঘ মাসের শীতেও জানালা খোলা রাখা চাই। একবার তো খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার শার্ট আর গেঞ্জী নিয়ে গেল। শার্টের পকেটে ছয় টাকা ছিল। কি মুশকিল। শেষ পর্যন্ত মজিদের বাপ ছোট এক শার্ট গায়ে দিয়ে কারখানায় গেছে। আহা একটা শার্ট ছিল না লোকটার। কম বেতনের চাকরী। তার উপর পয়সা জমানো নেশা। খুব ধুমধাম করে মজিদের বিয়ে দিবে সেই জন্যে পাই পয়সাটিও জমিয়ে রাখা।

শিখা মেয়েটির সঙ্গে মজিদের পরিচয় না হলে সুতাখালীর ঐ মেয়েটির সঙ্গে কত আগেই মজিদের বিয়ে হয়ে যেত। আর বিয়ে হলে কি বউ ফেলে যুদ্ধে যেত মজিদ? কোনদিন না। গ্রামের মধ্যে বউ নিয়ে লুকিয়ে থাকতো কিছুদিন। তারপর সব ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসত সবাই।

কিন্তু সে রকম হল না। শিখা মেয়েটি বাহারি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আসতেই থাকল। আসতেই থাকল। আর দিনদিন সুন্দর হতে থাকল মেয়েটা।

তখন খুব গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। মজিদের ঘরে দিনরাত লোকজনের ভীড়। আগের মত শিখা মেয়েটির তীক্ষ্ণ হাসি শোনা যায় না। রহিমা বুঝতে পারে খুব খারাপ সময়। দেশের অবস্থা ভাল না। কিন্তু দেশের অবস্থা দিয়ে রহিমা কি করবে? সে শুধু দেখে তার নিজেরই কপাল মন্দ। মন্দ কপাল না হলে কি মজিদ তার বাপকে বলে, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কি হয় বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা গ্রামে চলে যাও।

মজিদের বাপ বলেছে, তুই গেলে আমরা যাব।

আরে কি বল পাগলের মত। আমি কি করে যাই? আমার কত কাজ এখন। তোমরা কবে যাবে বল? আমি সব ব্যবস্থা করে দেই।

মজিদের বাপ সে কথার জবাব না দিয়ে ফস করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে আর মজিদ হঠাৎ করে প্রসঙ্গ পাল্টে নীচু গলায় বলেছে, শিখাকে বিয়ে করলে তোমাদের আপত্তি নেই তো বাবা?

মজিদের বাপ একটুও অবাক না হয়ে বলেছে, কবে বিয়ে?

সে দেরী আছে। তোমাদের আপত্তি আছে কি-না তাই বল।

AMARBOI.COM

না, আপত্তি কিসের জন্যে? বিয়েটা সকাল সকাল করে ফেললেই তো ভাল হয়। টাকার জন্যে ভাবিস না তুই। তোর বিয়ের টাকা আলাদা করে পোস্টাপিসে জমা আছে।

ছেলের বিয়ে দেখে যেতে পারল না। রহিমা যখন রান্না ঘরে ডাল চাপিয়ে খোঁজ নিতে এসেছে লোকটা চা-টা কিছু খাবে কিনা তখনি জেনেছে সব শেষ। সব আল্লার ইচ্ছা।

তারপর তো যুদ্ধই শুরু হল। গ্রামের বাড়িতে রহিমাকে রেখে মজিদ উধাও। কত উড়ো খবর কানে আসে। কোথায় নাকি একশ' মুক্তিবাহিনীর ছেলে ধরা পড়েছে। কোথায় নাকি চারজন মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মিলিটারী পুড়িয়ে মেরেছে। রহিমা শুধু মন্ত্রের মত বলেছে, 'মজিদের হায়াৎ ভিখ মাংগি গো আল্লাহ। তুমি নেকবান। হাসবুনাল্লাহে নিয়ামুল ওয়াকিল নেয়ামুল মওলা ওয়া নিয়ামুন নাসির।' রহিমার রাতে ঘুম হয় না। জেগে জেগে রাত কাটে। সেই সময়ই অসুখটা হল। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় মৃত্যু বুঝি এসে বসেছে বুকের উপর।

যুদ্ধ থেমে গেল। মজিদ ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাসিমুখে একদিন দরজার সামনে এসে ডাকল, মা আমি মরি নাই গো। দেখ বেচে আছি।

অসুখটা তখন খুব বাড়ল রহিমার। ক্র্যাচের খটখট শব্দ তুলে মজিদ যখন এক পায়ে হেঁটে বেড়ায় তখন রহিমার বুক ধড়ফড় করে। কি কষ্ট, কি কষ্ট। সে মজিদের মত ভাবতে চেষ্টা করে, 'একটি স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।'

মজিদ বলে না কিছু কিন্তু রহিমা জানে শিখার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই মজিদের মত ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে না।

'স্বাধীনতার কাছে এই ক্ষতি খুব সামান্য।' রহিমা মজিদের মত ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু রহিমা মজিদ নয়। জীবন তার সুবিশাল বাহু রহিমার দিকে প্রসারিত করেনি। কাজেই তার ঘুম আসে না।

শেষ রাতে যখন চাঁদ ডুবে গিয়ে নক্ষত্রের আলোয় চারদিক অন্য রকম হয় তখন সে চুপি চুপি মজিদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা গলায় ডেকে উঠে, 'ও মজিদ মিয়া ও মজিদ মিয়া'। সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মজিদের ঘুম ভাঙে না। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করবার জন্যেই হয়ত শেষ রাতের দিকে তার গাঢ় ঘুম হয়।

AMARBOI.COM

বেয়ারিং চিঠি

জমীর সাহেব অফিস থেকে ফেরা মাত্রই তাঁর বড় মেয়ে মিতু বলল, বাবা আজ তোমার একটা চিঠি এসেছে। বলেই সে মুখের হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকাল।

মিতুর বয়স একুশ। এই বয়সের মেয়েদের মুখে অকারণে হাসি আসে। হাসি– তামাশা জমীর সাহেবের একেবারেই পছন্দ নয়। বিশেষ করে মা–বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি। আজকাল অনেক পরিবারেই তিনি এই ব্যাপার দেখেন। মেয়ে বাবার সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে — খিলখিল করে হাসছে। এসব কি? তিনি একবার তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই বন্ধুর মেয়ে বাবাকে নিয়ে খুব হাসি–তামাশা করতে লাগল। এক পর্যায়ে বলে ফেলল, বাবা দিন দিন তোমার চেহারা সুন্দর হচ্ছে। রাস্তায় বের হলে নিশ্চয়ই মেয়েরা তোমার দিকে তাকায়। জমীর সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর নিজের মেয়ে হলে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিতেন। অন্যের মেয়ে বলে কিছু বলা গেল না। তবে ঐ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন।

মিতু চিঠি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বেয়ারিং চিঠি বাবা। দু'টাকা দিয়ে চিঠি রাখতে হয়েছে। বলে আবার ফিক্ করে হেসে ফেলল।

জমীর সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হাসছিস কেন? বেয়ারিং চিঠি এসেছে এর মধ্যে হাসির কি হল? এ রকম ফাজলামি শিখছিস কোথায়?

মিতু মুখ কালো করে চলে গেল। বাবাকে সে সঙ্গত কারণেই অসম্ভব ভয় পায়। জমীর সাহেব লক্ষ্য করলেন খামের মুখ খোলা। এরা চিঠি পড়েছে। এই বেয়াদবীও সহ্য করা মুশকিল। একজনের চিঠি অন্যজন পড়বে কেন? খামে তাঁর নাম লেখা দেখার পরেও এরা কোন্ সাহসে চিঠি খুলে? রাগে জমীর সাহেবের গা কাঁপতে লাগল। এই অবস্থায় তিনি চিঠি পড়লেন। একবার, দু'বার তিনবার। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সুস্মিতা নামের এক মেয়ের চিঠি। তাঁর কাছে লেখা। সম্বোধন হচ্ছে প্রিয়তমেষু। এর মানে কি? সুস্মিতা কে? সুস্মিতা নামের কাউকে তিনি চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না। কলেজে পড়ার সময় কমলা নামের এক মেয়ের প্রতি খুব দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাবার পর দুর্বলতা কেটে যায়। এছড়া অন্য কোন মেয়েকে তিনি চেনেন না। জমীর সাহেব কপালের ঘাম মুছে চতুর্থবারের মত চিঠিটি পড়লেন।

AMARBOI.COM

প্রিয়তমেষু,

তুমি কেমন আছ? তোমার কথা খুব মনে হয়। তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন? শরীরের আরো যত্ন নেবে। আমি দেখেছি তুমি বাসে যাওয়া–আসা কর। তোমাকে অনুরোধ করছি সপ্তাহখানেক বাসে উঠবে না। কাল তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নটা হচ্ছে তুমি বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছ। স্বপ্নকে গুরুত্ব দেয়ার কোন মানে হয় না। তবু অনুরোধ করছি — এক সপ্তাহ বাসে উঠবে না।

বিনীতা

তোমার সুস্মিতা

জমীর সাহেব পঞ্চমবারের মত চিঠি পড়তে শুরু করলেন। মোটা নিবের কলমে গোটা গোটা অক্ষরের চিঠি। তারিখ বা ঠিকানা নেই। হলুদ রঙের কাগজ। কাগজ থেকে হালকা ন্যাপথলিনের গন্ধ আসছে।

'বাবা তোমার চা।'

মিতু চায়ের কাপ এনে বাবার সামনে রাখল। তার মুখ থমথম করছে। বাবার ধমকের কথা সে এখনো ভুলতে পারেনি। জমীর সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, কে লিখল কিছুই বুঝতে পারছি না। সুস্মিতা নামের কাউকে চিনি না।

মিতু বলল, চিনি হয়েছে কি–না দেখ।

জমীর সাহেব চায়ের চিনির ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না। শুকনো গলায় বললেন, তোর মা এই চিঠি পড়েছে?

'হ্যাঁ।'

'বলেছে কিছু?'

'না।'

'বুঝলি মিতু — সুস্মিতা নামের কাউকেই চিনি না। আর ধর যদি চিনতামও তাহলেও কি এই রকম একটা চিঠি কেউ লিখতে পারে? ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

মিতু ইতস্তত করে বলল, আমার কি মনে হয় জান বাবা? আমার মনে হয়, এই বাড়িতে জমীর সাহেব বলে আগে কেউ ছিলেন। চিঠিটা তাঁকেই লেখা।

জমীর সাহেবের চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই সহজ সমাধান তাঁর মাথায় কেন আসেনি বুঝতে পারলেন না। মিতু মেয়েটার মাথা তো বেশ ভাল। সায়েন্সে দেয়া উচিত ছিল। গাধার মত তিনি মেয়েটাকে আর্টস পড়িয়েছেন।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, খুব ভাল চা হয়েছে মা। খুব ভাল। তোর মা কোথায়?

'নানুর বাড়ি গেছে।'

'মা নানুর বাড়ি গেছে' এই বাক্যটি জমীর সাহেবের খুব অপছন্দের বাক্য। শাহানার মা'র বাড়ি মীরপুর ছ' নম্বরে। ঐ বাড়িতে গেলেই শাহানা রাতটা থেকে যায়। আজও থেকে যাবে। তবে আজ জমীর সাহেব অন্যদিনের মত খারাপ বোধ করলেন না। শাহানা থাকলে নিশ্চয়ই

AMARBOI.COM

চিঠিটা নিয়ে গম্ভীর গলায় কথা বলত। শাহানার কথা শুনতেই ইদানীং তাঁর অসহ্য লাগে। রাগী রাগী কথা তো আরো অসহ্য লাগবে।

'মিতু।'

'জ্বি বাবা।'

'তোর মা বোধহয় থেকে যাবে ও বাড়িতে।'

'হ্যাঁ।'

'তোর মা কিছু বলেনি চিঠি পড়ে?'

'না।'

'তোর কি মনে হয় রাগ করেছে?'

'রাগ করেছিল, আমি বুঝিয়ে বলেছি?'

মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জমীর সাহেবের মন ভরে গেল। মেয়েটাকে সায়েন্স পড়ান উচিত ছিল। সায়েন্স না পড়িয়ে ভুল হয়েছে। আর্টস পড়বে গাধা টাইপের মেয়েরা। তাঁর মেয়ে গাধা টাইপ নয়। বুদ্ধি আছে। বাপের প্রতি ফিলিংস আছে।

পরদিন যথারীতি জমীর সাহেব অফিসে রওনা হলেন। একবার মনে হল বাসে না গিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে নেবেন। পর মুহূর্তেই এই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন। ফালতু একটা চিঠি নিয়ে কিছু ভাবার কোন মানে হয়? এইসব জিনিস প্রশ্রয় দেয়াই উচিত না। ঝিকাতলার মোড়ে অন্য সব অফিস যাত্রীর মত তিনি একটি টিফিন বক্স এবং ছাতা হাতে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং যথারীতি প্রচণ্ড ভীড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে পড়লেন। বাস ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে কিছু-একটা হল তাঁর। মনে হল ছিটকে বাস থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি এক সঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার শুনলেন — থামো, থামে, থামো — এই রুককে, রুককে —

জমীর সাহেব রাস্তায় ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান হল হাসপাতালে। তাঁর বাম পা হাঁটুর নিচে ভেঙেছে। এক জায়গায় না, দু' জায়গায়। মিতু এবং শাহানা মাথার কাছে বসে আছে। দু'জনই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছেন কেন? বললাম তো তেমন সিরিয়াস কিছু হয়নি। দিন পনেরোর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাসায় যাবেন। দু'টা ফ্র্যাকচার হয়েছে তবে সিরিয়াস কিছু না।

ডাক্তারের কথামত পনেরো দিনের মাথাতেই জমীর সাহেব বাড়ি ফিরলেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নয়। বাঁ পা অচল হয়ে গেল। এদেশে না-কি কিছু করা সম্ভব না। বিদেশে যদি কিছু হয়। চাকরি শেষ হবার আগেই জমীর সাহেব রিটায়ার করলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঐ হলুদ চিঠির কথা একবারও তুলল না। যেন ঐ চিঠি একটা অভিশপ্ত চিঠি। তার কথা তোলা উচিত না। চিঠিটা জমীর সাহেবের শোবার ঘরের টেবিলের তিন নম্বর ড্রয়ারে পড়ে রইল। মাঝে মাঝে জমীর সাহেব চিঠিটা বের করে পড়েন এবং তাঁর অচল পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই রাতে তাঁর এক ফোঁটা ঘুম হয় না। কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে।

নতুন বছরের গোড়াতে ঝিকাতলার বাসা উঠিয়ে উত্তর শাজাহানপুরে সস্তায় একটা ফ্ল্যাটে তাঁরা চলে গেলেন। রোজগার কমেছে এখন। টাকা-পয়সা সাবধানে খরচ করতে হবে।

AMARBOI.COM

নতুন ফ্ল্যাটে দু'টা মাত্র শোবার ঘর। একটিতে জমীর সাহেবে শাহানাকে নিয়ে থাকেন। অন্যটিতে মিতু আর তার ছোট বোন ইরা থাকে। জমীর সাহেবের বড় ছেলে থাকে বসার ঘরে। একটা খাট বসার ঘরে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে মাস তিনেক কাটানোর পর আরেকটি বেয়ারিং চিঠি এল। আগের মত গোটা গোটা হরফে লেখা। মোটা কলমের নিচ দিয়ে মেয়েলী অক্ষরে সুস্মিতা লিখেছে।

প্রিয়তমেষু,
তুমি কেমন আছ? এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখলে আমার ভাল লাগে না। সংসারে দুঃখ কষ্ট সমস্যা থাকেই। এতে বিচলিত হলে চলে? মনে সাহস রাখ। আচ্ছা একটা কথা — তোমার বড় ছেলেটাকে কিছুদিন ঢাকা শহরের বাইরে রাখতে পার না? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ও কোন ঝামেলায় পড়ে যাবে। তোমাদের গ্রামের বাড়িতে ওকে কিছুদিনের জন্যে পাঠিয়ে দাও না। ও যেতে চাইবে না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাও।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা।

এবার আর সুস্মিতার চিঠি নিয়ে কেউ হাসাহাসি করল না। চিঠি পড়বার সময় শাহানার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। জমীর সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বড় ছেলে সুমনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর প্রশ্নই উঠে না। কারণ তার বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দু'টা পেপার হয়ে গেছে। তবু শাহানা বললেন, থাক পরীক্ষা দিতে হবে না। ওকে পাঠিয়ে দাও।

জমীর সাহেব বললেন, দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। চিঠি পাওয়ার পরেও তো পনেরো দিন হয়ে গেল।

'হোক পনেরো দিন, পাঠিয়ে দাও। আমার ভাল লাগছে না।'

'আচ্ছা বলে দেখ। যদি যেতে রাজি হয় তাহলে যাক।'

সুমন যেতে রাজি হল। শুধু যে রাজি হল তাই না, তৎক্ষণাৎ যেতে রাজি। টাকা দিলে আজ রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায় এমন অবস্থা। ঠিক হল সে সোমবার সকালের ট্রেনে যাবে। জমীর সাহেবও সঙ্গে যাবেন। পৈতৃক বাড়ি ঠিকঠাক করবেন, জমিজমার খোঁজখবর করবেন। সম্ভব হলে কিছু জমি বিক্রি করে আসবেন। টাকা- পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে।

তাদের যাবার কথা সোমবার। তার আগের দিন অর্থাৎ রোববার ভোর রাতে পুলিশ এসে জমীর সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে সুমনকে ধরে নিয়ে গেল। হতভম্ব জমীর সাহেবকে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন — আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে। সাতদিন আগে চারজনে মিলে খুনটা করেছে। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। আপনার ছেলে এই চারজনের একজন। আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলেকে রাজসাক্ষী হতে রাজি করান। এতে আপনারও লাভ। আমাদেরও লাভ। না হলে কিন্তু ফাঁসিটাসি হয়ে যাবে। পলিটিক্যাল প্রেসারও আছে।

AMARBOI.COM

সুমন রাজসাক্ষী হতে রাজি হল না। দীর্ঘদিন মামলা চলল। রায় বেরুতে লাগল দু'বছর। তিনজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, একজনের ফাঁসি। সেই একজন সুমন। অন্য তিনজন ছেলেটাকে ধরে রেখেছিল। খুন করেছে সুমন। ধারাল ক্ষুর দিয়ে রগ কেটে দিয়েছে।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। পরবর্তী বেয়ারিং চিঠিটি এল পাঁচ বছর কেটে যাবার পর। এই পাঁচ বছরে জমীর সাহেবের সংসারে বড় রকমের উলটপালট হয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মিতুর বিয়ে হয়েছে কৃষি খামারের এক ম্যানেজারের সঙ্গে। সে স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে থাকে। ছোট মেয়ে ইরার বিয়ে হয়েছে ওষুধ কোম্পানীর এক কেমিস্টের সঙ্গে। তারা ঢাকা শহরেই থোকে। প্রায়ই বাবা-মাকে দেখতে আসে। বড় মেয়ের কোন ছেলে-পুলে হয়নি। ছোট মেয়ের একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম ফরহাদ। এই ছেলেটি জমীর সাহেবের খুব ভক্ত। তাঁর কাছে এলেই কোলে উঠে বসে থাকে। কিছুতেই কোল থেকে নামান যায় না।

পাঁচ বছর পর একদিন পিওন এসে বলল, স্যার, আপনার একটা বেয়ারিং চিঠি আছে, রাখবেন? জমীর সাহেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন ইরারা বেড়াতে এসেছে। জমীর সাহেবের কোলে ফরহাদ। তিনি ফরহাদকে মাটিতে নামিয়ে চিঠি হাতে নিলেন। হাতের লেখা চিনতে তাঁর অসুবিধা হল না। সেই হাতের লেখা। সেই ন্যাপথলিনের গন্ধ।

পিওন বলল, চার টাকা লাগবে।

জমীর সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, চিঠি রাখব না। তিনি তা বলতে পারলেন না। যন্ত্রের মত পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন। চিঠি পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দিলেন। কাউকে কিছু বললেন না। তাঁর বমি বমি ভাব হল। মাথা ঘুরতে লাগল।

রাতে তিনি কিছু খেলেন না। ইরাদের আসা উপলক্ষে ভালমন্দ রান্না হয়েছিল। তিনি কিছুই মুখে দিলেন না।

ইরা বলল, বাবা তোমার কি হয়েছে?

তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, কিছু হয়নি। শরীরটা ভাল না।

'রোজই তুমি বল শরীর ভাল না, অথচ একজন ভাল ডাক্তার দেখাও না। একজন ভাল ডাক্তার দেখাও বাবা।'

'দেখাব।'

'আর মা'কেও একজন ভাল ডাক্তার দেখাও।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না বাবা। দেখাও।'

মেয়ে-জামাই রাত ন'টার দিকে চলে গেল। ফরহাদ গেল না। সে নানার সঙ্গে থাকবে।

সারারাত জমীর সাহেবের ঘুম হল না। পরদিন হু-হু করে গায়ে জ্বর এসে গেল। জ্বরের মূল কারণ কাউকে বলতে পারলেন না। বেলা যতই বাড়তে লাগল জ্বরও ততই বাড়তে লাগল। দুপুরের পর ঘাম হতে লাগল। ইরা হতভম্ব হয়ে বলল, বাবা চল তোমাকে ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করি। আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমি এরকম ঘামছ কেন? হার্টের কোন সমস্যা না তো?

AMARBOI.COM

জমীর সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, চিঠি পেয়েছি।

'চিঠি পেয়েছি মানে? কার চিঠি?'

'বেয়ারিং চিঠি।'

ইরা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, কি লেখা এবারের চিঠিতে?

'চিঠি পড়িনি।'

'পড়ে দেখ। না পড়েই এরকম করছ কেন? হয়ত এবার কোন ভাল খবর আছে।'

জমীর সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, ভয় লাগছে রে ইরা।

'ভয়ের কিছু নেই। দাও, আমার কাছে দাও — আমি পড়ি।'

ইরা চিঠি খুলে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যদের সেই চিঠি দেখাল। যারা দেখল প্রত্যেকেই গম্ভীর হল। কারণ, চিঠিতে কিছু লেখা নেই। সাদা একটা পাতা। শেষে নাম সই করা — বিনীতা, তোমার সুস্মিতা। এই সাদা না লেখা অংশে কি বলতে চাচ্ছে সুস্মিতা? কে সে? কেনই বা সে চিঠি লেখে আবার আজ কেনই বা লিখল না?

AMARBOI.COM

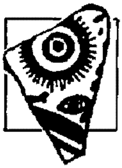

ভালবাসার গল্প

নীলু কঠিন মুখ করে বলল, কাল আমাকে দেখতে আসবে। রঞ্জু নীলুর কথা শুনল বলে মনে হল না। দমকা বাতাস দিচ্ছিল। খুব কায়দা করে তাকে সিগারেট ধরাতে হচ্ছে। কথা শুনবার সময় নেই।

নীলু আবার বলল, আগামী কাল সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।

কে আসবে?

মাঝে মাঝে রঞ্জুর বোকামিতে নীলুর গা জ্বালা করে। এখনো তাই করছে।

রঞ্জু আবার বলল, কে আসবে সন্ধ্যা বেলা?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র দেখতে আসবে।

রঞ্জুকে এ খবরে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হল না। সে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আসুক না।

আসুক না মানে? যদি আমাকে পছন্দ করে ফেলে?

রঞ্জু গম্ভীর হয়ে বলল, পছন্দ করবে না মানে? তোমাকে যেই দেখবে সেই ট্যারা হয়ে যাবে।

নীলু রেগে গিয়ে বলল, তোমার মত যারা গাধা শুধু তাদের চোখই ট্যারা হবে।

রঞ্জু রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে হেসে উঠল। নীলু বলল, আস্তে হাঁট না, দৌড়াচ্ছ কেন?

রঞ্জু এ কথাতেও হেসে উঠল। কি কারণে জানি তার আজ খুব ফুর্তির মুড দেখা যাচ্ছে। গুনগুন করে গানের কিএকটা সুর ভাঁজল। সচরাচর এ রকম দেখা যায় না। রাস্তায় সে ভারিক্কি চালে হাঁটে।

নীলু সিনেমা দেখবে নাকি একটা?

না।

চল না, যাই।

নীলু চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

কথা বল না যে? দেখবে?

উহুঁ। বাড়ীতে বকবে।

কেউ বকবে না। মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা যখন হয় তখন মায়েরা তাদের কিছু বলে না।

কে বলেছে তোমাকে?

AMARBOI.COM

আমি জানি। তখন মায়েদের মন খুব খারাপ থাকে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। এইসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে তুমি বুঝবে না। চল একটা সিনেমা দেখি।

না।

বেশ তাহলে চল কোন ভাল রেস্টুরেন্টে বসে চা খাওয়া যাক। নীলু সরু চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, খুব পয়সা হয়েছে দেখি।

রঞ্জু আবার হেসে উঠল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, কি ভেবেছ তুমি? রোজ তোমার পয়সায় চা খাব? এই দেখ।

রঞ্জু ম্যাজিসিয়ানদের মত পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি চকচকে একশ' টাকার নোট বের করল।

আরো দেখবে? এই দেখ।

এবার আরো দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট বের হল। নীলু কোন কথা বলল না।

তুমি এত গম্ভীর কেন নীলু?

তোমার মত শুধু শুধু হাসতে পারি না। বাসায় যাব, এখন চা-টা খাব না।

প্লীজ নীলু, এ রকম কর কেন তুমি?

রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। রঞ্জু ছেলে-মানুষের মত খুশী হয়ে বলল, বেশ হয়েছে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামবে ততক্ষণ বন্দি। সে এবার আরাম করে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু বলল, এই নিয়ে ক'টি সিগারেট খেলে?

এটা হচ্ছে ফিফ্‌থ।

সত্যি?

হুঁ।

গা ছুঁয়ে বল।

আহ্ কি সব মেয়েলি ব্যাপার। গা ছুঁয়ে বললে কি হয়?

হোক না হোক তুমি বল।

রঞ্জু ইতস্তত করে বলল, আর সিগারেট খাব ন। ওয়ার্ড অব অনার। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত।

তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। বৃষ্টি নেই। নিয়ন আলোয় ভেজা রাস্তা চিকমিক করছে।

রঞ্জু বলল, রিকশা করে একটু ঘুরবে নীলু?

উহুঁ।

বেশ। চল রিকশা করে তোমাকে ঝিকাতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

হ্যাঁ, পরে কেউ দেখুক।

সন্ধ্যাবেলা কে আর দেখবে? একটা রিকশা ডাকি?

আচ্ছা ডাক।

রিকশায় উঠতে গিয়ে রঞ্জু দেখল নীলুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সে দারুণ অবাক হয়ে গেল।

কি ব্যাপার নীলু?

AMARBOI.COM

খুব খারাপ লাগছে। কাল যদি ওরা আমাকে পছন্দ করে ফেলে?

রঞ্জু দরাজ গলায় হেসে উঠল, করুক না পছন্দ, আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলব।

তারপর আমাকে তুলবে কোথায়, খাওয়াবে কি? দু'টি টিউশনি ছাড়া আর কি আছে তোমার?

এম.এ. ডিগ্রিটা আছে। সাহস আছে। আর . . .

আর কি ?

আর আছে ভালবাসা।

নীলু এবং রঞ্জু দুজনেই এবার একত্রে হেসে উঠল। রঞ্জু অত্যন্ত উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীলু মৃদুস্বরে বলল, এই তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া? ফেল এক্ষুণি।

এটাই লাস্ট ওয়ান।

উহুঁ।

রঞ্জু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

পাত্র পক্ষ দেখতে আসবে সন্ধ্যাবেলা কিন্তু তোড়জোড় শুরু হল সকাল থেকে। নীলুর বড় ভাই এই উপলক্ষে অফিসে গেলেন না। নীলুর ছোট বোন বীলুও স্কুলে গেল না। এই বিয়ের যিনি উদ্যোক্তা — নীলুর বড় মামা, তিনিও সাত সকালে এসে হাজির। নীলু তার এই মামাকে খুব পছন্দ করে কিন্তু আজ যখন তিনি হাসিমুখে বললেন, কি করে নীলু বিবি কি খবর? তখন নীলু শুকনো মুখে বলল, ভাল।

মুখটা এমন হাড়ির মত করে রেখেছিস কেন? তোর জন্যে একটা শাড়ী এনেছি। দেখ তো পছন্দ হয় কি-না।

শাড়ী কি জন্যে মামা?

আনলাম একটা ভাল শাড়ী। এই শাড়ী পরে সন্ধ্যাবেলা যখন যাবি ওদের সামনে . . . ।

নীলু নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল।

রান্নাঘরে নীলুর ভাবী রেহানা মাছ কুটছিল। কলেজ যেদিন ছুটি থাকে সেদিন নীলু রান্নায় সাহায্য করার নামে বসে বসে গল্প করে। আজ নীলু দেখল রেহানা ভাবীর মুখ গম্ভীর। নীলু পাশে এসে বসতেই সে বলল, তোমার ভাই কাল রাতে আমাকে একটা চড় মেরেছে। তোমার বিশ্বাস হয় নীলু?

নীলু স্তম্ভিত হয়ে গেল। রেহানা বলল, তুমি বিয়ে হয়ে চলে গেলে আমার কেমন করে যে দিন কাটবে। নীলু বলল, দাদাটা একটা অমানুষ। অভাবে অভাবে এ রকম হয়েছে ভাবী। তুমি কিছু মনে করো না।

না, মনে করব কি? আমার এত রাগ-টাগ নেই।

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। রেহানা একসময় বলল, তোমার ভাই পাঁচ টাকা মানত করেছে। তোমাকে যদি ওদের পছন্দ হয় তবে পাঁচ টাকা ফকিরকে দিবে।

নীলু কিছু বলল না। রেহানা বলল,

AMARBOI.COM

পছন্দ তো হবেই। তোমাকে পছন্দ না করলে কাকে করবে? তুমি কি আর আমার মত? কত মানুষ যে আমাকে দেখল নীলু, কেউ পছন্দ করে না। শেষকালে তোমার ভাই পছন্দ করল। সুন্দর-টুন্দর তো সে বুঝে না।

নীলু হেসে উঠল। রেহানা বলল, চা খাবে? নীলু জবাব দিল না।

তোমাকে চা খাওয়াবার সুযোগ কি আর হবে? বড়লোকের বউ হবে। মামা বলেছিলেন ওদের নাকি দু'টি গাড়ী। একটা ছেলেরা ব্যবহার করে, একটা বাড়ীর মেয়েরা।

নীলু চুপ করে রইল। রেহানা বলল, ছেলের এক চাচা হাইকোর্টের জজ।

হাইকোর্টের জজ দিয়ে আমি কি করব ভাবী?

তুমি যে কি কথা বল নীলু, হাসি লাগে।

দুপুর থেকে নীলুর দাদা গম্ভীর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল। নীলু ভেবে পেল না এই সামান্য ব্যাপারে দাদা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছে কেন। একটি ছেলে মোটা মাইনের একটা চাকরি করলে এবং ঢাকা শহরে তার ঘর-বাড়ী থাকলেই এরকম করতে হয় নাকি?

অকারণে রেহানা নীলুর দাদার কাছে ধমক খেতে লাগল।

বললাম একটা ফুলদানীতে ফুল এনে রাখতে।

এই বুঝি ঘর পরিষ্কারের নমুনা?

টেবিল ক্লথটাও ইস্তি্র করিয়ে রাখতে পারনি?

নীলুর বড় মামা অনেকবার তাকে বুঝালেন কি করে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে। নম্র ভঙ্গিতে চা এগিয়ে দিতে হবে। কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব কম কথায় উত্তর দিতে হবে। নীলুর রীতিমত কান্না পেতে লাগল। সাজগোজ করাবার জন্যে মামী এলেন বিকেল বেলা। সন্ধ্যা হবার আগেই নীলু সেজেগুজে বসে রইল। সমস্ত ব্যাপারটি যে রকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল সে রকম কিছুই হল না। ছেলের বাবা খুব নরম গলায় বললেন, কি নাম মা তোমার?

নীলাঞ্জনা।

খুব কাব্যিক নাম। কে রেখেছেন?

বাবা।

তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নীলুর মামার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। ছেলে নিজেও এসেছিল। নীলু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না। চা পর্ব শেষ হবার পর নীলু যখন চলে আসছে তখন শুনল একজন ভদ্রমহিলা বলছেন,

খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের।

আগস্ট মাসে বিয়ে দিতে আপনাদের কোন অসুবিধা আছে?

নীলুর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রেহানা রান্নাঘরে বসে ছিল। নীলুকে দেখেই বলল, টি-পটটা ভেঙে দু'টুকরা হয়েছে। তোমার ভাই শুনলে কি করবে ভেবে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কি অলক্ষণ। ওমা কাঁদছ কেন, কি হয়েছে?

নীলু প্রায় দৌড়ে এসে তার ভাবীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, ভাবী আমি রঞ্জু ভাইকে বিয়ে করব। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। তুমি দাদাকে বল ভাবী ।

AMARBOI.COM

আমি? আমার সাহস হয় না। হায় রে কি করি। চুপ নীলু চুপ। ভাল করে সব ভাব। এক্ষুণি জানাজানির কি দরকার।

আমি ভাবতে পারি না ভাবী।

নীলু এ ক'দিন কলেজে যায়নি। দিন সাতেক পর যখন প্রথম গেল ক্লাসের মেয়েরা অবাক হয়ে বলল, বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই। অসুখ-বিসুখ নাকি?

সে চুপ করে রইল।

কেমন গোলগাল মুখ ছিল তোর, এখন কি রকম লম্বাটে হয়ে গেছে। কিন্তু বেশ লাগছে তোকে ভাই।

ক্লাসে মন টিকল না নীলুর। ইতিহাসের অনিল স্যার ঘুমপাড়ানো সুরে যখন গুপ্ত ডায়নাস্টি পড়াতে লাগলেন তখন ছাত্রীদের স্তম্ভিত করে নীলু উঠে দাড়াল।

স্যার আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। বাসায় যাব।

অনিল স্যার অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বেশী খারাপ? সঙ্গে কোন বন্ধুকে নিয়ে যাবে?

না স্যার, একাই যাব।

নীলু ক্লান্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে কলেজ গেটের সামনে রঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো মুখ। হাতে একটা কাগজের ঠোঙ্গা।

গত তিনদিন ধরে আমি রোজ একবার করে আসি তোমাদের কলেজে।

নীলু বলল, এই ক'দিন আসিনি, শরীর ভাল না।

দুজন পাশাপাশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। তারপর রঞ্জু হঠাৎ দাঁড়িয়ে থেমে থেমে বলল, আগস্ট মাসের ৯ তারিখে তোমার বিয়ে?

কে বলল?

কার্ড ছাপিয়েছ তোমরা। রেবার কাছে তোমার বিয়ের কার্ড দেখেছি।

নীলু চুপ করে রইল। রঞ্জু এত বেশী উত্তেজিত ছিল যে, সহজভাবে কোন কথা বলতে পারছিল না। কোনমতে বলল, কার্ড দেখেও আমার বিশ্বাস হয়নি। তুমি নিজের মুখে বল।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, না সত্যি না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।

কবে?

আজই।

রঞ্জু স্তম্ভিত হয়ে বলল, তোমার মাথা ঠিক নেই নীলু।

মাথা ঠিক আছে। কোর্টে মানুষ কিভাবে বিয়ে করে আমি জানি না।

রঞ্জু বলল, চল আমার মেসে। কি হয়েছে সব কিছু শুনি।

সে নীলুর হাত ধরল।

রঞ্জুর নয়া পল্টনের মেসে নীলু আগে অনেকবার এসেছে। দুপুরের গরমে বসে অনেক সময় গল্প করে কাটিয়েছে কিন্তু আজকের মত কুলকুল করে ঘামেনি কখনো। রঞ্জু বলল, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নীল, বড্ড ঘামছ।

AMARBOI.COM

আমার কিছু হয়নি।

চা খাবে? চা দিতে বলব?

উহুঁ। পানি খাব ।

রঞ্জু পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখে নীলু হাত-পা এলিয়ে বসে আছে। চোখ ঈষৎ রক্তাভ। পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল,

রেবা তোমাকে আমার বিয়ের কার্ড দেখিয়েছে?

হুঁ।

আর কি বলেছে সে?

বলেছে, তোমাকে নাকি ফর্সা মতন রোগা একটি ছেলের সঙ্গে দেখেছে।

নীলু বলল, ওর নাম জমশেদ। ওর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে আমার।

রঞ্জু কিছু বলল না।

নীলু বলল, ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তুমি কি করবে?

কি করব মানে?

নীলু ভীষণ অবাক হয়ে বলল, কিছু করবে না তুমি?

তোমার শরীর সত্যি খারাপ নীলু। তুমি বাসায় যাও। বিশ্রাম কর।

নীলু রিকশায় উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রঞ্জু বলল, আমি তোমার সঙ্গে আসব? বাসায় পৌঁছে দেব?

উঁহু।

নীলু বাসায় পৌঁছে দেখে অনেক লোকজন। হিরণপুর থেকে খালারা এসেছেন। বিয়ে উপলক্ষে বাড়ীতে তুমুল হৈচৈ। নীলু আলগাভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সেজো খালার হাসির গল্প শুনে উচু গলায় হাসল। কিন্তু রাতের বেলা অন্যরকম হল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল। রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে নীলু?

নীলু ধরা গলায় বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবী।

রেহানা নীলুর হাত ধরল। কোমল স্বরে বলল, ডাকব তোমার দাদাকে? কথা বলবে তার সাথে?

ডাক।

নীলুর দাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, কি রে নীলু কিছু হয়েছে?

নীলু বলল, কিছু হয়নি দাদা। তুমি ঘুমাও।

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

AMARBOI.COM

সৌরভ

আজহার খাঁ ঘর থেকে বেরুবেন, শার্ট গায়ে দিয়েছেন, তখনি লিলি বলল, বাবা আজ কিন্তু মনে করে আনবে।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। মেয়ে বড় হয়েছে, ইচ্ছে করলেও ধমক দিতে পারেন না। সেই জন্যেই রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

লিলি বলল, রোজ রোজ মনে করিয়ে দেই। আজ আনবে কিন্তু।

সামনের মাসে আনব।

না, আজই আনবে।

রাগে মুখ তেতো হয়ে গেলো আজহার খাঁর। প্রতিটি ছেলেমেয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে। বাবার প্রতি কিছুমাত্র মমতা নেই। আর নেই বলেই মাসের ছাব্বিশ তারিখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে পারে, না আজই আনতে হবে।

তিনি নিঃশব্দে শার্ট গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। জুতা পরলেন। জুতার ফিতায় কাদা লেগেছিল, ঘসে ঘসে সাফ করলেন। লিলি সারাক্ষণই বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই বলল, বাবা আনবে তো?

মেয়েটার গালে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রাণপণে দমন করে তিনি শান্ত গলায় বললেন, টাকা নেই, সামনের মাসে আনব।

লিলি নিঃশব্দে উঠে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না সবাই বৈরী হয়ে উঠলে কি করে বেঁচে থাকা যায়। তিনি তো কিছু বলেননি। শুধু শান্ত গলায় বলেছেন, হাতে টাকা নেই। এটা তাঁকে বলতে হল কেন? যে মেয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অভাব বুঝতে না পারে সে কেমন মেয়ে?

তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। ইদানীং অল্পাতেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। সামান্য সব কারণে হতাশা বোধ করেন। বেঁচে থাকা অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

"হতাশা গুণ নাশিনী। হতাশা মানুষের সমস্ত গুণ নষ্ট করে দেয়। তবুও তো ভালবাসার মত মহত্তম সৎগুণটি আমার এখনো নষ্ট হয়নি। তোমাদের সবাইকে আমি ভালবাসি। তোমাদের জন্যে সারাক্ষণ আমার বুক টনটন করে, আর লিলি তুমি তোমার বাবার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাক। মাসের ছাব্বিশ তারিখে তোমার একটি শখের জিনিস আমি কিনে আনতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমারই মেয়ে। তুমি তোমার মায়ের মত অবুঝ হবে কেন?"

আজহার খাঁর কান্না পেতে লাগল। যদিও সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাঁকে এক্ষুণি বাইরে বেরুতে হবে। তবু তিনি চৌকিতে বসে বাইরের আকাশ দেখতে লাগলেন।

AMARBOI.COM

বাবা এই নাও টাকা।

লিলি তিনটি দশ টাকার নোট টেবিলে বিছিয়ে দিল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, টাকা কোথায় পেয়েছিস?

আমার টাকা। আমি জমিয়েছি। আনবে তো বাবা?

আনব।

নাম মনে আছে তোমার?

আছে।

লজ্জা ও হতাশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে ঝিরঝির করে হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। সন্ধ্যা এখনো মিলায়নি। এর মধ্যেই চারদিকের তরল অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। পরিচিত পথঘাটও অপরিচিত লাগছে।

"দশ বছর ধরে আমি এই শহরে পড়ে আছি। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়। এই দীর্ঘ সময়ে আমি রোজ একই রাস্তায় হাঁটছি। একই ধরনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোথাও যাইনি। তোমাদের কথা ভেবেই প্রতিটি পয়সা আমাকে সাবধানে খরচ করতে হয়েছে। অফিসে টিফিন আওয়ারে সবাই যখন চায়ের সঙ্গে দু'টি করে বিস্কিট খায় আমি সেখানে এক কাপ চা নিয়ে বসি। সেও তোমাদের কথা ভেবেই। তোমরা তার প্রতিদানে কি দিয়েছ আমাকে? আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে লিলি, তুমি তোমার দীর্ঘদিনের জমানো টাকা বের করে আন। তোমার মা তার ভাইদের কাছে টাকা চেয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখে।"

তাঁর মনে হল তিনি কুকুরের জীবন যাপন করছেন। সাধ-আহ্লাদহীন বিরক্তিকর জীবন। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

বৃষ্টির ছাটে আধভেজা হয়ে আজহার খাঁ বাজারে ঢুকলেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে বাজার তেমন জমেনি। সন্ধ্যাবেলা যেমন জমজমাট থাকে চারদিক সে রকম নয়। কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তিনি বড়-সড় দেখে একটি স্টেশনারী দোকানে ঢুকে পড়লেন।

'ইভিনিং ইন প্যারিস' সেন্টটা আছে আপনাদের?

না, অন্য সেন্ট আছে। দেখবেন?

উঁহুঁ, এইটাই চাই।

তখন ঝমঝম করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। তিন-চারটি দোকান ঘুরতেই কাদায় পানিতে মাখামাখি। তাঁর গাল বেয়ে পানির স্রোত বইতে লাগল। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, সেন্টের শিশিটি তাঁর এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। বৃষ্টি কখন ধরবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছেন না — এমনি তাড়া। পঞ্চম দোকানে সেটি পাওয়া গেল। দোকানী শিশিটি কাগজে মুড়ে বলল, ইশ, একেবারে যে ভিজে গেছেন? রিকশা করে চলে যান।

কত দাম?

ছাব্বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দরদাম করবার ধৈর্য নেই আর। টাকার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে আজহার খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেখানে দু'টি এক টাকার নোট আর একটি আধুলী ছাড়া কিছুই নেই।

দোকানী নীরবে শিশিটি আগের জায়গায় রেখে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এ

রকম ঘটনা যেন প্রতিদিন ঘটে। কাস্টমার জিনিস কিনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে পয়সা নেই। এ যেন খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার।

আজহার খাঁ ভাবলেশহীন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বৃষ্টির ভেতর নেমে গেলেন। হু-হু করে হাওয়া বইছে। ঝড় উঠবে কিনা কে জানে। চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা জমে চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে। আজহার খাঁ নীরবে হেঁটে চলেছেন। দু' একটি রিকশা তার ঘাড়ের উপর পড়তে পড়তে সামলে উঠছে। দ্রুতগামী ট্যাক্সির উজ্জ্বল আলো মাঝে মাঝে তাঁর চোখ ঝলকে দিচ্ছে। তিনি আচ্ছন্নের মত হাঁটছেন। এই বৃষ্টি, এই শীতল হাওয়া, পায়ের কনুই পর্যন্ত ডুবে যাওয়া ময়লা পানির স্রোত কিছুই যেন নজরে আসছে না তাঁর।

"আহা, আমার মেয়ে শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে। আশা করে বসে আছে হয়তো। এমন লক্ষ্মী মেয়ে আমার। বাবার সংসারে কত কষ্ট পাচ্ছে। তার নিজের সংসার হোক, সেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি।"

এই জাতীয় অসংলগ্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে তিনি নয়াপাড়া ছাড়িয়ে হাইস্কুল ছাড়িয়ে সেইজখালী পর্যন্ত চলে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন, কি জন্য যাচ্ছেন এসব তাঁর মনে রইল না। এক সময় ইটে ধাক্কা খেয়ে পানিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলেন তাঁর পা টলছে; মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। "পাগলের মত ঘুরছি কি জন্যে?" এই ভেবে ফিরে চললেন উল্টো পথে। বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে পোস্ট অফিসের কাছে আসতেই সশব্দে বাজ পড়ল কোথাও। রাত কত হয়েছে কে জানে। বাতি-টাতি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। লোকজন শুয়ে পড়েছে। আজহার খাঁর হঠাৎ মনে হল রফিকের বাসায় গিয়ে বিশটা টাকা নিয়ে এলে হয়। কিন্তু দোকান খোলা থাকবে কতক্ষণ? তিনি ডানদিকের গলিতে ভেজা সেণ্ডেল টানতে টানতে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

ঘন অন্ধকার রাস্তা, বিজলীর আলোয় এক-আধবার সব ফর্সা হয়ে উঠে। পরক্ষণে নিকষ কালো।

রফিকের বাসায় কড়া নাড়তে গিয়ে বুঝলেন তাঁর শরীর সুস্থ নয়। প্রবল জ্বর এসেছে। পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। রফিক আঁৎকে উঠে বলল, কি হয়েছে আজহার ভাই?

না কিছু হয়নি। এক গ্লাস পানি খাওয়াও।

বাসার সবাই ভালো আছে তো? ভাবীর জ্বর কেমন?

সব ভালোই আছে, এক গ্লাস পানি আন আগে।

আজহার খাঁ উদভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। রফিক তাঁর হাত ধরল, এহ্, তোমার ভীষণ জ্বর। কি হয়েছে বল?

টাকা আছে তোমার কাছে?

কত টাকা?

গোটা বিশেক।

দিচ্ছি। তুমি একটা শুকনো কাপড় পর। আমি রিকশা আনিয়ে দিই।

আগে একটু পানি দাও।

ঘর বন্ধ করে দোকানিরা শুয়ে পড়েছিল। আজহার খাঁ হতভম্ব হয়ে দরজার সামনে

AMARBOI.COM

দাঁড়িয়ে রইলেন। রিকশাওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলল, ধাক্কা দেন না স্যার, ভিতরে লোক আছে।

তিনি প্রাণপণে দরজায় ঘা দিলেন। ভেতর থেকে শব্দ এল — কে? তিনি ভাঙা গলায় বললেন, আমি। একটু খুলেন ভাই।

কি ব্যাপার?

টাকা নিয়ে এসেছি। সেন্টের শিশিটা দিন।

খুট করে দরজা খুলে গেল। সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দোকানদার তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তিনি পকেট হাতড়ে টাকা বের করলেন।

দোকানদার বলল, আপনার কি হয়েছে?

কিছু হয়নি।

এত রাতে আসলেন কেন? সকালে আসলেই পারতেন।

রাত কত হয়েছে?

সাড়ে বারো।

দ্রুতগতিতে রিকশা চলছে। তিনি শক্ত হাতে হুড চেপে ধরে আছেন। তাঁর সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তাঁর মনে হল তিনি যে কোন সময় ছিটকে পড়ে যাবেন।

বাড়ীর কাছাকাছি সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকারে ডুবে আছে। একটি লাইটপোস্টেও আলো নেই। অল্প ঝড়–বাদলা হলেই এ দিককার সব বাতি নিভে যায়। রিকশা আজহার খাঁর বাড়ী থেকে একটু দূরে টগরদের বাড়ীর সামনে থামল। তিনি দেখলেন হারিকেন জ্বালিয়ে লিলি আর তার মা বারান্দায় বসে আছে। রিকশার বাতি দেখে দু'জনই উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের জন্যে বুঝতে পারছে না কে এল।

আজহার খাঁ ডাকলেন, লিলি লিলি। জমে থাকা পানিতে ছপছপ শব্দ তুলে মাও মেয়ে দু'জনেই দ্রুত আসছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে রিকশা থেকে নামতে গিয়ে উল্টে পড়লেন। যে জায়গাটায় তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, সেখানটায় অদ্ভুত মিষ্টি সুবাস। তিনি ধরা গলায় বললেন, লিলি তোর শিশিটা ভেঙে গেছে রে।

লিলি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার শিশি লাগবে না। তোমার কি হয়েছে বাবা?

গভীর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন আজহার খাঁ। রঞ্জু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। লিলি আর লিলির মা ভয়কাতর চোখে জেগে বসে আছেন। বাইরে বৃষ্টিস্নাত গভীর রাত্রি। ঘরের ভেতরে হারিকেনের রহস্যময় আলো। জানালা গলে ভিজে হিমেল হাওয়া আসছে।

সেই হাওয়া সেন্টের ভাঙা শিশি থেকে কিছু অপরূপ সৌরভ উড়িয়ে আনল।

AMARBOI.COM

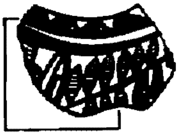

জলছবি

ফার্মগেটে বাসে উঠবার সময় জলিল সাহেবের বাম পায়ের জুতার তলাটা খুলে গেল। বাসে উঠবার উত্তেজনায় ব্যাপারটা তিনি খেয়াল করলেন না। শুধু মনে হল দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না। বাম পায়ে তেমন জোর নেই।

শাহবাগের কাছে এসে তিনি বসবার জায়গা পেলেন। অফিস টাইমে বসবার জায়গা পাওয়া অসম্ভব ভাগ্যের ব্যাপার। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঝামেলা আছে। তিনি আড়চোখে পাশে বসা লোকটির দিকে তাকালেন এবং শিউরে উঠলেন। লোকটির ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত দগদগে ঘা। লালাভ একরকম রস সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে। জলিল সাহেবের পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তার পায়ের দিকে। আর তখনই দেখলেন বাম পায়ের জুতার তলাটার কোনো চিহ্নই নেই। এক বছরও হয়নি। এর মধ্যে এই অবস্থা। পাশে বসা লোকটি বলল, ক'টা বাজে?

ন'টা।

লোকটা রাগী গলায় বলল, আপনার ঘড়িতে তো ন'টা দশ বাজে। ন'টা বললেন কেন?

জলিল সাহেব তাকিয়ে দেখলেন লোকটির হাতেও ঘা। কুষ্ঠ নাকি? তিনি বাঁ দিকে খানিকটা সরে এলেন। লোকটি পা মেলে যতটুকু জায়গা খালি ছিল সবটুকু ভরাট করে ফেলল।

আপনার জুতার কি হয়েছে?

জলিল সাহেব জবাব দিলেন না।

খুলে পড়ে গেছে নাকি?

হ্যাঁ।

বাসের অনেকগুলো লোক উঁকি দিল। যেন দারুণ একটা মজার ব্যাপার। অনেক রকম ছোট ছোট প্রশ্ন হতে লাগল, কোন সময় খুলল? টের পান নাই? বলেন কি?

কোন কোম্পানীর জুতা? বাটা নাকি? বাটা জুতার আগের কোয়ালিটি এখন আর নেই।

জুতার দোকানে না গিয়ে অর্ডার দিয়ে বানানোই এখন ভাল। হেসে-খেলে চার-পাঁচ বছর যায়।

জলিল সাহেব লক্ষ্য করলেন তাঁর সামনের সিটে বসা দু'টি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জুতা দেখতে চাচ্ছে। এই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেও তামাশা দেখা চাই। একটি মেয়ে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। এর মধ্যে হাসির ঠিক কি আছে জলিল সাহেব ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হল মেয়েরা এখন আর আগের মতো নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে তারাই সবার আগে

AMARBOI.COM

হেসে ওঠে। যেমন তাঁর অফিসের ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি। কি মায়াকাড়া চেহারা, কি মিষ্টি হাসি। একদিন লাঞ্চের সময় এসে জিজ্ঞেস করল, কি লাঞ্চ আনলেন আজ?

তিনি বললেন, রুটি আর আলু ভাজা।

কয়েকদিন পর আবার জিজ্ঞেস করল। সেদিনও তিনি বললেন রুটি আর আলু ভাজা। তারপর একদিন তিনি শুনেন ডেসপাস সেকশনের সবাই তাঁকে ডাকছে — মিস্টার পটেটু ভাজা।

এইসব তাঁকে বিচলিত করে না। কিন্তু এমন একটা মিষ্টি চেহারার মেয়ে যে এতো সুন্দর করে হাসে সে কি করে মানুষের কষ্ট নিয়ে তামাশা করে? তাছাড়া তিনি তার বাবার বয়সী। বিয়ে করলে এত বড় একটা মেয়ে তার নিশ্চয়ই থাকতো।

জলিল সাহেবের গুলিস্তানে নামার কথা কিন্তু তিনি প্রেসক্লাবে নেমে পড়লেন। জুতাটা সারানো যায় কিনা দেখতে হবে। আজ অফিসে দেরি হবেই। গত এক বছরে তিনি একদিন মাত্র দেরি করেছেন। আজকেরটা নিয়ে হবে দু'দিন। দু'দিন দেরি হলে কিছু হবে না।

কিন্তু সেকশন অফিসার নজমুল হুদা সাহেব তাঁকে সহ্যই করতে পারেন না। তিনি আসার পর থেকে শুধু খুঁত ধরার চেষ্টা করছেন। 'একি জলিল সাহেব, চিঠি লিখেছেন ডেট কোথায়? ডেট ছাড়া চিঠি হয়? বাইশ বছরে কাজ এই শিখেছেন? রিপিটিশনের বুঝি এই বানান? ডিকশনারি দেখতে পারেন না? অফিসের খরচে তো ডিকশনারি কেনা হয়। সেটা কি শুধু টেবিলে সাজিয়ে রাখবার জন্যে?'

'ভাউচারগুলো সই করিয়ে রাখতে বলেছিলাম। এখন দেখি দু'টা ভাউচারে কোনো সই নেই। পেয়েছেন কি আপনি? বাইশ বছরেও সামান্য কাজটা শিখতে না পারলে কখন পারবেন?'

'আসলে আপনার এখন অফিসের কাজে মন নেই। মন থাকলে এ রকম হয় না।'

AMARBOI.COM

মুচি ছেলেটি গম্ভীর মুখে টায়ারের রাবার কাটছে। বয়স তের-চৌদ্দর বেশি হবে না কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফসফস করে সিগারেট টানছে। এক পোচ রাবার কাটে আর গম্ভীর হয়ে সিগারেটে টান দেয়। ভাবখানা যেন রাবার কাটার মতো জটিল কাজ এ-পৃথিবীতে আর তৈরী হয়নি। বহু কষ্টে ছেলেটির গায়ে চড় মারার ইচ্ছা দমন করে জলিল সাহেব টুল কাঠের বাক্সের ওপর বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন। এগারোটা সাত মিনিটে জুতা তৈরী হল। জলিল সাহেব সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ছেলেটি ডেকে তুলল তাঁকে।

না। বয়স হয়ে যাচ্ছে। নয়তো এ রকম অসময়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে? নজমুল হুদা সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, বয়স হয়ে গেছে এখন অফিস ছেড়ে বাড়িতে বিশ্রাম করেন। অফিসের কাজ আর আপনাকে দিয়ে হবে না।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় তিনি অফিসে পৌঁছলেন। তাঁর মনে হল কিছু একটা হয়েছে। ডেসপাস সেকশনের আমিন সাহেব কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

জুতাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঠিক করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

আমিন সাহেব কোন কথা বললেন না।

রাবারের সোল লাগিয়েছি। দশ টাকা লাগল।

আমিন সাহেব শুধু বললেন, ও তাই বুঝি?

ডেসপাসের ঐ মেয়েটি হেড ক্লার্কের সঙ্গে হাত নেড়ে কি যেন বলছিল। জলিল সাহেবকে দেখেই থেমে গেল। এর মানে কি? জলিল সাহেব কৈফিয়তের স্বরে বললেন,

জুতার শুকতলিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি শীতল স্বরে বলল, বড় সাহেব আপনাকে খুঁজেছিলেন।

কখন?

সাড়ে দশটার দিকে।

কি জন্যে?

তাঁর কাছ থেকেই শুনবেন।

জলিল সাহেব নিঃশব্দে তার টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিলের উপর ক্লিয়ারেন্সের দু'টি ফাইল ছিল। তার একটিও নেই। তিনি চেয়ারে বসে ঘামতে লাগলেন। পাশের টেবিলের সুভাস বাবু মৃদু স্বরে বললেন, কোনোদিন দেরি করেন না। আজকের দিনটাই দেরি করলেন?

জলিল সাহেব বিড়বিড় করে কি বললেন ঠিক বোঝা গেল না।

আপনার ফাইল দু'টো নাজমুল হুদা সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমাকে দেখে দিতে বলেছেন।

জলিল সাহেব কিছু বললেন না।

আপনাকে বড় সাহেব দেখা করতে বলেছেন, যান দেখা করে আসুন।

জলিল সাহেব নড়লেন না। ফ্যানের ঠিক নিচেই তার চেয়ার। তবু তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন। তাঁর মনে হল নিশ্চয়ই চাকরি চলে গেছে।

আজ সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে কি বলবেন তিনি? যার বাড়িতে তিনি মাসে তিনশ' পনেরো টাকা দিয়ে থাকেন এবং খান সে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই। তব্ সে তাঁকে নিশ্চয় দশ দিনের মধ্যে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। দশ দিন পর নতুন মাস শুরু হচ্ছে। নতুন মাস থেকে অন্য একজন কাউকে সে নেবে। না নিলে তার সংসার চলবে না। তার বৌটি অবশ্যি খুব কষ্ট পাবে। এই মেয়েটি অন্য মেয়েগুলোর মতো না। এই মেয়েটির মধ্যে দয়ামায়া আছে। বড় ভালো মেয়ে।

জলিল সাহেব।

জ্বী।

বসে আছেন কেন? যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসুন।

যাই।

জলিল সাহেব উঠলেন না, বসেই রইলেন। তার দারুণ তৃষ্ণা বোধ হল। একটি বেয়ারা আছে। তাকে বললেই সে পানি এনে দেয়। কিন্তু তাকেও তিনি কিছু বললেন না। প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে ফ্যানের নিচে বসে তিনি ঘামতে লাগলেন।

প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরি চলে গেলে টাকা পয়সা তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে অল্প যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটা নিয়েই বাবার শেষ চিকিৎসা করাতে হল। জানতেন টাকাটা জলে যাচ্ছে তবু দায়িত্ব পালন। বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া যায় না।

AMARBOI.COM

ক্যান্সার, বাঁচার কোনো আশা নেই জেনেও তিন হাজার টাকা খরচ করে অপারেশন করালেন।

ডাক্তার সাহেব নিজেও নিষেধ করেছিলেন, এই বয়সে অপারেশনের শক সহ্য হবে না। বাড়িতে নিয়ে যান, শান্তিতে মরতে দিন। অপারেশন সাকসেসফুল হলেও লাভ নেই তেমন কিছু। বড়জোর বছর খানেক বাঁচবেন।

কিন্তু বাবা ক্ষেপে উঠলেন অপারেশনের জন্যে। রোজ দু'বেলা জিজ্ঞেস করেন, অপারেশন কবে? তাড়াতাড়ি করা দরকার। এইসব জিনিস যতো তাড়াতাড়ি হয় ততো ভাল।

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে মোট পাঁচ হাজার আটশ' টাকা পাওয়া গিয়েছিল। আসলে ছ'হাজার। দু'শ টাকা পান খাওয়ার জন্যে দিতে হয়েছে। তার মধ্যে খরচ হল তিন হাজার। বাকি টাকাটা ফেরত দিয়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু ফেরত দিতে ইচ্ছা করছিল না। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে মায়া লাগে। সব চকচকে নোট। হাতে নিয়ে বসে থাকতেও আনন্দ। নতুন জুতা কিনে ফেললেন একজোড়া, একটা মশারি কিনলেন। আগের মশারিটি দিয়ে তিনটি নারকেল পাওয়া গেল। সদরঘাটের পুরানো কাপড়ের দোকান থেকে ছাপ্পান্ন টাকায় কোট কিনলেন একটা। এই কোটটিই তার কাল হয়েছিল। কোটের পকেট থেকেই বাকি টাকাগুলো পকেটমার হয়। সব নতুন নোট। তিনি সেদিন অফিসে না গিয়ে রেসকোর্সের মাঠে একটা গাছের নিচে সারা দুপুর বসে ছিলেন। রেসকোর্সের মাঠটাকে গাছ-টাছ লাগিয়ে যে এতো চমৎকার করা হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

লাঞ্চ আওয়ারে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বড় সাহেবের ঘরে এয়ারকুলার আছে। সেটি বোধহয় কাজ করছে না। জলিল সাহেবের গরম লাগছে। প্রচণ্ড গরম। বড় সাহেবের পাশে নাজমুল হুদা সাহেব বসে আছেন। চেক চেক শার্টের জন্যে তাঁর বয়স খুব কম লাগছে। কিন্তু শার্টের ছাপাটা ভাল না। কেমন যেন চোখে লাগে। জলিল সাহেবের চোখ কড়-কড় করতে লাগল।

জলিল সাহেব।

জ্বী স্যার।

বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

জলিল সাহেব বসলেন।

সকাল বেলার দিকে একবার আপনার খোঁজ করেছিলাম।

জলিল সাহেব জুতা ছেঁড়ার ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় কথা আটকে গেল। বড় সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছে। তারা আপনাকে অফিসার্স গ্রেডে প্রমোট করেছে। আপনার সার্ভিসে হেড অফিস খুব স্যাটিসফায়েড।

জলিল সাহব শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন।

নাজমুল হুদা সাহেবের পাশের কামরাটাতে আপনি আপাতত কাজ শুরু করুন। জিনিসপত্র কিছু লাগলে রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে স্টোর থেকে নিয়ে নেবেন।

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন — 'কনগ্রাচুলেশনস।' হাতটি যে হ্যান্ডসেকের জন্যে

AMARBOI.COM

বাড়ানো জলিল সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। যখন পারলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি ধরা গলায় বললেন, স্যার জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উচা হয়ে আছে। খুব ব্যথা লাগছে।

ক্যান্টিনে সবাই বোধহয় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি হাসি মুখে বলল, স্যার আপনার সম্মানে আজ আমরা সবাই দুপুরে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া করবো। নজমুল হুদা সাহেবও খাবেন আমাদের সঙ্গে।

কিছু একটা বলা দরকার। সবাই হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। জলিল সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উচা হয়ে আছে।

কাদের মিয়া বিরিয়ানী এবং একটি করে টিকিয়া আনতে স্টেডিয়ামে গেছে। জলিল সাহেব তাঁর নিজের লাঞ্চ বাক্সটি হাতে করে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল ডেসপাস সেকসনের মেয়েটিকে লাঞ্চ বাক্সটি খুলে দেখান। কারণ সেখানে রুটি এবং আলুভাজা ছাড়াও একটা খেজুরগুড়ের সন্দেশ আছে। রোজ-রোজ এক জিনিস খেতে কষ্ট হয় ভেবেই বাড়ি থেকে মেয়েটি দিয়ে দিয়েছে। তিনি খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি শোনেনি। মেয়েজাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত। শুধু শুধু মায়া দেখায়। জলিল সাহেবের চোখ আবার ভিজে উঠলো। ডেসপাস সেকশনের মেয়েটি বলল, স্যার আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং জুতাটা খুলে রাখুন।

AMARBOI.COM

নন্দিনী

মজিদ বলল, চল্ তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই।

বেশ রাত হয়েছে। চারদিকে ফিনফিনে কুয়াশা। দোকানপাট বন্ধ। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাড়াগাঁর শহরগুলিতে আগে ভাগে শীত নামে। মজিদ বলল, পা চালিয়ে চল। শীত কম লাগবে।

কোথায় যাবি?

চল না দেখি। জরুরী কোন কাজ তো তোর নেই। নাকি আছে?

না নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা ছেড়ে ইট বিছানো সরু রাস্তায় এসে পড়লাম। শহর অনেক বদলে গেছে। আগে এখানে ডালের কারবারীরা বসত। এখন জায়গাটা ফাঁকা। পিছনেই ছিল কার্তিকের 'মডার্ণ সেলুন'। সেখানে দেখি একটা চায়ের স্টল। শীতে গুটিশুটি মেরে লোকজন চা খাচ্ছে। আমি বললাম, এক দফা চা খেয়ে নিবি নাকি মজিদ?

উঁহু, দেরী হয়ে যাবে।

শহরটা বদলে গেছে একেবারে। মহারাজের চপের দোকানটা এখনো আছে?

আছে।

হাঁটতে হাঁটতে ধানতলা পর্যন্ত চলে এলাম। পঞ্চতলার গা ঘেঁসে গিয়েছে হাড়িখাল নদী। আমি আর মজিদ গোপনে সিগারেট টানবার জন্যে কতবার হাড়িখালের পাড়ে এসে বসেছি। কিন্তু এখন নদী–টদী কিছু চোখে পড়ছে না।

নদীটা কোথায় রে মজিদ? হাড়িখাল এইদিকেই ছিল না?

ঐতো নদী। সাবধানে আয়।

একটা নর্দমার মত আছে এখানে। পা পিছলে পড়েই গিয়েছিলাম। সামলে উঠে দেখি নদী দেখা যাচ্ছে। আমারা নদীর বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সরু ফিতের মত নদী অন্ধকারেও চিকমিক করছে। আগে এখানে এরকম উঁচু বাঁধ ছিল না। নদীর ঢালু পাড়ে সরষের চাষ হত। মজিদ চুপচাপ হাঁটছিল।

আমি বললাম, আর দূর কত?

ঐ দেখা যাচ্ছে।

কার বাড়ী?

আয় না চুপচাপ। খুব সারপ্রাইজড্ হবি।

একটি পুরানো ভাঙ্গা দালানের সামনে দু'জন থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ীর চারপাশ ঝোপঝাড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। সামনের অপরিচ্ছন্ন উঠোনে চার–পাঁচটা বড় বড় কাগজি লেবুর গাছ। লেবুর গন্ধের সঙ্গে খড় পোড়ানো গন্ধ এসে মিশেছে। অসংখ্য মশার পিনপিনে আওয়াজ। মজিদ খট খট করে কড়া নাড়তে লাগল। ভেতর থেকে মেয়েলী গলায় কেউ একজন বলল, কে?

মজিদ আরো জোরে কড়া নাড়তে লাগল। হারিকেন হাতে একটি লম্বা রোগামত শ্যামলা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মজিদ বলল, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ।

আমি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন তো? আমি নন্দিনী।

আমি মাথা নাড়লাম।

আপনি কবে দেশে ফিরেছেন?

দু'মাস হবে। এতদিন ঢাকায় ছিলাম। এখানে এসেছি গতকাল।

মজিদ বিরক্ত হয়ে বলল, ভিতরে আয় না। ভিতরে এসে বস্।

ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। একটি টেবিলে কাঁচের ফুলদানীতে গন্ধরাজ ফুল সাজানো। চৌকিতে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো। ঘরের অন্য প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা ইজি চেয়ার। মজিদ গা এলিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়ল। হালকা গলায় বলল, চিনি এনেছি। একটু চা বানাও।

নন্দিনী হারিকেন দুলিয়ে চলে গেল। আমরা দু'জন অন্ধকারে বসে রইলাম। মজিদ ফস করে বলল, সারপ্রাইজড্ হয়েছিস নাকি?

হুঁ।

কেমন দেখলি নন্দিনীকে?

ভাল।

AMARBOI.COM

শুধু ভাল? ইজ নট শী ওয়ান্ডারফুল?

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে বললাম, এই বাড়িতে আর কে থাকে?

সবাই থাকে।

সবাই মানে?

মজিদ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুই একবার নন্দিনীকে প্রেমপত্র লিখেছিলি না? অনেক কবিতা-টবিতা ছিল সেখানে। তাই না?

আমি শুকনো গলায় বললাম, বাদ দে ওসব পুরানো কথা।

মজিদ টেনে টেনে হাসতে লাগল।

পরের দশ মিনিট দু'জনেই চুপ করে রইলাম। মজিদ একটির পর একটি সিগারেট টানতে লাগল। মাঝে মাঝে হাসতে লাগল আপন মনে।

অনেকক্ষণ আপনাদের অন্ধকারে বসিয়ে রাখলাম। ঘরে একটা মোটে হারিকেন। কি যে করি!

নন্দিনী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল।

চিনি হয়েছে চায়ে?

কাপে চুমুক দিয়ে মজিদ বিষম খেয়ে কাশতে লাগল। আমি বললাম, আপনাদের এদিকে খুব হাওয়া তো।

হুঁ নদীর উপরে বাড়ী। হাওয়ার জন্যে কুপী জ্বালানোই মুশকিল।

ভেতর থেকে কে একজন ডাকল, বউ ও বউ।

নন্দিনী নিঃশব্দে উঠে গেল। আমি বললাম, তুই প্রায়ই আসিস এখানে?

আসি।

ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ বলল, রাত হয়ে যাচ্ছে, এইবার ফিরব। নন্দিনীকে কেমন দেখলি বল না শুনি।

ভাল। আগের মতই, একটুও বদলায়নি।

নন্দিনী আমাদের ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় চারিদিক কেমন ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। মজিদ বলল, যাই নন্দিনী।

নন্দিনী কিছু বলল না। হারিকেন উঁচু করে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রইল। আমরা ধর্মতলা পর্যন্ত নিঃশব্দে হাঁটলাম। এক সময় মজিদ বলল, কলেজের ফেয়ারওয়েলে নন্দিনী কোন গানটা গেয়েছিল মনে আছে?

না মনে নেই।

আমার আছে।

মজিদ গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাজতে থাকল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, জানিস, নন্দিনীকে আমিই এ বাড়ীতে এনে তুলেছিলাম।

তাই নাকি?

ওর বাবাকে তখন মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে।

সুরেশ্বর বাবুকে মিলিটারীরা মেরে ফেলেছিল নাকি?

AMARBOI.COM

মারবে না তো কি আদর করবে? তুই কি যে কথা বলিস। মেরে তো সাফ করে ফেলেছে এদিকে।

আমি বললাম, সুরেশ্বর বাবু একটা পাগল ছিলেন। কত বললাম -- মিলিটারী আসবার আগেই পালান। না পালাবেন না, একটামাত্র মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হুস করে চলে যাবে, তা না . . .।

মজিদ একদলা থুথু ফেলে বলল, নন্দিনী তখন এসে উঠেছে হারুনদের বাসায়। হিন্দু মেয়েদের সে সময় কে জায়গা দেবে বল? কি যে মুসিবত হল। কতজনর বাড়ীতে গিয়ে হাত জোড় করে বলেছি, এই মেয়েটিকে একটু জায়গা দেবেন। এর বড় বিপদ। কেউ রাজী হয় না। শেষকালে আজিজ মাস্টার রাজী।

আজিজ মাস্টার কে?

এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের টিচার।

মজিদ একটি সিগারেট ধরাল। ঘন ঘন ধোঁয়া টেনে কাশতে লাগল। আমি বললাম, পা চালিয়ে চল, বেশ রাত হয়েছে।

মজিদ ঠাণ্ডা সুরে বলল, নন্দিনী আজিজ মাস্টারের কাছে কিছুতেই থাকতে চায়নি। বারবার বলছে — 'আপনি তো ইণ্ডিয়া যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। পায়ে পড়ি আপনার।'

আমি ধমক দিয়ে বলেছি, তুমি হিন্দু মেয়ে মুসলমানের ছেলের সঙ্গে যাবে, পথেঘাটে গিজগিজ করছে মিলিটারী। নন্দিনী কি বলেছিল জানিস?

কি?

আন্দাজ করতে পারিস কিছু?

আমি কথা বলার আগেই মজিদ চাপা গলায় বলল,

নন্দিনী বলেছে, বেশ, তাহলে আপনার বউ সেজে যাই। না হয় আপনি আমাকে বিয়ে করুন।

মজিদ এক দলা থুথু ফেলল। আমি বললাম, আজিজ খাঁ বুঝি বিয়ে করেছে একে?

হ্যাঁ।

আজিজ খাঁ কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না।

ও শালাকে দেখবি কি করে? ও মুক্তি বাহিনীর হাতে মরেছে। দালাল ছিল শালা। হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করেছে। বুঝতে পারছিস না? আর নন্দিনী কিনা তার বাড়ীতেই মাটি কামড়ে পড়ে রইল। হারামজাদী।

আমি চুপ করে রইলাম। মজিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই গলা উঁচিয়ে বলল, মেয়ে মানুষের মুখে থুথু দেই। তুই হারামজাদী ঐ বাড়ীতে পড়ে আছিস কি জন্যে? কি আছে ঐ বাড়িতে? জোর করে তোকে বিয়ে করেছে, আর তুই কিনা ছিঃ ছিঃ!

দু'জনে বাঁধ ছেড়ে শহরের প্রশস্ত পথে উঠে এলাম। বড় রাস্তাটা বট গাছ পর্যন্ত গিয়ে বেঁকে গেছে ডান দিকে। এদিকেই সুরেশ্বর বাবুর বাড়ী ছিল। আমি আর মজিদ সেই বাড়ীর সামনে শুধুমাত্র নন্দিনীকে এক নজর দেখবার জন্যে ঘুর ঘুর করতাম। কোন কোন দিন সুরেশ্বর বাবু অমায়িক ভঙ্গিতে ডাকতেন, আরে আরে তোমরা যে। এসো, এসো চা খাবে। মজিদ হাতের সিগারেট কায়দা করে লুকিয়ে ফেলে বলতো, আরেক দিন আসব কাকা।

AMARBOI.COM

মজিদ নিঃশব্দে হাঁটছিল। আমি ডাকলাম, এই মজিদ।

কি?

চুপচাপ যে?

শীত করছে।

সে কান পর্যন্ত চাদর তুলে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, জানিস, আমি আর নন্দিনী একটা গোটা রাত নৌকায় ছিলাম। রাতের অন্ধকারে আজিজ খাঁর বাড়ীতে নৌকা করে ওকে রেখে এসেছিলাম। খুব কাঁদছিল সে। আমি ওর ঘাড়ে একটা চুমু খেয়েছিলাম। মজিদ হঠাৎ কথা থামিয়ে কাশতে লাগল। আমি চারদিকের গাঢ় কুয়াশা দেখতে লাগলাম।

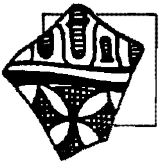

সুখ অসুখ

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে।

সুরমা আসছে। দশটা বেজে গেল নাকি? রহমান সাহেব দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। তাকাতে কষ্ট হয়। ঘাড় অনেকখানি বাঁকা করতে হয়। না দশটা বাজেনি, এখনো দশ মিনিট বাকি আছে। সুরমা আজ সকাল সকাল চলে আসছে কেন? তার সব কাজ তো ঘড়ি ধরা। রহমান সাহেব বিস্ময় বোধ করলেন।

বাবা, কিছু লাগবে?

রহমান সাহেব উত্তর দেবার আগে সুরমার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিছু কিছু মুখ আছে যেখানে মনের কোন ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেব সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনদিনই কিছু বুঝতে পারেননি। আজও পারলেন না। সুরমা দ্বিতীয়বার বলল, কিছু লাগবে আপনার?

না বৌমা। কিছু লাগবে না।

দুধ খেয়েছেন?

হু।

তোতা মিয়া আপনাকে বাথরুম করিয়ে গেছে?

এই প্রশ্নটি সুরমা প্রতি রাতেই জিজ্ঞেস করে এবং প্রতি রাতেই তিনি দারুণ লজ্জিত বোধ করেন। আজও হ্যাঁ বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে গেল।

আবার যদি বাথরুমের দরকার হয় তাহলে তোতা মিয়াকে ডাকবেন। কলিং বেলটা টেপেন।

না দরকার নাই।

বাতি নিভিয়ে দেই?

দাও।

AMARBOI.COM

সুরমা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অবশ্যি অন্ধকার হল না। সুরমা জিরো পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালাল। এই কাজ দু'টি শুয়ে শুয়ে রহমান সাহেব নিজেও করতে পারেন। তাঁর হাতের কাছে বেড সুইচ আছে। প্যারালাইসিস হবার পর থেকে শেষ বাতি নেভানোর জন্যে সুরমা আসছে। তিনি এই বাড়তি যত্নটুকু পাচ্ছেন। বড় ভাল মেয়ে।

বাতি নেভাবার পরও সুরমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে কি কিছু বলতে চায়? রহমান সাহেব উঠে বসার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তিনি যে এখন আর ইচ্ছামতো উঠে-বসতে পারেন না, তা মনে থাকে না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, বৌমা, লিলি কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ। ও ন'টার সময় ঘুমুতে যায়।

তুমি কি কিছু বলবে?

না কিছু বলব না। আপনি ঘুমান। মাথার পাশের জানালাটা বন্ধ করে দেই? শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে।

দাও।

আপনার পায়ের কাছে চাদর আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই চাদর টেনে দেবেন।

ঠিক আছে।

আর কোন রকম দরকার হলেই তোতা মিয়াকে বলবেন আমাকে ডেকে তুলতে।

ঠিক আছে মা, বলব।

সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে নিচে নেমে গেল। রহমান সাহেব মনে করতে চেষ্টা করলেন — সুরমার চোখে-মুখে ঠিক কি পরিমাণ ঘৃণা ছিল। ভাল মেয়েদের মধ্যেও ঘৃণা থাকতে পারে এবং থাকে।

বালিশের নিচ থেকে তিনি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। হাত দু'টি সচল আছে। সিগারেট ধরাতে কোন অসুবিধা হয় না। ভাগ্যিস কোমরের নিচ থেকে প্যারালাইসিস হয়েছে।

সিগারেটে টান দিয়ে নিজের মনে তিনি খানিকক্ষণ হাসলেন। মনে মনে বললেন, আমার খুব ভাল এবং খুব লক্ষ্মী বৌমাকে আমি প্যাঁচে ফেলেছি। আমাকে এই অবস্থায় ফেলে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। এইখানেই তাকে থাকতে হবে।

আফজাল নিশ্চয়ই নর্থ ডাকোটা থেকে প্রতি সপ্তাহেই লিখছে — সুরমা, বাবাকে এই অবস্থায় দেশে ফেলে তোমাদের আমেরিকায় আসার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। বাবার শরীর সুস্থ হোক। বাবার শরীর না সারা পর্যন্ত এই নিয়ে আর কিছুই করা যাবে না . . . ।

রহমান সাহেব অন্ধকারেই হাসলেন, এটা সুস্থ হবার অসুখ না। তিনি খাটের কাছে লাগানো সুইচ টিপলেন। দু'বার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই তোতা মিয়া বিরক্ত মুখে ঢুকল।

বেড প্যান দাও। পেসাব করব।

তোতা মিয়া বাতি জ্বালাল। তার মুখ অন্ধকার। হারামজাদা নবাব বেড প্যান দিতে তার কষ্ট হচ্ছে। মুখ একেবারে আঁধার হয়ে গেল।

তোতা মিয়া শুকনো গলায় বলল, সিগারেট খাইতে আম্মা নিষেধ করছে না?

চুপ থাক তুই।

আম্মা আমরারে গাইল মন্দ করে।

করলে করুক। তুই টেবিল ল্যাম্পটা মাথার কাছে দিয়ে যা।

এত রাইতে টেবিল ল্যাম্প দিয়া কি করবেন?

যাই করি। তোকে দিতে বলছি, দে।

তোতা মিয়া টেবিল ল্যাম্প এগিয়ে আনল। রাত এগারোটার দিকে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। রাতজাগার রুটিন তাঁর নতুন নয়। সুরমা বাতি নিভিয়ে দেবার পরপরই তিনি বাতি জ্বালেন। প্রায় রাতে দেড়টা দু'টা পর্যন্ত জাগেন। এই বয়সে ঘুম কমে যায়। শুধু জেগে থাকতে ইচ্ছা করে।

রহমান সাহেবের হাতের লেখা পরিস্কার। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখলেন — প্রিয় আফজাল, আমার শরীর ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। রাতদিন পাক পরওয়ারদেগারের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাকে তোমার মা'র কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আমার কারণে বৌমার যাওয়া স্থগিত আছে মনে হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করি। লিলির দিকে তাকাইলে চোখে পানি আসে। বাবা, তোমার প্রতি আমার আদেশ— তুমি আমার কথা চিন্তা না করিয়া বৌমাকে নিজের কাছে নেওয়ার ব্যবস্থা করো। এইখানে একা একা থাকিতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ইনশাআল্লাহ। তোতা মিয়া আছে। মনোয়ারের মা আছে। পাশের বাড়ির ডাক্তার সাহেব আছেন। তুমি বাবা, আমার জন্যে চিন্তা করিবে না। আমার কোনই অসুবিধা নাই . . . ।

চিঠিটা প্রায় তিন পৃষ্ঠা হল। অসুখের পর রহমান সাহেব ছোট চিঠি লিখতে পারেন না। চিঠি লম্বাই হতে থাকে। শুধু লিখতেই ইচ্ছা করে।

তিনি চিঠি শেষ করে বাতি নেভালেন। ঘুমঘুম ভাব আসছে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ঘুম হয়তো এসে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন—আফজাল চিঠির জবাবে কি লিখবে? সে নিশ্চয়ই রেগে-মেগে লিখবে — "কি করে আপনি ভাবলেন আপনার বৌমা আপনাকে ফেলে আমার কাছে আসবে? এ রকম চিন্তা করাই বাতুলতা। এ নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আমি খুব শিগগিরই দেশে এসে আপনাকে দেখে যাব।"

রহমান সাহেব আবার কলিং বেল টিপলেন। বৌমা এই বুদ্ধিটি ভাল করেছে। খাটের সঙ্গে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছে। তোতা মিয়াকে আনবার জন্যে বেশ কয়েকবার সুইচ টিপতে হল। হারামজাদা নবাব, বারোটা বাজতেই ঘুম। তাকে রাখাই হয়েছে রুগী দেখাশোনার জন্যে। রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, বেড প্যান দে।

আবার?

হ্যাঁ, আবার।

তোতা মিয়া বেড প্যান দিল। খাবার পানি দিল। টেবিল ল্যাম্প সরিয়ে রাখল। মাথার কাছের যে জানালাটা বন্ধ করা হয়েছিল সেটি খুলল। রহমান সাহেবের ফরমায়েশ তখনো শেষ হল না। তিনি হঠাৎ বললেন, পান বানিয়ে আন। পান খাব।

পান ঘরে নাই। এই বাড়িতে পান তো কেউ খায় না।

খায় না কি রে ব্যাটা? আমি খাই না? আমি তো খাই, যা নিয়ে আয়।

কোনখে আনমু?

দোকান থেকে আন।

AMARBOI.COM

এই দুপুর রাইতে?

হ্যাঁ।

দোকান তো সব বন্ধ।

চুপ, ব্যাটা বেশি কথা বলে। ঢাকা শহরে বারোটার সময় পানের দোকান বন্ধ হয়? আবার মুখে মুখে কথা।

অখন গেট খুললে আম্মার ঘুম ভাঙ্গব।

আর একটি কথা বললে চড় খাবি। পান নিয়ে আসতে বলেছি, নিয়ে আয়।

তোতা মিয়া পান আনতে যায় এবং ইচ্ছা করেই গেটে ঝনঝন শব্দ করতে থাকে। দোতলা থেকে রহমান সাহেব গেটের ঝনঝনানি শুনতে পান। এবং তার খানিকক্ষণ পর সিঁড়িতে খুট খুট শব্দ হয়। সুরমা উঠে আসছে। রহমান সাহেব চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা এলিয়ে দেন।

কি হয়েছে বাবা?

কিছু হয় নাই মা। বমি বমি লাগছে। তোতা মিয়াকে পান আনতে পাঠিয়েছি। বড় খারাপ লাগছে মা।

রহমান সাহেব ওয়াক করে বমির একটা ভঙ্গি করেন

আপনি এখনো ঘুমাননি?

ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। তোমার শাশুড়িকে স্বপ্নে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম, হাত ইশারা করে আমাকে ডাকছে। মরা মানুষের হাত ইশারা করে ডাকার স্বপ্ন খুব খারাপ।

রহমান সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুরমার দিকে। সুরমাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিশ্বাস করছে। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। এই মেয়ে তাঁর বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করে না। রহমান সাহেব মনে মনে একটা কুৎসিত গালি দিলেন। সুরমা বলল, ঘুমুতে চেষ্টা করুন। বাতি নিভিয়ে দিন।

পান আনুক। আগে পান খেয়ে নেই।

সুরমা আর কোন কথা না বলে নিচে নেমে গেল। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন, আদরের বৌমাকে আমি ভাল প্যাঁচে ফেলেছি। এখন যাও দেখি আমেরিকা? সব তো ঠিকঠাক করা ছিল। বুড়ো শ্বশুর এখানে থেকে বাড়ি পাহারা দিবে। আর তোমরা মহাসুখে থাকবে আমেরিকা। সেখানে বাড়িটারিও কেনা হয়েছে। লেকের পাড়ে বাড়ি। উইক এণ্ডে লেকে ঘুরে বেড়ানোর জন্য স্পীড বোট পর্যন্ত কেনা হয়েছে। এখন ঘুরো দেখি স্পীড বোটে? এখন আর বুড়ো বাপের কথা মনে থাকে না? বুড়ো দেশে থেকে পচুক। কিছুই যায় আসে না। ছ'মাস দশ মাস পরপর একখানা চিঠি ছাড়লেই হবে — বাবা, তুমি কেমন আছ? তুমি একা একা দেশে পড়ে আছ ভাবতেই খুব কষ্ট হয় . . .।

তোতা মিয়া পান নিয়ে এল।

রহমান সাহেব এক সঙ্গে দুটো পান মুখে দিয়ে হৃষ্টচিত্তে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন খুব কায়দা করে। মশারির ভেতর সিগারেটের ধোঁয়া মেঘের মত জমে জমে যাচ্ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

AMARBOI.COM

তোতা মিয়া বলল, আর কিছু লাগব?

না।

পেসাব করবেন আরেক বার?

না।

ঘুমাইতে যাই।

যা।

বেশ লাগছে তাঁর। তবে ঘুম চটে গেছে। বাকি রাতটা বোধহয় জেগেই কাটাতে হবে। তিনি মনে মনে আফজালের কাছে দ্বিতীয় একটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। এই চিঠিটি তিনি আগামী সপ্তাহে পাঠাবেন। বাবা, শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হইতেছে। বাঁচিয়া থাকা বড় কষ্ট। তবে আমার লক্ষ্মী বৌমা বড় যত্ন করিতেছে। আমার নিজের মেয়ে থাকিলে সেও এত কষ্ট করিত কি–না সন্দেহ। আল্লাহ তার হায়াত দরাজ করুক। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্যে খাস দিলে দোয়া করিতেছি।

ভাবতে ভাবতে রহমান সাহেব খুকখুক করে হাসলেন। ভাল প্যাঁচে আটকে দিয়েছি। প্যারালিসিস–এর রুগী সহজে মরে না। এরা শকুনের মত বেঁচে থাকে। আমিও থাকব। দেখি আমাকে ফেলে রেখে তোমরা যাও কোথায়?

তাঁর ডান পায়ের পাতা চুলকাচ্ছে। কোনমতেই চুলকানো সম্ভব নয়। তাঁর বড় অস্বস্তি লাগছে। তিনি কলিং বেলের সুইচ টিপলেন। হারামজাদা তোতা মিয়া আসছে না। ইচ্ছা করে আসছে না। জেগে মটকা মেরে পড়ে আছে। রহমান সাহেব টিপতেই থাকলেন।

খুটখুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। সুরমা উঠে আসছে না–কি? রহমান সাহেবের পায়ের চুলকানি সেরে গেল।

কি হয়েছে বাবা?

পায়ের পাতা চুলকাচ্ছিল?

কোন্ পায়ের পাতা?

ডানটা।

সুরমা মশারি তুলে মাথা ভেতরে ঢুকাল। রহমান সাহেব দেখলেন তার ফর্সা হাত এগিয়ে আসছে পায়ের দিকে ।

চুলকাতে হবে না। এখন আর নাই।

আহ কি ফর্সা হাত মেয়েটার।

বাবা, এখন কি আরাম হয়েছে?

হ্যাঁ, তুমি যাও মা। আর লাগবে না।

সুরমা গেল না। বিছানার পাশে বসল। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ে। রহমান সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন — বুঝলে বৌমা, তোমার সাথে তোমার শাশুড়ির খুব মিল আছে।

সুরমা কিছু বলল না।

সেও তোমার মত সুন্দর ছিল। তোমার মতই গায়ের রং।

রহমান সাহেবের হয়ত আরো কিছ্ বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুরমা উঠে দাঁড়াল। মশারি

AMARBOI.COM

গুঁজে দিয়ে হাল্কা সুরে বলল, মশারির ভেতর সিগারেট খাবেন না বাবা। হঠাৎ আগুন-টাগুন ধরে যাবে।

আচ্ছা আর খাব না।

সিগারেট খাবার সময় কাউকে রাখবেন আশেপাশে। এখন কি আপনার সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে? ইচ্ছা হলে একটা খান, আমি বসছি।

তিনি যন্ত্রের মত বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সুরমা চেয়ারে বসল। তার গায়ে হাল্কা নীল রঙের একটা শাড়ি। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন — বড় সুন্দর মেয়ে, তবে খুব অহংকারী। এত অহংকার ভাল না।

সুরমা তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। সময় দেখছে হয়ত। দেড়টা বাজে, অনেক রাত। এক সময় সে মৃদুস্বরে বলল — বাবা, বাইরের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা সাবধানে বলা উচিত। কেউ পেটে কথা রাখে না। চারদিকে ছড়ায়।

কাকে আমি কি বললাম?

ডাক্তার সাহেবকে আপনি বলেছেন আপনার মনে সন্দেহ কোনদিন না কোনদিন আমি বিষ-টিষ খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলব। এসব বলা ঠিক না।

ঠাট্টা করে বলেছিলাম মা।

ঠাট্টা করে বলাও ঠিক না। সবাই তো আর ঠাট্টা বুঝতে পারে না। মনে করে সত্যি।

সুরমা বসে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। তার মুখে মনের ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেবের ইচ্ছা হল জ্বলন্ত সিগারেট হাত থেকে বিছানায় ফেলে দেন। আগুন জ্বলে উঠুক। মেয়েটি দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু তার সাহস হয় না। তাঁর বড় বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

বেঁচে থাকতে তাঁর খুব ভাল লাগে।

AMARBOI.COM

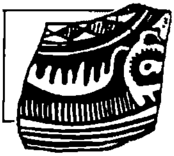

গোপন কথা

আজ আমার ঘুম ভাঙ্গল খুব ভোরে।

আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। এখনো অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ আলো-আঁধারিতে মন অন্য রকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

আমি পৃথিবীর সবাইকে ভালবেসে ফেল্লাম। আমার পাশের চৌকিতে বাকের সাহেব ঘুমিয়ে। অন্ধকারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তবু আমি নিশ্চিত জানি তিনি একটি কুৎসিত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছেন। মুখের লালায় তাঁর বালিস ভিজে গেছে। লুঙ্গি উঠে গেছে কোমরে। তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না, বাকের সাহেবকেও আমি ভালবাসব।

'বৎসরের অন্যদিনগুলি আজকের মত হয় না কেন?' — ভাবতে ভাবতে আমি সিগারেট

ধরালাম। হিটার জ্বালিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল নিঃশব্দে। তবু বাকের সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জড়ানো গলায় বললেন, চা হচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ।

আজ এত ভোরে উঠলেন যে, ব্যাপার কি? শরীর খারাপ নাকি?

জ্বি না। চা খাবেন বাকের সাহেব?

দেন এক কাপ।

এই বলেই মাথা বের করে তিনি নাক ঝাড়লেন। নাক মুছলেন মশারীতে — কি কুৎসিত ছবি। আজ চমৎকার সব ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম বাকের সাহেব নামে এ ঘরে কেউ থাকে না এবং এটা যেন-তেন কোন ঘরও নয়। এটা হচ্ছে মহিমগড়ের রাজবাড়ি এবং আমি এসেছি মহিমগড়ের রাজকন্যার অতিথি হয়ে। আর আমিও কোন হেজিপেজি লোক নই। আমি একজন কবি। আজ সন্ধ্যায় মহিমগড়ের রাজকন্যাকে আমি কবিতা শুনাবো।

মঞ্জু সাহেব।

জ্বি বলুন।

এ রকম লাগছে কেন আপনাকে? কিছু হয়েছে নাকি?

না, কি হবে?

দেখি, একটা সিগারেট দেন দেখি।

বাকের সাহেব তাঁর সাপের মত কালো রোগা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা সিগারেট দিলাম। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, বালিশের নিচে তাঁর নিজের সিগারেট আছে। বাকের সাহেব নিজের সিগারেট কমই খান। আহ্, কি সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবছি। আজ আমি একজন অতিথি-কবি। আমার চিন্তা-ভাবনা হবে কবির মত। আমি নরম স্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

জ্বি।

আজ আমার কেন জানি বড় ভাল লাগছে।

ভাল লাগার কি হল আবার?

বাকের সাহেব বড়ই অবাক হলেন। তাঁর কাছে আজকের দিনটি অন্য সব দিনের মতই। সাধারণ। ক্লান্তিকর। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, বাকের সাহেব।

বলেন।

আজ আমার জন্মদিন।

তাই নাকি?

জ্বি। এগারোই বৈশাখ।

আম-কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন রে ভাই।

এই বলেই বাকের সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আজ আমি রাগ করবো না। চমৎকার একটি সকালকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। সন্ধ্যাবেলা যাব নীলুদের বাড়ি। সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত শুধু ওর কথাই ভাববো।

বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললেন, 'পাইখানা কষা হয়ে গেছে ভাই'।

AMARBOI.COM

আমি শুনেও না শোনার ভান করলাম। আজ আমি অসুন্দর কিছুই শুনব না। আজ আমার জন্মদিন। আজ নীলুদের বাসায় যাব এবং তাকে গোপন কথাটি বলব।

ঝড় হোক। বৃষ্টি হোক। কিংবা প্রচণ্ড টর্নেডো হোক। কিছুই আসে যায় না। আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিকই যাব নীলুদের বাসায়। নীলুর বাবা হয়তো বসে থাকবেন বারান্দায়। তিনি আজকাল বেশীরভাগ সময় বারান্দাতেই থাকেন। অপরিচিত কাউকে দেখলে কপালের চামড়ায় ভাজ ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। আমার দিকেও তাকাবেন। আমি হাসিমুখে বলব, 'নীলুফার কি বাসায় আছে? ওর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।' আমি উত্তেজিত অবস্থায় ঠিকমত কথা বলতে পারি না। কথা গলায় আটকে যায়। কিন্তু আজ আমার কোন অসুবিধা হবে না। আজ কথা বলব অভিনেতাদের মত।

চা শেষ করেই বাকের সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। গলা টেনে টনে বলেন, ' ন'টা পর্যন্ত ঘুমাব। তারপর উঠে নাশতা খেয়ে আবার ঘুম। ছুটির দিনের ঘুম কাকে বলে দেখবেন। ম্যারাথন ঘুম। হা হা হা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখি আলো ফুটেছে। আকাশ হালকা নীল। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। গোপন কথা বলার জন্যে এরচে' সুন্দর দিন আর হবে না।

সকাল এগারোটায় টেলিফোন করলাম। নীলুকে টেলিফোনে কখনো পাওয়া যায় না। আজ পাওয়া গেল। নীলু কিশোরীদের মত গলায় বলল, কে কথা বলছেন?

আমি মঞ্জু।

ও, মঞ্জু ভাই। আপনি কেমন আছেন?

ভাল। তুমি কেমন আছে নীলু?

আমিও ভাল।

কি করছিলে?

পড়ছিলাম। আবার কি করব? আমার অনার্স ফাইন্যাল না?

ও তাই তো। আচ্ছা শোন নীলু, তুমি কি আজ সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে?

থাবব না কেন?

আমি একটু আসব তোমাদের ওখানে।

বেশ তো আসুন।

একটা কথা বলব তোমাকে।

কি কথা?

গোপন কথা?

আপনার আবার গোপন কথা কি?

নীলু খিল খিল করে হাসতে লাগল। কি সুন্দর সুরেলা হাসি। কি অদ্ভুত লাগছে শুনতে।

হ্যালো নীলু।

বলুন শুনছি।

আজ সন্ধ্যায় আসব।

বেশ তো আসুন। রাখলাম এখন। নাকি আরো কিছু বলবেন?

না, এখন আর কিছু বলব না।

AMARBOI.COM

নীলু রিসিভার নামিয়ে রাখার পরও আমি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে লাগিয়ে রইলাম।

মাত্র এগারোটা বাজে। আরো আট ঘণ্টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিউ মার্কেটে কিছুক্ষণ হাঁটলাম একা একা। এবং একসময় দামী একটা সার্ট কিনে ফেলাম। অন্যদিন হলে সার্টের দাম আমার বুকে বিঁধে থাকতো। আজ থাকল না। দামের কথা মনেই রইল না।

দশটি ফাইভ ফাইভ কিনলাম এ্যালিফেন্ট রোড থেকে। অন্তত আজকের দিনটিতে দামী সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। নীলুর জন্য কিছু একটা উপহার নিয়ে গেলে হয় না? কি নেয়া যায়? সুন্দর মলাটের একটা কবিতার বই। সেখানে খুব গুছিয়ে একটা কিছু লিখতে হবে যেমন, "নীলুকে — দেখা হবে চন্দনের বনে।" বইটি দেয়া হবে ফিরে আসার সময়। নীলু নিশ্চয়ই আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে। তখন বলব, 'নীলু, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন'। নীলু বলবে, ওমা আগে বলবেন তো?

আগে বললে কি করতে?

কোন উপহার-টুপহার কিনে রাখতাম।

কি উপহার?

কবিতার বই-টই।

আমি তো কবিতা পড়ি না।

না পড়লেও বই উপহার দেয়া যায়।

ঠিক এই সময় আমি মোড়ক খুলে বইটি হাতে দিয়ে অল্প হাসব। হাসতে হাসতেই বলব, আমি তোমার জন্য একটা কবিতার বই এনেছি নীলু।

সন্ধ্যাবেলা আকাশে খুব মেঘ করল, এবং একসময় শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করল। নীলুদের বারান্দায় পা রাখামাত্র সত্যি সত্যি ঝড় শুরু হল। কারেন্ট চলে গেল। সমস্ত অঞ্চল ডুবে গেল অন্ধকারে। নীলু আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন? ভিজে গেছেন দেখি। আসুন, ভেতরে আসুন। কি যে কাণ্ড করেন? কাল এলেই হতো।

বসার ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। একজন বুড়োমত ভদ্রলোক বসে আছেন। তার পাশে বিলু। বিলু আমাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, স্যার ভূতের গল্প বলছেন। উফ যা ভয়ের। তারপর স্যার বলুন।

নীলু বলল, দাঁড়ান স্যার, আমি এসে নেই। চায়ের কথা বলে আসি।

নীলু চায়ের কথা বলে এল। একটা তোয়ালে আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, মাথা মুছে ফেলুন। তারপর স্যারের গল্প শুনুন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। বানানো গল্প না।

তোমার সংগে আমার একটা কথা ছিল নীলু।

দাঁড়ান গল্প শুনে নেই।

আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

তাই নাকি?

কৃষি ব্যাংকে একটা চাকরি হয়েছে। ফিফথ গ্রেড অফিসার।

বাহ্, বেশ তো। আসুন এখন গল্প শুনুন।

AMARBOI.COM

নীলু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল, স্যার ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু। যে ভাই ওয়াশিংটন ডি.সি-তে থাকেন তাঁর। নীলুর স্যার বললেন, 'বসুন'। আমি বসলাম। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। পথ-ঘাট অন্ধকার। শ্রাবণ মাস। আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমি আর আমার বন্ধু তারাদাস পাশা পশি যাচ্ছি। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। যেন কেউ একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। তারাদাস বলল, 'কে? কে?' তখন শব্দটা থেমে গেল।

ভদ্রলোক ভালোই গল্প করতে পারেন। নীলু-বিলু মুগ্ধ হয়ে শুনছে। নীলু একটা শাড়ি পরেছে। পরার ভংগিটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তাকে বিলুর চেয়েও কম বয়স্ক লাগছে। যেন সিক্স-সেভেনে পড়া বালিকা শখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।

গল্প শেষ হতে অনেক সময় লাগল। নীলু উঠে গিয়ে চা নিয়ে এল। আমি বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নীলু অবাক হয়ে বলল, একবার তো বলেছেন।

কি বললাম?

কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।

এ কথা না। অন্য একটা কথা।

ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান স্যারের কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনি। স্যার আরেকটা গল্প বলুন।

ভদ্রলোক গল্প বলার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। গল্প হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে। নীলু ব্যস্ত হয়ে তাদের ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল।

আমি স্যারের পাশে বসলাম। নীলু হালকা গলায় বলল, আবার আসবেন মঞ্জু ভাই।

গাড়ী চলতে শুরু করতেই বিলুর স্যার বললেন, 'আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?' আমি তার জবাব দিলাম না। ভূতে বিশ্বাস করি কি না করি তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি পরশু দিন চলে যাব। অনেকদিন আর ঢাকায় আসা হবে না। আর এলেও গোপন কথা বলার ইচ্ছা হবে না হয়তো। বিলুর স্যার বললেন, পৃথিবীতে অনেক স্ট্রেঞ্জ ঘটনা ঘটে বুঝলেন মঞ্জু সাহেব, নাইনটিন সিক্সটিতে একবার কি হয়েছে শুনেন . . .।

আরেক দিন শুনব। আজ আমার মাথা ধরেছে।

আমাদের এদিকেও বাতি নেই। অন্ধকার ঘরে বাকের সাহেব শুয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখেই ক্লান্ত স্বরে বললেন, শরীরটা খারাপ করেছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।

সব পরিষ্কার করে ঘুমুতে যেতে আমাদের অনেক রাত হল। বাইরে আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাকের সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ঘুমালেন নাকি ভাই?

জ্বি না।

আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম। গরীব মানুষ কি আর দিব বলেন। বাকের সাহেব অন্ধকারে এগিয়ে দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটি। আমি নীচু স্বরে বললাম, একটা কথা শুনবেন?

AMARBOI.COM

কি কথা?

গোপন কথা। কাউকে বলতে পারবেন না।

বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বোধহয় পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয়নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগল।

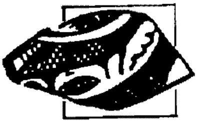

ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য

ফজলুল করিম সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'মাঝে মাঝে বড় ধরনের ক্যালামিটির প্রয়োজন আছে। বন্যার খুব দরকার ছিল।' এই বলেই তিনি পানের পিক ফেলে কড়া করে তাকালেন ইয়াজুদ্দিনের দিকে। ইয়াজুদ্দিন ভয়ে কুঁচকে গেল।

'পানে কি জর্দা দেয়া ছিল ইয়াজুদ্দিন?'

ইয়াজুদ্দিন হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। ফজলুল করিম সাহেব দ্বিতীয়বার পানের পিক ফেলে বললেন, 'তোমরা কোন কাজ ঠিকমত করতে পার না। আমি কি জর্দা খাই?'

'আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যার?'

তিনি জবাব দিলেন না। তাঁর মাথা ঘুরছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। এই সঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহও হচ্ছে যে, ইয়াজুদ্দিন নামের বোকা বোকা ধরনের এই লোকটা ইচ্ছে করে তাঁকে জর্দাভর্তি পান দিয়েছে। এরা কেউ তাঁকে সহ্য করতে পারে না। পদে পদে চেষ্টা করে ঝামেলায় ফেলতে। ইয়াজুদ্দিনের উচিত ছিল ছুটে গিয়ে পান নিয়ে আসা। তা না করে সে ক্যাবলার মত জিজ্ঞেস করছে — আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যাব। হারামজাদা আর কাকে বলে।

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, 'রিলিফের মালপত্র সব উঠেছে?'

রোগা লম্বামত এক ছোকরা বলল, 'হয়েছে স্যার।' ছোকরার চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাস চোখে দিয়ে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চূড়ান্ত অভদ্রতা — এটা কি এই ছোকরা জানে? অবশ্যি পুরোপুরি মন্ত্রী তিনি নন, প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রীদের দলের হরিজন। তিনি যখন কোথাও যান তাঁর সঙ্গে টিভি-ক্যামেরা থাকে না। বক্তৃতা দিলে খবরের কাগজে সবসময় সেটা ছাপাও হয় না। কাজেই এই ছোকরা যে সানগাস পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবু তিনি বললেন, আপনার চোখে সানগ্লাস কেন?

'চোখ উঠেছে স্যার।'

ছোকরা সানগ্লাস খুলে ফেলল। তিনি আঁতকে উঠলেন . . . ভয়াবহ অবস্থা। তাঁর ধারণা ছিল চোখ-উঠা রোগ দেশ থেকে বিদেয় হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি বিদেয় হয়নি। এই ছোকরার কাছ থেকে হয়ত তাঁর হবে। এখনি কেমন যেন চোখ কড় কড় করছে। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, 'আমরা অপেক্ষা করছি কি জন্যে?'

AMARBOI.COM

'সারেং এখনো আসেনি।'

'আসেনি কেন?'

'বুঝতে পারছি না স্যার। নটার সময় তো আসার কথা।'

তিনি ঘড়ি দেখলেন এগারোটা কুড়ি বাজে। তাঁর এগারোটার সময় উপস্থিত হবার কথা ছিল। তিনি কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় এসেছেন। অথচ তাঁর পি.এ. এসেছে এগারোটা দশে। প্রতিমন্ত্রী হবার এই যন্ত্রণা।

'ডেকে চেয়ার আছে স্যার। ডেকে বসে বিশ্রাম করুন। সারেংকে আনতে লোক গেছে।'

তিনি অপ্রসন্ন মুখে ডেকে রাখা গদিওয়ালা বেতের চেয়ারে বসলেন। সামনে আরো কিছু খালি চেয়ার আছে কিন্তু তাঁর সঙ্গের কেউ সেই সব চেয়ারে বসল না। তিনি দরাজ গলায় বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। কতক্ষণে লঞ্চ ছাড়বে কোন ঠিক নেই। বাংলাদেশ হচ্ছে এমনই একটা দেশ যে সময়মত কিছু হয় না।'

'বন্যাটা অবশ্যি স্যার সময়মত আসে।'

তিনি অপ্রসন্ন মুখে তাকালেন। কথাটা বলেছে সানগ্লাস পরা ছোকরা। কথার পিঠে কথা ভালই বলেছে। তিনি নিজে তা পারেন না। চমৎকার কিছু কথা তাঁর মনে আসে ঠিকই কিন্তু তা কথাবার্তা শেষ হবার অনেক পরে। তিনি চশমা পরা ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

'আমার নাম স্যার জামিল। নিউ ভিডিও লাইফে কাজ করি। আমি স্যার ত্রাণকার্যের ভিডিও করব।'

'ত্রাণকার্যের ভিডিও করবেন মানে? ত্রাণকার্যের ভিডিও করতে আপনাকে বলেছে কে?'

'আমাকে স্যার একদিনের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।'

'আপনি নেমে যান।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনাকে নেমে যেতে বলছি। ত্রাণকার্যের ভিডিও করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'স্যার হামিদ সাহেব বললেন . . .'

'হামিদ সাহেব বললে তো হবে না। আমি কি বলছি সেটা হচ্ছে কথা। যান, নেমে যান।'

জামিল লঞ্চের ডেক থেকে নীচে নেমে গেল। ফজলুল করিম সাহেব থমথমে গলায় বললেন, জনগণকে সাহায্য করবার জন্যে যাচ্ছি। এটা কোন বিয়েবাড়ির দৃশ্য না যে ভিডিও করতে হবে। কি বলেন আপনারা?

একজন বলল, স্যার ঠিকই বলেছেন। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সাহায্য যা দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে ছবি বেশী তোলা হচ্ছে। টিভি খুললেই দেখা যায় . . .

তিনি তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। কড়া গলায় বললেন, লঞ্চের সারেং-এর খোঁজ পাওয়া গেল কি-না দেখুন। আমরা রওনা হব কখন আর ফিরবই বা কখন? এত মিস ম্যানেজমেন্ট কেন?

দুপুর বারোটা পর্যন্ত লঞ্চের সারেং-এর খোঁজ পাওয়া গেল না। তার বাসা কল্যাণপুরে। পুরো বাড়ি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় তার পরিবার-পরিজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না —

AMARBOI.COM

এরকম একটা খবর পাওয়া গেল। ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। এত মিস ম্যানেজমেন্ট। কেউ কোন দায়িত্ব পালন করছে না।

লঞ্চ একটা দশ মিনিটে ছাড়ল। অন্য একজন সারেং জোগাড় করা হয়েছে।

ফজলুল করিম সাহেব বলে দিয়েছেন ইনটেরিয়রের দিকে যেতে হবে। এমন জায়গা যেখানে এখনো সাহায্য পৌঁছেনি। তাঁরা হবেন প্রথম ত্রাণদল।

'প্রথম দিকে এ রকম হচ্ছে — একই লোক তিন-চারবার করে সাহায্য পাচ্ছে, আবার কেউ কেউ এখন পর্যন্ত কিছু পায়নি। তবে অবস্থাটা সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যে খুবই প্ল্যানড ওয়েতে ত্রাণকার্য শুরু হবে। কি বলেন হামিদ সাহেব?'

'তা তো ঠিকই স্যার। জার্মানরা যখন প্রথম রাশিয়া আক্রমণ করল তখন কি রকম কনফিউশন ছিল রাশিয়াতে। টোটেল হচপচ। কে কি করবে, কার দায়িত্ব কি — কিছুই জানে না। এখানেও একই অবস্থা।'

ফজলুল করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর এই পি.এ-র স্বভাব হচ্ছে বড় বড় কথা বলা। বুঝিয়ে দেয়া যে, সে নিজে প্রচুর পড়াশোনা জানা লোক। সে ছাড়া বাকি সবাই মূর্খ।

'স্যার চা খাবেন? ফ্লাস্কে চা এনেছি।'

'না।'

'খান স্যার, ভাল লাগবে।'

তাঁর চায়ের পিপাসা ছিল কিন্তু তিনি চা খেলেন না। ডেকের খোলা হাওয়ায় আরাম করে চা খেতে খেতে যাওয়ার চিন্তাটাই অস্বস্তিকর। তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এতো দেখি সমুদ্র।

'সমুদ্র তো বটেই স্যার। বাতাস নেই, আরামে যাচ্ছি। বাতাস দিলে ছয়-সাত ফুট ঢেউ হয়।'

'সে-কি!'

'একটা ত্রাণলঞ্চ ডুবে গেল। আর ছোটখাটো নৌকা তো কতই ডুবছে।'

'বলেন কি! নতুন সারেং কেমন?'

'লঞ্চ ডুবার ভয় নেই স্যার। স্টিল বডি লঞ্চ। নতুন ইঞ্জিন।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'সেটা তো স্যার এখনো ঠিক হয়নি।'

'কি বলছেন এসব? চোখ বন্ধ করে চলতে থাকবে নাকি?'

'ব্যাপার অনেকটা তাই স্যার। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই পানি। এখন কম্পাস ছাড়া গতি নেই।'

'ডেস্টিনেশন তো লাগবে?'

'অফকোর্স স্যার। আমি সারেংকে বলে দিয়েছি, ঘণ্টা খানিক নদী ধরে সোজাসুজি যাবে, তারপর কোন-একটা শুকনো জায়গা দেখলে . . . শুকনো জায়গা মানেই আশ্রয় শিবির।'

'আগে দেখতে হবে ওরা সাহায্য পেয়েছে কি-না। তেলা মাথায় তেল দেয়ার মানে হয় না।'

'তা তো বটেই স্যার।'

AMARBOI.COM

'ত্রাণ সামগ্রীর লিস্ট কার কাছে?'

'আমার কাছে।'

'কি কি নিয়ে যাচ্ছি আমরা?'

হামিদ সাহেব ফাইল খুলে লিস্ট বের করলেন।

'বায়াম্নটা তাঁবু . . . '

'তাঁবু? তাঁবু কি জন্যে? তাঁবু আপনি কি মনে করে আনলেন? এটা মরুভূমি নাকি?'

'মরুভূমির দেশ থেকে আসা সাহায্য আমরা স্যার কি করব বলুন। তাঁবু ছাড়াও আরো জিনিস আছে। এক হাজার কৌটা কনসানট্রেটেড টমেটো জুস।'

'বলেন কি? কনসানট্রেটেড টমেটো জুস দিয়ে ওরা কি করবে?'

'ইরাকের সাহায্য স্যার। গত বছরে বন্যার জন্যে দিয়েছিল। গুদামে থেকে পচে গেছে বলে মনে হয়। কৌটা খুললেই ভক করে একটা গন্ধ আসে।'

'আর কি আছে?'

'পাঁচশ' বোতল ডিস্টিল ওয়াটার। এক একটা বোতল দু'লিটারের।'

'ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে কি করবে?'

'বুঝতে পারছি না স্যার। মনে হচ্ছে মেডিক্যাল সাপ্লাই, বরিক কটন আছে দুই পেটি।'

'এই সব সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হলে তো আমার মনে হয় মার খেতে হবে।'

'তা তো হবেই। বেশ কিছু ত্রাণ পার্টি মার খেয়ে ভূত হয়েছে। কাপড়-চোপড় খুলে নেংটা করে ছেড়ে দিয়েছে।'

'আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

'জ্বি না স্যার, সত্যি কথা বলছি। একটা পার্টি খুব সম্ভব শিক্ষক সমিতি — শিশু শিক্ষা বই, খাতা, পিনসিল এইসব নিয়ে গিয়েছিল। তাদের এই অবস্থা হয়েছিল।'

ফজলুল করিম সাহেব খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। হামিদ সাহেব বললেন, আমাদের এই ভয় নেই। রান্না করা খাবারও তো নিয়ে যাচ্ছি।

'কি খাবার?'

'খাবার হচ্ছে খিচুড়ি। প্রায় তিনশ' লোকের ব্যবস্থা। তারপর লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি এসবও আছে। ক্যাশ টাকা আছে।'

'ক্যাশ টাকা কত?'

'প্রায় পাঁচ হাজার।'

'প্রায়? প্রায় কি জন্যে? এগজেক্ট ফিগার বলুন।'

'পাঁচ হাজার ছিল, তার মধ্যে কিছু খরচ হয়ে গেল। ভিডিও ক্যামেরা, তারপর আপনার নতুন সারেং নিতে হল। এই খরচা বাদ যাবে।'

'ভিডিও ক্যামেরা আপনাকে কে নিতে বলল?'

'এটা তো স্যার বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা রেকর্ড থাকতে হবে না?'

ফজলুল করিম সাহেব আর কিছু বললেন না; ঝিম মেরে বসে রইলেন। চারিদিকে পানি আর পানি। নদী দিয়ে নৌকা চলছে না সমুদ্র পাড়ি দেয়া হচ্ছে বোঝার কোন উপায় নেই। আকাশ কেমন ঘোলাটে। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। তাতেই বড় বড় ঢেউ তৈরী হচ্ছে।

AMARBOI.COM

লঞ্চের গায়ে বেশ শব্দ করে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে। এর চেয়ে বড় ঢেউ উঠতে শুরু করলে মুশকিল।

দু'ঘন্টা চলার পরও কোন শুকনো জায়গা দেখা গেল না। লঞ্চের সারেং চোখ-মুখ কুঁচকে জানাল, নদী-বরাবর গেলে শুকনো জায়গা চোখে পড়বে না। আড়াআড়ি যেতে হবে। তবে সে আড়াআড়ি যেতে চায় না। লঞ্চ আটকে যেতে পারে। আড়াআড়ি যেতে হলে নৌকা নিয়ে যাওয়া উচিত।

ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, মিস ম্যানেজমেন্ট। বিরাট মিস ম্যানেজমেন্ট। এই ব্যাপারগুলো আগেই দেখা উচিত ছিল।

হামিদ সাহেব হালকা গলায় বললেন — আগে তো স্যার বুঝতে পারিনি। আপনি কিছু মুখে দিন, সারাদিন খাননি। চা আর নোনতা বিসকিট দেই? কলাও আছে। স্যার দিতে বলি?

'আপনারা কিছু খেয়েছেন? চারটা তো প্রায় বাজে।'

'খিচুড়ি নিয়ে বসেছিল সবাই। খেতে পারেনি। টক হয়ে গেছে।'

'টক হয়ে গেছে মানে?'

'সকাল সাতটার সময় রান্না হয়েছে, এখন বাজছে চারটা — গরমটাও পড়েছে ভ্যাপসা। এই গরমে মানুষ টক হয়ে যায় আর খিচুড়ি।'

লঞ্চ মাঝ-নদী কিংবা মাঝ-সমুদ্রে থেমে আছে। ফজলুল করিম সাহেব বিমর্ষ মুখে নোনতা বিসকিট এবং চা খাচ্ছেন। এক ফাঁকে লক্ষ্য করলেন ভিডিওর জামিল ছোকরা লঞ্চেই আছে, নেমে যায়নি। পানির ছবি তুলছে। হারামজাদাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে পারলে একটু ভাল লাগত, তা সম্ভব না।

নদীতে নৌকা, লঞ্চ একবারেই চলাচল করছে না। দুপুর বেলার দিকে কিছু কিছু ছিল এখন তাও নেই। হামিদ সাহেব শুকনো গলায় বললেন, কি করব স্যার? ফিরে চলে যাব?

ফজলুল করিম সাহেব জবাব দিলেন না। হামিদ সাহেব থেমে থেমে বললেন — সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে থাকা ঠিক হবে না স্যার, ডাকাতের উপদ্রব। খুবই ডাকাতি হচ্ছে। ফিরে যাওয়াই ভাল। দিনের অবস্থা খারাপ। ভাদ্র মাসে ঝড়-বৃষ্টি হয়।

'আশ্বিন মাসে ঝড় হয় বলে জানতাম। ভাদ্র মাসের কথা এই প্রথম শুনলাম।'

'আবহাওয়া তো স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন তাহলে কি রওনা হব?'

ফজলুল করিম সাহেব চুপ করে রইলেন। বন্যার পানি দেখতে লাগলেন। হামিদ সাহেব বললেন, খিচুড়ি ফেলে দিতে বলেছি। টক খিচুড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তো লাভ নেই। যে খাবে তারই পেট নেমে যাবে।'

'যা ইচ্ছা করুন। কানের কাছে বকবক করবেন না।'

'পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ আছে বলেছিলাম না, তাও ঠিক না। লঞ্চের তেলের খরচ দিতে হয়েছে। সারেং এবং তার দুই এ্যাসিসটেন্টের বেতন, ভিডিও ভাড়া, চা, নোনতা বিসকিট এবং কলার জন্যে খরচ হল চার হাজার সাতান্ন টাকা তেত্রিশ পয়সা। সঙ্গে এখন স্যার ক্যাশ আছে সাতাশি টাকা তেপ্পান্ন পয়সা।'

'আমার কানের কাছে দয়া করে ভ্যানভ্যান করবেন না।'

AMARBOI.COM

লঞ্চ ফিরে চলল। পথে কলাগাছের ভেলায় ভাসমান একটি পরিবারকে পাওয়া গেল। তিন বাচ্চা, বাবা–মা, একটি ছাগল এবং চারটা হাঁস। অনেক ডাকাডাকির পর তারা লঞ্চের পাশে এনে ভেলা ভিড়াল। সাতাশি টাকা তেত্রিশ পয়সার সবটাই তাদেরকে দেয়া হল। একটা শাড়ি, একটা লুঙ্গি এবং একটা গামছা দেয়া হল। ফজলুল করিম সাহেব দরাজ গলায় বললেন — একটা তাঁবু দিয়ে দিন। হামিদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, তাবু দিয়ে ওরা কি করবে?

'যা ইচ্ছা করুক। আপনাকে দিতে বলছি দিন।'

'তাঁবুর ভারে ভেলা ডুবে যাবে স্যার।'

'ডুববে না।'

তারা তাঁবু নিতে রাজি হল না। তার বদলে ভেলা থেকে লঞ্চে উঠে এল। এগারো–বারো বছরের একটি মেয়ে আছে সঙ্গে। সে সারাদিনের ধকলের কারণেই বোধ হয় লঞ্চে উঠে হড়হড় করে বমি করল। ফজলুল করিম সাহেব আঁৎকে উঠে বললেন, কলেরা না–কি? কি সর্বনাশ! তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেল। তিনি বাকি সময়টা কেবিনে দরজা আটকে বসে রইলেন। তাঁর গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে গেল।

পরদিনের খবরের কাগজে ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্যের একটি বিবরণ ছাপা হয় — অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জনশক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুল করিম একটি ত্রাণদল পরিচালনা করে বন্যা মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে তুলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পুরো চব্বিশ ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এখলাস উদ্দিন হাসপাতালে তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন — বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফজলুল করিম সাহেবের মত মানুষ দরকার। পরের জন্যে যাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা নন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবি ঠাকুরের একটি কবিতার চরণও আবেগজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন — "কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি।"

AMARBOI.COM

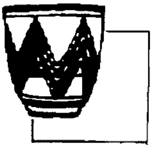

সুলেখার বাবা

ঘুম ভেঙেই সুলেখা দেখল গেটের কাছে একটি লোক উবু হয়ে বসে আছে। লোকটির চোয়াল ভাঙ্গা, মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা, চোখ দু'টি ফোলা ফোলা। সে কিছুক্ষণ পর পর পিক করে থুথু ফেলছে। কি বিশ্রী স্বভাব। নিজের চারদিকে কেউ এমন থুথু ছিটায়? এই তো সুলেখা দাঁত মাজছে। মুখ ভর্তি হচ্ছে ফেনায়। সে তো থুথ্ ফেলছে না। বেসিনে গিয়ে ফেলে আসছে। তাই নিয়ম। মুখে থুথু এলে সেটা ফেলতে হয় বেসিনে কিংবা আশেপাশে নর্দমা থাকলে নর্দমায়। থুথু কখনো গিলে ফেলতে নেই। তাদের ক্লাসের মিস এ্যানি বলে দিয়েছেন। মিস এ্যানি বিদেশিনী হলেও কি সুন্দর বাংলা বলেন শুনতে যা ভাল লাগে। তবে তিনি সুলেখা বলতে পারেন না। তিনি কেমন সুন্দর ঠোঁট গোল করে বলেন — "চুলেকা, দুষ্টু মেয়ে"। মিস এ্যানির কথাগুলি যেমন সুন্দর চেহারাও তেমনি সুন্দর। মাঝে মাঝে শাড়ি পরলে তাঁকে দেখায় ঠিক পরীর মতন।

সুলেখা ব্রাস ঘসতে ঘসতে ফুলের টবগুলির দিকে এগিয়ে গেল। ঐ লোকটা ফোলা ফোলা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাঁ চোখের কোণে এক গাদা ময়লা। দেখলেই বমি বমি ভাব হয়। সুলেখা চেষ্টা করল লোকটির বাঁ চোখের দিকে না তাকাতে। যে সব দৃশ্য কুৎসিত সে সব দেখতে নেই। কুৎসিত কিছু দেখলে মন ছোট হয়ে যায়। এই কথাটা বলেন সুলেখার মা। এবং তিনি সুলেখাকে কুৎসিত কিছু দেখতে দেন না। একবার তারা গাড়ীতে করে সোনার গাঁ যাচ্ছিল। হঠাৎ সুলেখার বাবা বললেন — মাই গড। কুকুরটাকে দেখি পিষে ফেলেছে। নির্ঘাৎ কোন ট্রাকের কাণ্ড।

AMARBOI.COM

সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবা আমি দেখব। কিন্তু মা দেখতে দিলেন না। চট করে একটা হাত দিয়ে তার চোখ ঢেকে গম্ভীর গলায় বললেন, কুৎসিত জিনিস দেখতে নেই সোনা। সুলেখার অবশ্যি কুৎসিত জিনিস দেখতে এম্নিতেই ভাল লাগে না। তার শুধু ভাল ভাল জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। দেখার মত কত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে।

ফোলা ফোলা চোখের ঐ লোকটি এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই লোকটিরও বোধহয় সুন্দর জিনিস দেখতে ইচ্ছে করে। সুলেখা তো খুবই সুন্দর। এটা তো তার নিজের কথা নয়, — সবাই বলে। মিস এ্যানি তাকে ডাকেন — সুইট এনজেল। এনজেল মানে পরী। পরীতো খুবই সুন্দর হয়। মিস এ্যানি ছাড়া অন্য আপারাও তাকে সুন্দর বলেন। নুতন একজন আপা সেদিন এলেন। পরিবেশ পরিচিতি পড়াবেন। ক্লাসে ঢুকেই বললেন — বল তো তোমরা পরিবেশ কাকে বলে? কেউ বলতে পারল না। শেষটায় তিনি সুলেখার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, এই যে সুন্দর মেয়ে, তুমি বলতে পার? সুলেখা বলতে পারল না। নতুন আপা পুরুষদের গলায় বললেন, শুধু সুন্দর হলে তো হবে না। পড়াশোনাও করতে হবে। যা রাগ

লেগেছিল সেদিন। কান্নাও পেয়েছিল। আরেকটু হলে সে কেঁদেই ফেলতো। অল্পতেই তার কান্না পায়।

সুলেখার দাঁত মাজা হয়ে গেছে। এখন আর বারান্দায় শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সে চলেই যেত কিন্তু ঐ লোকটা তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ফিক ফিক করে হাসছে। কি বিশ্রী দাঁত লোকটার। হলুদ এবং কালো। এই লোক বোধহয় কোনদিন দাঁত মাজে না। আরে কি আশ্চর্য লোকটা হাত ইশারা করে তাকে ডাকছে। সুলেখা এগিয়ে গেল। মিষ্টি রিণরিণে গলায় বলল, ডাকছ কেন?

লোকটি কিছু বলল না। মুখ ভর্তি করে হাসল। সুলেখা বলল, নাম কি তোমার?

আমার নাম নাই গো মা।

সবারই নাম থাকে।

লোকটা খুব মাথা দুলিয়ে হাসছে। যেন সুলেখার কথায় খুব মজা পাচ্ছে। সুলেখা তো কোন মজার কথা বলেনি।

তুমি হাসছ কেন শুধু শুধু?

এই কথায় লোকটি যেন আরো মজা পেয়ে গেল। অদ্ভুত শব্দ করে হাসল। হঠাৎ কল খুললে যে রকম শব্দ হয় সে রকম শব্দ। হাসিটা আবার চট করে থেমেও গেল। লোকটি পিক করে বেশ অনেকখানি দূরে থুথু ফেলল। সুলেখা কড়া গলায় বলল, চারদিকে থুথু ফেলছ কেন? ঘর ময়লা হয় না বুঝি? লোকটি কোন উত্তর দেবার আগেই সুলেখার মা বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। চোখ দু'টি অসম্ভব শুকনো। বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে মা'র মুখ এরকম হয়ে যায়। কে জানে আজ হয়তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। মা বললেন, সুলেখা, তুমি এখানে কি করছ?

কিছু করছি না মা।

যাও, হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খেতে যাও।

মা খুব কড়া গলায় কথা বলছেন। সুলেখার মন খারাপ হয়ে গেল। সে কান্না-কান্না মুখে বাথরুমের দিকে রওনা হল। মা রাগী রাগী গলায় ঐ লোকটাকে ধমকাচ্ছেন।

কোথায় তুমি ঠিকানা পেয়েছ? তোমাকে বলা হয়েছে না কোনদিন আমাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে না? কি, বলা হয় নি? চুপ করে আছে কেন? জবাব দাও।

মনটা বড় টানে আম্মা। বড় টানে।

কি আজে বাজে কথা বলছ? তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে যাতে মন না টানে। তোমার তো আরো ছেলেমেয়ে আছে, আছে না?

জ্বি আছে। আরো আছে।

তাহলে এত মন টানাটানি কিসের?

লোকটি খুক খুক করে কাশতে লাগল। মা ক্রমাগত কি সব বলতে লাগলেন। তার বেশীর ভাগই সুলেখা বুঝল না। মা আজ ভীষণ রেগেছেন। কোনদিন এ রকম রাগেন না। বাইরের লোকের সঙ্গে তো কখনো না। কি মিষ্টি করে মা কথা বলেন। শুনতে যা ভাল লাগে।

সে নাস্তা খেতে গিয়ে দেখল বাবার মুখও গম্ভীর। তাঁর হাতে একটি চটি বই। সামনে চায়ের কাপ। কিন্তু চা খাচ্ছেন না। সুলেখা তাঁর সামনে বসেছে। কিন্তু তিনি একটি কথাও

AMARBOI.COM

বললেন না। যেন তাকে দেখতেই পান নি। সুলেখা চুপচাপ বসে রইল। বুয়া এসে তাকে এক বাটি পরিজ এবং একটা সিদ্ধ ডিম দিয়ে যাবে। তার আগে তো আর কিছু করার নেই। সে চামচ দিয়ে টুং করে গ্লাসে একটা শব্দ করল। বাবা তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। অন্য সময় হলে বলতেন — খাবার সময় খেলতে নেই। খাওয়ার সময় খাওয়া। খেলার সময় খেলা।

বুয়া এবং মা ঢুকলেন একই সঙ্গে। বুয়ার হাতে পরিজের বাটি। সে বাটিটি সুলেখার সামনে রাখল।

সুলেখার মা বললেন, রহিমার মা ঐ লোকটাকে কিছু খাবার-টাবার দাও। ওকে বল গেটের বাইরে গিয়ে বসতে। কেন ভতরে ঢুকল? বাইরে যেতে বল। এক্ষুণি বল।

জ্বি আইচ্ছা।

রাতের ভাত তরকারী কিছু আছে? থাকলে ওকে তাই দাও। ভাত দাও। সুলেখার বাবা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কি চায়?

তার নাকি মন টানছে। মেয়েকে দেখতে চায়।

যত ফালতু কথা। আরো কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা।

এতো মহা যন্ত্রণা হল। বাসা চিনে গেছে। এখন তো দু'দিন পরে পরে এসে বসে থাকবে। অস্থির করে মারবে। পুলিশকে দিয়ে একটা ধমক দেওয়াবো?

সুলেখার মা বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন। বাবা বললেন, ওর বৌটার কি অবস্থা? বৌয়ের মন টানে না? বৌটা তো কখনো আসে না।

জানি না। আমি কি ওর সঙ্গে রসালাপ করতে গিয়েছি নাকি?

একশ'টা টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। এবং ভয় দেখিয়ে দাও যে আরেকবার এলে পুলিশে দেয়া হবে। আর যেন ত্রিসীমানায় ওকে না দেখি।

মা একটা চকচকে একশ' টাকার নোট সুলেখার হাতে দিয়ে বললেন — যাও, ঐ লোকটাকে দিয়ে আস। দিয়েই চলে আসবে। আবার গল্প জুড়ে দিবে না। যাবে আর আসবে।

বাবা বললেন, ওর যাবার দরকার কি? তুমি গিয়ে দিয়ে আস। মা ক্লান্ত গলায় বললেন, যাক সুলেখাই যাক। মেয়েকে দেখতে এসেছে।

লোকটি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কি রোগা একটা মানুষ। নীল রঙ্গের গেঞ্জী গায়ে। গেঞ্জীটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু লুঙ্গীটা অসম্ভব নোংরা।

সুলেখা টাকা হাতে এগিয়ে এল। লোকটি তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

সুলেখা বলল, নাও, টাকা নাও। মা দিয়েছেন।

লোকটি টাকা নিল না। বিড়বিড় করে বলল, ভাল আছ আম্মা? শইল বালা? ইস্কুলে পড়? কোন ইস্কুলে?

সুলেখা কিছু বলল না। লোকটি ফিস ফিস করে বললো, খুব অভাবের মইধ্যে পড়ছিলাম গো। খুবই অভাব। ভাতের কষ্ট হইল গিয়া খুব বড় কষ্ট। পেটের জইন্যে এই কাম করলাম। ওমন কুকাম করলাম।

কি করলে?

লোকটি তার জবাব না দিয়ে বলল, আমি কে কও দেখি?

AMARBOI.COM

কি ভাবে বলব?

আমারে চিনা চিনা লাগে না গো মা? ভাল কইরা দেখ।

সুলেখার মা বারান্দায় বের হয়ে এলেন। কর্কশ গলায় বললেন, টাকা দিয়ে চলে আসতে বললাম না? কি করছ তুমি? টাকা দিয়ে দাও।

সুলেখা বলল, টাকা নাও।

লোকটি টাকা নিল না। কুঁজো হয়ে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল। একবারও পিছনে ফিরে তাকাল না। সুলেখা বলল, ঐ লোকটা কে মা? তাকে তুমি বকছ কেন?

সুলেখার মা তার জবাব দিলেন না।

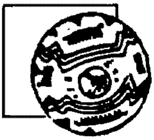

যন্ত্র

[গল্পটি এই শতকের নয়। আগামী শতকের শেষের দিকের। এই জাতীয় রচনার একটি বিশেষ নাম আছে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। কেন যে দেন না তা সাহিত্যের ছাত্র নই বলেই হয়ত বুঝি না। আমি নিজে এই জাতীয় রচনা আগ্রহ নিয়ে পড়ি। লেখার সময়ও আগ্রহ নিয়ে লিখি — পাঠকদের এই তথ্যটি খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে গল্প শুরু করছি।]

তিনি নরম গলায় বললেন, ভাই এর কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?

সেলসম্যান জবাব দিল না, বিরক্ত চোখে তাকাল। তিনি আবার বললেন, ভাই এই যন্ত্রটার কোন সাইড এফেক্ট নেই তো? সেলসম্যানের বিরক্তি চোখ থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে গেল, নীচের ঠোঁট টানটান হয়ে গেল। সে শুকনো গলায় বলল, সাইড এফেক্ট বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন?

ঃ মানে নেশা ধরে যায় কিনা। শুনেছি একবার ব্যবহার শুরু করলে নেশা ধরে যায়। রাতদিন যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকে . . .।

ঃ আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কিনবেন না। আপনাকে কিনতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এতগুলি টাকা দিয়ে যন্ত্রটা কিনবেন অথচ লোকটা তার প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না। এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে যেন তিনি...

ঃ আপনি কি যন্ত্রটা কিনবেন না দাড়িয়ে থাকবেন?

তিনি পকেট থেকে চেক বই বের করলেন। খসখস করে টাকার অংক বসালেন। হাতের লেখাটা ভাল হল না। কারণ এত বড় অংকের চেক তিনি এর আগে কাটেননি। মাত্র আটশ

গ্রাম ওজনের কালো চৌকোণা একটা বস্তু। অথচ কি অসম্ভব দাম। টাকার অংক লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যাচ্ছে।

সেলসম্যান বলল, আপনার কোন ক্রেডিট কার্ড নেই?

ঃ জ্বি না।

ঃ আপনাকে তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আপনার ব্যাংক একাউন্ট চেক করব। কম্পুটারটা ট্রাবল দিচ্ছে — একটু সময় লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে পাশের রুমে বসতে পারেন।

ঃ আমি বরং এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়।

সেলসম্যান জবাব দিল না। তাঁর কাছে মনে হল সেলসম্যানের মুখের বিরক্ত ভাব একটু যেন কমেছে। কমাই উচিত — তিনি তো শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটা কিনেছেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনের সঞ্চিত অর্থের সবটাই চলে গেছে। এর পরেও কি লোকটা তাঁর সঙ্গে সহজভাবে দু'একটা কথা বলবে না? তিনি বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আবার বললেন, ভাই এর কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?

এবার জবাব পাওয়া গেল। সেলসম্যান রোবটদের মত ধাতব গলায় বলল, না নেই।

ঃ নেশা হয় না ?

ঃ না — হয় না। তবে আপনি ইচ্ছা করে যদি নেশা ধরান তাহলে তো করার কিছু নেই। যন্ত্রটির সঙ্গে ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল আছে। ম্যানুয়েল মেনে যদি ব্যবহার করেন তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশী ব্যবহার করবেন না। সপ্তাহে অন্তত একদিন যন্ত্রটায় হাত দেবেন না।

তিনি এবার আনন্দের একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। লোকটি শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি হাসিমুখে বললেন, যন্ত্রটা নিয়ে নানান কথাবার্তা হয় তো। তাই . . .

ঃ আমাদের স্বভাবই হচ্ছে নতুন আবিষ্কার নিয়ে কথা বলা। পি থার্টি টু হচ্ছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই বিষয়ে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে?

ঃ জ্বি না।

ঃ তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন ?

ঃ ভয় পাচ্ছি না তো ।

ঃ পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। আরো আধ ঘণ্টার মতো লাগবে ।

ঃ জ্বি আচ্ছা।

ঃ একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন, এই শতাব্দীর সবচে' বড় আবিষ্কার পি থার্টি টু। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার যেমন টেলিভিশন। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?

ঃ জ্বি একমত।

তিনি মোটেই একমত না। বিংশ শতাব্দীর টেলিভিশন ছাড়াও আরো অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। এই শতাব্দীতে দশটি বড় বড় আবিষ্কার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সবচে' বড় আবিষ্কার হচ্ছে "ডেথ হরমোন"। ডাক্তার পিটার স্ট্রীম্যান প্রমাণ করেছেন, একটা নির্দিষ্ট বয়সে পিটুইটারী গ্ল্যান্ড থেকে "ডেথ হরমোন" শরীরে চলে আসে। শরীর তখন মৃত্যুর জন্যে নিজেকে তৈরী করে। শুরু হয় বার্ধক্য প্রক্রিয়া। যে হারে জীবকোষ মরে যায় সেই হারে তৈরী

AMARBOI.COM

হয় না। জরা শরীরকে গ্রাস করে। ডাক্তার পিটার ট্রীম্যান দেখালেন, সালফার এবং অক্সিজেন ঘটিত একটি আপাতদৃষ্টিতে সহজ যৌগ অণু এই কাজটি করে। তিনি যৌগটি শরীর থেকে বের করে দেবার প্রক্রিয়াও বের করলেন। এই অসম্ভব ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে পৃথিবীর কিছু ভাগ্যবান মানুষ তাদের শরীর থেকে ডেথ হরমোন বের করে দিয়েছে। জরা আর তাদের স্পর্শ করতে পারছে না।

তিনি পাশের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। এই ঘরে একটি 'কফি ডিসপেনসিং' রোবট আছে। সে তাকে এক পেয়ালা কফি দিয়ে হাসিমুখে বলেছে, আশা করি এক পেয়ালা উষ্ণ কফি আপনার হৃদয়ের শৈত্য দূর করে দেবে।

তিনি রোবটের কথার কোন জবাব দিলেন না। এদের তৈরীই করা হয় বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে মানুষকে চমৎকৃত করার জন্য। এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই মানুষ হিসাবে নিজেকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হয়। তিনি সামনের গোল টেবিলের উপর রাখা চকচকে কিছু ম্যাগাজিন থেকে একটি তুলে নিলেন। পাতা উল্টিয়ে তাঁর মুখ বিকৃত হল। ভুল ম্যাগাজিন বেছে নিয়েছেন — 'জেনো-কোড নিউস'। জেনেটিক ইনজিনীয়ারিং বিষয়ে রগরগে সব খবরে ভর্তি। এইসব খবরের কোনটির প্রতিই তাঁর কোন আগ্রহ নেই। প্রাণীর জিনের সঙ্গে উদ্ভিদের জিন লাগিয়ে কত সব অদ্ভুত জিনিস তৈরী হচ্ছে তার রগরগে বর্ণনা — পড়তে তাঁর ভাল লাগে না। টেমেটো জিনের সঙ্গে গোলাপ গাছে জিন লাগানো হচ্ছে — সাফল্য দোরগোড়ায়। এর শেষ কোথায় কে জানে? মানুষ এবং উদ্ভিদের এক সংকর প্রজাতি তৈরী হবে? আগামী পৃথিবীতে কারা বাস করবে? মানব-উদ্ভিদ?

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির মিলনে তৈরী হল নতুন প্রজাতি। তারা মানুষ না, আবার শিম্পাঞ্জিও না। গাধা ও ঘোড়ার সংকর যেমন খচ্চর এ-ও তেমনি। তবে সেই পরীক্ষা হয়েছিল গোপনে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন — নতুন প্রজাতি গ্রহণযোগ্য নয়। সেদিন এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানীর সাজা দেয়া হয়েছিল। আজ আর সেই দিন নেই। জেনেটিক ইনজিনীয়াররা আজকের পৃথিবীর সবচে' সম্মানিত মানুষ। তাঁদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব রকম সুযোগ এবং অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ এই পৃথিবীকে তাঁরা ক্ষুধামুক্ত করেছেন। জেনেটিক ইনজিনীয়ারদের কারণে আজকের পথিবীতে কোন খাদ্যাভাব নেই। সমুদ্রের শৈবালকে তাঁরা স্বাদু স্টার্চে রূপান্তরিত করেছেন। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের জিনের সংযোগে তৈরী করেছেন সুস্বাদু প্রোটিনসর্বস্ব উদ্ভিদ। জেনেটিক ইনজিনীয়াররা আজকের পৃথিবীর দেবতা।

ঃ আপনার চেক ওকে হয়েছে। আপনি যন্ত্রটি নিতে পারেন ।

ঃ আপনাকে ধন্যবাদ।

ঃ আশাকরি এই যন্ত্রের কল্যাণে আপনার সময় আনন্দময় হবে।

ঃ শুভ কামনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ ।

তিনি কালো বাক্সটি বুকের কাছে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। রাত বেশী হয়নি, তবু পথঘাট নির্জন। টাউন সার্ভিসের হলুদ বাসগুলি প্রায় ফাঁকা যাচ্ছে — তার যে কোন একটিতে উঠে

AMARBOI.COM

গেলেই হয়। উঠতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভাল লাগছে। আবহাওয়া চমৎকার, তবে একটু শীত ভাব আছে।

বেশ কিছু সময় হাঁটার পর তিনি একটা ফাঁকা বাসে উঠে পড়লেন। বাসের ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনার নৈশভ্রমণ আনন্দময় হোক। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রোবট ড্রাইভার। পৃথিবী রোবটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই সব রোবট চমৎকার কথা বলে। এদের প্রোগ্রামিং অসাধারণ।

রোবট ড্রাইভার বলল, আপনি কত দূর যাবেন?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, কাছেই।

ঃ আপনি মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

ঃ না।

ঃ কেন বলুন তো?

তিনি চুপ করে রইলেন। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। এই সব রোবটদের সঙ্গে কথা বলা মানেই হচ্ছে নিজেকে ছোট করা। রোবট গাড়ির গতি বাড়াতে বাড়াতে বলল, আমি রোবট বলেই কি আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন না?

ঃ জানি না।

ঃ আমি লক্ষ্য করেছি বেশীরভাগ মানুষ রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। সারাক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে থাকে যেন তার সমস্যার অন্ত নেই। আমি কি ঠিক বলছি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ আপনারা কি নিয়ে এত চিন্তা করেন?

তিনি জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গাড়ি রেসিডেনশিয়েল এলাকায় ঢুকেছে। রাস্তার দু'পাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। কত লক্ষ মানুষই না এইসব বাড়িতে বাস করে। তবু কেন জানি বাড়িগুলিকে প্রাণহীন মনে হয়।

রোবট ড্রাইভার গাড়ির বেগ অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। রেসিডেনশিয়েল এলাকায় গাড়ির গতি অনেক কম রাখতে হয়। ফাঁকা রাস্তা — ইচ্ছা করলেই ঝড়ের গতিতে চালানো যায়। রোবট ড্রাইভার কখনো তা করবে না। লালবাতিতে গাড়ি থামল। রোবট বলল, এই শতকে আপনারা — মানুষেরা এত অসুখী হয়ে গেলেন কিভাবে?

ঃ জানি না।

ঃ আপনাদের তো অসুখী হবার কোন কারণ নেই। মানুষ ক্ষুধা জয় করেছে, রোগ-ব্যাধি জয় করেছে। অমরত্ব তার হাতের মুঠোয়। তবু এত দুঃখ কেন?

তিনি বললেন, সামনের ব্লকে আমি নামব।

ঃ অবশ্যই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনারা মানুষরা এই শতকে সবই পেয়েছেন। হাইড্রোজেন ফুয়েল আসায় শক্তির সমস্যা মিটেছে, বাসস্থানের সমস্যা মিটেছে। আপনার নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি এ্যাপার্টমেন্ট আছে। আছে না?

ঃ হুঁ।

ঃ আপনি নিশ্চয়ই একা থাকেন না। আপনার স্ত্রী আছে।

AMARBOI.COM

ঃ হঁ।

ঃ তার পরেও পি থার্টি টু কিনে এনেছেন। অনেক টাকা গেল তাই না?

ঃ উঁ।

ঃ আপনি কি হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলবেন না?

ঃ আমি এইখানে নামব।

স্টপেজের মাঝখানে গাড়ি থামানোর নিয়ম নেই। রোবট ড্রাইভার নিয়ম ভঙ্গ করে গাড়ি থামাল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে উঁচু গলায় বলল, আপনার পি থার্টি টু আনন্দময় হোক।

তিনি রোবটদের মত গলায় বললেন, ধন্যবাদ।

তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে কাজ করেন। আজ তাঁর নাইট ডিউটি। কাজেই তিনি এ্যাপার্টমেন্টে নেই। টেলিফোনের কাছে ছোট চিরকুট লিখে রেখে গেছেন — খাবার তৈরী করা আছে। খেয়ে নিও।

তিনি খেয়ে নিলেন। অত্যন্ত স্বাদু খাবার। খাবারের সঙ্গে চমৎকার পানীয়। এই পানীয়টি এই শতকের মাঝামাঝি তৈরী করা হয়েছে — ঝাঁঝালো টক ধরনের স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ করে দেয় — বড় ভাল লাগে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন, আনন্দের কত উপকরণ চারদিকে ছড়ানো — ত্রিমাত্রিক ছবি দেখার জন্যে একটি হলোরামা, যা চালু করামাত্র অনুষ্ঠানের পাত্র-পাত্রীরা মনে হয় সশরীরে ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই তাদের ছোঁয়া যাবে।

মস্তিষ্কের আনন্দকেন্দ্র উত্তেজিত করবার জন্যে আছে নানান ব্যবস্থা। সুমধুর সংগীত শ্রবণের আনন্দ থেকে শুরু করে নারীসঙ্গের আনন্দের মত তীব্র আনন্দ মস্তিষ্ক উত্তেজিত করেই পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মানুষ কেন আনন্দ পায়, কোত্থেকে আনন্দ পায় তা জেনেছেন। তাঁরা জানেন বাগানের একটি ফুল দেখার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পিঠ চুলকানোর আনন্দের বেশ কিছু মিল আছে, আবার অমিলও আছে। ফুল না দেখেও এবং পিঠ না চুলকিয়েও অবিকল সেই আনন্দ মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তেজিত করে পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে সেই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষ তা থেকে আর আনন্দ পাচ্ছে না। মানুষ ঝুঁকেছে পি থার্টি টু-এর দিকে। কে জানে এক সময় হয়ত এই যন্ত্রটিও তার ভাল লাগবে না।

তিনি তাঁর স্ত্রীকে পি থার্টি টু কেনার খবর দেবার জন্যে ফোন করলেন। রোবটদের ভাবলেশহীন গলায় বললেন, আমি আজ একটি পি থার্টি টু কিনেছি।

ঃ সে কি সত্যি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বিরাট ভুল করেছ।

ঃ কেন?

ঃ আমাদের মত দম্পতিদের সরকার থেকে একটি করে এই যন্ত্র দেয়া হবে বলে কথা হচ্ছে। তুমি কি জানতে না?

ঃ জানতাম।

ঃ তাহলে?

ঃ কবে না কবে দেয় — আগেভাগেই কিনে ফেললাম। তুমি কি রাগ করেছ?

AMARBOI.COM

ঃ না। যন্ত্রটা কি ব্যবহার করেছ?

ঃ এখনো করিনি। এখন করব।

ঃ আচ্ছা। তোমার যন্ত্র তোমার জীবনকে আনন্দময় করে তুলুক। আমাদের মত দম্পতিদের যন্ত্রের আনন্দের প্রয়োজন আছে।

ঃ তোমাকে ধন্যবাদ।

তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। কাগজের মোড়ক খুলে কালো বক্সটি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে মনে মনে বললেন, "আমাদের মত দম্পতি" — এই বাক্যটি আমার ভাল লাগে না।

ভাল না লাগলেও তাঁর স্ত্রী এই বাক্যটি তাঁকে দিনের মধ্যে কয়েকবার বলেন। হয়ত এই নিয়ে তাঁর মনে গোপন ক্ষোভ আছে। ক্ষোভ থাকার কোনই কারণ নেই। তাঁদের মত দম্পতি পৃথিবীতে অসংখ্য আছে যাঁরা সন্তান জন্মাবার অধিকার পাননি। মানব জাতির স্বার্থেই তা করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আনার একটি শর্তই হচ্ছে একদল সন্তানহীন দম্পতি।

মানুষ মৃত্যুকে যদি সত্যি সত্যি জয় করে ফেলে তাহলে জনসংখ্যা আরো কমাতে হবে। তাঁদের মত দম্পতির সংখ্যা আরো বাড়বে।

তিনি যন্ত্র হাতে নিয়ে সোফায় এসে বসলেন। ইনস্ট্রাকশান ম্যানুয়েল মন দিয়ে পড়লেন। যন্ত্রটি ব্যবহার করা খুব সহজ — যন্ত্র থেকে বের হওয়া ঋণাত্মক ইলেকট্রোড ঘাড়ের ঠিক মাঝামাঝি লাগাতে হয়। ধনাত্মক ইলেকট্রোড থাকবে বা কপালে। স্ট্যাণ্ড বাই বোতাম টিপে কারেন্ট ফ্লো এ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এক মাইক্রো এ্যাম্পায়ারেরও কম বিদ্যুৎপ্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারেন্ট এ্যাডজাস্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল আলো জ্বলে উঠবে। তখন চোখ বন্ধ করে স্টার্ট বাটন টিপতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছুই হবে না। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে।

পি থার্টি টু যন্ত্রটি বেশ কিছু শ্বাপদ জন্তুর মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই স্মৃতি বায়ো কারেন্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় সঞ্চারিত করা হয়।

তিনি যন্ত্র চালু করে বসে আছেন। মাথায় ভোঁতা ধরনের যন্ত্রণা হচ্ছে — অল্প পিপাসাও বোধ হচ্ছে। হঠাৎ সেই পিপাসা হাজারো গুণে বেড়ে গেল। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে — এই তৃষ্ণার কারণেই বোধ হয় তাঁর ঘ্রাণশক্তি লক্ষগুণ বেড়ে গেল। তিনি এখন সব কিছুর ঘ্রাণ পাচ্ছেন। মাটির ঘ্রাণ, ফুলের ঘ্রাণ, গাছের শেকড়ের ঘ্রাণ। তাঁর জগৎটি ঘ্রাণময় হয়ে গেছে। এবং তিনি বুঝতে পারছেন তিনি শহরের সাতানব্বুই তলার সাজানো-গোছানো কোন এ্যাপার্টমেন্টে বাস করেন না। তিনি বাস করেন বনে। গহীন বনে। তিনি কে? তিনি কি...

বোঝা যাচ্ছে, পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি একটি চিতাবাঘ। বাঘ নয় বাঘিনী। তাঁর তিনটি শিশু শাবক আছে। গত দু'দিন এদের তিনি আগলে রেখেছেন। আজ প্রবল তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে এদের ছেড়ে পানির সন্ধানে বের হয়েছেন। পানি কোথায় আছে তা তিনি জানেন — পানিরও গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মাটির গন্ধের শতগুণ তীব্র। পানি আছে, কাছেই আছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি পানির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারেন কিন্তু যেতে পারছেন না। কাছেই

AMARBOI.COM

কোথায় যেন পুরুষ বাঘটা ঘুরঘুর করছে। এর মতলব ভাল না। বাচ্চাটাকে এ হয়ত মেরে ফেলবে। এদের একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না। অথচ তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

আকাশে বিরাট চাঁদ। তার আলোয় বনভূমি ঝলমল করছে। কনকন করে বইছে শীতের বাতাস। বাতাসে কি অদ্ভুত শব্দেই না গাছের পাতা নড়ছে। যে সব পাতা নড়ছে তার থেকে এক ধরনের গন্ধ আসছে। আবার স্থির পাতা থেকে অন্য ধরনের গন্ধ। কি বিচিত্র, কি বিচিত্র চারপাশের জগৎ। কোন্ স্তরেই না পৌঁছে গেছে অনুভূতির তীব্রতা।

তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে — অথচ কি আনন্দই না তিনি রক্তের ভেতর অনুভব করছেন। তিনি জলের সন্ধানে এগুচ্ছেন অথচ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর শাবকদের দিকে।

তারো অনেক পরের কথা।

ডেথ হরমোন রক্তের ভেতরই ভেঙে ফেলার অতি সহজ পদ্ধতি বের হয়েছে। মানুষ জরা রোধ করেছে। মানুষকে এখন অমর বলা যেতে পারে। বার্ধক্যজনিত কারণে তার আর মৃত্যু হবে না। জীবাণু এবং ভাইরাসঘটিত কোন অসুখও পৃথিবীতে নেই। মানুষকে এখন কি তাহলে অমর বলা যাবে? হয়ত বা।

অমর মানুষরা এখন দিনরাত ঘরেই বসে থাকে। তাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। কাজের জন্যে আছে রোবট শ্রেণী। চিন্তা–ভাবনারও কিছু নেই। অমরত্বের বেশী আর কিছু তো মানুষের চাইবারও নেই। এখনকার মানুষ দিনের পর দিন একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে থাকে। পি থার্টি টু যন্ত্র লাগিয়ে পশুদের জীবনের অংশবিশেষ যাপন করতে তাঁদের বড় ভাল লাগে। এই তাঁদের একমাত্র আনন্দ।

AMARBOI.COM